বঙ্গীয়

লোক-সঙ্গীত রত্নাকর

বাংলার লোক-সঙ্গীতের কোষগ্রন্থ

(An Encyclopaedia of Bengali Folk-Song)

চতুর্থ খণ্ড

ভ হইতে হ

Sponsored by the Sangeet Natak Akademi

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য এম. এ., পি-এইচ্. ডি.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক,

ভারতের জাতীয় সঙ্গীত নাটক আকাদেমির রত্নসদস্য,

পশ্চিমবঙ্গ লোক-সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদের অবৈতনিক অধ্যক্ষ

পশ্চিমবঙ্গ লোক-সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ

৩২, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড্

কলিকাতা-৩৪

Vangiya Loka-Samgit Ratnakar, Vol. IV

(An Encyclopaedia of Bengali Folk-Song, Vol. IV)

Professor Asutosh Bhattacharyya, M. A., Ph. D., F. N. A.

প্রকাশক
শ্রীঅরূপকুমার ভট্টাচার্য এম এ
৩২, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড্
কলিকাতা ৩৪

প্রথম সংস্করণ, কার্তিক, ১৩৭৪ (১৯৬৭)

পরিবেশক
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

মূল্য ছয় টাকা মাত্র

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র পান, ১—২৭ ফর্মা পর্যন্ত নবীন সরস্বতী প্রেস, ১৭, ভীম ঘোষ লেন হইতে ও অবশিষ্টাংশ ৭এ, বলাই সিংহ লেন, অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে মুদ্রিত।

নিবেদন

'বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত' রত্নাকর বা বাংলা লোক-সঙ্গীতের কোষগ্রন্থ চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহাই এই গ্রন্থের সর্বশেষ খণ্ড। ইহাতে 'ভ' হইতে 'হ' আদ্য অক্ষরযুক্ত বাংলার লোক-সঙ্গীত স্থান পাইল। তদুপরি ইহার পরিশিষ্টে (পরিশিষ্ট—ক) একটি 'সংযোজন' যুক্ত করা হইল; তাহাতে বিভিন্ন খণ্ডে যে সকল লোক-সঙ্গীত পূর্বে যথাস্থানে উদ্ধৃত হইতে পারে নাই, বর্ণানুক্রমিক তাহাদিগকে যোগ করা হইল। 'বাংলার লোক-সঙ্গীতের সুর-বিচার' শীর্ষক একটি আলোচনাও পরিশিষ্টে (পরিশিষ্ট—খ) যুক্ত হইল। কারণ, সঙ্গীতগুলির পরিচয় দিতে গিয়া ইহাদের সুরের বিষয় এই পর্যন্ত কিছুই বলা হয় নাই, অথচ সুরের মধ্যেই সঙ্গীতের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। কয়েকটি পল্লী-সঙ্গীতের স্বরলিপিও ইহার পরিশিষ্টে (পরিশিষ্ট—গ) যুক্ত হইল। স্থানাভাব বশত বিস্তৃততর স্বরলিপি দেওয়া সম্ভব হইল না। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, পল্লী-সঙ্গীতের স্বরলিপি রচনা করিবার কার্য অত্যন্ত দুরূহ, ইহাদের সুর পল্লীবাসীর এমনই নিজস্ব যে তাহা সহুরে সুরকারিদিগের কণ্ঠে কখনও সম্পূর্ণ ধরা দেয় না, সুতরাং তাঁহারা যে স্বরলিপি রচনা করেন, তাহা দ্বারা ইহাদের সুর সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা সৃষ্টি হইলেও তাহাতে ইহাদের যথার্থ চরিত্রটি সম্যক্ প্রকাশ পায় না। সর্বশেষে ইহার পরিশিষ্টে (পরিশিষ্ট—ঘ) 'বাংলার লোক-নৃত্যের বর্ণানুক্রমিক একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশিত হইল। কারণ, সঙ্গীতগুলির পরিচয় দিতে গিয়া অনেক ক্ষেত্রেই ইহাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন কোন নৃত্যেরও উল্লেখ করা হইয়াছে; সুতরাং এই লোক-নৃত্যগুলির পটভূমিকাতেই লোক-সঙ্গীতগুলি জানা আবশ্যক। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে লোক-নৃত্যের আলোচনা স্বভাবতই সংক্ষিপ্ত হইল।

এই খণ্ডের প্রারম্ভেই কয়েকটি প্রচলিত লোক-সঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্রের চিত্র দেওয়া হইল। পল্লীবাংলার প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রগুলির অধিকাংশই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; যাহা এখনও আছে, তাহাদেরও আকৃতি এবং ব্যবহার দ্রুত পরিবর্তিত হইতেছে। বাংলার প্রাচীন সাহিত্য বিশেষত মঙ্গলকাব্যে বহুসংখ্যক বাদ্য-যন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়; তাহাদের অধিকাংশেরই আজ আর কোন সন্ধান

পাওয়া যায় না। যাহাদের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাদেরও প্রয়োগ পদ্ধতি পরিবর্তিত হইয়াছে। তথাপি যে কয়টি মাত্র বাদ্যযন্ত্রের চিত্র প্রকাশিত হইল, তাহাদের মধ্য দিয়াই বাংলার নিজস্ব বাদ্যযন্ত্রগুলি সম্পর্কে এখনও কিছু ধারণা করা যাইতে পারিবে।

এই খণ্ডটি পরিকল্পিত গ্রন্থের সর্বশেষ খণ্ড বলিয়াই ইহার উদ্ধৃতি প্রায় সর্বত্রই সংক্ষিপ্ত করিতে হইয়াছে, স্থানাভাবে বহু উদ্ধৃতি পরিত্যক্ত হইয়াছে, তথাপি কোন প্রয়োজনীয় বিষয় যাহাতে ইহার মধ্যে একেবারেই বাদ পড়িয়া না যায়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখিয়াছি।

ইহার মধ্যে যে সকল গানের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী, ভাদু, মুর্শিদ্যা, যাত্রাগানই প্রধান। ভাওয়াইয়া উত্তর বাংলার সর্বাধিক জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত। কোন আঞ্চলিক বিষয়-বস্তু কিংবা সমসাময়িক কোন ঘটনা ইহার উপজীব্য না হইয়া নর-নারীর শাশ্বত প্রেমানুভূতি ইহার নির্ভর বলিয়া ইহা আঞ্চলিক হওয়া সত্ত্বেও সর্বত্র সমান সমাদর লাভ করিয়াছে। উত্তর বাংলার অধিবাসী পল্লীগীতির সুপ্রসিদ্ধ গায়ক মৌলভি আব্বাসউদ্দীন এই গান বাংলার সঙ্গীত-রসিকদিগের সমাজে সুপরিচিত করিয়াছেন। ভাওয়াইয়া গানের আর একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, প্রেম-সঙ্গীত হওয়া সত্ত্বেও ইহার মধ্যে রাধাকৃষ্ণের নাম প্রবেশ করিতে পারে নাই। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-কাহিনীর মধ্যে যে মানবিক-প্রেরণাই থাকুক না কেন, একটি সুনির্দিষ্ট কাহিনীর ধারা অনুসরণ করিয়া ইহা রচিত হয়, ইহার পটভূমিকায় যমুনা, বৃন্দাবন, জটিলা কুটীলা ইত্যাদির কতকগুলি চিত্র অবিচল হইয়া আছে। সেইজন্য ভাব-গভীরতা সত্ত্বেও ইহারা বৈচিত্র্যহীন হইয়া উঠে। কিন্তু উত্তর বাংলার ভাওয়াইয়া গান রাধাকৃষ্ণের কাহিনী নিঃসম্পর্কিত রচনা বলিয়া তেমন সুনির্দিষ্ট কোন অবিচল পটভূমিকা তাহাতে রচিত হয় নাই। সেইজন্য ইহাদের মধ্যে চিত্রগত বৈচিত্র্য সৃষ্টির কোন বাধা হইতে পারে নাই। কখনও প্রবাসী সাধু বা সদাগর, কখনও মৈযাল, কখনও রাখাল, কখনও মাহুত, কখনও তিস্তা নদীর মাঝি ইহাদের নায়ক হইয়া থাকে, বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে ইহাতে নানা বৈচিত্র্য-সৃষ্টির অবকাশ হয়।

ভাটিয়ালী বাংলার পল্লী-সঙ্গীতের এক অতি প্রাচীন সুর। পূর্ববঙ্গের বিশেষ প্রকৃতি অনুযায়ীই সেখানেই ইহার উৎপত্তি এবং বিকাশ হইয়াছে, পশ্চিম কিংবা উত্তর বাংলায় ইহা নানাভাবে প্রচার লাভ করিলেও ইহা সেখানের জল-

বায়ুতে স্বাঙ্গীকৃত হইতে পারে নাই। ভাটিয়ালীর মধ্যে রাধাকৃষ্ণের নাম এবং নানা তত্ত্বকথা প্রবেশ করিয়াছে, পূর্ববাংলার বাউল, বৈরাগ্য এবং দেহতত্ত্বের গান ভাটিয়ালী সুরেই গীত হয়—ভাওয়াইয়ার মত ইহা কেবলমাত্র প্রেমসঙ্গীত প্রচারক নহে। বিষয়ের দিক দিয়া বাংলার সকল লোক-সঙ্গীতের মধ্যে ইহা বৈচিত্র্যপূর্ণ। ইহা বাংলা দেশের একটি মৌলিক সুর, ইহা আশ্রয় করিয়া পরবর্তী কালে লোক-সঙ্গীতের বিভিন্ন সুরের সৃষ্টি হইয়াছে।

বর্তমান খণ্ডে কিছু বেশি সংখ্যক মুর্শিদ্যাগান প্রকাশিত হইল। এই গানগুলি পূর্বে প্রায় কোথাও প্রকাশিত হয় নাই, প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে ইহারা সংগৃহীত হইয়াছিল। যে সুফীধর্ম অবলম্বন করিয়া ইহারা উৎপত্তি এবং বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহা আজ বহুল পরিমাণে জনপ্রিয়তা হইতে বঞ্চিত বলিয়া ইহাদের প্রচারও ক্রমে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে ; অথচ কি ভাবে একদিন নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে যে ইসলাম ধর্ম প্রচার লাভ করিয়াছিল, ইহাদের মধ্য দিয়া তাহা অনুভব করা যায়। সুফীধর্মের মধ্যে একটি সমন্বয়ের ভাব আছে ; বাংলার মৌলিক ধর্মচেতনার সঙ্গে ইহার অন্তরগত কোন বিরোধ ছিল না বলিয়াই ইহা সেদিন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সাধারণ বাঙ্গালীর নিকট সার্থক আবেদন সৃষ্টি করিয়াছিল, এই গানগুলির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই যে সর্বজনীন আবেদন প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেই ইহারা সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে, রাধাকৃষ্ণের নাম ইহাদের মধ্যে গৃহীত হইতেও কোন বাধা হয় নাই।

যাত্রাগান সম্পর্কেও বর্তমান খণ্ডে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে ; কারণ, যাত্রা বাংলার লোক-নাট্য ও লোক-সঙ্গীতের এক মিশ্র অনুষ্ঠান, ইহা বাঙ্গালীর লোক-সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট রূপ।

'বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকরে'র চারিখণ্ডে প্রকাশিত উপকরণগুলি সামগ্রিকভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বাংলার জন-জীবনের কতকগুলি অনাবিষ্কৃত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে। ইহাতে দেখা যাইবে, দেশে সর্বব্যাপী নিরক্ষরতা সত্ত্বেও কি ভাবে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের কাহিনী সর্বত্র বিস্তার লাভ করিয়াছে। বাংলার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসী ভিন্ন ভাষাভাষী আদিবাসী সমাজেও কি ভাবে বাংলা ভাষার মাধ্যমে পুরাণ-কাহিনী প্রচারিত হইয়াছে ; রামলীলা, হরগৌরী এবং রাধাকৃষ্ণের কাহিনী বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনের বিভিন্ন স্তরে কি ভাবে নিজেদের স্বাক্ষর রাখিয়াছে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, বাংলার জনসাধারণকে আমরা নিরক্ষর মনে করিলেও মূর্খ মনে

করিতে পারি না ; কারণ, যাহারা বাউল, মুর্শীদ্যা, দেহতত্ত্ব, গুরুবাদী ইত্যাদি গভীর দার্শনিক তত্ত্বমূলক সঙ্গীত রচনা করিয়া শিষ্য পরম্পরায় তাহা প্রচার করিয়া আসিয়াছে, তাহারা আর যাহা হউক, মূর্খ বলিয়া অবজ্ঞার পাত্র নহে। বাঙ্গালীর ধর্মচিন্তার যে এক সূক্ষ্ম ধারা জন-মানসের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়া বাঙ্গালীর আধ্যাত্মিক সাধনার বিশেষত্ব প্রমাণিত করিয়াছে, তাহাও সংগৃহীত লোক-সঙ্গীতগুলির ভিতর দিয়া উপলব্ধি করা যায়। বাংলার সাধারণ জনগণের সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক-সাধনার ইতিহাসে এই সকল অলিখিত উপকরণ কিছুতেই অবজ্ঞাত হইতে পারে না। অথচ সংগ্রহ এবং শৃঙ্খলার সঙ্গে তাহা প্রকাশ করিবার অভাবে এই পর্যন্ত কেহই ইহাদিগকে এই কার্যে ব্যবহার করিতে পারেন নাই। 'বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর' সেই অভাব অনেকখানি পূর্ণ করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

বর্তমান খণ্ডে প্রকাশিত স্বরলিপিগুলি খ্যাতনামা লোক-সঙ্গীত গায়ক শ্রীমন্মথলাল দাস রচনা করিয়াছেন। অধিকাংশ সঙ্গীতের সংগ্রহ কালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার ছাত্রছাত্রীগণ সাহায্য করিয়াছেন। সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন বুনিয়াদি শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের নিকট হইতেও এই কার্যে সাহায্য লাভ করিয়াছি। ডক্টর শ্রীঅজয়কুমার চক্রবর্তী, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এবং সিরাজুদ্দিন কাশীমপুরীর সংগ্রহ হইতেও সাহায্য পাইয়াছি। পশ্চিমবাংলা সরকারের বনবিভাগের সংরক্ষক (Conservator) আমার প্রাক্তন ছাত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী সংগ্রহকার্যে সাহায্য করিয়াছেন। মুদ্রণ ব্যাপারে আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র অধুনা অধ্যাপক শ্রীসনৎ কুমার মিত্রও নানাভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। জাতীয় সঙ্গীত নাটক আকাদেমির অর্থসাহায্যে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া ইহার মূল্য এত সুলভ করা সম্ভব হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা বিভাগ
দীপান্বিতা, ১৩৭৪ সাল

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

বিভিন্ন সংগ্রহ-শিবিরে অংশগ্রহণকারিগণ

১৯৬২

অযোধ্যা পাহাড়, কাঁটাদি—পুরুলিয়া

সুমিত্রা চট্টোপাধ্যায়, রমা রায়, দীপালি ঘোষ, কমলা পেরেরা, সাধনা লাহিড়ী, শকুন্তলা দেবী, সুমিত্রা দাশগুপ্ত, তাপসী বসু, তুষার চট্টোপাধ্যায়, দুলাল চৌধুরী, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত চক্রবর্তী, পার্থ ঘোষ, সুধাংশু শাসমল, নারায়ণ ইন্দ্র, অমর আদক, শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত। শিবিরাধ্যক্ষ—ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য।

সারগাছি—মুর্শিদাবাদ

শ্রীপ্রশান্ত সেনগুপ্ত এবং সারগাছি রামকৃষ্ণমিশন বুনিয়াদি শিক্ষকশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ছাত্রগণ। শিবিরাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য।

১৯৬৩

বাঁশপাহাড়ী—ঝাড়গ্রাম (মেদিনীপুর),

শিখা মিত্র, অঞ্জলি বসু, মন্দিরা গুহ, বেলা ঘোষাল, চন্দন রুদ্র, মুক্তি দত্ত, কাজল ঘোষ, উমা সিংহ, সুপ্রিয়া মৈত্র, সঙ্গিনী সনাতনী, পুর্ণিমা গুপ্ত, আশিস্ মজুমদার, নবেন্দু সেন, প্রদীপকুমার সরকার, লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য, অচিন্ত্যকুমার সরকার, বাঁশরীমোহন ভট্টাচার্য, সুনীলকৃষ্ণ দেব, তুষার চট্টোপাধ্যায়, দিব্যজ্যোতি মজুমদার, দেবব্রত চক্রবর্তী, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সনৎ মিত্র। শিবিরাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য।

সারগাছি—মুর্শিদাবাদ

শ্রীপ্রশান্ত সেনগুপ্ত এবং সারগাছি রামকৃষ্ণমিশন বুনিয়াদি শিক্ষকশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ। শিবিরাধ্যক্ষ--ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য।

১৯৬৪

বাঁশপাহাড়ী—ঝাড়গ্রাম (মেদিনীপুর)

কমলা সরকার, সুষমা, মাজি, মিনতি গোস্বামী, আরতি দেব, সান্ত্বনা দাস, ধীরা চক্রবর্তী, ধীরা মিত্র, মীনা রায়, সাধনা হাজরা, মঞ্জুলা বসু, নমিতা মজুমদার, নীলা দে, লীলা ঘোষ, জ্যোৎস্না মোদক, শতাব্দী মজুমদার, স্বপ্না মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা গোস্বামী, ইলা ঘোষ, মঞ্জুশ্রী ঘোষাল, রমা ধর, শোভনা ভড়, গোবিন্দ হালদার, পরমেশ্বর সী, ত্রৈলোক্যনাথ মিশ্র, অপূর্বকৃষ্ণ রায়, তুষার চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত চক্রবর্তী, দিব্যজ্যোতি মজুমদার, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়। শিবিরাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য।

সারগাছি—মুর্শিদাবাদ

শ্রীপ্রশান্ত সেনগুপ্ত এবং সারগাছি রামকৃষ্ণমিশন বুনিয়াদি শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ। শিবিরাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য।

১৯৬৫

বেলপাহাড়ী—ঝাড়গ্রাম (মেদিনীপুর)

ডলী সেনগুপ্ত, মঞ্জু রায়, নূপুর সরকার, ইরা রায়, কৃষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায়, মঞ্জরী মজুমদার, গৌরী ভট্টাচার্য, শুভ্রা মুখোপাধ্যায়, মানস মজুমদার, পূর্ণানন্দ মাইতি, বারিদবরণ মণ্ডল, নিমাই সিংহ রায়, বরুণ চক্রবর্তী, সুভাষ পাণ্ডা, রমেন্দ্রনাথ অধিকারী, দেবব্রত চক্রবর্তী, দিব্যজ্যোতি মজুমদার, দুলাল চৌধুরী, সনৎ মিত্র। শিবিরাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য।

১৯৬৬

হাতীবাড়ী—ঝাড়গ্রাম (মেদিনীপুর)

কৃষ্ণা দত্ত, প্রভা গোস্বামী, নন্দিতা চৌধুরী, শান্তা সেন, মালতী চক্রবর্তী, গীতা ভৌমিক, গৌরী ভট্টাচার্য, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক সরকার, দিলীপ ঘোষ, বারিদবরণ মণ্ডল, সমীর সেনগুপ্ত, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত। শিবিরাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য।

১৯৬৭, এপ্রিল

কুইলাপাল—পুরুলিয়া

সমীর সেনগুপ্ত, দুলাল চৌধুরী, বরুণ চক্রবর্তী, তুষার চট্টোপাধ্যায়, দিব্যজ্যোতি মজুমদার, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত, দিলীপ ঘোষ, গৌরী ভট্টাচার্য, কৃষ্ণা দত্ত, শান্তা সেন, প্রভা গোস্বামী, নন্দিতা চৌধুরী, ইরা রায়, গীতা ভৌমিক, সনৎ মিত্র। শিবিরাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য।

১৯৬৭, মে

হাতীবাড়ী—ঝাড়গ্রাম (মেদিনীপুর)

সীমা সেনগুপ্ত, রুবি সেনগুপ্ত, গীতা কয়াল, সন্ধ্যা মণ্ডল, জয়শ্রী ঘোষ, বনানী সরকার, রত্না ভট্টাচার্য, বুলা সেনগুপ্ত, মমতা বসু, মিনু মুখোটি, শান্তিশ্রী ধর, কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, উজ্জয়িনী রায়, সুনীল মণ্ডল, অজিত বেরা, জয়ন্ত রায়, সনৎ মিত্র। শিবিরাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য।

বিষয়-সূচী

ভ

ম

পরিশিষ্ট

ক—সংযোজন

বিষয়	পৃষ্ঠা

❋

বঙ্গীয়

লোক-সঙ্গীত রত্নাকর

চতুর্থ খণ্ড

ত—হ
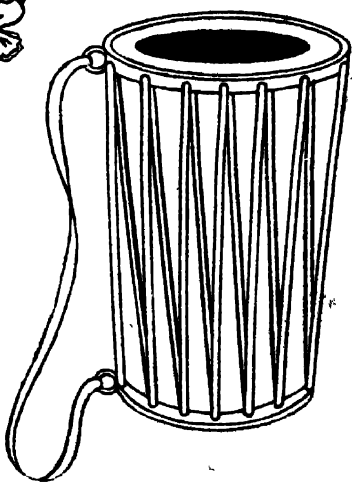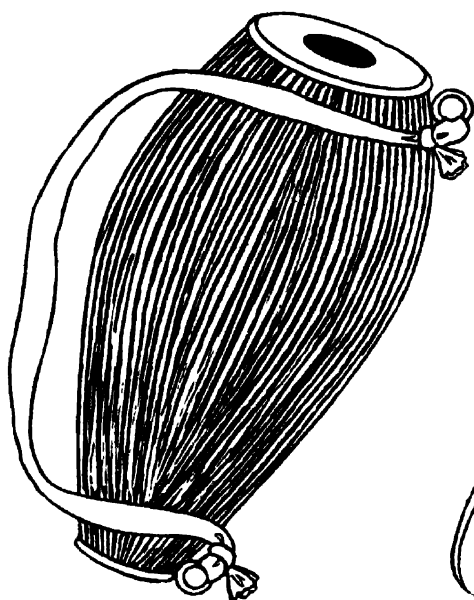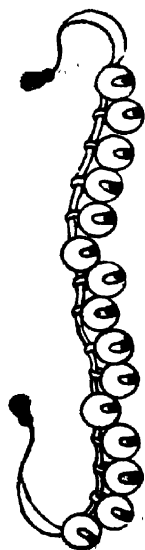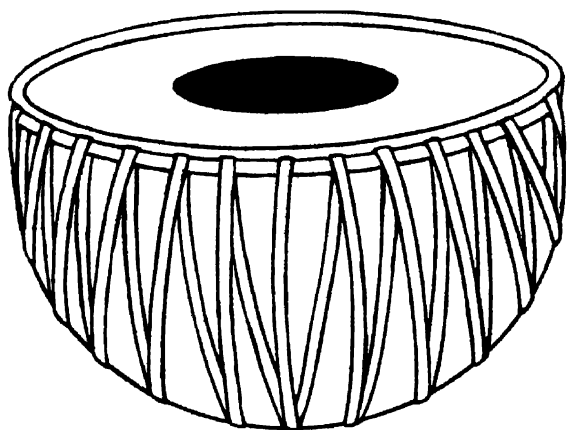
লোক-সঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্র

ধাম্‌সা ঘুঙুর
মৃদঙ্গ মাদল

লোক-সঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্র

শিঙা

ঢোল

বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর, ৪র্থ খণ্ড
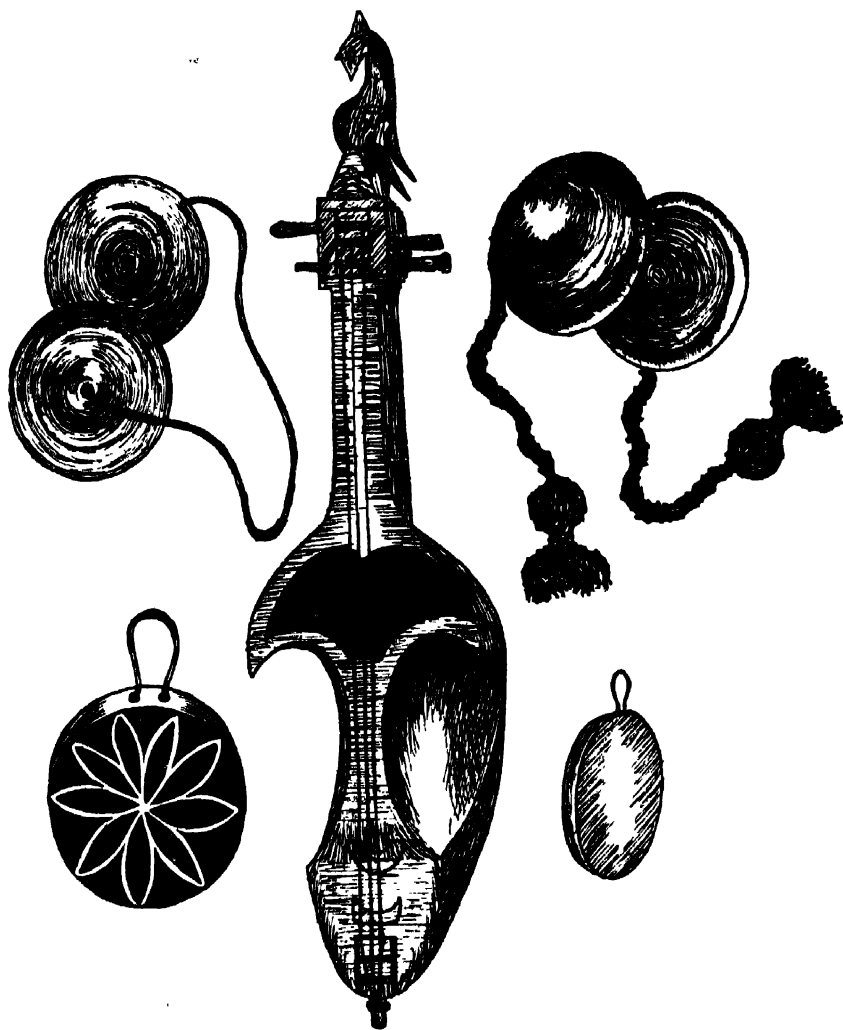
লোক-সঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্র

গাবগুবাগুব বাঁশী
একতারা দোতারা

লোক-সঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্র

করতাল	সারিন্দা	মন্দিরা
ঝাঁঝর		কাঁসী

লোক-সঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্র
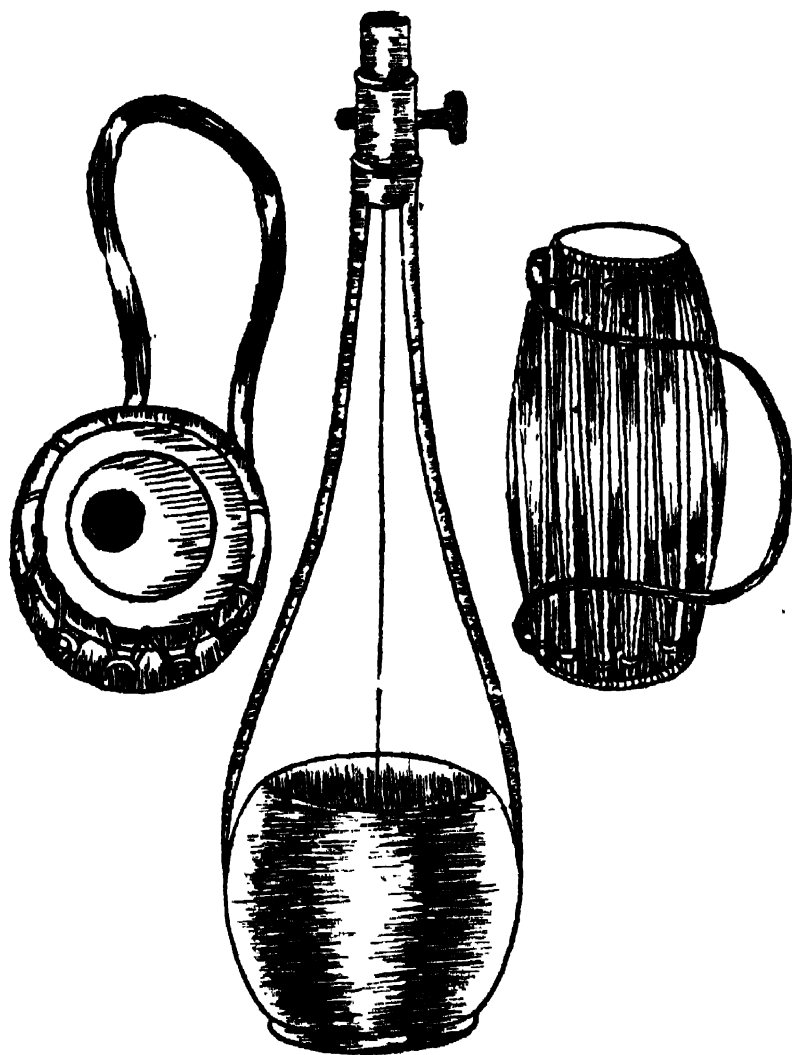
টিকারা লাউ ঢোলক

ভক্তিগীতি, ভক্তিমূলক গান

ভক্তিগীতি বা ভক্তিমূলক গান বলিতে প্রধানত তিন শ্রেণীর গান বুঝাইতে পারে, প্রথমত কৃষ্ণভক্তি, দ্বিতীয়ত কালীভক্তি, তৃতীয়ত গুরুভক্তি। কৃষ্ণ-ভক্তির মধ্যে হরিভক্তি এবং অন্যান্য ভগবদ্‌ভক্তি মূলক সাধারণ গান বুঝায়। চৈতন্য ধর্মের প্রবর্তনের পূর্ব হইতেই এই শ্রেণীর গান প্রচলিত থাকিলেও চৈতন্যের আবির্ভাবের পর ইহাদের মধ্যে নূতন প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হয়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে যে এক শ্রেণীর ভক্তিমূলক গানের উদ্ভব হয়, তাহাদিগকে কালীভক্তিমূলক গান, বা শ্যামাসঙ্গীত বলিয়া উল্লেখ করা হয়। তান্ত্রিক সাধনার পথ ধরিয়া এই ভক্তির প্রথম বিকাশ দেখা গেলেও বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিবাদের প্রভাবে ইহারা এক নূতন রূপ লাভ করে। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ইহাদের প্রথম রচয়িতা। এই দুই শ্রেণীর ভক্তিগীতির অতিরিক্তও আরও এক শ্রেণীর অনুরূপ গীতি ব্যাপক প্রচলিত আছে, তাহা গুরুভক্তিমূলক গান। এই শ্রেণীর সঙ্গীতের ভিতর দিয়া দেখা যায়, ভক্তিমূলক গানে কৃষ্ণ কিংবা শ্যামা যে স্থান অধিকার করিয়াছেন, ইহাতে ধর্মীয় গুরু বা মন্ত্রদাতা সেই স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইহাদিগকে সাধারণত গুরুবাদী সঙ্গীত বলা হয়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সাধারণ গুরুভক্তিমূলক গানের সঙ্গে গুরুবাদী সঙ্গীতের সামান্য একটু পার্থক্য আছে। ভক্তির গানে কেবলমাত্র নিবিচার আত্মনিবেদনের কথাই প্রকাশ পায়, সেই দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'ও আধুনিক ভক্তিগীতির একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। গুরুভক্তিমূলক গানে গুরুর প্রতি একান্ত আত্মনিবেদনের ভাবটি প্রকাশ পায়। গুরু অনেক সময় ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্নও হইয়াছিলেন; সেইজন্য গুরুভক্তি মূলক গান সাধারণত বৈষ্ণবী ভক্তি দ্বারা সুরভিত। বিষয়টি একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনার যোগ্য।

ভারতীয় আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের নানা বিচিত্র পথ ধরিয়া ক্রমে এই দেশের ধর্মচিন্তায় গুরুবাদ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বৈদিক যুগে গুরু বলিতে একমাত্র আচার্য গুরুকেই বুঝাইত। আচার্যগুরু শিক্ষাগুরু, কিন্তু তিনি আধ্যাত্মিক

সাধনার ক্ষেত্রে গুরু নহেন। বৈদিক যুগের পূর্ববর্তী কাল হইতে যে যোগধর্ম ভারতবর্ষে প্রচারিত ছিল, তাহাও মূলত গুরুবাদী ছিল না; কিন্তু কালক্রমে ইহা পরবর্তী নানা ধর্মমতের সম্মুখীন হইয়া প্রবল গুরুবাদী ধর্মরূপে পরিণত হইয়াছিল। মনে হয়, বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তনের সময় হইতেই ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনায় গুরুবাদ সর্বপ্রথম বিকাশ লাভ করিতে আরম্ভ করে। কারণ, বৌদ্ধধর্ম ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্ম, হিন্দুধর্মের মত অপৌরুষের ধর্ম নহে। বুদ্ধদেব তাঁহার জীবিতকালেই যে কয়জন তাঁহার বিশিষ্ট শিষ্যকে দীক্ষা দান করিয়া নিজের সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সময় হইতেই এদেশে গুরুবাদের প্রথম আবির্ভাব হইল। বুদ্ধদেব শিষ্যগণের নিকট প্রথমত গুরু এবং পরে স্বয়ং ভগবানের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন; তাহার পর হইতেই বুদ্ধ শিষ্যগণই গুরুর স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার পর হইতে বুদ্ধ শিষ্যগণই গুরুর স্থান অধিকার করিয়া তাঁহাদের শিষ্যমণ্ডলী গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। এইভাবে গুরুপরম্পরার সৃষ্টি হইল।

কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্ম হইলেই যে তাহাতে গুরুবাদের প্রতিষ্ঠা হইবে, এমন কোন কথা নাই। ইসলাম ধর্মও ব্যক্তিবিশেষ প্রবর্তিত ধর্মমত, কিন্তু তাহাতে গুরুবাদ জন্ম লাভ করিতে পারে নাই। খ্রীষ্টান ধর্মের মধ্যেও প্রাচীন রোমান ক্যাথলিক ধর্মে গুরুবাদের সূচনা দেখা দিলেও মধ্যযুগে ইউরোপ ব্যাপী যে ধর্মসংস্কারমূলক আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার ফলে খৃষ্টান সমাজ হইতে গুরুবাদের প্রায় উচ্ছেদ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের পর হইতেই ধর্মীয় সাধনায় গুরুবাদের ধারা ক্রমেই বিকাশ লাভ করিয়া চলিয়াছে। এমন কি, ক্রমে ইস্‌লাম ধর্মের মধ্য হইতেও উদ্ভূত সূফী সাধনায় গুরুবাদ একটি মুখ্য স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল। অবশ্য সূফী মতবাদ ভারতবর্ষের বাহিরেই উদ্ভূত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা মধ্যযুগে ভারতবর্ষে প্রচার লাভ করিবার পর দেখিতে পাওয়া গেল, ভারতের জলবায়ু ইহার বিকাশের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। সেইজন্য অতি অল্পদিনের মধ্যেই ইহা সহজেই পাঞ্জাব হইতে বাংলা, এমন কি, আসাম পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিল। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে যে সকল ধর্মমতের গৌণ সম্পর্কও ছিল, তাহাদের মধ্যে গুরুবাদ প্রবল আকারে আত্মপ্রকাশ করিল। ইহার একটি প্রধান কারণ এই যে, বৌদ্ধধর্ম নিরীশ্বরবাদী ধর্ম। যেখানে ধর্মীয়

সাধনার লক্ষ্য ঈশ্বর কিংবা কোন পৌরাণিক দেব-দেবী, সেখানে সাধকের একাগ্র লক্ষ্য ঈশ্বর কিংবা দেব-দেবীর উপরই স্থির হইয়া থাকে; কিন্তু যেখানে ঈশ্বর কিংবা দেব-দেবী কোন লক্ষ্য নাই, সেখানে যদি কোন গুরু থাকে, তবে স্বভাবতই তাহার উপর সকল লক্ষ্য গিয়া স্থির হইয়া পড়ে। কারণ, সাধন-ভজন স্বভাবতই লক্ষ্যহীন হইতে পারে না। এমন কি, যে সকল ধর্ম-বিশ্বাসে ঈশ্বরের অস্তিত্বকেও স্বীকার করা হয়, তাহাদের মধ্যে যে গুরুবাদ প্রবেশ করিয়া পুষ্টি লাভ করে, তাহারও কারণ এই যে ঈশ্বর অদৃশ্য, কিন্তু গুরু দৃশ্য এবং তিনি তাঁহার দেবোপম চরিত্র দিয়া সাধকের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সম্মুখেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তিনি তাঁহার কার্য দ্বারা, জীবনের আচরণ দ্বারা সহজেই শিষ্যকে আকর্ষণ করিতে পারেন। তিনি নিজের জীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়াই একটি আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন।

বাংলাদেশে অধঃপতিত বৌদ্ধধর্মের যে সকল শাখা-প্রশাখা একদিন হিন্দু এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে আত্মগোপন করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে গুরুবাদ প্রবল ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, যোগধর্ম যাহা পরবর্তীকালে নাথধর্ম বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, তাহা মূলত গুরুবাদী ছিল না, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের সান্নিধ্যে আসিবার ফলে কালক্রমে তাহাতে প্রবল গুরুবাদ আত্মপ্রকাশ করে। ভারতীয় যোগসাধনা যখন বাংলাদেশে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার পূর্বেই ইহার মধ্যে গুরুবাদ প্রবেশ করিয়াছিল, বাংলাদেশে আসিয়া তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাবের বশবর্তী হইবার ফলে তাহার মধ্যে গুরুবাদ প্রবলতর হইয়া উঠিল। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন স্বরূপ আমরা 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা' নামে যে কয়েকটি চর্যাপদের সন্ধান পাইয়াছি, তাহা যোগতান্ত্রিক নাথসমাজের রচনা, ইহাদের মধ্যে প্রবল গুরুবাদের উল্লেখ আছে। সেই ধারাই অনুসরণ করিয়া ক্রমে এ দেশে যে সহজিয়া সম্প্রদায় এবং বাউল সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহারাও গুরুবাদের এই ধারা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। ক্রমে বাংলার লৌকিক আর আধ্যাত্মিক চিন্তায় তাহার ভাব নানাভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে।

বাংলাদেশের নিরক্ষর সমাজের ধর্মচিন্তা প্রধানত এ দেশের মৌখিক লোক-সঙ্গীতের মধ্য দিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে, ইহাদের জন্য কোন লিখিত

শাস্ত্র গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। সেইজন্য সাধারণ বাঙ্গালী সমাজের প্রচলিত গুরুবাদের আধ্যাত্মিক দর্শনের ইহার মধ্যেই সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত কয়েকটি সঙ্গীতের মধ্য হইতে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রথমত দেখিতে পাওয়া যায়, গুরুর সঙ্গে ঈশ্বরের কোন পার্থক্য থাকে না। ঈশ্বর যেমন অদৃশ্য অনুভূতি সাপেক্ষ মাত্র, গুরুও তেমনই,

বিশ্বমাঝে নাইরে গুরু, গুরুবস্তু আছে ঘরে।
জ্ঞানের অভাব হয়রে কেবল পড়ে মায়া অন্ধকারে॥

এখানে ঘর বলিতে ভক্তের দেহকে মনে করা হইয়াছে। বিশ্বের মধ্যে গুরু নাই, দেহরূপ মন্দিরের মধ্যে গুরু অনুভূতি-সর্বস্ব হইয়া অধিষ্ঠিত আছেন। ইহা অদ্বৈতবাদেরই আর একটি রূপ। জগতে গুরুই একমাত্র সত্য এবং গুরুর অধিষ্ঠান অন্য কোথাও নহে, কেবলমাত্র ভক্ত শিষ্যের হৃদয়েই তাঁহার অধিষ্ঠান। এখানে গুরু রূপাতীত, ব্যক্তিসত্তাহীন ভাবসর্বস্ব মাত্র। ইহাই তাঁহার অদ্বৈত ভাব। সুতরাং গুরুবাদ বলিলেই ব্যক্তিপূজা বুঝায় না। অদ্বৈত ব্রহ্মবাদও এই গুরুবাদের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়া থাকে। অদ্বৈত ব্রহ্ম-বাদের মধ্যে যেমন মায়াবাদ স্বীকার করা হয়, ইহাতেও সেই মায়াবাদের কথা আছে। মায়ার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াই আমরা প্রকৃত গুরুর সন্ধান করিয়া লইতে পারি না। মায়ার প্রভাবে যেমন বিশ্ব মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়, ইহাও তাহাই।

ভ্রমে জীবগণ বেড়ায় ঘুরে,
চিন্‌তে নারে আপন ঘরে,
ভাগ্যগুণে যার লক্ষ্য পড়ে,
সেই ত চেতন এ সংসারে।

কেবলমাত্র চৈতন্য দ্বারা গুরুর উপলব্ধি হইতে পারে, অচেতন কিংবা মায়া দ্বারা তাহা সম্ভব নহে।

আমাদের দেশের নিরক্ষর সমাজেও যে বেদান্ত-চিন্তা কি ভাবে প্রচার লাভ করিয়াছে, এই শ্রেণীর লোক-সঙ্গীত তাহার প্রমাণ। কোন আধ্যাত্মিক দর্শন বা শাস্ত্র পাঠ করিয়া এই চিন্তার উদয় হয় নাই, কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক সাধনার একটি ধারা অনুসরণ করিয়াই এদেশের সাধারণ সম্প্রদায় এই চেতনা লাভ

করিয়াছে। বেদান্ত দর্শন আমাদের দেশের সাধারণ নিরক্ষর সমাজে কেহ কোন দিন প্রচার করে নাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মানব মনের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক চেতনার মধ্যে তাহার উপলব্ধি সার্থক হইয়াছে। গুরুভক্তিকে যাঁহারা আত্মবিকাশের অন্তরায় বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা কদাচ বাংলার সাধারণ সমাজে ইহা কি ভাবে যে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার সন্ধান জানেন না। গুরুবাদ এবং অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ যে কি ভাবে একাকার হইয়া যাইতে পারে, তাহা তাঁহাদের কল্পনার অতীত।

কিন্তু গুরু সর্বদাই যে বেদান্তের ব্রহ্মের মত নির্গুণ, তাহা নহে। তাঁহার একটি প্রধান গুণ, তিনি দয়াল। ঈশ্বরের করুণাময় সত্তা গুরুর পরিকল্পনার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু পার্থিব কোন বস্তুর জন্য যে তাঁহার দয়া প্রকাশ পায়, তাহা নহে। কারণ, পার্থিব বস্তু অনিত্য, পারত্রিক কল্যাণের পথেই গুরুর দয়া প্রকাশ পায়; কারণ, তাহাই নিত্য। যাঁহারা গুরুবাদী, তাঁহারা প্রধানত সংসার-বিরাগী। বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া আধ্যাত্মিক মুক্তিই তাঁহাদের লক্ষ্য, পার্থিব জীবনে ঐহিক কল্যাণ তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য নহে। সেইজন্য তাঁহারা ঈশ্বরের দয়া গুণ বুঝিতে তাহার পারমার্থিক কল্যাণের কথায় বুঝিয়া থাকেন। বাংলার লৌকিক গুরুভক্তির মধ্যে দুইটি ধারা—একটি বৈরাগ্যমূলক, আর একটি আসক্তিমূলক। যে গুরুবাদ বৈষ্ণব ধর্মকে আশ্রয় করিয়াছিল, তাহা প্রধানত বৈরাগ্যের ধারা অনুসরণ করিয়াছে এবং যে গুরুবাদ তান্ত্রিক সাধনার ধারা অনুসরণ করিয়া শাক্ত ধর্মের পথ ধরিয়া চলিয়াছে, তাহা আসক্তিমূলক। প্রথম শ্রেণীর সাধকেরা গুরুর নিকট বৈরাগ্য কামনা করিয়া শেষোক্ত শ্রেণীর সাধকেরা গুরুর নিকট সাংসারিক ভোগ-বিলাসের কামনা জানাইয়াছে। বাংলার লোক-সঙ্গীতে যে গুরুভক্তির চেতনা অনুভব করা যায়, তাহা প্রধানত বৈষ্ণব ধর্ম প্রভাবিত বৈরাগ্যমূলক; সেই জন্য গুরুকে যখন তাহারা দয়াল বলিয়া অনুভব করিয়াছে, তখন তাঁহাকে পারমার্থিক কল্যাণের কারণ বলিয়াই মনে করিয়াছে, ঐহিক সুখভোগের কারণ বলিয়া মনে করে নাই।

নির্গুণ ব্রহ্মচেতনা এবং সগুণ দয়াশীলতার পরও বাংলার লোক-সঙ্গীতে গুরুর আর একটি বিশেষত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তিনি পারমার্থিক পথের সহায়ক বন্ধু—

গুরু, বন্ধু গো, তুমি বিনে
ভবপারে আমার কেহ নাই।

সংসার সাগর মাঝে
কত বিপদ পদে পদে গো,
গুরু বন্ধু গো, তুমি বিনে ভবপারে
পারের সম্বল নাই।
আশা পথ চেয়ে থাকি, আমি চাতক তুমি বারি গো,
গুরু, বন্ধু গো, আমার হৃদয়-মাঝে বিরাজ সদাই।
সঁপিয়ে তোমায় হিয়ে গো, কলঙ্কিনী জগৎ ভইরে,
গুরু বন্ধু গো, সেও ভাল তোমায় যদি পাই।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সখ্যভাবের আদর্শ দ্বারা যে গুরুবাদ এখানে প্রভাবিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের সখ্য ভাবের মধ্যে অদ্বৈত ভাব নাই, বরং দ্বৈত ভাব আছে। কারণ, দ্বৈত সত্তা ব্যতীত পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব হইতে পারে না। কিন্তু গুরুবাদের মধ্যে যে সখ্যভাব দেখা যায়, তাহার মধ্যে দ্বৈত সত্তা নাই। উদ্ধৃত সঙ্গীতটির মধ্যে দেখা যাইবে, পল্লীর সাধক উল্লেখ করিয়াছেন, "গুরু বন্ধু গো, আমার হৃদয় মাঝে বিরাজ সদাই।" অর্থাৎ গুরু-বন্ধুর অধিষ্ঠান হৃদয়ের মধ্যে, গোচারণের মাঠের প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে নহে। ইহাও অদ্বৈত ব্রহ্ম চেতনার মত সূক্ষ্ম ভাববাদ মাত্র, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের দ্বৈতবাদ নহে। গুরুতত্ত্ব কোন বস্তুতত্ত্ব নহে, কিংবা কোন ব্যক্তি-বাদও নহে।

গুরুতত্ত্ব বস্তুতত্ত্ব কিংম্বা ব্যক্তিবাদ নহে বলিয়াই গুরুর উপলব্ধি সহজসাধ্য নহে।

তুমি কোথায় কি ভাবে থাক, গুরু, দেহ পরিচয়।
আমি ভাব না জেনে ভজি কেমনে, ওহে গুরু দয়াময়॥
কোন ধামে কি ভাবে প্রাপ্তি, না জান্‌লে কি হবে গতি গো,
গুরুমতি কিসে শুদ্ধ হয়॥

গুরু প্রত্যক্ষ গোচর নহেন, মানস-গোচর। মন দিয়া তাঁহাকে চিনিয়া লইতে হয়, চক্ষু দিয়া তাঁহাকে দেখিতে পারা যায় না। এখানেও গুরুর ঐশী শক্তির কথা আসিয়া যায়। ইহা ঈশ্বরেরই গুণ। সুতরাং গুরুতত্ত্ব এবং ঈশ্বরতত্ত্ব এখানে একাকার হইয়া গিয়াছে।

গুরু, তোমার অপার লীলা, নানা ধামে নানা খেলা গো,
এ তত্ত্ব শুন্‌লে গলে শিলা, ভবজ্বালা আদি দূরে যায়॥

সুতরাং গুরুতত্ত্বই পরমতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্বের সঙ্গে তাহার কোন পার্থক্য নাই। এই তত্ত্ব জানিতে পারিলে সকল তত্ত্ব জানা হয়। পার্থিব নানা ভোগ্য বস্তু এই তত্ত্বজ্ঞানের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়—

ভবে কি ধন পাইয়া ভুইলাছ, রে মন,
গুরুর চরণ অমূল্য ধন, তাই কেনে কল্লে না স্মরণ।
কি ধন পাইয়া ভুইলাছ, রে মন ॥
ধনী হবার ইচ্ছা কর, মনকে মহাজন কর,
প্রেমধন লইয়া ব্যাপার কর ঠিক রাখ্যা ওজন।
অন্য দিকে মন দিয়ো না রে, তোমার হৃদে রাখ গুরুর চরণ ॥

প্রেমই একমাত্র ধন, প্রেম-ধনে যে ধনী; সেই প্রকৃত ধনী, প্রেম-ধনের লক্ষ্য একমাত্র গুরু। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সাধনার আদর্শের কথা ইহাতে থাকিলেও ইহাতে কৃষ্ণ বা ঈশ্বরই যে সকল সাধনার লক্ষ্য, তাহা উল্লেখ করা হয় নাই; এখানে সকল লক্ষ্যের লক্ষ্য গুরু, সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আদর্শে ঈশ্বর কিংবা শ্রীকৃষ্ণ যাহা, এখানে গুরুও তাহাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, অনেকের বিশ্বাস ধর্মচিন্তায় গুরুবাদ আত্মবিকাশের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু বাংলার নিরক্ষর সমাজেও যে গুরুবাদের আদর্শ প্রচলিত আছে, তাহাতেও দেখা যায় যে, গুরুবাদ এখানে আত্মবিকাশের সহায়ক হইয়াছে, কিন্তু আত্মবোধের অন্তরায় হয় নাই। কারণ, গুরুর চিন্তা এখানে ঈশ্বর চিন্তার তুল্য হইয়াছে, ঈশ্বরের মত গুরুর রূপ এখানে অদৃশ্য হইয়া কেবলমাত্র তাঁহার শক্তি ও জীবনে তাহার প্রেরণা অনুভূত হইয়াছে। ঈশ্বর নামের মত গুরুর নাম এবং গুরুর গুণই এখানে কীর্ত্তনীয় হইয়াছে, তাঁহার রূপ ধ্যেয় হয় নাই, সেইজন্য গুরু ব্যক্তিত্ব ভক্তের আত্মবোধের অন্তরায় হইয়া উঠিতে পারে নাই। সুতরাং গুরুভক্তি এবং ঈশ্বরভক্তিতে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হইতে পারে নাই।

বাংলার নিরক্ষর সমাজেরও অধ্যাত্ম-চেতনা যে কত সূক্ষ্ম ছিল, তাহার গুরুভক্তির উপলব্ধি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

১

অধমের দয়া করে দয়াল তুমি দেও শ্রীচরণ,
আমি মত্ত হয়ে রিপুর বশে ঘুরি ফিরি পাগলের মতন।

আমার ক্রমে হল ভবব্যাধি, ওগো সেই ভাবনা নিরবধি,
নয়ন-জল হল বাদী, দূরে গেল সাধন-ভজন।
মহামায়া কাম-সাগরে, ঢেউ দেখে প্রাণ শিহরে,
ভয় পাইয়ে ডাকি তোমারে, তরাও আমায় পতিত পাবন।

—মৈমনসিং

২

খুঁজিয়া বেড়াই, পাই কি না পাই, দেখিগো তাহারে তল্লাসি।
জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে তার জন্য মন আমার উদাসী।
সে বাসে না ভাল তাতে বা কি হল, আমি ত তাহারে ভালবাসি
না জেনে সন্ধান, দিয়েছি মন প্রাণ, জাতি কুলমান যায়গো ভাসি।
তবু যদি হয় খুসী, আরো খুঁজে দেখি, কত দিন আর বাকি মিশামিশি।
থাকি কোন দেশে না জানি কার বেশে, বিজনে বসিয়ে বাজাও বাঁশী।
কেঁদে পীতাম্বর বলে, দয়া নাই তোর অন্তরে, আমারে করলে দোষী।

—ঐ

৩

মনমোহনে ধরবি যদি মনে জেগে থাক্,
মানসে মনের মানুষে অডাকাতে ডাক্।
নিশ্চয় বাঁকা দিবেন দেখা,
গোরা পাগলী, গুরুর চরণ ধর্।
নারীপ্রেম রতন ধন চিনল্যম নারে, মন।
মহেশের মন মোহিতে নারীরূপে নারায়ণ।
সেই নারীর জন্যে রামচন্দ্র রাজ্য ত্যজি বনবাসী গমন মাধুরী,
শেষে জানকী হারায়ে হরি করিয়া বেড়ান ক্রন্দন।
সেই নারী গৌরহরি নদে এসে অবতীর্ণ
তবু রইলেন চির ঋণী নৃত্যে শ্রীমুখ দর্শন
সে নারীর গৌরব বাড়াতে
দেহি পদপল্লব বলি পড়েন পায়েতে।
জয়দেব নারায়ণ নারেন লেখিতে
বন্ধুর শ্রীহস্তে লিখন।

সেই নারী মোর আশ্রয় বিষয়
নারী কুঞ্জে প্রবেশিলে আগে নারী হত্যে হয়।
নারীরূপেতে কভু নারী কিরে হয় মোহন ?
সেখানে স্ত্রী পুরুষ গৌরব কিছুই নাই।
সেই প্রকৃতি, কাল কানাই, গোরা পাগলিনীর হৃদ্‌রঞ্জন ॥ —বাঁকুড়া

৪

তেল লাগা তুই আপন চরকাতে
তোর কাজ নাই পরের রটাতে
কে কোথায় পেয়েছে দেখ হিংসা নিন্দা ভেদেতে।
ছাড় মন ছল কপট চাতুরী
সকল হৃদে একই তিনি নিন্দা কার করি।
সর্বজীবে সম হেরি, হের হরি সাক্ষাতে সর্বজীবে কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।
তার নিকটে ছোট বড় সকলি সমান।
চাঁদা মামা, সবার মামা
(বাবার মামা, মামার মামা, আমার মামা) কে না জানে জগতে ?
তার ধাতুরূপে সর্বদেহে বাস,
বস্তু জ্ঞান না জানিলে হয় কিসে প্রকাশ।
গোরা পাগলারে, তোর বৃথা প্রয়াস বামনে চাঁদ ধরতে। —ঐ

৫

লেখা পড়ায় কাজ নাই, মন, গৌর পদে পড়গা গিয়ে,
সে হাটে নাই বিদ্যায় গৌরব বিদ্যাও দাসী রাঙ্গা পায়।
অলেখা কি লেখায় মিলে, অপড়া কি পড়ায় নিলে,
যার যত পাশ তার তত পাশ পরমহংস গেছেন কয়ে।
বেদ শাস্ত্র সকল অভ্যস্ত, নভেদ পরম তত্ত্ব
শাস্ত্র পড়া তার অনর্থ বৃথা কাল তার গেল বয়ে।
লেখা পড়ায় কাজ নাই মন,
রাজ বিদ্যা রাজ গুহ্য বিদ্যা পবিত্র সতত
গোরা পাগলারে, তোর হ'লো মতিভ্রম
গুরুর পদে পড়গা গিয়ে। —ঐ

৬

গুরু দয়াল হইলে হবে কি, আমি ত ভক্তিহীন, ভক্তিহীন।
গুরুনামের বলে পাষাণ গলে, আমি তা হতে কঠিন।
গুরু দয়াল বটে সত্য, নিজে আমি কুপদার্থ,
হলেম গো পদার্থবিহীন ;
আমি মন খুলে, নয়নজলে চরণ ভজলাম না একদিন।
এক দিন না করলেম চিত্তে, গুরুর ঐ চরণ চিন্তে।
কুচিন্তায় গেল রাত্রিদিন, ওগো জন্মাবধি গেল না গো,
আমার মনের মলিন।
মজতাম যদি গুরুর পদে তবে যেতেম নিরাপদে,
বিপদে হইত শুভ দিন, আমি বিষয় জ্বালায় জ্বলে মলেম,
সোনার তনু হ'ল ক্ষীণ। —ঢাকা (১৩২২)

৭

মাধা ভাই, একবার জেনে আয়,—সুরধনীর তীরে ধ্বনি
ধ্বনি কি মধুর শুনা যায়।
মাধা ভাইরে, কাল শুনেছি এই হরিনাম নামেতে কর্ণ ফেটে যায় ;
আজ কেন রে এ ভাব হইল, নামে কি ধ্বনি শুনা যায়।
সুরধনীর তীরে ধ্বনি ধ্বনি কি মধুর শুনা যায়।
কত যোগী ঋষি ব্রহ্মচারী পুরুষ নারী মেরেছি সবায়,
কইরাছি ভাই দস্যুবৃত্তি, কারো প্রতি মায়া রাখি নাই ;
ভক্তিবসন গলে দিয়া রে, মাধা ভাই, ধরগা নিতাইর পায়।
সুরধনীর তীরে ধ্বনি ধ্বনি ধ্বনি কি মধুর শুনা যায়॥ —ঐ (১৩২২)

৮

হরিনাম যে দিন শুইনাছি,
সেই দিন হইতে ভাই রে, মাধা, আমি কি আমাতে আছি।
কুলমান লজ্জা সরম সুরধনীতে ভাসায়ে দিয়াছি।
সুমধুর হরিনামে, মনপ্রাণ সহিতে টানে,
বল্‌তে চায় বলে না প্রাণে তা' নইলে কেমনে বাঁচি ;
কবে তার দেখা পাব, প্রাণ জুড়াব, আশায় রইয়াছি॥

যে দিকে ঘুরাই আঁখি, হরিময় সকলি দেখি,
হরি বৈলে জুড়াই আঁখি, প্রাণপাখী বেন্ধে রাইখাছি ;
মন আমার হয় না ধৈর্য—গৃহকার্যে সকলি ভুইলাছি ॥
—ঐ (১৩২২)

৯

ও নাগরী, হেরবি গো সদায়,
তোরা দেখবি যদি আয় এমন গৌরাঙ্গ রূপ।
সে যে হরি বলে নৃত্য করে শ্রীবাস আঙ্গিনায় ॥
তোরা দেখবি যদি আয়, এমন গৌরাঙ্গ রূপ।
সে যে নগর দিয়ে হেটে বেড়ায়,
সোনার নূপুর বাজে রাঙ্গা পায়।
তোরা দেখবি যদি আয়, এমন গৌরাঙ্গ রূপ।
সে যে রথের শোভা মদনমোহন, মদনমোহন বাঁশরী বাজায়।
তোরা দেখবি যদি আয়, এমন গৌরাঙ্গ রূপ। —ঐ (১৩২১)

১০

দিবা নিশি হরি বলে কে—বান্ধবীর মায়রা,
অহর্নিশি হরি বলে কে, হরি বলে কে গৌরাঙ্গ বলে কে,
ওরে মনের সাধে হরি বলে কে—বান্ধবীর মায়রা।
কে শুনাইলা এই হরির নাম, গুণের বান্ধব বলি তারে,
ওরে ভক্তবৃন্দ সঙ্গে কইরা
দয়াল নিতাই এইসেছে রে—বান্ধবীর মায়রা।
হরি হরি হরি রবে মায়া ঘুমের থনে উঠ্‌লাম জেইগে ;—
হরির নামে পাষাণ গলে—বান্ধবীর মায়রা।
হরি হরি বইলে আমার নিতাই নাচে বাহু তুইলে,
হরির নামে মনপ্রাণ হরে—বান্ধবীর মায়রা। —ঐ (১৩২০)

১১

আমি দোষী হইয়াছি,—
দোষী হইয়াছি—আমি শ্রীগুরু গৌরাঙ্গপদে প্রাণ সঁইপাছি গো।

দোষী হইলাম ভাল হইল গো,—তাতে ক্ষতি নাই ;—
ওগো যার জন্যে হইলাম গো দোষী—তারে যদি পাই গো।
পরের মন্দ পুষ্প চন্দন গো,—ওগো অলঙ্কার গায়,—
নেইচে গেয়ে ব্রজে গো যাব—নিতাই মাঝির নায় গো।—ঐ (১৩২০)

ভক্ত্যানাচের গান

শিব কিংবা ধর্মঠাকুরের গাজনে যাঁহারা সন্ন্যাসী হয়, তাহাদিগকে কোন কোন অঞ্চলে ভক্ত্যা বলে। গাজনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভক্ত্যাগণ সমবেতভাবে কিংবা কোন কোন সময় এককভাবেও নৃত্য সহযোগে যে গান গাহে, তাহাকেই ভক্ত্যানাচের গান কহে। ইহারা আচার সঙ্গীতের (ritual song) অন্তর্গত ; সেইজন্য ইহাদের বিশেষ কোন কাব্যমূল্য কিংবা গীতিমূল্য নাই।

১

শুন শুন, মহাদেব, কি করিছ বসি।
সমুদ্র মন্থন কৈল দেবগণে আসি ॥
ইন্দ্র নিল উচ্চৈঃশ্রবা লক্ষ্মী নিল নারায়ণ।
আর যত ছিল তাহা নিল দেবগণ ॥
শেষে, মহাদেব, তুমি পোলে ফাঁকি।
ক্রোধে মহাদেব বলে, আমি এখন করি কি ॥ —মালদহ

ভজন গান

ভগবানের মহিমা কীর্তন মূলক ভক্তিগীতির নাম ভজন গান। যাহা দ্বারা ভজনা করা হয়, তাহাই ভজন গান। এই গান বাংলা দেশের নিজস্ব গান নহে, উত্তর ভারত হইতে বাংলাদেশে আসিয়াছে। রাজস্থানী ভাষায় মীরার ভজন ভজন গানের আদর্শ। প্রধানত তাহারই অনুকরণে বৈষ্ণব প্রভাবিত যুগ হইতেই বাংলার নিজস্ব গীতরীতি অবলম্বন করিয়া বাংলার লোক-সঙ্গীতেও ভজন গান রচিত হইতেছে।

১

গুরু, বর্তমানে হ'ল অনুমান, আমি না জানি ভজনের সন্ধান।
গুরু গোসাই ক্ষেত নিড়াইতে, দিল দুইখান কাস্তে হাতে,
পারলাম না তার ভাব রাখিতে—ঘাস নিড়াইতে নিড়াইলাম ধান ॥

ইলিশ কি বিলে থাকে, কিলাইলে কি কাঁঠাল পাকে,
বোলতার চাকে মধু থাকে বিশ্বাস করে কে।
সাধুর কাছে জেনে শুনে হলেম রে, ভাই, কালী চুণে—
আমন ক্ষেতে গেলাম ভাইরে বোরো ধান বুনে—
তিথি নক্ষত্রের ফলে—সমুদ্রে কি রত্ন ফলে
বাচ পড়িলে ভাত কাপড় হয় পাত্র বিশেষ গড়ল সমান ॥ —নদীয়া

২

জয় গৌরাঙ্গ, শ্রীগৌরাঙ্গ, জয় জয় জয় শচীর নন্দন।
নদীয়া বিহারী, এস দয়া করি, চরণ তোমার করিহে সাধন ॥
এস এস, প্রভু, এস দয়া করে কাতরে ডাকিহে তোমারে,
নিত্যানন্দে সঙ্গে করে এসে কর হে নাম সংকীর্তন ॥
তুমি দয়াময় সকলে জানে, তরাইলে কত পতিত অধমে,
আমায় তরাও নিজগুণে শ্রীচরণে নিলাম স্মরণ ॥

—বাড়ালা, মুর্শিদাবাদ

৩

আগে করগে উপাসনা,
উপাসনা ঠিক না হলে সহজ মানুষ কেহ পাবে না।
শ্রীরূপের ধর্ম যাজন জীবে না সম্ভবে মন,
না হলে রিপু দমন, হয় কি সাধন।
আগের কাজে বাজ পড়িলে হবিরে দিন কানা—
শেষে কাজের বেলায় বাজে কাজে করতে হবে আনাগোনা ॥
আদি মূল মূলাধারে মূলে ভুল স্থূল বিচারে,
তারে চিনতে না পারে বৈধি অঙ্গ জনা।
রাগাত্মিকা গুরু ধারে করতে হয় যাজনা।
তারে করলে যাজন, ও আমার মন, বরণ হবে কাঁচা সোনা।
ভেবে মাতাল চাঁদে ভণে সহজের অঙ্গ বিনে,
সহজ প্রেম নিয়ে পদে এল উপাসনার সোনা।
তাইতে কতই রঙ্গ প্রেমতরঙ্গ এমনি সহজ প্রেমের ধারা।

—মুর্শিদাবাদ

৪

যদি ধরবি সে মানুষে, গুরুবাক্য ঐক্য করে
থাক রে নদীর পারে বসে।
সে নদীর তিনটি ধারা, যাইবিরে তুই মারা।
এক কালে মানব দেহে দফা হবে সারা।
আত্ম সুখে মত্ত হইলে ডাকাতি হবে দিবসে,
মাসে তিন দিন জোয়ার আগে মণিমুক্তা আসে ভেসে,
তিন দিন তিন রকম জল, পান করলে বুঝবি সকল,
অমৃত সুধা গরল, যে যাহা ভালবাসে,
কেহ মহাজনের মাল হারায়ে, মরে হায় হুতাশে,
কেহ গুরুরূপে নয়ন দিয়ে সুধা উঠায় অনায়াসে
পাহারা দিচ্ছে তিনজন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ত্রিলোচন,
শক্তি করে মহাজন, আনন্দেতে ভাসে,
সেই শক্তির কৃপায় যখন জল মোহনাতে আসে,
গোঁসাই হীরালাল কয় শুন রে কেশব,
পান করবি অনায়াসে।

—মুর্শিদাবাদ

৫

রাগের ঘরে না ঢুকিলেরে মুখের কথায় ভজন হয় না,
ও তোর গুরু রতি ঠিক না হলে রে সাধু সঙ্গ কেউ ছোঁবে না,
হবে বৈষ্ণবেতে ঘৃণা দেহ ভাব যজ্ঞ হলো না॥
মন্ত্র অর্থ তত্ত্বযোগে সাক্ষাৎ চৈতন্য জেনে শুনে
হলো না তোর জ্ঞান চৈতন্য।
দেহ ত্রিতাপেতে হইতেছে জীর্ণরে, তবু আত্মসুখ গেল না,
তত্ত্ব কি বস্তু চিনলি না, পূর্বের স্বভাব গেল না।
আত্মজ্ঞানের উদয় হলে তত্ত্ব পদার্থ সাধন রতি
পূর্ণ হতো ভজন ঘরেতে,
ও দেহ লাগতো শ্রীগুরুর সেবাতে।
হতো ভজনের লেনা দেনা, রতি ভঙ্গ যে হতো না,
পূর্ণ থাকতো ষোল আনা।

সাধন ভজন অতি গোপন, জান না কেমন,
যেমন সাপের মাথায় মণি ধরা জানে রসিক জন।
গুরু যারে দেয় আশ্রয় আলিঙ্গন রে,
সেত ভাবের গুরু কিনা একদিন তার সঙ্গ নিলি না,
সেই ভাব শিক্ষা তো হল না। —মুর্শিদাবাদ

৬

গুরু ভজ আমার মন, অসাধনে সাধের জনম গেলরে এবার,
আসা যাওয়া সার হল এ ভব সংসার।
থেকে জননী জঠরে, ভজবি বলে দামোদরে,
মন তোর মনে নাই, জননী জঠরের কথা মনে নাই।
এসে মর্তধামে ভুলে রইলি পুর্ব অঙ্গীকারে।
শ্রীগুরু পরমারাধ্য, তারে কেন করলি না বাধ্য।
মন তোর সাধ্য কি আছেরে, আছে জীর্ণ তরী ঘাটে বাঁধা,
কিসে হবি পার।
যেতে হবে ভব পারে, কি ধন নিবি সঙ্গে করে,
মন তোর কি ধন বা আছে রে।
সঙ্গে করে নিয়ে যেতে কি ধন বা আছে রে।
ও তোর ভয়ে পলাইয়া যাবে পুত্র পরিবার,
গোঁসাই কৃষ্ণকমল বলে, তরী চলে ভক্তির বলে;
মন তোর ভক্তি নাই, ভক্তি নাই।
শ্রীগুরুর শ্রীপাদ পদ্মে ভক্তি নাই ভক্তি নাই।
মন রে, সেই ভক্তি না উপজিলে, কিসে হবি পার। —মুর্শিদাবাদ

৭

অকুল দরিয়ার পানির বুকে,
চলে আমার ভাঙ্গা নাও কতই সে যে দুঃখে॥
একে আমার ভাঙ্গা তরী তাতে ঢেওয়েরই উড়া,
চলতে উজান ভেটিয়ে আসি হালে লাগে মুড়া।
আমি মাঝ দরিয়ায় ঘুরে বেড়াইরে এপথ সেপথ বেঁকে॥

আমি রে আনাড়ি নেয়ে করি কি উপায়,
কার নামে ভরসা করি কে আছে কোথায়।
আমি গুরুর নামে সঁপে দিলাম রে তরিটি আজ থেকে ॥

—ভাবতা, মুর্শিদাবাদ্

৮

গুরু বলে মন কাঁদে না, উপায় কি করি,
যার জন্য কাঁদে আমার মন, সে দেয় আমার গলে দড়ি,
আমি কত মনেরে বুঝাই, ভোলা মন আমার বুঝে না।
সে ত অন্য পথে যায়,
আমি কি দিয়ে মন বাধ্য করি,
দারুণ মদন আছে তার প্রহরী।
ছয় রিপু হল আমার কাল, মন ভুলাইয়ে রাখে তারা ঘটাইল জঞ্জাল।
মন, তুই পাবিনি রে অন্তিম কালে শ্রীগোবিন্দের চরণ তরী।

—পাঁচবেড়িয়া, নদীয়া

৯

শ্রীগুরু ভজিতে এলেম আমি তত্ত্ব জানিনা রে,
দয়াল, গুরু, আমায় দাও না শিখাইয়ে।
ও গুরু গো, প্রথমেতে ছিলেম আমি পিতার মস্তকে,
কোন সন্ধানে এলেম জননী জঠরে।
ও গুরু গো—ক্ষিধার সময় খেতাম আমি কোন বৃক্ষের ফল,
তৃষ্ণার সময় খেতাম আমি কোন নদীর জল।
ও গুরু গো, মাসে মাসে চন্দ্র ঋতু সর্ব শাস্ত্রে কয়,
শুক্র পুরুষের ঋতু কোন দিবসে হয় রে দয়াল ॥
ও গুরু গো, যখনেতে ছিলাম আমি জননী জঠরে।
কোন কোন বস্তু আহার কর্তেম, থাকতেম কোন শিয়রে,
দয়াল গুরু, আমায় দাওনা শিখাইয়ে ॥ —ঐ

১০

গুরু যে ধন দিয়াছে তোরে, চিনলি না তারে,
আছে মাল ধরা ধন সিন্দুকেতে, তারে পরে কেমনে চিনে নেয়রে।

চাবি তার পরেরই হাতে।
তারে খুঁজলে পরে মিলবে চাবি।
যদি ডুবতে পার সেই রূপসাগরে ॥
আছে সহজ মানুষ, আছে ঢাকা।
তারে সাধন করলে পাবি দেখা, সেই মানুষ ত্রিভঙ্গ কানাই।
মানুষ উল্টা কলে সদায় চরে, সে যে ত্রিবেণীতে উজান ধরে,
অমূল্য ধন রত্ন পেয়ে, দেখলি না চেতন হইয়ে,
চিরকাল নগর বন হইয়ে,
মন তুই ঘরে যেয়ে দেখলি নারে কত রত্ন আছে হেথায়। —নদীয়া

১১

পাগল মন আমার, হরি বিনে কে দুঃখ হরিবে আর।
হরি ভজন না করিলে ভব পারে যাওয়া ভার ॥
দেখ সত্য যুগ হতে পড়লাম সত্য যুগেতে।
আবার বিশ্বে প্রাণে জীবন পেলে হরিনামের গুণেতে;
আবার সেই পেলহাদের লাগি হল নরসিংহ অবতার ॥
দেখ ত্রেতা যুগেতে ও রাম জানকীর সাথে,
পিতৃসত্য পালনার্থ গেলেন বনেতে,
আবার অহল্যা মানব হল চরণ পরশে তার ॥
দেখ দ্বাপর যুগেতে হরি পাণ্ডবের রথে,
অর্জুনের সারথি হলেন কুরুক্ষেত্রেতে।
আবার নানান বিপদে তাদের করেছিল হে উদ্ধার ॥
ধন্য কলি যুগ রে প্রেমে ভাসে গৌর নিতাই,
যেচে হরিনাম বিলায় জাতির বিচার নাই,
আবার গোঁসায় বনমালী বলে নামে মতি হওয়া ভার ॥ —মুর্শিদাবাদ

ভবানীবিষয়ক গান

শ্যামা কিংবা দুর্গা পুজা উপলক্ষে গীত দুর্গার মাহাত্ম্য সূচক গানকেই ভবানী বিষয়ক গান বলিয়া উল্লেখ করা হয়। প্রকৃত শ্যামাসঙ্গীত বলিতে যাহা বুঝায়,

ইহা তাহা নহে, তবে কোন কোন সময় ইহাদের মধ্যে রামপ্রসাদী সুর ব্যবহৃত হইতে পারে।

শঙ্করী সংকটে সদয় হ',
করাল-বদনা কালী হৃদ কমলে র'।
প্রাপ্ত হ'য়ে-রূপা সোনা, হ'ল না তোর উপাসনা,
ঘুচবে কিসে কুবাসনা, তার উপায় কি ক'॥
তাপে তনু আছে জোরে, ভাবনাতে আছি ম'রে,
কেমন ক'রে যাব ত'রে, ভব নদীর দ'॥
সদাই করি কড়ি কড়ি, কে করায় তা কেন করি,
ভেবে ভেবে, শুভঙ্করী, পেলাম না তার খ'॥
ঐহিক সুখে যারা মাতায়, আনন্দ নাই তাদের কথায়,
পূর্ণানন্দ পাব যেথায়, সেথায় লয়ে চ'॥
চন্দ্র সূর্য গ্রহ-তারা, কৃপাবলে চলে তারা,
ব্রহ্মাণ্ডের ভার বয় তারা, এ ভণ্ডের ভার ব'॥
একবার উঠায় একবার নামায়, কেমন করে করে আমায়,
সতেরো জনাতে আমায় বানাইলে থ'॥
অপকীর্তি বৃত্তি চৌর্য, ত্যজলাম ধর্ম ত্যজলাম ধৈর্য
অনেক দোষ করেছ সহ্য, আরও একবার স'॥
দিন ফুরালো দিনে দিনে, কে তরাবে সে দুর্দিনে,
হরি নারায়ণ দীনে সঙ্গে করে ল'॥ —মুর্শিদাবাদ,

ভবানীমঙ্গল

দুর্গা বা ভবানীর মাহাত্ম্যকীর্তনমূলক এক শ্রেণীর আখ্যায়িকা-গীতির নাম ভবানীমঙ্গল। সাধারণত পৌরাণিক কাহিনীর ভিত্তিতেই ইহারা মধ্যযুগে রচিত হইয়াছে। শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে পাঁচালীর আকারে ইহার গীত হইত। (মঙ্গল গান দেখ)

ভাইফোঁটার গান

কার্তিক মাসে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে কোন কোন অঞ্চলে যে মেয়েলী গীত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই ভাইফোঁটার গান। সাধারণত মৈমনসিং জিলার

পূর্বভাগ, ত্রিপুরা জিলার উত্তর ভাগ এবং শ্রীহট্ট জিলার পশ্চিম ভাগে এই গান শুনিতে পাওয়া যায়—

১

আশ্বিন যায়, কার্তিক আইয়ে গো,
দ্বিতীয়ার চান্দে দিল দেখা।
ভাই দ্বিতীয়ারে দিলাম ফোঁটা।
ওরে ওরে করুয়াল, তুই স'রে যাইতে,
ভাইফোঁটার কথা শুন্‌তাম, গোরব আন্ধা দিতে।
ওরে ওরে করুয়াল, তুই স'রে যাইতে,
ভাইফোঁটার কথা শুনতাম, মেথী আন্ধা দিতে।
ওরে ওরে করুয়াল, তুই সরে যাইতে,
ভাইফোঁটার কথা শুনতাম আত্রী আন্ধা দিতে। —মৈমনসিং

ভাওয়াইয়া গান

বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের উত্তর অংশ অর্থাৎ জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও রংপুর জেলার উত্তরাংশ ভৌগোলিক এবং প্রাকৃতিক দিক দিয়া বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র। সাংস্কৃতিক দিক দিয়াও একদিকে ইহার সঙ্গে কামরূপ, একদিকে উত্তর বিহার বা মগধ এবং অন্য আর একদিক দিয়া ভুটানের সঙ্গে ইহার যতখানি যোগ আছে, নিম্ন বঙ্গের সঙ্গে তত যোগ নাই। এই অঞ্চলের প্রায় সকল আদিম অধিবাসীই বোরো নামক এক আদিম ইন্দো-মোঙ্গলীয় বা কিরাত জাতির বংশধর। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞের অভিমত এই যে,

'The masses of North Bengal areas are very largely of Bodo-origin, or mixed Austric-Dravidian-Mongoloid, where groups of peoples from Lower Bengal and Bihar have penetrated among them. They can now mainly be described as Koch, i. e. Hinduised or semi-Hinduiscd Bodo'.

এই অঞ্চলের অধিবাসী বোরো জাতির বংশধরগণ সাধারণভাবে কোচ নামে পরিচিত। ইহারা ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব তীর অর্থাৎ বর্তমান আসাম প্রদেশের

ক্রমে শিথিল হইতে আরম্ভ করিয়াছে সত্য, তথাপি ইহার জাতীয় জীবনের বহু আচার আচরণের মধ্য দিয়া তাহার প্রভাব এখনও অত্যন্ত সক্রিয় রহিয়াছে বলিয়া অনুভব করা যায়।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজে সমাজের কিংবা পরিবারের ধর্মীয় আচারে নারী একটি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর সেই অধিকার স্বীকৃত হয় না। বোড়ো জাতির বংশধর এই অঞ্চলের হিন্দু এবং মুসলমানগণ এখনও লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানে মুখ্য অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। কৃষিকর্ম সম্পর্কিত সকল ধর্মীয় বা ঐন্দ্রজালিক (magical) আচার অনুষ্ঠানে নারীই পৌরোহিত্য এবং অন্যান্য ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে, পুরুষের ইহাদের মধ্যে কোন অধিকার নাই। কৃষিকর্মের সঙ্গে আদিম সমাজ নরনারীর প্রজনন ক্রিয়ার সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া থাকে। সেইজন্যই এই অঞ্চলের যোনি-পূজার এক সংস্কার গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার অদূরবর্তী অঞ্চল কামরূপের কামাখ্যাতীর্থ যোনিপীঠ বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের বেরুবাড়ী, ধূপগুড়ি, ধাপগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও যোনিপূজার এক আদিম রীতির প্রচলন আছে। এই অঞ্চলে 'হুদুমা' উৎসব নামে ভূমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যে এক উৎসব পালন করা হয়, তাহা স্ত্রী-সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ইহাতে যে সঙ্গীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহাতে কেবলমাত্র নারীই অংশ গ্রহণ করিতে পারে; এমন কি, ইহার কোন কোন আচার পুরুষের দৃষ্টির অন্তরালে গোপনে অনুষ্ঠিত হয়।

রাজবংশী সমাজের ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কে একটি প্রধান কথা এই যে, ইহাতে বাংলা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই হয় নাই। সেইজন্য ইহার ধর্মীয় জীবনের মৌলিক রূপটি অনেকখানি অবিকৃতই রহিয়া গিয়াছে। গ্রাম-দেবতা (village-god)-কে কেন্দ্র করিয়া প্রাচীন গ্রাম্য জীবন গড়িয়া উঠিত। এখানেও গ্রাম-দেবতার উপাসনা অত্যন্ত ব্যাপক। তাহাকে 'গারাম ঠাকুর' বলা হয়। গ্রাম-দেবতা গোষ্ঠীজীবনের দেবতা, এক একটি গ্রামে যে এক একটি গোষ্ঠীভুক্ত সমাজ গড়িয়া উঠিত, তাহার সকল সুখ-দুঃখ-কারক গ্রামের বিশেষ, এক একজন দেবতা। পশ্চিম বাংলার রাঢ় অঞ্চলের প্রাচীন গ্রামগুলির মধ্যেও ইহাদের উপাসনা অত্যন্ত ব্যাপক। যে স্থানে 'গারাম ঠাকুর' অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহা 'ঠাকুরের থান' বলিয়া পরিচিত। ঠাকুর থান লোকালয় হইতে একটু দূরে গ্রামের কোন

নির্জন স্থানে উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে কিংবা কোন বৃক্ষমূলে অবস্থিত থাকে। কোন কোন সময় উন্মুক্ত স্থানে খড়ের ছাউনি দেওয়া একটি ছোট ঘরের আকৃতি একটু আশ্রয় গড়িয়া দেওয়া হয়, তাহার মধ্যে একটি ছোট বেদী থাকে, তাহাতেই 'গারাম ঠাকুর' অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন বলিয়া কল্পনা করা হয়, তাঁহার কোন প্রতীক্ (symbol) কিংবা বিগ্রহ প্রায়ই কল্পনা করা হয় না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে একটি শিলাখণ্ড প্রতীক্ রূপে গৃহীত হয়। প্রধানত বাৎসরিক পুজার যে একটি দিন ধার্য থাকে, সেই দিন এখানে হাঁস, পায়রা, ছাগল ইত্যাদি তাহার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হয়। মড়ক কিংবা অনাবৃষ্টি হইলেও তাহার নিকট বিশেষ পুজার ব্যবস্থা হয়। এই অঞ্চলে একটি লৌকিক দেবীর প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক, তাহাকে বুড়ীমা বলা হয়। ইহার উপাসনা কেবলমাত্র একটি গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, একাধিক গ্রামে ইহার প্রতিষ্ঠা দেখা যায়। পশ্চিম বাংলার রাঢ় দেশেও 'বুড়ী' নামক গ্রামদেবীর সন্ধান পাওয়া যায়, যেমন আসানসোলের নিকটবর্তী কালীপাহাড়ীর ঘাগড় বুড়ী ইত্যাদি। কিন্তু উত্তরবঙ্গে এই বুড়ী উপাসনা আরও ব্যাপক। সেখানে তিস্তা বুড়ী নামে তিস্তা নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী, ময়নাবুড়ী ইত্যাদির উপাসনা অত্যন্ত জনপ্রিয়। সেই সূত্রে সেই অঞ্চলের কোন কোন গারাম ঠাকুর 'বুড়ীমা' বলিয়া পরিচিত। বুড়ীমার নিকট নবজাতকের মস্তক মুণ্ডন করিয়া কেশ উৎসর্গ করা হয় এবং আরও অনেক মানসিক পালন করা হয়। কিন্তু লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে যাঁহার প্রভাব এই অঞ্চলে আরও ব্যাপক, তিনি বিষহরী বা বিষরী। শ্রাবণ সংক্রান্তি ব্যতীতও যখনই কোন পরিবারের মধ্যে অন্নপ্রাশন, বিবাহ, এমন কি, শ্রাদ্ধেরও অনুষ্ঠান হয়, তখনও এখানে বিষহরীর গান শুনিতে পাওয়া যায়। কোন কোন উৎসব উপলক্ষে রামায়ণ গানও শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাকে কুষাণে বলে। অন্যান্য লৌকিক অনুষ্ঠানের মধ্যে 'মেছেনী ব্রত' উল্লেখযোগ্য। মেচ নামক এক আদিম জাতির মেয়েদের এক অনুষ্ঠানই 'মেচেনী ব্রত' নামে পরিচিত, ইহাতে মেচ নারীদের নৃত্য এবং গীত প্রধান অংশ অধিকার করিয়া থাকে। যে সকল মেচ নারী নৃত্যে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে সাধারণ বলিয়া মনে করা হয় না, তাহাদিগকে অলৌকিক কিংবা দেবী শক্তির অধিকারিণী বলিয়া কল্পনা করা হয়। দর্শকেরা তাহাদিগকে দেবীজ্ঞানে ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে।

উত্তরবঙ্গের যে অঞ্চলের বিষয় উপরে বর্ণনা করা হইল, তাহা প্রধানত হিমালয়ের পাদভূমিতে অবস্থিত হিংস্র শ্বাপদ-সঙ্কুল বিস্তীর্ণ অরণ্যাকীর্ণ অঞ্চল। ইহার নিম্নভূমি ক্রমে সমতল কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এই অঞ্চলের নদনদী পার্বত্য অঞ্চলের জলধারা বহন করিয়া আনিয়া ইহাদের প্রবাহে তীব্রগতি সৃষ্টি করে, তাহাতে নদীপথও বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠে। কূলপ্লাবী বন্যায় তীরবর্তী লোকালয়ের অশেষ দুর্গতি সৃষ্টি করে। সর্বত্রই দেখা যায় যে, মানুষের জীবনযাত্রা যতই সংগ্রামশীল হয়, তাহার মধ্যে সঙ্গীতের উৎসও ততই অফুরন্ত হইয়া উঠে। ইহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, যেথানে জীবন অনায়াস-সাধ্য সেখানেই সাংস্কৃতিক জীবনের পরিপুষ্টি। কিন্তু এই কথা প্রায় কোন ক্ষেত্রেই সত্য নহে ; বরং যেখানে জীবনের বিক্ষোভজাত বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়, সেখানেই সংস্কৃতিরও বৈচিত্র্য দেখা যায়। উত্তর বাংলার দুর্গম অরণ্য, অসমতল চারণভূমি, হিংস্র বন্যজন্তু পূর্ণ অরণ্যানী, নদনদীর ক্ষিপ্রধারা—প্রকৃতির এই সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সাংস্কৃতিক জীবনের একটি বিশিষ্ট রূপ এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে। একদিকে বিশাল অরণ্যানীর স্তব্ধতা এবং আর একদিকে নদনদীর ক্ষিপ্র গতিবেগ; প্রকৃতির দুই বিপরীতমুখী রূপের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়া যেমন এখানকার লোক-জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার সাংস্কৃতিক জীবনও ইহার এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই বিকাশ লাভ করিয়াছে। ইহার লোক-সঙ্গীতের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য অনুভব করা যায়।

এই অঞ্চলের লোক-সঙ্গীতকে প্রধানত দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়, প্রথমত প্রেমসঙ্গীত, দ্বিতীয়ত আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত, অর্থাৎ বিবিধ সামাজিক অনুষ্ঠানে যে সকল সঙ্গীত গীত হয়, যেমন বিবাহসঙ্গীত কিংবা ব্রত পার্বণের সঙ্গীত। এতদ্ব্যতীত আরও এক শ্রেণীর সঙ্গীতের সঙ্গেও এখানে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, তাহা বনে পশুশিকার উপলক্ষে গীত হয়, তাহা সারি শ্রেণীর সমবেত সঙ্গীত। বিবাহ-সঙ্গীত হিন্দু-মুসলমান এবং আদিবাসী সকল শ্রেণীর সমাজের মধ্যেই প্রচলিত আছে।

এই অঞ্চলে আরও এক শ্রেণীর সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তাহা প্রকৃত উপরোক্ত শ্রেণীর সঙ্গীতের মত কেবলমাত্র ভাবমুলক সঙ্গীত নহে—তাহা কাহিনীমূলক সঙ্গীত। তাহা বাংলার লোক-সাহিত্যে গীতের পরিবর্তে গীতিকা বলিয়া পরিচিত। গোপীচন্দ্রের গান, মাণিকচন্দ্রের গান, সোনা

রায়ের গান ইত্যাদি ইহার অন্তর্ভুক্ত। গোপীচন্দ্র-মাণিকচন্দ্রের গান ইত্যাদি যুগীযাত্রা জাগগান বলিয়াও পরিচিত।

এই অঞ্চলের প্রেম-সঙ্গীতই সাধারণভাবে ভাওয়াইয়া গান বলিয়া পরিচিত, ভাবমূলক গান অর্থে ই ভাওয়াইয়া গান কথাটি ব্যবহৃত হইলেও প্রেম ব্যতীত অন্য কোন ভাব ইহাতে সাধারণত প্রকাশ পায় না। পূর্বেই বলিয়াছি, এই অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক হইয়া উঠিতে পারে নাই ; সেইজন্য বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে যেমন প্রেম-সঙ্গীতের নায়করূপে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই নাম শুনিতে পাওয়া যায়, এখানে তাহা পাওয়া যায় না, অর্থাৎ এখানে 'কানুছাড়া গীত নাই' এ'কথা প্রযোজ্য নহে।

এখানে প্রেমসঙ্গীতের নায়ক প্রধানত মৈষাল বা মহিষ-রক্ষক। মৈষাল মহিষের দল লইয়া এক অঞ্চল হইতে আর এক অঞ্চলে চরাইয়া বেড়ায়, গ্রাম্য যুবতীর মন তাহার দিকে আকর্ষণ অনুভব করে।

প্রাণ কান্দে মোর, মৈষাল বন্ধুরে—
মইষ চড়ান, মইষাল বন্ধু, ঘাটের উজানে,
তোমার মইষের ঘণ্টায় বাইজে
মন উড়াং বাইরাং করে রে।
মইষ বান্ধ, মইষাল বন্ধু, বাড়ীর বগলেতে,
মুই নারীটা দেখা দিম
সকালে বৈকালে রে।
ভার বান্ধেন ভারাটি বান্ধেন (মইষাল)
ছাড়িয়া আপন মায়া,
ওরে আজি কেনে দেখং, মইষাল,
মোক ছাড়িয়া যাবার কায়া রে।
তোমরা যাইবেন দূর স্থাশে
আমার হইবে কি—
দিন রাইতে, ওরে মইষাল, কান্দি কান্দি মরি রে।

যাহারা মহিষ চরায়, তাহারা গ্রামান্তর হইতে মহিষের পাল লইয়া আসে, কিছুদিন এক অঞ্চলে থাকিয়া সেখানকার চারণভূমি তৃণ-সম্পদহীন হইলে পর অন্য অঞ্চলে চলিয়া যায়। তাহারা এক এক অঞ্চলে ক্ষণিকের অতিথি মাত্র,

বা 'বিদেশী পথিক'; সেইজন্য গ্রাম্য যুবতীদের তাহাদের সম্পর্কে এক বিশেষ কৌতূহল সৃষ্টি হয়; কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে পরিণামে বিচ্ছেদ অনিবার্য হইয়া উঠে, বিচ্ছেদের বেদনাতেই ভাওয়াইয়া গান মধুর হইয়া উঠিয়াছে—

ধিক্ ধিক্ ধিক্, মইষাল রে,
মৈষাল ধিক্ গাভুরালি—
এহেন সুন্দর নারী ক্যামনে যাব ছাড়ি,
মৈষাল রে!
তোমরা যাইবেন মৈষ বাথানে
আমরা বাদে কি, মৈষাল রে ॥
তোমার পেন্দোনে শ্যামলাই ধুতি
আমরা দাঁতের মিশি ॥
ভার বান্দো ভারটি বান্দো রে
মৈষাল, ভৈষের পৃষ্ঠে জিন।
আজি কেন দেখাও, মৈষাল,
ছাড়ি যাবার চিন ॥
তখন না কইচোঙ, মাইষাল রে,
মৈষাল, না যাইস্ গোয়ালপাড়া,
কাড়িয়া লবে হস্তের বাঁশী
ছিঁড়িবে গলার হারা ॥

মুগ্ধ গ্রাম্য যুবতী একদিন আসিয়া দেখিতে পাইল, তাহার প্রেমিক ভিন-গাঁয়ের অতিথি মৈষাল গ্রামান্তরে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছে। যে যাযাবর—পথের পথিক মাত্র, তাহাকে প্রেম নিবেদন করিয়া গৃহস্থ যুবতী একদিন তাহার ভুল বুঝিতে পারিল,—'আজি কেন দেখাও্, মৈষাল, ছাড়ি যাবার চিন্।' তাহার প্রেম একথা বিশ্বাস করিয়াছিল যে যাহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, সে তাহার আপনার হইতে আর বাকি নাই; কিন্তু কঠিন সত্য একদিন রূঢ় বাস্তব হইয়া যখন আত্মপ্রকাশ করিল, তখন হইতে তাহার অশ্রুজল ব্যতীত আর কিছুই সম্বল রহিল না। বিচ্ছেদের এই বেদনার অনুভূতিতে গান মাত্রই করুণ হইয়া থাকে।

ভাওয়াইয়ার প্রেম-সঙ্গীতে পূর্বরাগ, অনুরাগ, মিলন, রসোল্লাস, মান কিছুই

নাই—একমাত্র যাহা আছে, তাহা বিরহ; বিরহেই ইহার আরম্ভ, বিরহেই ইহার শেষ। ইহার পল্লীকবিগণ একথাই বিশ্বাস করিয়াছেন যে,; প্রেমে বিরহই একমাত্র সত্য। বৈষ্ণব কবি মিলনের মধ্যেও বিরহের ছায়া দেখিয়া বলিয়াছেন, 'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'। ভাওয়াইয়ার পল্লীকবিগণ তেমনই প্রেমে বিরহই একমাত্র সত্য বলিয়া মনে করিয়া নরনারীর পার্থিব প্রেমের মধ্যে স্বর্গীয় মহিমা অনুভব করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিতায় সম্ভোগের পর বিরহ, কিন্তু ভাওয়াইয়া গানে সম্ভোগ ব্যতীতই বিরহ; সেইজন্য ইহার বেদনার অনুভূতি পার্থিব কলুষতা হইতে প্রথম হইতেই মুক্তিলাভ করিয়াছে।

ও কি নাগর কানাই, তুই মোরে
উজান ছাড়ি ভাটির দ্যাশৎ কল্লেন মায়া বাড়ী—
ওরে যৌবন কালে দোনো জনায় হলং ছাড়াছাড়ি রে।
তোমার বাড়ী আমার বাড়ী
(নাগর) অনেক দূরের ঘাটা,
ওরে কেমন করি হইবে দেখা
ঝোরে চোখের পানি রে।
ভোমরা খালি উড়িয়া পড়ে ফুলের মধু বাদে,
ওরে তুই ভোমরার বাদে আজি
মোর না পরাণ কান্দেরে,
নাগর কানাই তুই…… ॥

শ্রীকৃষ্ণের হাতে যেমন বাঁশী ছিল, বাঁশীর সুরে তিনি গোপবালাকে ঘর ছাড়া করিতেন, মইষালের হাতেও তেমনই আছে দোতারা বা দোত্‌রা, এই দোত্‌রার সুরে সে পল্লীবালাকে নিয়তই আকর্ষণ করিয়াছে—

রায়ডাকে নদীর ঘাটৎ বসি
দোতরা বাজাও আপন খুশী
দোতরায় মোক করিছে বাড়ী ছাড়া।
মোর দোতরায় মৈষালী ডাক্সে
পাড়ার চেংড়ীয় মনটা ভাঙ্গে
বগলৎ ডাকায় চক্ষুতে ইশিড়া
দোতরায় মোক করিছে বাড়ী ছাড়া ॥

ও মোর মৈষাল বন্ধু রে,
না বাজান তমান খুটারে দোতরা।
নারীর মন মোর করিল রে ঘর ছাড়া॥
ওর এ্যাখেতে সুতারো বাইজন রে,
কি না সুরে বাজে।
তোর দোতরার বাইজন শুনি
মন না অয় মোর ঘরে।

রাধাকৃষ্ণের-কাহিনী যে সমগ্র ভারতব্যাপী কেন জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, তাহা এই প্রকার ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লৌকিক প্রেম-গীতি একটু গভীর ভাবে অনুসরণ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ইহার একটি প্রধান কারণ এই যে, একটি সর্বভারতীয় কাঠামোর উপরই ইহার কাহিনীটি স্থাপিত হইয়াছিল। প্রেম এবং তাহার অভিব্যক্তির প্রণালীর সর্বজনীনতার গুণের উপরই ইহার কাহিনী সমগ্র ভারতব্যাপী জনপ্রিয় হইয়াছিল। উপরি উদ্ধৃত ভাওয়াইয়া গানটি হইতে তাহাই বুঝিতে পারা যাইবে। গ্রাম্য যুবতীর ভাষায় 'দোতরায় মোক করিছে বাড়ী ছাড়া'ই বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষায় 'বাঁশীর শবদেঁ, বড়ায়ি, হারাইলোঁ পরাণী' হইয়াছে। ইহা নরনারীর এক শাশ্বতী বেদনা, রাধাকৃষ্ণের মাধ্যমে চিরকালের যুবক-যুবতী ইহাতে কথা বলিয়াছে; সেইজন্য ইহার আবেদন যেমন নিত্য, তেমনই ব্যাপক।

তিস্তা নদীর তীরে বিস্তীর্ণ অরণ্য ভুমিতে কোন দূর গ্রাম হইতে মৈষালেরা মহিষ চরাইবার জন্য আসে, নিভৃত অরণ্যের স্তব্ধ নির্জনতার মধ্যে তাহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হয়, মৈষাল যুবতীকে কাঠ কাটিয়া দিতে সাহায্য করে, কাঠের বোঝা মাথায় তুলিয়া দেয়, কঠিন জীবনের মধ্যেও প্রেমের আলো বিদ্যুতের মত চকিতে দেখা দিয়া যায়—

তিস্তা নদীর পারে পারে
ও মোর বাই গে,
না জানি মৈষাল বন্ধু মোর,
ভইষ চরেবার আসে॥
আজি খড় কাটিয়ে দে রে মৈষাল,
বোঝা বান্ধিবার দে।

হাত ধরোঁ, মিনতি করোঁ রে, মৈষাল,
মাথাতে তুলিয়া দে ॥
হাতে ধরোঁ মিনতি করোঁ রে, মৈষাল,
আজি আগ্ বাড়েয়া দে।
আগ্ বাড়েয়া দে রে মৈষাল,
বাড়ীতে পহুঁছেয়া দে ॥

গ্রাম্য কুমারী ভিন গাঁয়ের মৈষালকে হাত ধরিয়া মিনতি করিতেছে, গভীর অরণ্যের মধ্যে সে তাহাকে তাহার ঘরের পথে আগাইয়া দিয়া আসুক, বাড়ীতে পৌছাইয়া দিয়া আসুক, বোঝাটি মাথায় তুলিয়া দিক। নির্জন অরণ্যপথে মৈষালকে সঙ্গী করিয়া লইয়া তাহার পথ চলিবার এবং বোঝা বহিবার শ্রম লঘু হইয়া উঠুক।

জীবন যত কঠিনই হোক, তাহার মধ্যেও প্রেম তাহার আপনার পথ করিয়া লইতে জানে, প্রেমের অনুভূতিতে জীবনের কঠিনতা অনেকখানি লাঘব হইয়া আসে। মৈষাল ও গ্রাম্য বালিকার সুকঠিন জীবনাচরণের মধ্য দিয়া তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে।

দুর্গম অরণ্যপথচারী মৈষাল যেমন ভাওয়াইয়া গানের নায়ক, তেমনি উত্তর বাংলার দুস্তর পার্বত্য নদীর নৌকার মাঝিও ইহার নায়ক হইয়া থাকে। গ্রামান্তরের মাঝি যখন নদীর তীব্র স্রোতের মধ্যে নিজের নৌকা ভাসাইয়া দিয়া সতর্ক হইয়া হাল ধরিয়া থাকে, তখন তীরাগত সঙ্গীতের মধ্য দিয়া কোন রিক্তা নারীর বেদনার্ত দীর্ঘশ্বাস ভাসিয়া আসে—.

নাইয়া রে—
চাপাও নৌকা কমলাসুন্দরীর ঘাটে রে।
নাও বাইয়া যাও নাইয়া রে,
তোর সে মনের সুখ।
ওরে, নায়ের বাদাম তুলিয়া, নাইয়ারে,
দেখাও চান্দ মুখ রে ॥
মনে বড় দুখ নাইয়া রে, চিত্তে বড় দুখ।
ওরে নদীর পাথরের মত
ভাঙ্গে নারীর বুকও রে ॥

নদীর মাঝে থাক, নাইয়া রে, নায়েরও কাণ্ডারী।
ওরে অভাগিনী নারীর নাইয়া রে, নাইয়া,
যৈবনের ব্যাপারী রে ॥

উত্তর বাংলার নদনদীর প্রকৃতির সঙ্গে পূর্ববঙ্গের নদনদীর প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। সেইজন্য এই দুই স্বতন্ত্র অঞ্চলের মাঝিকে লক্ষ্য করিয়া যে গান রচিত হইয়াছে, তাহাদের প্রকৃতিও স্বতন্ত্র। উত্তর বাংলার মাঝি খরস্রোতা নদীর মাঝি, পূর্ববাংলার মাঝি ধীরস্রোতা নদীর মাঝি। পূর্ববঙ্গের মাঝির কণ্ঠে যে ভাটিয়ালী গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার সুরে ধীরমন্থর গতির স্পর্শ অনুভব করা যায়, উত্তর বঙ্গের মাঝির কণ্ঠে তাহার অভাব আছে। সেখানে স্বভাবতই তাহাতে একটু দ্রুততা আসিয়া যায়। উত্তর বাংলার নদীর রূপের যে তাল ও ছন্দ ফুটিয়া উঠে, তাহাই সেখানের সঙ্গীতের সুরে প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্ববঙ্গে নিম্নভুমির অন্তহীন বিস্তারের মধ্যে নদী গতিবেগ হারাইয়া ফেলে, সেই ভাবেই সেই অঞ্চলে মাঝির কণ্ঠে যে ভাটিয়ালী সুর শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে গতিবেগ অনুভব করা যায় না। যেখানে গতি নাই, সেখানে তাল (rhythm)ও নাই; সেইজন্য ভাটিয়ালী সুরে তাল নাই; কিন্তু ভাওয়াইয়া গানের সুরে তাল আছে; ভাটিয়ালী ঢঙ্গের গান হওয়া সত্ত্বেও ইহার দীর্ঘ টানগুলি ভাঁজে ভাঁজে খণ্ডিত হইয়া প্রবাহিত, ভাটিয়ালীর মত সরল রেখায় লম্বিত নহে। প্রকৃতির মধ্য হইতেই মানুষ তাহার গানের সুর খুঁজিয়া পায়, পূর্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের নদনদীর প্রকৃতিগত পার্থক্যের মধ্যেই এই দুই অঞ্চলের মাঝির গানে এই পার্থক্যটুকুর সৃষ্টি হইয়াছে।

ভাওয়াইয়া গান সম্পর্কে আর একটি প্রধান কথা এই যে, ইহা বিচ্ছেদের গান; প্রোষিতভর্তৃকা কিংবা ব্যর্থ প্রণয়িনী নারীর বেদনা ও হৃদয়ানুভূতিরই অভিব্যক্তি ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রেমে অপূর্ণতার বেদনাই ইহার অনুভূতির বিষয়। ভাটিয়ালী সুরে দেহতত্ত্ব, বাউল ও বৈরাগ্যমূলক গান গাওয়া হয়, কিন্তু ভাওয়াইয়া গানে কেবলমাত্র নারীহৃদয়ের বেদনার অভিব্যক্তি দেখা যায়।

ও পতিধন, প্রাণ বাঁচে না যৈবন জ্বালায় মরি—
সখিরে, মনোকে বুঝাব বা কত,
সখিরে, চিতোকে বুঝাব বা কত।

(আজি) আকাশেতে নাইরে চন্দ্র কি করে তার তারা,
যে নারীর সোয়ামী নাইরে দিনে আঁধিহারা।
খোপেতে যে নাইরে কইতর কি করে তার খোপে,
যে নারীর সোয়ামী নাইরে কি করে তার রূপে,
সখি রে।
তোলা মাটির কলা যেমন রে হল্‌হল্‌ যল্‌যল্‌ করে,
ঐ মতন নারীর যৈবন দিনে দিনে বাড়ে রে,
সখি রে······

নারীমনে একটি মাত্র বিষয় অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত হইয়া থাকে বলিয়া ইহার মধ্যে যে বৈচিত্র্যহীনতা দেখা যাইবার কথা ছিল, প্রকৃতপক্ষে ইহাতে তাহা প্রকাশ পায় না; কারণ, ইহার অনুভূতি অত্যন্ত গভীর বেদনার সঙ্গে যুক্ত বলিয়া ইহা সর্বদাই একটি বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়। কারণ, বেদনার মধ্য দিয়াই জীবনের মধুরতম সঙ্গীতের সুর বাজিয়া উঠে—"Our sweetest songs are those that telleth of saddest thought. বৈষ্ণব পদাবলীর মাথুর যেমন করুণতম হইয়াও মধুরতম বিষয়, ভাওয়াইয়া গানও বাংলার লোক-সঙ্গীতের মধ্যে করুণতম বলিয়াই মধুরতম বলিয়া বোধ হয়।

ভাওয়াইয়া গানে সর্বত্রই কেবলমাত্র নারী মনেরই অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়। ইহার কারণ সম্পর্কে প্রথমেই বলিয়াছি যে, ইহা স্ত্রী-প্রধান বা মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-জীবন হইতে উৎসারিত হইয়াছে। সেইজন্য এই অঞ্চলের লোকসাহিত্য মাত্রেই নারীর অন্তর্বেদনাই সঙ্গীতে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। তবে সামাজিক জীবনে নারীই যে বিচ্ছেদমূলক ভাওয়াইয়া গানের গায়িকা, তাহা নহে; পুরুষই নারীর অন্তর্বেদনাকে ভাষা দেয়; পুরুষ যেমন এই গানের রচয়িতা, তেমনই পুরুষই ইহার গায়ক, তথাপি গানের বিষয়বস্তু সর্বত্রই নারী।

ভাওয়াইয়া গানের সঙ্গে যে বাদ্যযন্ত্রটি অপরিহার্যরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা দোতারা, স্থানীয় উচ্চারণে দোত্‌রা। ইহা তারযন্ত্র, কাঠে তৈরি, চারিটি তার সংযুক্ত; তবে দুইটি তারই অঙ্গুলির স্পর্শ পায় বলিয়া দোতারা নামে পরিচিত। দোতারা বাদ্যের সঙ্গে ভাওয়াইয়া গানের সুর ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া থাকে। দোতারার সুরও পল্লীবালাকে গৃহছাড়া করে—

ও মোর মৈষাল বন্ধুরে,
না বাজান তমান খুটা রে দতারা।
নারীর মন মোর করিল রে ঘরছাড়া ॥
ওর এ্যাখেতে সুতারো বাইজন রে ;
কি না সুরে বাজে।
তোর দোতরার বাইজন শুনি
মন না রয় মোর ঘরে রে ॥

দোতারার সঙ্গে ভাওয়াইয়া গান অনিবার্যরূপে গীত হয় বলিয়া ভাওয়াইয়া গানকে দোতারার গানও বলা হয়।

উত্তর বাংলায় ভাওয়াইয়া গান ব্যতীতও অন্যান্য কোন কোন লোক-সঙ্গীতেও দোতারার ব্যবহার দেখা যায়। তথাপি মনে হয়, ভাওয়াইয়া গানের জন্যই যেন দোতারার জন্ম হইয়াছে। উত্তর বাংলার লোক-সঙ্গীতের গায়কদের নিকট দোতারা যন্ত্রটি অত্যন্ত প্রিয়। দোতারাকে উপলক্ষ করিয়াও সেখানে অনেক গান শুনিতে পাওয়া যায়। একটি গানে দোতারাকে গায়কের পুত্র বলিয়া কল্পনা করিয়া তাহার সম্পর্কে নানা সস্নেহ উক্তি প্রকাশ করা হইয়াছে। তবে উত্তর বাংলার পুরুষ সমাজই দোতারা বাজাইয়া কিংবা অন্যান্য গান গাহিয়া থাকে ; স্ত্রী-সমাজে যে গানের প্রচলন আছে, তাহাদের প্রায় অধিকাংশের মধ্যেই নৃত্য সংযুক্ত থাকিলেও কোন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায় না, কোন কোন সময় হাতে তালি দিয়া নৃত্যের তাল রাখা হয় মাত্র।

ভাওয়াইয়া গান বাংলার প্রেম-সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত। আমি অন্যত্র বলিয়াছি, প্রকৃত প্রেম-সঙ্গীতে কোন মালিন্য নাই, ভাওয়াইয়া গান আরও একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ মালিন্য বর্জিত হইতে পারিয়াছে, তাহা এই যে, ইহাতে মিলনের কথা নাই, সুতরাং রসোল্লাসও ইহাতে সৃষ্টি হইবার কোন অবকাশ হয় নাই। ইহা নিরবচ্ছিন্ন বিচ্ছেদের গান, গভীরতম বেদনার গান। অন্তরের গভীরতম তলদেশে কোন মালিন্য স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়া ইহা বাংলার পবিত্রতম প্রেম-সঙ্গীত। লৌকিক প্রেম-সঙ্গীত যে দেবতার নামে নিবেদিত প্রেম-সঙ্গীতের তুলনায়ও নির্মল হইতে পারে, ভাওয়াইয়া গান তাহারই নিদর্শন।

পূর্ব বাংলার কোন কোন অঞ্চলে বিচ্ছেদী গান নামে এক শ্রেণীর লৌকিক

বিরহ সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়। তাহা প্রধানত পূর্ববঙ্গের প্রচলিত লোক-সঙ্গীতের সুরে অর্থাৎ ভাটিয়ালী সুরেই গীত হয়। পূর্ববঙ্গের লোক-সঙ্গীতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রই তাহাতে ব্যবহার করা হয়। ভাব-গভীরতার দিক হইতে ইহাও ভাওয়াইয়ার সমকক্ষ। তবে পূর্ববঙ্গের বহু বিচ্ছেদী গানে যেমন রাধা-কৃষ্ণের বিরহ চিত্র গিয়া প্রবেশ করিয়াছে, ভাওয়াইয়া গানে তাহা হয় নাই। ভাওয়াইয়া গান প্রেম-সঙ্গীত হওয়া সত্ত্বেও ইহার সম্পর্কে একটি প্রধান কথা এই যে, ইহাতে রাধাকৃষ্ণের চিত্র কোন দিক দিয়াই প্রবেশ করে নাই। সেই জন্যই ইহার চিত্রগত নির্মলতা রক্ষা পাইয়াছে। দেবতার নামে মানুষ একদিন যে দুর্নীতির আদর্শকে তাহার লোক-সঙ্গীতে গ্রহণ করিয়াছিল, দেবতার অভাবে ভাওয়াইয়া গানে কোন দিক দিয়াই তাহা প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। সেইজন্য ভাওয়াইয়া গানে মানবিক প্রেমানুভূতির পবিত্রতম বিকাশ দেখা গিয়াছে। দেবতার নামে মানুষ এখানে মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিবার অবকাশ পায় নাই।

ভাওয়াইয়া গানের নায়ক কৃষ্ণ বা কানুর পরিবর্তে গ্রাম্য 'চ্যাংরা' বা যুবক—

> এমন মন মোর করেরে, বিধি, এমন মন মোর করে,
> মনের মত চ্যাংরা দেখি ধরিয়া পালাওঁ দূরে,
> রে বিধি নিদয়া।

চ্যাংরা বন্ধুর গান শুনিবার জন্য পল্লীবালার মন উৎসুক হইয়া থাকে, গৃহ-কর্ম তাহার নিকট অর্থহীন বলিয়া মনে হয়—

> ঢেঁকি কো কাটিম্ রে,
> ছাইলাকো পুতিম্ রে,
> কেম্‌নি শুনিম্ মুঞঞ চ্যাংরা বন্ধুর গান রে।

এই চ্যাংরা বন্ধুর জন্যই নারীর মন ব্যাকুল হইয়া থাকে। নায়িকার নামও ভাওয়াইয়া গানে রাধিকা নহে, নায়িকার জবানীতে গানগুলি রচিত হয় বলিয়া নায়িকার কোন নামই ইহাতে শুনিতে পাওয়া যায় না, সাধারণ ভাবে নায়িকা বিমুগ্ধা স্মরশরাহতা পল্লীবালিকা।

প্রেম-ভাবের সমুচ্চ আদর্শ এইভাবে রক্ষা করিয়া ভাওয়াইয়া গান রচিত হইয়া চলিলেও ইহার একটি ধারার মধ্যে একটু লৌকিক বিকৃতি দেখা গিয়া-

ছিল, তাহাই অনুসরণ করিয়া ইহার মধ্যে এক নূতন প্রকৃতির লোক-সঙ্গীত রচিত হইয়াছে, তাহা চট্‌কা গান (পূর্বে দেখ) নামে পরিচিত। ইহা লঘু এবং হালকা কথায় দ্রুত তালের ছন্দে রচিত কৌতুক সঙ্গীত মাত্র, যে ভাব-গভীরতা ভাওয়াইয়া গানকে বাংলার লোক-সঙ্গীতের মধ্যে একটি বিশেষ মর্যাদা দিয়াছে, তাহা হইতে ইহা সম্পূর্ণ বঞ্চিত। ভাওয়াইয়া গানে তাল থাকিলেও দীর্ঘ সুরের টানের মধ্যে সেই টান যেমন প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না, ইহাতে তাহার পরিবর্তে দ্রুত তালের ছন্দ ব্যবহৃত হইয়া তালই প্রাধান্য লাভ করিয়া বিষয়-বস্তুকে নিতান্তই তরলায়িত করিয়া তুলে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে—

ও দিদি, শোনেন একটা কথা কঙ,
তোকে ছাড়া আর কাকে সাইকাং
তুই ছাড়া আর কবার জাগায় নাই।
(দিদি) বাপ মায়ের কপাল পোড়া
মোরও নারীর অল্প পড়া
সেইজন্য ভাল পাত্তর আইসেং না।

দিব্যভাবমূলক বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেম-সঙ্গীত যেমন লৌকিক স্তরে অবনমিত হইয়া একদিন কবিওয়ালার গানের অধঃপতিত পরিচয় প্রকাশ করিয়াছিল, তেমনই উচ্চ ভাবমূলক প্রেম-সঙ্গীত ভাওয়াইয়া গানও লৌকিক স্তরে অবনমিত হইয়া চট্‌কা গানে পরিণত হইয়াছে। তবে কবিওয়ালার গানের মধ্যে যেমন বৈষ্ণব পদাবলী শেষ পরিণতি লাভ করিয়াছিল, চট্‌কা গানের মধ্যে ভাওয়াইয়া গানের সেই পরিণাম ঘটে নাই—ইহার একটি ধারা এইভাবে অধঃপতিত হইয়া পড়িলেও ইহার মূল ধারাটি অবিকৃত থাকিয়া আজও উচ্চ ভাবমূলক ভাওয়াইয়া গান রচনার শক্তি অক্ষুন্ন রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। সেইজন্য ভাওয়াইয়া এবং চট্‌কা উভয়েই সমান্তরাল ভাবেই আজও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। ভাওয়াইয়ার ক্ষেত্রে ভাওয়াইয়া এবং চট্‌কার ক্ষেত্রে চট্‌কা ব্যবহৃত হইতেছে।

চট্‌কা গানের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের সারি গানের ভাব ও রূপগত অনেকখানি সাদৃশ্য আছে। সারি গানের মধ্যেও প্রেমের বিষয় থাকিলেও যেমন তাহা নিতান্ত লঘু এবং চটুল তাল-প্রধান সুরে রচিত হইবার ফলে তরলায়িত হইয়া

উঠে, চট্‌কা গানেও তাহাই হয়; তবে সারি গানে যেমন রাধাকৃষ্ণের দিব্য প্রেমের কাহিনীকে নিতান্ত লৌকিক স্তরে অবনমিত করিয়া কৌতুক উপভোগ করা হয়, চট্‌কা গানে তাহা করা হয় না; চট্‌কাই হোক কিংবা ভাওয়াইয়াই হোক, কাহারও মধ্যে রাধাকৃষ্ণের কাহিনী প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই, সে কথা পুর্বেও বলিয়াছি।

এইবার ভাওয়াইয়া গানের ভাষা সম্পর্কে কিছু না বলিলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। উত্তর বাংলার উপভাষার সমগ্র বৈশিষ্ট্য আশ্রয় করিয়াই ভাওয়াইয়া গান রচিত হইয়া থাকে, তাহা সাধু ভাষায় রূপান্তরিত করা যায় না, করিলে গানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইতে পারে না। বাংলার সকল আঞ্চলিক লোক-সঙ্গীত সম্পর্কেই একথা সত্য। তথাপি ভাওয়াইয়া গানের সম্পর্কে এ'কথা আরও সত্য বলিয়া মনে হইবে; কারণ, এই অঞ্চলের উপভাষার একটি বিশেষত্ব আছে, ভাওয়াইয়া গানের গঠনে তাহা অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত হইয়াছে।

ভাষা

এই অঞ্চলের অধিবাসী রাজবংশীদের ভাষা রাজবংশী বা পশ্চিম কামরূপী ভাষা বলিয়া ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ নির্দেশ করিয়া থাকেন। যে মাগধী অপভ্রংশ বাংলা-আসমী-ওড়িয়া ভাষার মূল এই উপভাষারও মূল তাহাই। ইহার কতকগুলি বিশেষত্ব এই প্রকার—

ধ্বনিতত্ত্ব—(১) পদের আদিস্থিত 'অ' অনেক সময় 'আ' হয়: যেমন—

কথা	স্থলে	কাথা
সকাল	„	সাকাল
সন্ধ্যা	„	সাঞ্ঝা
পয়সা	„	পাইসা
লম্বা	„	লাম্বা
অঞ্চল	„	আঞ্চল

(২) পদের আদিস্থিত 'অ' অনেক সময় 'উ'-তেও পরিণত হয়, যেমন, অঝোর স্থলে উঝোর

(৩) শব্দের আদি বর্ণে সংযুক্ত 'ে' একার সর্বত্র 'য়্যা'র ন্যায় উচ্চারিত হইবে—

শেষ — 'শ্যাষ'

বেশ — 'ব্যাশ'

কেশ — 'ক্যাশ'

দেশ — 'দ্যাশ'

ইহার বিভক্তি প্রকরণ এই প্রকার। প্রথমা বিভক্তিতে প্রাকৃতে 'এ' সংযুক্ত হইয়া থাকে। রাজবংশী ভাষা এই নিয়ম লঙ্ঘন করে নাই। যথা—

রাজাএ ডাকে — রাজা ডাকে

চোরে তামাম্ নিচে — চোরে সমস্ত লইয়াছে।

প্রাকৃতের ন্যায় দ্বিতীয়াতে রাজবংশী ভাষায় সর্বত্র 'ক' বিভক্তি চিহ্ন সংযুক্ত হয়। যথা—'পতিক', 'ভীষ্ম', 'তোক', 'মোক', 'রাজক,' ইত্যাদি দ্বিতীয়ান্ত।

করণ কারকে 'ত', 'দি' সংযুক্ত হয়। যথা—

দাওদি হাত কাটছে, — দাওত হাত কাটছে,

অধিকরণে 'ত' সংযুক্ত হয়! যথা—

হাতত পাঞসা নাই, — হাতে পয়সা নাই।

ঘরত ভাত নাই — ঘরে ভাত নাই।

নিশ্চয়ার্থে 'ই' এর পরিবর্তে 'এ' সংযুক্ত হইয়া থাকে। যথা—

'হামরাএ যাবেন' — আমরাই যাইব।

ইহার কারক প্রকরণ এবার উল্লেখ করিতে হয়। কর্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যথা—

ধান খায়া যায় বানে,

মাগী ক্যাদলে বারা বানে।

—অর্থাৎ বন্যায় ধান নাশ করিতেছে, আর বেটী তখনও উদুখলে মুষল পেষণ করিতেছে। (রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। ১ম—১৩২৫)

এই উপভাষার সর্বনামের পদগুলিও উল্লেখযোগ্য—

সম্ভ্রমার্থে	তুচ্ছার্থে	
হামি	মুঁইঞ	(আমি)
হামরা	—	(আমরা)

সম্ভ্রমার্থে	তুচ্ছার্থে	
হামাক্	মোক	(আমাকে)
হামারগুলাক,	—	(আমাদিগকে)
হামার ঘরক্		”
হামাকদি	—	(আমাদ্বারা)
হামার গুলাকদি	—	(আমাদিগ দ্বারা)
হামার	—	(আমার)

১

পরসি আপনার নয় বান্ধব রে।
নলবাড়ী খান্ দলোরে মলো আরো বাগের ভয়।
তোমরা ক্যানে আসিলেন, বন্ধু, আমরা গ্যাইলোঙ্ হয়।
পরসি আপনার নয় বান্ধব রে।
নলের আগুন তলেরে তলে খাগ্ড়ার আগুন জ্বলে,
মোর অভাগীর মনের আগুন সদায় জ্বলিয়া ওঠেয়ে।
পরসি আপনার নয় বান্ধব রে।
কোড়া কান্দে কুড়িরে কান্দে কান্দে বালি হাঁস।
বনের হরিণী কান্দে ছাড়িয়া মুখের ঘাস।
পরসি আপনার নয় বান্ধব রে। —কুচবিহার

২

আজি নাও চাপাও, নাও চাপাও, নাইয়া রে,
আর নাও চাপাও, নাও চাপাও নাইয়া
নাও চাপাও তুই ঘাটে।
ওকি আমি নারী আচি বসিয়া রে
ওকি পান বিড়ি লইয়ারে।
ওরে খাটো খুঁটো নাইয়া রে তোর দীঘল মাথার কেশ।
ওকি যেদিকে চাপাইবেন নাও নাইয়া স্যাটি আমার দেশ।
ওকি নাও বাইয়া যাও, ওরে নাইয়া, মধ্য নদী দিয়া,
ওকি আমি নারী বসিয়া আচিরে পান বিড়ি লইয়ারে।
ওকি নাও চাপাও নাও চাপাও নাইয়ারে। —ঐ

৩

আরে, ও মন মোর ঝোরে ঝোরে মন মোর চান্ বন্ধুর বাদে।
চান বন্ধুয়া মোক গেইচে রে ছাড়ি,
মুঞ্‌ঞ নারী দিম গলায় দড়ি রে!
আরে, ও মন মোর ঝোরে ঝোরে মন মোর চান বন্ধুর বাদে।
চান বন্ধুয়ার এমনি মায়া, বুঝাইতে না মানে দেহারে,
আরে, ও মন মোর ঝোরে ঝোরে, মন মোর, চান বন্ধুর বাদে। —ঐ

৪

তোরষা নদীর পারে পারে, ও দিদিও, মানসাই নদীর পারে—
দিদিও, মানসাই নদীর পারে—আজি সোনার বঁধু গান করি যায় ও,
দিদি তোরে কি মোরে কি শোনেক্, দিদিও!
বড় বইনে ভুকায় ঢেকি, ও দিদি, ও মাইজান বোনে ঝাড়ে,
আর ছোট বইনের চোখের পানি ও দিদি হিড়িস্ বাঁধি পড়ে—
কি শোনেক দিদি ও!!
কেমন করি ডাকাঙ দিদি ও দিদিও ঐদি ঐদি' যায়—
বুকের আগুন জ্বলে দিয়া যায়—দিদি, তোরে কি মোরে
কি শোনেক দিদিও!! —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত ভাওয়াইয়া গানটি একটি দ্বৈত সঙ্গীত, ইহার মধ্যে একক ভাওয়াইয়ার ভাব-নিবিড়তা নাই—

৫

পুরুষ— আগা নাওয়ে ডুবু ডুবু পাছা নাওয়ে বৈস
ঢোঙায় ঢোঙায় ছেকোং জলে রে।
ও কন্যা, পাছা নাওয়ে বৈসো, ঢোঙায় ঢোঙায় ছেকোং জলে রে!!
জল ছেকিতে জল ছেকিতে সেঁউতির ছিঁড়িল দড়ি,
গলার হার খসেয়া, কন্যারে—
ও কন্যা, সেঁউতিত নাগাও দড়ি, গলার হার খসেয়া কন্যা রে!!

স্ত্রী— তোক সে বলোং, ছওয়াল কানাই, তোর সে ভাঙা নাও—
ভাঙা নাওয়ের খেওয়া দিয়া রে—ও তুমি কেমন মজা পাও।
ভাঙা নাওয়ের খেওয়া দিয়া রে!!

পুরুষ : ভাঙাও নোয়ায় ফুটাও নোয়ায় সোনা রূপার গড়া,
রাজরে হস্তী পাব করিচোং রে !
এক সুন্দরীক পার করিতে নিচোং আনা আনা—
তোক সুন্দরীক পার করিয়া রে—
কন্যা, খসাইম কানের সোনা, তোক সুন্দরীক পার করিয়া রে ! —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত গানটি আধুনিকতার লক্ষণাক্রান্ত—

৬

তোরষা নদীর ধারে, দিদি, মানসাই নদীর পারে,
সোনার বঁধু গান গেয়ে যায় যায় সে অভিসারে।
তোর পানে ও চায় কি দিদি, মোর পানে ও চায় ?—
কান পেতে শোন, সোনার বঁধু গান গেয়ে ঐ যায়।
বড় বহিন ঢেঁকি পাড়ায়, ছোট বহিন ঝাড়ে,
গাঙ্ গড়িছে মেজো বহিন দুই নয়নের ধারে।
চোখের জলের ধারা দিয়ে গাঙ্ যে গড়ি, হায়,
তোর পানে ও চায় কি, দিদি, মোর পানে ও চায়।
যায় চলে আর পিছন পানে তাকায় থাকি থাকি,
ও দিদি, ও যায় যে চলে, কেমন করে ডাকি ?
যায় ছড়িয়ে তুষের আগুন মনের আঙিনায়।
তোর পানে ও চায় কি, দিদি, মোর পানে ও চায়। —ঐ

ভাঁজের গান

মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এবং বর্ধমান জিলার পশ্চিম ভাগে ভাদ্রমাসে কুমারী মেয়েদিগের মধ্যে ভাঁজে নামে এক লৌকিক দেবীর পূজা হয়। বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার ভাদুর সঙ্গে ইহার সম্পর্ক থাকা সম্ভব নহে। গানগুলিও প্রায় একই প্রকার। পূর্বে এই গান নৃত্য সম্বলিত ছিল ; সেইজন্য ইহাদের রচনা এখনও তালপ্রধান।

১

তিন দিনকের ভাঁজে আমারে চারে দিলে পা,
তবুতো সোনার ভাঁজে গা তোলে না।

গা তোলরে, ভাঁজে, গা তোল, বসতে দেবো শীতল পাটি,
খেতে দেব ননী ;
জল আনা সফল হোক, মা বল তুমি।
যাদুর হাতে ক্ষীরের নাড়ু, বর্ধমানের কলা, ভাঁজে,
গা তোল, আতপ খাও, এ নন্দের বালা ভাঁজে,
ঘরকে আলো কর। —কোদলা, মুর্শিদাবাদ

২

ধূপের ধোঁয়া খাওরে, ভাঁজে, ধোঁয়া খাও ;
ধূপ ধূপ ধূপের গন্ধ খাওরে।
কাঁহাতে বসিয়া, ভাঁজে, করল চৌকিদারী,
পাটরৈল, ভাঁজে, চূড়ামণি।
ক্ষীর ছাউনি নাওরে, ভাঁজে, ক্ষীর ছাউনি নাও।
এ'কুলে কদমের ফুল সদাই ফেলে মারি।
কি আরে, ভাঁজে ঘরকে আলো কর। —ঐ

৩

বাড়ীর কাছে সিদ্ধির বন, শূকর ডাকে গ্যাঁ-গোঁ।
ডাকুক শূয়র পোহাক রাত, আমার ভাঁজেএর নিশি রাত।
বাজ বাজ শঙ্খ বাজ আমরা দিব কড়ি,
আইবুড়ো ভাঁজে এর সাথে কর কি চাতুরি।
ওকি আরে ভাঁজের ঘরকে আলো কর।
ওকি আরে ভাঁজে, ঘরকে আলো কর। —ঐ

৪

ও পাড়াদের ভাঁজেগুলি গরুতে খেয়েছে,
আমাদের ভাঁজেগুলি লাফিয়ে উঠেছে।
ও পাড়াদের ভাঁজেগুলি তুষের ধূনা খায়।
আমাদের ভাঁজেগুলি ধূপের ধূনা খায়।
ও পাড়াদের ভাঁজেগুলি গড়ের গুগুলি,
আমাদের ভাঁজেগুলি সোনার মাদুলী।

নদীর ধারে রে, ভাই, পুষ্প সারি সারি—
ডাল ভাঙো ফুল তোল বেছে তোল কড়ি।
আর যাব না, মা, পরল পাটের বাড়ী
পড়ল পাট রইল ভাঁজৈ চূড়ামণি।
ক্ষীর ছাউনি খাওরে, ভাঁজৈ, ক্ষীর ছাউনি খাও।
এবড় একড়া সদাই ফুলে সদাই কোল মরে কি,
কি ওরে ভাঁজৈ, চোরে আলির মা। —ঐ

৬

বারো হাত কাপড়খানি তের হাত দসি,
লুটাতে লুটাতে যাবে সেঁকরা ভায়ের বাড়ী।
সেঁকরা ভাই, সেঁকরা ভাই, বসো নাগর চাঁদে।
এমন করে বাঁক গড়াব যেন ভাঁজৈকে সাজে,
সাজাতে গোছাতে ঘামলা গা,
কোথায় গেলে হে, মোর বিজনী বাতাস করে যা।
বাতাস করতে জানি না, মা, এলা বেলা করে,
হাতের বেনা কেড়ে নিয়ে তিন ঠোক্‌না দিয়ে।
ঠোক্‌না নয়, ঠুক্‌নি নয়, ইন্দির রাজার ঘর,
ইন্দির রাজার ঘরে রে, ভাই, আঁজরে পাঁজরে ধান,সগলি খেলে হাসে,
কি ওরে ভাঁজৈ—মা টগর ফুলের বাসে। —ঐ

৭

খাও মা খাও মা সুসার বলি,
কি করে পাঠাব মা, দূরে শ্বশুর বাড়ী।
চাঁদ পাড়ার ডাঙ্গাতে, ঝুরঝুরে বালি,
চাঁদ মুখুতে রোদ লেগেছে, তুলে ধরো ডালি।
ভঁজৈ, মা, তুলে ধর ডালি। —ঐ

৮

সাধ খাও মা, সাধ খাও, নূতন ঘরখানি দানে নাও,
জবা ফুলে রে, ভাই, মেলাম পাগেড়া,
যত ফুল পাড় রে, থকোড়া থকোড়া। —ঐ

৯

কাল কুচুরে, ধলো কুচুরে, কুচুর মাথায় ফুল।
আমার ভাঁজে লাইতে যাবে পুকুর কত দূর।
তোমার ভাঁজে আমার ভাঁজে শাক্ তুলতে গেল,
এক না মাছের ফেকনা দিয়ে চোখ জড়িয়ে গেল॥ —ঐ

১০

কাঁটা বন কাটিয়ে তুললাম মাটি তাতে উঠল ইঁদুর বেটী,
উঠ্ কেন গো, ইঁদুর বেটী দেখ কেন গো বিয়ে,
আমার ভাঁজেএর বিয়ে শনি মঙ্গল বারে,
তোরা মাটী যোগান লো, বারে বারে। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত গানটি ভাঁজের বিজয়ার গান—

১১

এবার যেছো, মা, কাঁদিয়ে কাটিয়ে
আবার আসিচও মা, নৌকা সাজিয়ে।
ভাঁজে ভাসিয়ে করব কি, শিল পাটা বুকে দিয়ে মরব যি,
ভাঁজে যাবে স্রোতে স্রোতে আমরা যাব লায়ে,
হাতের কঙ্কণ বাঁধা দিয়ে তুলিয়ে নিব লায়ে,
আজ এতক্ষণ ভাঁজে আমার বড় ঘরের থারে,
কাল এতক্ষণ ভাঁজে আমার মধ্যি পাথারে।
এ আলকার জলগুলি ওখানে যায়,
করবীর ডাল ধরে পাই ঝুলি খেলাই কি, ওরে ভাঁজে। —ঐ

ভাঁজোর গান

মুর্শিদাবাদ, বীরভূম অঞ্চলে প্রচলিত এক কৃষি-উৎসবের নাম ভাঁজো। ইহার সঙ্গে ভাঁজের কোন সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নহে। ভাঁজো পুজার একটি অনুষ্ঠানের নামে ভাঁজোর বালি আনা। এই উপলক্ষে কুমারী মেয়েরা এক সারিতে দাঁড়াইয়া এবং পুরুষেরা অন্য এক সারিতে দাঁড়াইয়া পরস্পর মুখোমুখী হইয়া নৃত্য ও গীত করিয়া থাকে। গীত অনেক সময় ছড়ার লক্ষণাক্রান্ত দেখা যায়। সেইজন্য ইহাদিগকে ভাঁজোর ছড়া বা শোলোকও বলে।

১

ভাঁজোর শোলোক বলব কি ভাই, জুয়ায় নাক কথা।
কাল গিয়েছে জ্বরের পালা আজ ধরেছে মাথা॥
এই পথে যেও ভাঁজো এই পথে যেও।
বেনা বনে কড়ি আছে ভাগ করে নিও॥ —মুর্শিদাবাদ

২

ভাঁজুই লো সুন্দরী, মাটি লো সরা,
কাল ভাঁজুর বিয়ে দেবো গেঁথে দেবো বেলফুলের মালা।
তোমার বাড়ী আমার বাড়ী আট পাঁচিলে ঘেরা,
হাত বাড়িয়ে পান দিলে দেখলে দেওর ছোঁড়া।
গিয়েছিলাম জেমো কান্দী দেখে এলাম রথ,
যেমন তোমার নাকের শোভা হে, তেমন গড়িয়ে দেব নথ। —ঐ

ভাটিআরি

ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের একটি রাগিণীর নাম ভাটিআরি। মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীতে এই রাগিণীর ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। বাংলার লোক-সঙ্গীতের সুর ভাটিয়ালির সঙ্গে ইহার কোন দিক দিয়াই কোন সম্পর্ক নাই। ইহা মাত্রা ও তালভিত্তিক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সুর অবলম্বন করিয়া গীত হয়।

ভাঁড় যাত্রা

ভাঁড়যাত্রা সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্তটি পাওয়া যায়। 'অধুনা অবলুপ্তির পথে ভাঁড়যাত্রা মেদিনীপুরের লেটো গানের অনুরূপ। নিম্নস্তরের চাষী মজুরের মধ্যে খুব জনপ্রিয় ছিল। যুবক যুবতী সেজে আদি রসাত্মক গান গাইত। নন্দীগ্রাম কাঁথী অঞ্চলে রাসের সময় হতো গদাভারত পালাগান। রামায়ণ মহাভারতের ঘটনা অবলম্বনে আখ্যান সুরে আবৃত্তি করে গাওয়া ছিল গদাভারতের বৈশিষ্ট্য। (মণি বর্ধন, 'বাংলার লোক-নৃত্য ও গীতি বৈচিত্র্য' পৃ. ১৬৩) ইহার সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না। গানের কোন নিদর্শনেরও কোথাও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ভাব গান

বিভিন্ন বিষয় লইয়া রচিত এক শ্রেণীর গান মুর্শিদাবাদ, চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ভাব গান বলিয়া সংগৃহীত হইয়াছে। সম্ভবত কোন একটি বিশেষ সুরে গীত হইত বলিয়া ইহাদিগকে ভাব গান বলা হইত। আধুনিক বাংলা সঙ্গীতে যে ভাব-সঙ্গীত কথাটি আছে, তাহার সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। ভাবমূলক গান (অবশ্য প্রায় সকল গানই ভাবমূলক) বলিয়াই ইহাদিগকে ভাব গান বলা হইতে পারে।

১

এত রাত্রে আমায় কে ঠেকা মারে জানালায়,
শূন্য ঘর পড়ে আছে বন্ধু নাই ঘরে॥
গোপনে একা একা, তবে থাকবে ভালবাসা নইলে থাকবে না,
হাতে ছড়ি মাথায় তেড়ী ভুলতে পারি না॥
বন্ধু গেছে কলকাতায় ভুলেতে পাষাণে ভাঙ্গিয়ে মাথা
রক্তেতে সরোবর নদী ভেসে যায়॥
রস খাওয়া পরিপাটি, রসগোল্লা পাউরুটি,
গামছায় মোড়া পানের খিলি বাঁধা রহিয়াছে,
এত রাত্রে আমায় কে ঠেকা মারে জানালায়॥

—তুড়িয়া, মেদিনীপুর

২

আমি গুরু বই আর বলব কারে,
আমার আর কেহ নাই এ সংসারে।
আমি যারে বলি আপন আপন, সে মানুষ রয়েছে গোপন,
আমি ঘুমের ঘোরে দেখি তারে, চেতন হলে পাই না তারে॥
ওগো রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট সাধুর মুখে শুনি স্পষ্ট,
দীনু বলে আমার কষ্ট উদয়চাঁদের চরণ বিনে॥ — ২৪ পরগণা

৩

বলি হায় গো তবে কোথায় যাব?
আমি কোথা গেলে বন্ধু পাব, হায় গো তবে কোথায় যাব।

করিয়া প্রণয় বিপদ বাড়ে, কি ভাবে তুষ্ট জানিব কি করে,
কি করে জানিব—কি ভাবে সন্তুষ্ট, বন্ধু, কি করে জানিব।
মনের ভিতরে হৃদয় মাঝারে, বন্ধু, আছে বুঝি হায় গো,
আমি বন্ধুর লাগিয়া হইলাম আকুল, বন্ধু মেলা বড় দায় গো। —ঐ

৪

এমন ভালবাসা সর্বনাশা কে আনিল দেশে।
করিয়ে ভালবাসা ভাঙলো সুখের বাসা
বড় দুর্দশায় পড়িলাম শেষে।
সইবে কি জানি, কি ভাবে জ্বলে পুড়ে মরি অহর্নিশি,
যদি মনের কথা কইতে যাই—বাসা খুঁজে নাহি পাই,
তাই কাঁদি গো নির্জনে বসে, আমার মন না নেয় গৃহকাজে।
যেমন কাঁচা বাঁশে লাগলো ঘুন, ফুটিল যৌবন কুসুম,
সই রে, যা বলিস রে বল, তোদের মনে যা লয়,
যদি মনের মত মানুষ পাই, কুলের মুখে দিয়ে ছাই,
যাব গদা কুমুদকান্তের কাছে।
এমন ভালবাসা সর্বনাশা কে এনেছে দেশে॥
গত নিশি শয়নে শুইয়া স্বপনে,
কালা আমার হিয়ার পরে।
গোঁসাই কুমুদকান্তের বাণী শুন বিনোদিনী।
এ সকল হয় প্রেম বিকারে আঁখি যায় ঝরে॥ --মুর্শিদাবাদ

৫

আমার আশা নৈরাশ করো না, ওগো বৃন্দে সই,
আশা নৈরাশ করলে কেমন জ্বালা সই।
বিধির কি এমনি লীলা, প্রকাশ করে যায় না বলা,
তোমার যদি হত প্রেম-জ্বালা, কেমন জ্বালা সই॥
বেহাল বনে ছমির চাঁদে, প্রেমহারা হয়ে বেড়ায় কেঁদে,
পড়েছি পিরীতের ফাঁদে ছাড়লে ছাড়ে কই।
আমার আশা নৈরাশ করো না, ওগো বৃন্দে সই॥ —যশোহর

৬

মরি রে, প্রাণের সুবল, মরি রাই অদর্শনে,
ব্রজের রাখাল সনে ধেনু চরাই বনে।
(আমার) মনে লয় কোটাল সাজিতে সখার নিধুবনে রে,
সুবল, মরি রাই অদর্শনে ॥
বানালাম কত পিরীত আয়ানের সনে,
আমার রাই-বিচ্ছেদে জ্বলছে অনল দহে রাত্রদিনে।
রে সুবল, মরি রে, রাই অদর্শনে ॥
ভেবে রাধারমণ বলে, ওগো রাধার ভাবটি নিয়ে,
এবার ঘরে ঘরে মেগে খাব যোগিনী সেজে,
রে সুবল, মরি রাই অদর্শনে ॥ —যশোহর

৭

এসেছ বসেছ, রে মন, তাস খেলিতে,
এক ব্রহ্ম টেক্কার মর্ম বুঝে দেখ না আগেতে ॥
দুই রঙেতে হচ্ছে লীলা, বুঝে দেখ মন দুয়ের খেলাতে।
ত্রিগুণেরও ত্রিখানা চৌকো চারি ধামেতে ॥
পঞ্চভূতে পাঞ্জা, থানা ছয়ে ঋতু ছক্কাখানা।
সপ্ত পাতা সাতাখানা খুঁজলে পাবা দেহেতে ॥
আট কুটরী বুঝবি যবে আটার মর্ম পাবি তবে।
নবদ্বারের নওলীখানা চৌদ্দ হবে রঙ্গেতে ॥
যদি গোলাম রঙের হয়, সে করে না আর কারু ভয়।
রঙের গোলাম বিবির সাথে জ্ঞান-সাহেবটা পেয়ে হাতে,
তাতে হবে ইস্তক বিন্তি ভুলো না মন কাবার দিতে ॥
দশ গোলাম বিবি সাহেবে তাতে হবে পঞ্চাশ মোরে।
তারি সঙ্গে টেক্কা নিলে শখের খেলা হবে না রে ॥
হৃদানন্দ কি খেলিলি, খেলতে গিয়ে হেরে গেলি।
চিরদিনের মত বাঁধা রইলি ছক্কা পাঞ্জাতে ॥
এসেছ বসেছ রে মন তাস খেলিতে ॥ —বাহাদুরপুর (যশোহর)

৮

শোলা ডোবে পাথর ভাসে হরিনামের নিশানা।
নাগের সঙ্গে নেউলের পিরীত সুহৃদ হলে যায় জানা ॥
অষ্টমীতে একাদশী বিধবা রহিল বসি
পুর্ণশশী উদয় আসি নিত্য করে ছলনা।
খাওয়ালে সে গর্ভ হয়, না খাওয়ালে পাপের উদয় হয়
কৃপা করে, হে দয়াময়, আমায় তাই বল না ॥
জননীর উদরে পতি, সতী হল গর্ভবতী,
সে সতীর আর নাইকো পতি উপপতি করে না।
পতি যায় সদা বিদেশে নিত্য রমণ করে এসে
সেই সতী নিত্য প্রসবে, সতীর হ'ল ঘোষণা ॥
ছয় আঙুল ছেলের, নয় আঙুল মাথা
সে মলে গোর হবে কোথা ॥
ওগো মহাজন, তোমরা সব চিন্তা করে
বল দেখি এসব কথা ॥
সেই ছেলের তো নয়তো মরণ
মলে হবে করণ কারণ।
অতিনলের এই নিবেদন যুগল চরণ বাসনা ॥ —মুর্শিদাবাদ

ভাটিয়ালি

বাংলার লোক-সঙ্গীতকে প্রধানত দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়; প্রথমত উৎসব অনুষ্ঠান কিংবা কোন বিশিষ্ট ক্রিয়ার (action) সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সমবেত সঙ্গীত এবং দ্বিতীয়ত নিঃসঙ্গ অবসরের মুহূর্তে গেয়ে একক সঙ্গীত। কর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সমবেত সঙ্গীতটিকে প্রধানত সারি শ্রেণীর গান বলিয়া নির্দেশ করা যায়, নিঃসঙ্গ অবসরের একক সঙ্গীতই ভাটিয়ালি নামে পরিচিত। প্রত্যেক দেশেরই লোক-সঙ্গীত প্রধানত ইহার প্রাকৃতিক পরিবেশে এবং সমাজ-মানসের পটভূমিকার উপর জন্মলাভ করে। এক হিসাবে বহিঃপ্রকৃতিই সমাজের মানস-প্রকৃতি গঠন করিতে সহায়তা করে। সেই জন্যই প্রকৃতির সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া সমাজের রস-সংস্কার বিকাশ লাভ করিয়া থাকে।

সুতরাং বাংলা দেশের বিশেষ একটি অঞ্চলেই ভাটিয়ালি জন্ম এবং বিকাশ লাভ করিয়াছে ; নদীমাতৃক পূর্ববাংলাই ভাটিয়ালির জন্মস্থান। দেশের যে বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্য দিয়া ভাটিয়ালি জন্ম লাভ করিয়াছে, তাহা আশ্রয় করিয়াই তাহা বিকাশ লাভ করিয়া আসিয়াছে। প্রাকৃতিক এই বিশেষ পটভূমিকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া ইহা কোথাও প্রচার লাভ করিলেও তাহাতে ইহার মৌলিক প্রাণশক্তি রক্ষা পাইতে পারে না।

কেবল মাত্র নদীর সঙ্গেই যে ভাটিয়ালির সম্পর্ক, তাহাই নহে—বিশাল প্রান্তরের দিগন্ত প্রসারিত বিস্তার, তাহার উপর দিয়া অলস মন্থর গতির পথযাত্রা, প্রকৃতির মধ্যে উদাসী বিষণ্ণ বৈরাগ্যের রূপ—ইহারা ভাটিয়ালির প্রেরণা দান করিয়া থাকে। পূর্ববাংলার দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তর বলিতে বিস্তৃত জলাভূমি বা হাওর বুঝায়। হাওর শব্দটি সাগর কথারই অপভ্রংশ। দিগন্ত বিস্তৃত হাওরের বুকের উপর দিয়া অলস মন্থর গতিতে ভাসমান নৌকার হাল ধরিয়া থাকিয়া যখন মাঝি দেহে এবং মনে একটু অবসরের সুযোগ পায়, তখনই ভাটিয়ালির সুর তাহার কণ্ঠে আপনা হইতে জাগিয়া উঠে। কিংবা হেমন্ত-শীতের বিষণ্ণ মধ্যাহ্নে হাওরের জলরাশি যখন শুষ্ক হইয়া গিয়া ইহার মধ্যে কেবল শূন্যতা হাহাকার করিতে থাকে, তখন কোন মহিষ কিংবা গোরক্ষক বালক কোন বৃক্ষচ্ছায়ায় যখন অবসর যাপন করিবার জন্য তাহার নিঃসঙ্গ তৃণশয্যায় আশ্রয় লয়, তখনই তাহার কণ্ঠে ভাটিয়ালির সুর জাগিয়া উঠে। সুতরাং দেখা যায়, ভাটিয়ালির প্রকৃত অবকাশ একদিকে যেমন প্রকৃতির অন্তহীন বিস্তার, আর একদিক দিয়া তেমনই বিষণ্ণ নিঃসঙ্গতা। ইহা একক সঙ্গীত ; ইহা বিশেষ অর্থে একক—এখানে গায়কের যেমন কোন সঙ্গী থাকে না, তেমনই গায়কের সম্মুখে কোন শ্রোতাও থাকে না, কাহারও মুখের দিকে তাকাইয়া, কাহারও রস ও রুচির উপর লক্ষ্য রাখিয়া এখানে গায়কের রসোৎসারকে নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়োজন হয় না। এখানে গায়ক সম্পূর্ণ স্বাধীন, নিজের নিতান্ত অন্তরের সঙ্গে তাহার একাত্মতার অনুভূতিতে তাহার কোন অন্তরায় নাই। কোন সংস্কার তাহার সহজাত অনুভূতির অভিব্যক্তিতে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না। সুতরাং ইহার মধ্য দিয়া গায়কের অন্তরটি যত স্বচ্ছভাবে প্রকাশ পায়, অন্য কোন লোক-সঙ্গীতের মধ্য দিয়া তাহা তত স্বচ্ছ ভাবে প্রকাশ পায় না।

ভাটিয়ালির প্রধান বিষয় প্রেম। তরুণ গায়কের কণ্ঠে তাহার ব্যক্তিগত প্রণয়-জীবনের আশা নৈরাশ্যের সুর ইহার মধ্যে যেমন ধ্বনিত হইয়া থাকে, পরিণত-বয়স্ক গায়কের কণ্ঠে তেমনই আধ্যাত্মিক আশা নৈরাশ্যের সুর ধ্বনিত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই গায়:কর অন্তর মথিত করিয়া ইহার সুর উৎসারিত হয়। সেইজন্য লোক-সঙ্গীতের মধ্যে ইহাই সর্বাধিক আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। নিঃসঙ্গ নির্জনতার মধ্য দিয়া বিষাদের ভাবই মনে জাগ্রত হয়, সেই জন্য ভাটিয়ালি গানের প্রেমানুভূতি এই প্রকার বেদনার্ত, যেমন—

পাখী, তোমার পায়ে ধরি মিনতি গো করি
আর আমায় জ্বালাইও না।
'বউ কথা কও'—বলে গো ডাইকো না॥
পাখী ডাকে সন্ধ্যাকালে,
আমি সন্ধ্যা দিতে যাই গো ভুলে;
যদি ডাক নিশিকালে
আমি কাইন্দ্যা ভিজাই বিছানা॥

পরিণত বয়স্কের কণ্ঠে যখন ভাটিয়ালি গানে আধ্যাত্মিক ভাবেরও বিকাশ দেখা যায়, তখন তাহাতেও বেদনা ও নৈরাশ্যের অনুভূতিই ব্যক্ত হইয়া থাকে—

ভেবে দেখলাম ভবনদীর নাইরে পারাপার।
আমি যেই দিকে চাই, সেই দিকেই দেখি অকুল পাথার॥
উন্দুধুন্দু নৈরাকারে, যে কথা মনে পইলে ফাঁপর করে,
চিন্তায় জরজর না দেখি উপায়॥

ভাটিয়ালি গান প্রধানত বিরহ-বেদনা ও নৈরাশ্যের গান—এই বিরহ-বেদনা যেমন প্রণয়-গত নৈরাশ্য-জনিত হইতে পারে, তেমনই আধ্যাত্ম-জীবনের অসম্পূর্ণতা বোধ হইতেও সৃষ্টি হইতে পারে। প্রকৃতির যে বিশেষ রূপটির কথা ভাটিয়ালির পটভূমিকা রূপে উল্লেখ করিলাম, তাহা হইতেই এই নৈরাশ্য ও বেদনার ভাবটি আসিয়া ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। সুতরাং এই সঙ্গীতও ইহার সুর প্রকৃতির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। ইহার এই বিশিষ্ট প্রাকৃতিক পটভূমিকা হইতে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করিবার উপায় নাই।

অনেকেই এ'কথা যথার্থই মনে করিয়া থাকেন যে, ভাটিয়ালি বাউল গানের

অনেক পূর্ববর্তীকালেই উদ্ভূত হইয়াছিল। অর্থাৎ ভাটিয়ালি গানের মধ্যে তত্ত্বকথা যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা অনেক পরবর্তী কালীন যোজনা, মূলতঃ ইহা একান্ত পার্থিব জীবনের দুঃখ-বেদনা ও নৈরাশ্য অবলম্বন করিয়াই রচিত হইত, ইহার মধ্যে তত্ত্বকথার কোনও সংস্রব ছিল না। পার্থিব সুখ-দুঃখ অনুভূতির অভিব্যক্তিই সাহিত্যে প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, এ'কথা সত্য; দর্শন বা তত্ত্বকথা পরবর্তী কালে আসিয়া মানব-সমাজের চিন্তার রাজ্য অধিকার করিয়াছে। ভাটিয়ালির যখন উদ্ভব হয়, তখন ইহা মানব-জীবনের পার্থিব দুঃখ-বেদনাকেই রূপ দিয়াছে; ক্রমে পূর্ববঙ্গের বাউল, দেহতত্ত্ব, মুর্শীদ্যা, মারফতির তত্ত্বকথাও ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে পূর্ববঙ্গের প্রায় অনুরূপ ভাবমূলক সকল লোক-সঙ্গীতই ইহা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে, পূর্ববঙ্গের উপরি-বর্ণিত বিশিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশ আশ্রয় করিয়া যখনই যে ভাবমূলক সঙ্গীত রচিত হইয়াছে, তাহাতেই প্রধানত ভাটিয়ালির প্রভাব নিজের অধিকার স্থাপন করিয়া লইয়াছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গের উক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়া ইহা বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। সেই জন্যই এ'কথা অতি সহজেই মনে হয় যে, ইহা পূর্ববঙ্গেই অত্যন্ত প্রাচীন কালে উদ্ভূত হইয়া একমাত্র সেখানেই বিকাশ লাভ করিতেছে। অন্যত্র ইহার বিকাশ ও পুষ্টিলাভ অসম্ভব।

ভাটিয়ালি যত প্রাচীনই হউক, ইহা কবে, কি ভাবে যে সর্বপ্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা আজ আমাদের জানিবার উপায় নাই। প্রাচীন বাংলার যে সকল গ্রন্থের মধ্যে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা' গ্রন্থটিই বাংলা ভাষায় রচিত সর্বপ্রাচীন পুঁথি বলিয়া পণ্ডিতগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহাতে যে সাতচল্লিশটি প্রাচীন বাংলা গান সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটিরই রাগ-রাগিণীর উল্লেখ রহিয়াছে। এই গ্রন্থখানি খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর পূর্বেই সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ইহাতেও দেখিতে পাওয়া যায়, বিভিন্ন প্রাচীন রাগ-রাগিণীর সঙ্গে 'বঙ্গাল-রাগ' নামক একটি রাগের উল্লেখ আছে। যে সঙ্গীতটি সম্পর্কে এই রাগটির উল্লেখ আছে, তাহার রচয়িতার নাম ভুসুক, তিনি বঙ্গাল দেশের অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। যদিও বঙ্গাল রাগই ভাটিয়ালি কি না, এই বিষয়ে নিঃসংশয়ে কিছুই বলিতে পারা যায়

না, তথাপি ইহার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে অনুমান করিবার পক্ষেও যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। কারণ, এ'কথা সত্য, পুর্ববাংলার সর্বাপেক্ষা নিজস্ব উল্লেখযোগ্য সঙ্গীতটিই ভাটিয়ালি। ইহার প্রসার ও অন্তর্নিহিত সুরগুণ বিচার করিয়া দেখিলে সহজেই মনে হইতে পারে যে, দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহা সেই অঞ্চলের একটি বিশিষ্ট গীতিরূপ বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়া আসিতেছে। সুতরাং প্রাচীনতর কালে বঙ্গাল-রাগ ও ভাটিয়ালি একার্থ বাচক হওয়া কিছুই আশ্চর্য নহে। 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা'য় অন্যান্য আর যে সকল রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে অন্যান্য নানা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর সঙ্গে 'দেশাখ্য' বা দেশীয় রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে, তবে তাহাদিগকে গৌড়ীয় বা দেশাখ্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, 'বঙ্গাল-রাগ'কে স্বতন্ত্র স্থান নির্দেশ করিয়া তাহার একটি মাত্র নিদর্শন উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং যাহা বঙ্গাল-রাগ বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে, তাহা দেশীয় কিংবা গৌড়ীয় হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক। ইহার অর্থ এই যে, সাধারণ গৌড়ী, কিংবা দেশী রাগ হইতে ইহা স্বতন্ত্র ছিল, ইহার বিশেষত্বের মধ্যেই ইহার স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়িয়াছিল।

বঙ্গাল-রাগে গেয় যে গানটির 'বৌদ্ধ গান ও দোঁহা'য় উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা সহজিয়া বা যোগতান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি সাধন-সঙ্গীত। একে ইহার ভাষা প্রাচীন, তাহার উপর সাধন ভজনের গূঢ় তত্ত্বকথা ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া ইহার অর্থ সহজবোধ্য নহে। তথাপি বাংলার প্রাচীন একটি সঙ্গীত হিসাবে ইহা এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য। গানটি এই প্রকার—

সহজ মহাতরু ফরিঅএ তেলোএঁ।
খসম সভাবে রে বান্ধই কা কোএ॥
জিম জলে পাণিআ টালিয়া ভেউ ন জাই।
তিম মণ রঅণা রে সমরসে গঅণ সমাই॥
জাসু নাহি অপ্পা তাসু পরেলা কাহি।
আইএ অনুঅনারে জাম মরণ ভব নাহি॥
ভুসুক ভনই কট রাউতু ভনই কট সঅলা এহ সহাব।
জাইএ ণ আবই রেণ তহিঁ ভাবাভাব॥

আধুনিক বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিলে ইহা এই প্রকার দাঁড়াইবে—

সহজ-মহাতরু স্ফুরিত এ ত্রিলোকে।
খ-সম স্বভাবে রে বাঁধে কাহাকে কে এ?
যেমন জলে পানি ঢালিয়া ভেদ করা যায় না।
তেমন মনোরত্ন রে সমরসে গগনে সামায়॥
যাহার নাহি আপন তাহার পর কোথায়?
আদৌ অনুৎপন্ন সম্বন্ধে জন্ম মরণ ভব নাই॥
ভুসুকু ভণে আশ্চর্য! রাজপুত্র ভণে আশ্চর্য! সকল এই স্বভাব!
না যায় না আসে রে, যা তায় ভাবাভাব॥

এই বৌদ্ধ সহজিয়া গানটি বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিবার একটি বিশেষ কারণ আছে, তাহা এখানে উল্লেখ করিতেছি। পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভাটিয়ালিতে তত্ত্বকথাও স্থান পাইয়া থাকে, সুতরাং ইহাতে তত্ত্বকথা আছে বলিয়া ইহা ভাটিয়ালি হইবার পক্ষে কোন বাধা নাই। যদি ইহা ভাটিয়ালিই হইয়া থাকে, তবে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ভাটিয়ালি নামটির যে উৎপত্তি হয় নাই, তাহা বুঝিতে পারা যায়। তখন সম্ভবত ইহা বঙ্গাল দেশ বা পূর্ববঙ্গের গীতরূপে বঙ্গাল রাগ বলিয়াই পরিচিত ছিল। কিন্তু এই বিষয়ে নিঃসংশয়ে কিছুই বলিতে পারা যায় না। ভাটিয়ালি কথাটির কি ভাবে কবে উদ্ভব হইল, তাহা এখন আলোচনা করিয়া দেখিতে হয়।

এ'কথা সকলেই জানেন যে, ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মধ্যে 'ভাটিয়ারী' নামে একটি রাগিণী আছে। মধ্যযুগের বাংলার বৈষ্ণব পদাবলীতে এই রাগিণীর ব্যাপক উল্লেখ পাওয়া যায়। উপরে বাংলার লোক-সঙ্গীত ভাটিয়ালির যে প্রকৃতির কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার সঙ্গে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত 'ভাটিয়ারী'র কোন দিক দিয়াই সম্পর্ক নাই। ভাটিয়ালির মৌলিক প্রকৃতির মধ্যে যে ভাব-গভীরতা ও সুরের বিস্তার আছে, ভাটিয়ারীর মধ্যে তাহা নাই। 'বৈষ্ণব পদ-লহরী'-তে নিম্নোদ্ধৃত পদটিকে ভাটিয়ারী রাগিণীতে গেয় বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, ইহা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইহা মাত্রা ও তাল-ভিত্তিক উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত অনুযায়ী রচনা। ভাটিয়ালির রচনা ও ভাবগত বৈশিষ্ট্য কিছুমাত্র ইহার নাই। 'বৈষ্ণব পদ-লহরী' হইতে দুইটি পদ এখানে উদ্ধৃত করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে, যেমন—

মাথহি তপন তপত পথ বালুক
আতপ দহন বির্থার।
ননীর পুতুল তনু চরণ কমল জনু
তবহি চলল অভিসার॥

ইহা যদি ভাটিয়ারী হইয়া থাকে, তবে বাংলার পল্লী-সঙ্গীত ভাটিয়ালি যে ইহা হইতে স্বতন্ত্র, তাহা বিশদ্ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া না বুঝাইলেও চলিতে পারে।

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে'র মধ্যেই বাংলার প্রাচীন গীতি সাহিত্যে 'ভাটিআলী' নামক একটি রাগের সর্বপ্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন' খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন ; সুতরাং 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা'র ধারা অনুসরণ করিয়া ইহা 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে' আত্মপ্রকাশ করা কিছুই অসম্ভব নহে। কিন্তু একটি কথা এখানে উল্লেখ করিতে পারা যায় যে, 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন' রাঢ় অঞ্চল বা বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলের রচনা, কিন্তু ভাটিয়ালি সম্পর্কে আমরা পুর্বে যাহা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা পুর্ব-বঙ্গেরই লোক-সঙ্গীত। পুর্ববঙ্গেরই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা ইহা চিহ্নিত, সুতরাং পশ্চিম বঙ্গের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক থাকিবার কথা নহে। কিন্তু ইহারও একটি সদুত্তর পাওয়া যায়, তাহাই এখানে উল্লেখ করিতেছি।

এ'কথা পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ভাটিয়ালি নৌকার মাঝি মাল্লা ও চাষী রাখালের গান। পুর্ববাংলার মাঝি মাল্লারা সর্বদা পশ্চিম বঙ্গে জীবিকার্জনের জন্য যাতায়াত করিত এবং সেই সূত্রে তাহাদের নিজেদের অঞ্চলে প্রচলিত সঙ্গীত পশ্চিম বঙ্গেও প্রচার করিবার সহায়তা করিয়াছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, পশ্চিম বাংলার সওদাগরদিগের বাণিজ্যতরী পুর্ববাংলার মাঝিরাই বাহিয়া দেশ দেশান্তরে লইয়া যাইত। মধ্যযুগের প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেই সওদাগরদিগের ডিঙ্গাডুবির পর 'বাঙ্গাল মাঝির খেদ' নামক একটি বিষয় বর্ণনা করা হইত। এই বিষয়টি সুগভীর তাৎপর্যমূলক। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, পুর্ব বাংলার গান পুর্ব বাংলার মাঝিদিগের মধ্যে পুর্ববঙ্গেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিত না, বরং তাহাদের মধ্যস্থতায় দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িত। প্রধানত এই ভাবেই ভাটিয়ালি পশ্চিম বাংলায়ও প্রচার

লাভ করিয়াছিল। তবে এ'কথা সত্য, সেখানে ইহা প্রচার লাভ করিলেও অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের অভাবে তাহা সেই অঞ্চলে কোনদিন পুষ্টিলাভ করিতে কিংবা বিকাশ লাভ করিতে পারিত না—প্রচার হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়া যাইত। সুতরাং বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন' গীতিকাব্যে 'ভাটিআলি' নামক যে রাগের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা পূর্ববাংলার ভাটিয়ালির মধ্য দিয়া ভাটিয়ালির যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে' 'ভাটিয়ালি' বলিয়া উল্লেখিত গীতগুলির মধ্য দিয়া আনুপূর্বিক যে সেই বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নহে, পাইবার কথাও নহে॥ কারণ, বিশিষ্ট একটি লোক-সঙ্গীতের রীতি ইহার নিজস্ব সমাজ ও প্রাকৃতিক জীবনের পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া অন্যত্র যখন আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাহার মৌলিক শক্তি অনেকাংশেই হ্রাস পাইয়া যায়। এই বিষয়ে মার্গ-সঙ্গীত ও লোক-সঙ্গীতে পার্থক্য আছে। মার্গ-সঙ্গীত একটি অবিচল আদর্শ অটুটভাবে রক্ষা করিবার ফলে ভারত ব্যাপী সর্বত্র যেমন এক অখণ্ড গীতি-রূপ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, লোক-সঙ্গীতের গীতি-রীতি তদপেক্ষা শিথিলবদ্ধ বলিয়া তাহা সেই ভাবে অনুসরণ করা হইতে পারে না। এমন কি, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মধ্যেও দেখা যায়, দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত শাস্ত্রীয় সঙ্গীত যত রক্ষণশীল, উত্তর ভারতে প্রচলিত শাস্ত্রীয় সঙ্গীত তত রক্ষণশীল নহে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রকৃতির গীতিরীতির সঙ্গে সম্পর্কের ফলে উত্তর ভারতের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ইহার প্রাচীনতম আদর্শ অটুটভাবে রক্ষা করিয়া চলিতে পারে নাই; সুতরাং যে লোক-সঙ্গীতের জন্য কোন লিখিত শাস্ত্রই কোন কালে রচিত হয় নাই, তাহার পক্ষে রূপান্তরিত হওয়া আরও সহজ। সুতরাং পূর্ববাংলার ভাটিয়ালিই যে 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে' 'ভাটিআলী' বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে, এমন অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। বিষয়ের দিক দিয়াও যদি বিচার করিয়া দেখি, তাহা হইলেও বুঝিতে পারা যাইবে যে, পূর্ববাংলার ভাটিয়ালির সঙ্গে যে 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে'র 'ভাটিআলী'র একেবারেই কোন ঐক্য নাই, তাহা নহে। পূর্ববাংলার ভাটিয়ালি যেমন বিরহ, বিচ্ছেদ ও বেদনার গান 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে' যে গানগুলি 'ভাটিয়ালী' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও বেদনার সুরের অভাব বোধ হইবে না। প্রথমত দেখা যায় যে, 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে'র 'রাধা-বিরহ' খণ্ডে অধিক সংখ্যক ভাটিআলী রাগের উল্লেখ আছে। ইহার রাধা-বিরহ অংশ শ্রীরাধিকার

সুগভীর অন্তর্বেদনার ভারে ভারাক্রান্ত। একটি সঙ্গীত এখানে উদ্ধৃত করা যায়—

হরি হরি।
আয়াসেঁ কাহ্নের উরে
শুতিলোঁ দিআ শিয়রে
প্রাণের বড়ায়িল
দারুণ নয়নে ভৈল নিন্দে। ল
কাহ্নাঞির দরশন যেহেন ভৈল স্বপন
প্রাণের বড়ায়িল
যাগিআঁ চাহোঁ নাহিক গোবিন্দে॥

ভাটিয়ালির যে কয়েকটি প্রধান বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সব কয়টিই এখানে রক্ষা করিবার যথাযথ সুযোগ রহিয়াছে। ভাটিয়ালির প্রথম বিশেষত্ব, দুই তিনটি শব্দ লইয়া যে এক একটি শব্দগুচ্ছ রচিত হয়, তাহা এখানে আছে। তারপর এই শব্দগুচ্ছ গীত হইবার পরই সুদীর্ঘ একটানা যে কেবল মাত্র একটি সুর আন্দোলন-যুক্ত হইয়া প্রকাশ পায়, তাহারও যথাযথ অবকাশ উদ্ধৃত পদগুলির মধ্যে রহিয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন' রচনার সমসাময়িক কালে ইহার এই সকল পদে যে কি ভাবে গীত হইত, তাহা আজ জানিতে পায়া যায় না, তথাপি ইহার রচিত পদগুলি হইতে অন্তত এই অংশ যে ভাটিয়ালির অনুরূপ কোন সুরেই গীত হইত, তাহাও বুঝিতে পারা যায়।

একথা এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে'র মধ্যেও 'বঙ্গাল-রাগে'র উল্লেখ আছে। সুতরাং 'বৌদ্ধ গান ও দোঁহা'য় বঙ্গাল-রাগের উল্লেখ পাইয়া তাহা যে ভাটিয়ালি বলিয়া অনুমান করিয়াছি, সেই সম্বন্ধে ইহা হইতে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে; কারণ, কেহ হয় ত বলিবেন, বঙ্গাল রাগই যদি ভাটিয়ালি, তবে 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে' বঙ্গাল-রাগ উল্লেখ করিবার পরও 'ভাটিআলী'র উল্লেখ থাকিবার প্রয়োজন কি ছিল? এ' কথা মনে রাখিতে হইবে যে, 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা'র অন্তত: তিনশত বৎসরের পরবর্তী রচনা। সুতরাং এই তিনশত বৎসরের মধ্যে পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিম বঙ্গে আরও নূতন নূতন লোক-সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর প্রচার হইয়াছে এবং পূর্ববর্তী কাল হইতে প্রচলিত বঙ্গাল রাগ একটি সুনির্দিষ্ট গীত-রীতিতে পরিণত হইয়া একটি বিশেষ রূপ লাভ

করিয়া মূল ভাটিয়ালি হইতে কতকটা স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্য মৌলিক ভাটিয়ালির রূপ নির্দেশ করিবার জন্যই বঙ্গাল রাগ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ভাটিয়ালির এক স্বতন্ত্র স্থান নির্দেশ করা হইয়া গিয়াছে। ক্রমে বঙ্গাল রাগ ও ভাটিয়ালি দুইটি স্বতন্ত্র গীতি-রীতিতে পরিণত হইয়া গিয়া থাকিবে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, এই বিষয়ে কেবল মাত্র অনুমানই আমাদের নির্ভর, প্রত্যক্ষ তথ্য ইহার কিছুই নাই।

'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন' হইতে মনে হয়, 'ভাটিআলী' রাগটি পশ্চিম বঙ্গেও অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল। প্রায় আঠারটী গীত 'ভাটিআলী' রাগের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ইহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে এ' কথা সত্য, ইহাদের মধ্যে সব কয়টি গীতই নিরাশা ব্যঞ্জক, অর্থাৎ পূর্ববাংলার ভাটিয়ালির যাহা প্রধান বৈশিষ্ট্য, তাহা ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্য দিয়াও প্রকাশ পাইয়াছে।

স্বাধীন সঙ্গীত ব্যতীতও ভাটিয়ালির আরও একটী বিশেষ প্রয়োগ ক্ষেত্র আছে, তাহা রূপকথা। এ'কথা সকলেই জানেন যে, রূপকথা গীতিধর্মী গদ্য রচনা। রূপকথার কাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে কোন কোন স্থানে যেখানে বর্ণনা নিতান্ত করুণ কিংবা একান্ত গীতিধর্মী হইয়া উঠে, তখনই রূপকথার পরিবেশক গদ্য বর্ণনা পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গীতের আশ্রয় গ্রহণ করে। কাহিনীর বিশেষ বিশেষ স্থানেই তাহা সম্ভব হয়, সর্বত্রই যে এমন হয়, তাহা নহে। যেমন মধুমালার কাহিনীর মধ্যে এই অংশ আপনা হইতেই যেন ভাটিয়ালি হইয়া উঠিয়াছে—

আমি স্বপ্নে দেখি মধুমালার মুখ রে।
স্বপ্ন যদি মিথ্যা রে হইত,
গলার হার কি বদল হইত রে, লোকজন!
স্বপ্ন যদি মিথ্যা রে হইত,
অঙ্গুরি কি বদল হইত রে, লোকজন!
মদন কুমার যাত্রা করে,
মাস্তুল ভাঙ্গ্যা পানিত পড়ে রে, লোকজন।

মধুমালা রূপকথার এই প্রকার বহু অংশই সার্থক ভাটিয়ালি। ইহা শাশ্বত প্রেমের কাহিনী। ইহার মধ্যে প্রেমে নৈরাশ্য আছে, নৈরাশ্যের অবসানে মিলনও আছে।

এইভাবে বাংলার রূপকথার যে সকল অংশ বিরহ ও বিচ্ছেদ মূলক, তাহা অতি সহজেই ভাটিয়ালিতে রূপান্তরিত হইয়া যায়। ভাটিয়ালি মূলত মাঝি-মাল্লা ও রাখাল মহিষালের গান হইলেও কিংবা নদীমাতৃক দেশের সঙ্গে ইহার মৌলিক সম্পর্ক থাকিলেও ইহা অন্তঃপুরের বর্ষীয়সী নারীর কণ্ঠেও গীত হইয়া সার্থক আবেদন সৃষ্টি করে—রূপকথার রহস্যময় পরিবেশক ইহা আরও রসঘন করিয়া তোলে। সেখানে নদীও থাকে না, প্রান্তরও থাকে না, তবে ভাটিয়ালির আর একটি যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় অর্থাৎ অবসর, তাহার অভাব থাকে না। রূপকথার পরিবেশের মধ্যে ভাটিয়ালি এমন নিবিড় সংযোগ স্থাপন করে যে, সঙ্গীতের সুরে ও কাহিনীর বর্ণনায় মিলিয়া তাহা এক সহজ অখণ্ডতা সৃষ্টি হয়।

বাংলার লোক-সঙ্গীতের মধ্যে ভাটিয়ালি যে কেবল মাত্র প্রাচীনতমই তাহা নহে, ইহার মধ্য দিয়া সমগ্র বাংলার লোক-সঙ্গীতের কতকগুলি মৌলিক গুণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। সেইজন্য এ'কথাও মনে হইতে পারে যে, বাংলার অধিকাংশ অনুরূপ ভাবমূলক লোক-সঙ্গীত ভাটিয়ালির ভিত্তির উপরই রচিত হইয়াছে। বাংলার কীর্তন এবং বাংলার টপ্পার সঙ্গে যে কোন কোন ক্ষেত্রে ভাটিয়ালির আশ্চর্যজনক ঐক্য রহিয়াছে, তাহা অনেকেই অনুভব করিয়াছেন। এমন কি, এই সকল তথ্য হইতে এমনও মনে হইতে পারে যে, বাংলার লোক-সঙ্গীতের একাংশের ভিত্তিই ভাটিয়ালি, ইহার উপর আশ্রয় করিয়া বাংলার বহু আঞ্চলিক লোক-সঙ্গীত আনুপুর্বিক রচিত হইয়াছে। পুর্ব বাংলার বাউল, দেহতত্ত্ব, মুর্শীদা, মারফতী প্রভৃতি তত্ত্বমূলক বহু সঙ্গীতই ভাটিয়ালির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। অন্তরের সুগভীর ভাব ও সূক্ষ্মতম অনুভূতি প্রকাশ করিবার ভাটিয়ালির যে শক্তি, তাহা বাংলার আর কোন লোক-সঙ্গীতের নাই। সেই জন্য জীবন-দর্শনের সুগভীর বিষয় সমূহ অতি সহজেই ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। বাংলার আর কোন লোক-সঙ্গীতের এই শক্তি নাই।

ভাটিয়ালি সম্পর্কে একটি প্রধান কথা এই যে, ইহা মূলত কোন বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে গীত হয় না। কেবল মাত্র সুরই ইহার মুখ্য অবলম্বন—ইহার সঙ্গে নৃত্য কিংবা আর কোন তাল রক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় না বলিয়া বাদ্য-যন্ত্রের সহায়তা ব্যতীতই ইহা গীত হয়। যদিও সকল পল্লী-সঙ্গীতই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বাদ্য-যন্ত্রের সাহায্যে গীত হয়, তথাপি ভাটিয়ালির মধ্য এই বিষয়ে

একটু বিশেষত্ব আছে—কেবলমাত্র কণ্ঠস্বরই ইহার মুখ্য অবলম্বন। তাহার ফলে ইহার স্বরের বিভিন্ন পর্দাগুলি অতি সহজেই সুস্পষ্ট অনুভব করা যায়। যেখানে তাল রক্ষা করিবার প্রয়োজন, কেবল সেখানেই বাদ্যযন্ত্র অপরিহার্য হইয়া উঠে। ভাটিয়ালির সেই দায়িত্ব নাই বলিয়া ইহা এই বিষয়ে স্বাধীন। সুতরাং সহরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কিংবা চলচ্চিত্রে, বেতারে কিংবা রেকর্ডে বিচিত্র বাদ্য-যন্ত্রের সহযোগে আমরা যে ভাটিয়ালি শুনিতে পাই, তাহা প্রকৃত ভাটিয়ালিই নহে—ইহাকে 'নাগরিক ভাটিয়ালি' বলিয়া নির্দেশ করা যায়; সুতরাং এই তথাকথিত 'ভাটিয়ালি' শুনিয়া বাংলার এই বিশিষ্ট লোক-সঙ্গীত সম্পর্কে কোন ধারণাই করিতে পারা যাইবে না। বাদ্য-যন্ত্র প্রায় সর্বদাই কণ্ঠস্বরের দৈন্য গোপন করিয়া থাকে। কিন্তু যাহার কণ্ঠস্বরের মধ্যে একদিকে গভীরতা এবং অন্যদিক দিয়া উচ্চতম গ্রামে উঠিয়া যাইবার ক্ষমতা নাই, তাহার পক্ষে আর যে লোক-সঙ্গীত পরিবেশন করাই সম্ভব হউক না কেন, ভাটিয়ালি পরিবেশন করা সম্ভব হইবে না। স্বভাব-সিদ্ধ এই স্বরগুণে অধিকার যাহার না থাকে, সে অনুশীলন করিয়াও তাহার অধিকারী হইতে পারে না। পল্লী-জীবনে ভাটিয়ালির অবসর যে ভাবে আসে, তাহাতে আয়োজন করিয়া তাহা পরিবেশন করা সম্ভব হয় না। পল্লী-গায়কের মধ্যে ভাটিয়ালীর মেজাজ যখন আসে, তখন তাহার অবসরের মুহূর্ত, দেহ ও মনের বিশ্রামের অবকাশ, সে তখন নিঃসঙ্গ মনের গহনে বিচরণশীল। সুতরাং বহির্জগতের আড়ম্বর ও আয়োজন সেখানে পৌছিতে পারে না। তাহার কর্মহীন মুহূর্তের সুমধুর একাকীত্বই তাহার কণ্ঠে সঙ্গীতের সুর আপনা হইতে ধ্বনিত করিয়া তোলে। সেই জন্য বহির্জগতের উপকরণ সেখানে গিয়া পৌছিতে পারে না।

পূর্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি যে, ভাটিয়ালির গীতি-রীতির একটি প্রধান লক্ষণ এই যে ইহার প্রথম পদটির কয়েকটি শব্দ একসঙ্গে গীত হইবার পর ইহার সর্বশেষ স্বরটি দীর্ঘায়িত হইয়া উচ্চারিত হইতে থাকে, এই দৈর্ঘ্যের সুনির্দিষ্ট কোন পরিমাপ নাই, গায়কের মেজাজ ও রুচি অনুযায়ী ইহা যে কোন সীমায় গিয়া পৌছিতে পারে। প্রারম্ভ পদটির সর্বাপেক্ষা চড়া সুরে উচ্চারিত হইবার পরে পরবর্তী পদগুলির ভিতর দিয়া তাহা কখনও ক্রমে কখনও বা আকস্মিক ভাবে খাদে নামিয়া আসে। ভাটিয়ালির সমস্ত জোর গিয়া প্রথম পদটির উপরই পড়ে এবং প্রথম পদটির ভাবই ক্রমে অন্যান্য পদগুলির মধ্য দিয়া নিম্নতর সুরে

প্রকাশ পায়। সুতরাং ভাব এবং সুর উভয়ের জন্যই প্রথম পদটিই প্রধানত লক্ষ্য এবং প্রথম পদের শেষ স্বরটি ক্রমাগত দীর্ঘায়িত হইয়া উচ্চতম সুরে প্রকাশ করিবার ফলে এই স্বরটিও অত্যধিক প্রাধান্য পাইয়া যায়। যেমন—

কৃষ্ণহারা হইলাম গো,
কৃষ্ণহারা হইয়া কান্দ্‌ছি গো বনে নিশিদিনে।
ওগো আমার মত দীন দুঃখিনী
কে আছে আর বৃন্দাবনে ॥
সখি গো, যার যে জ্বালা সেই যে জানে,
অন্যে কি আর জানে,
আমার অরণ্যে রোদন করা
কার কাছে কই কেবা শোনে।
সখি গো, নয়ন দিলাম রূপ নেহারে
প্রাণ দিলাম তার সনে,
ওগো দেহ দিলাম, অঙ্গের বসন
মন দিলাম তার শ্রীচরণে।
সখি গো, কৃষ্ণ শূণ্য দেহ গো আমার
কাজ কি এ'জীবনে,
অধীন কালাচাঁদ কয়, রাই মরিল
রাই মরিল শ্যাম বিহনে ॥

ইহার প্রথম পদটির মধ্য দিয়াই গানের স্বর ও ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে, পরবর্তী পদগুলির মধ্য দিয়া তাহারই ব্যাখ্যা ও পুনরুক্তি চলিয়াছে মাত্র। ভাটিয়ালি কখনও বর্ণনাত্মক হয় না, কেবল ভাবাত্মক হইয়া থাকে; সেইজন্য ইহা সর্বদাই রচনার দিক দিয়া সংক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। তবে স্বরের তুলনায় কথাংশ অপ্রধান বলিয়া বর্ণনার বাহুল্য থাকিলেও তাহা গীতের মধ্যে কদাচ ভার স্বরূপ হইয়া উঠে না। কারণ, একটি মাত্র চড়া সুরের দীর্ঘায়িত উচ্চারণ ইহার কথা বা ভাষাকে প্রায় সর্বদাই আচ্ছন্ন করিয়া দেয়।

ভাটিয়ালি আরম্ভেই যেমন চড়া স্বরের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইয়া যায়, তেমনই আবার পরক্ষণেই খাদের দিকে নামিয়া আসে, কখনও বা অত্যন্ত দ্রুত খাদের মধ্যে ইহার স্বর নামিয়া আসে, আবার কখনও বা ধীরে ধীরেও নামিয়া

আসে। সেইজন্য ভাটিয়ালিতে সাত স্বরেরই প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু চড়া স্বরই ইহার লক্ষ্য থাকে বলিয়া পরক্ষণেই ইহা পুনরায় চড়ার দিকে অগ্রসর হইয়া যাইতে পারে। স্বরের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন স্তরে উত্থান পতনের মধ্য দিয়াই ভাটিয়ালির আবেদন প্রকাশ পায়। অন্তরের অবরুদ্ধ বেদনা যেন ইহার মধ্য দিয়া একবার দিগন্তে গিয়া প্রতিহত হইয়াই অন্তরের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় স্তম্ভিত হইয়া যায়। এই গুণে ভাটিয়ালির একটি নিজস্ব বিশেষত্ব আছে।

একথা সহজেই মনে হয় যে, ভাটিয়ালির প্রভাব এ দেশের পল্লী-সঙ্গীতে অত্যন্ত ব্যাপক। ইহার সুর নানা দিক দিয়া মার্জিত ও পরিবর্তিত করিয়া বিভিন্ন পল্লী-গীতের সুর জন্মলাভ করিয়াছে, ইহা বাংলার শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের একটি বুনিয়াদি (basic) সুর। অনেক ক্ষেত্রে ইহার প্রভাব এ'দেশের শিল্প-সঙ্গীতের মধ্যেও গিয়া প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া অনুভূত হয়। কীর্তনের মধ্যেও ইহার প্রভাব যে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, তাহা পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি।

একজন সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ ভাটিয়ালির সঙ্গে টপ্‌পার সম্পর্ক আছে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। তাঁহার মতে, 'টপ্‌পা গোড়ায় হিন্দুস্থানী রীতিতে গীত হলেও বাংলাদেশে এ'সে সে নবরূপ ধারণ ক'রেছে, তার মধ্যে বাংলার নিজস্ব রুচি ও মেজাজের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। হিন্দুস্থানী টপ্‌পায় অত্যন্ত দ্রুত তালের যে তাড়া আছে, বাংলা টপ্‌পায় তা নেই—এখানে তালগুলির গতি মন্থর। কেবল তাই নয়, এই সব তালে মোটামুটি ভাবে হিসেব থাকলেও মাত্রা গুণতির হিসেব নেই, অর্থাৎ সুর মাত্রার সঙ্গে লাফালাফি করে অগ্রসর হয় না—ছন্দ এখানে গা ঢাকা দিয়ে পিছনে সরে আছে। ভাটিয়ালির মত এ'র কথাগুলোও এক এক গোছা ক'রে গায়কের মুখে উচ্চারিত হয়, আর তারপরেই কথার হাল থেকে ছাড়ান পেয়ে সুর "জমজমা" নামক তালের মধ্যে বিশ্রাম লাভ করে। তফাৎ দাঁড়াল এই, ভাটিয়ালিতে একটানা সুরের যা কাজ, টপ্‌পার বেলায় "জমজমা" তালের কাজও তাই। যদি বলা যায়, বাংলা টপ্‌পায় ভাটিয়ালির প্রভাব আছে, তাহলে বোধ হয়, খুব মিথ্যা কথা বলা হবে না। বাংলার নিজস্ব সঙ্গীত-চেতনা সর্বত্র সঞ্চারিত হ'য়ে র'য়েছে বলেই টপ্‌পার মধ্যে এই বিশেষ পরিবর্তন ঘটে গেছে বলে মনে করতে পারি (বাংলার লোক-সাহিত্য, পরিশিষ্ট, ৬০৭ পৃষ্ঠা, ২য় সং)।

রচনার দিক দিয়া ভাটিয়ালি নিতান্ত সরল এবং সংক্ষিপ্ত। বাংলার লোক-সঙ্গীতের মধ্যে ইহার রচনাই সংক্ষিপ্ততম ; ইহার কারণ, কথার পরিবর্তে স্বরই এখানে প্রাধান্য লাভ করে। সেইজন্য ইহাতে কথার প্রয়োজনীয়তা বেশি নাই। নিম্নোদ্ধৃত রচনাটি ভাটিয়ালির একটি আদর্শ নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, যেমন—

ও সুবল রে, গুণের ভাই রে সুবল,
আমায় শীঘ্র এ'নে দেখা, রে সুবল, ব্রজেশ্বরী রাধা।
হস্ত দিয়ে দেখ রে সুবল আমার হৃদয়ে,
বিনা কাষ্ঠে জল্‌ছে অনল আমার অন্তরে।

কিন্তু অনেক সময় রচনা যে দীর্ঘ হয় না, তাহা নহে। তবে তাহা বর্ণনাত্মক লোক-সঙ্গীতের প্রভাবের ফলেই হইয়া থাকে, ইহাতে ভাটিয়ালির রস অনেক ক্ষেত্রেই নিবিড়তা লাভ করিতে পারে না।

এইবার ভাটিয়ালির বিষয়-বস্তু সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। বাউল, মুর্শিদ্যা, মারফতী, দেহতত্ত্ব যেমন কেবল তত্ত্বমূলক সঙ্গীত, ভাটিয়ালি তাহা নহে। জীবন ও ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব ব্যতীতও ইহার মধ্য দিয়া সুগভীর ভাবমূলক লৌকিক অনুভূতি প্রকাশ পাইয়া থাকে—সে'কথা পূর্বেও একবার উল্লেখ করিয়াছি। মনে হয়, লৌকিক ভাবমূলক সঙ্গীতই ভাটিয়ালির আদিরূপ। সকল লোক-সঙ্গীত সম্পর্কেই এই কথা প্রযোজ্য—প্রত্যেক সমাজেই লৌকিক অনুভূতি অবলম্বন করিয়া ইহার প্রথম সঙ্গীত রচিত হইয়াছে, তারপর ক্রমে ইহার মধ্যে তত্ত্বকথা প্রবেশ করিয়াছে। লৌকিক অনুভূতির সর্বজনীন বিষয়ই প্রেম, সংস্কৃত সাহিত্যে সেইজন্যই ইহাকে আদি (বা prime) রস বলিয়া উল্লেখ করা হয়। প্রেমের মধুরতম অংশই বিরহ, ভাটিয়ালিতে বিরহ ও বিচ্ছেদের বেদনা সঙ্গীতের মাধুর্য লাভ করিয়াছে, ইহার মধ্যে কোন কদর্যতা নাই। অন্তরের নিভৃততম ক্ষেত্র হইতে ইহার উৎসার, সেই জন্যই ইহা দর্পণের মত নির্মল। নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটির মধ্য দিয়া লৌকিক প্রেম ব্যর্থতার বেদনায় হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে, ইহাতে আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ নাই, তথাপি অনুভূতির আন্তরিকতায় স্বচ্ছ ও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে—

বন্ধু, কই রইলারে—
অকূলে ভাসাইয়া, বন্ধু, কই রইলারে।

লহর দরিয়ার বুকে রইলাম সাঁতারিয়া,
কি দুখ বুঝিবে বন্ধু কিনারায় দাঁড়াইয়া।
বন্ধু, কই রইলারে !
বন্ধুরে, কুল নাই কিনারা নাই
উঠছে কত ঢেউ,
এমন নিদান কালে
সঙ্গী নাই মোর কেউ
বন্ধু, কই রইলারে।

ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বাংলার সমাজের উপর বিস্তার লাভ করিতে লাগিল। তাহার ফলে লৌকিক প্রেম রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর মধ্যে স্বর্গীয়তা লাভ করিল। কিন্তু তথাপি তাহা ধূলিমাটির সম্পর্ক পরিত্যাগ করিল না। পার্থিব প্রেমের অনুভূতিই অপার্থিব আধারে পরিবেশন করা হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণের পরিচয়ে ব্যর্থ মানব-প্রেম নিজের বেদনার কথাই প্রকাশ করিল—

ওগো রাধে, গোকুলেতে থাকি।
তোমার লাগি পরের মাকে
আমি মা বলিয়া ডাকি গো।
কুল দিলাম মান দিলাম
আর কি আছে বাকি।
তোমার লাগি ব্রজপুরে আমি মুরলী যে শিখি গো,
গোকুলে নন্দের ঘরে ধেনু বৎস রাখি।
তোমার শ্রীচরণের লাগি
আমি দাসখত লিখি গো।

রাধা-কৃষ্ণ প্রসঙ্গের উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও ইহা যে ভক্তিমূলক রচনা নহে, বরং নিতান্ত লৌকিক প্রেম-মূলক, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারিবেন। বাংলা দেশে 'কানু ছাড়া গীত নাই'—সেই সূত্রেই ইহার মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রসঙ্গ আসিয়াছে, কোন আধ্যাত্মিক প্রেরণা হইতে তাহা আসে নাই।

কিন্তু ক্রমে আধ্যাত্মিক বিষয়ক লইয়াও ভাটিয়ালি রচিত হইতে লাগিল। যে সকল আধ্যাত্মিক বিষয়ের মধ্যে বেদনা ও বৈরাগ্যের ভাব আছে,

ভাটিয়ালিতেই তাহার সার্থক অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। নিম্নোদ্ধৃত ভাটিয়ালিটি ইহার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন—

জীবনের নাইরে আশা, কর শ্রীগুরুর চরণ ভরসা।
দেহের গুমান কর মিছে, নিঃশ্বাসের কি বিশ্বাস আছে?
কাল শমনে জাল পেতেছে—
ভাঙ্‌বে রে তোর সুখের বাসা।
ভাই বন্ধু দারা সুত সকল পথের পরিচিত,
যখন প্রাণ তোর হবে হত কেউ না করবে জিজ্ঞাসা।
আপন আপন বল যারে কেউত সঙ্গে যাবে না রে,
গুরু ভজন হইল নারে, কেবল ভবে যাওয়া আসা॥

বৈরাগ্যমূলক সঙ্গীতের সঙ্গে ভাটিয়ালির দীর্ঘায়িত চড়া স্বর অতি সহজেই সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারে; সেইজন্য পূর্ববাংলার বৈরাগ্যমূলক বিষয়ে প্রধানত ভাটিয়ালিই শুনিতে পাওয়া যায়। এই সূত্রে নানা তত্ত্ববিষয় ভাটিয়ালির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। দেহতত্ত্বের এই ভাটিয়ালি গানটি সুপরিচিত—

আরে, মন মাঝি, তোর বৈঠা নে রে
আমি আর বাইতে পারলাম না।
আমি জনম ভইরা বাইলাম বৈঠা রে—
তরী ভাইট্যায় বয় আর উজায় না।
ওরে জঙ্গি রসি যতই কসি,
ওরে হাইলেতে জল মানে না।
নায়ের তলী খসা, গোড়া ভাঙ্গা রে—
নায় ত গাব গয়নি মানে না।

ইহাদের ভাব যেমন গভীর, রচনা তেমনই পরিচ্ছন্ন ও সুনির্মল। সুতরাং বাংলার লোক-সঙ্গীতের ইহাই শ্রেষ্ঠ পরিচয়। বাংলার জন-মানসে যে লোকায়ত দর্শনের অনুভূতি দেখা দিয়াছিল, তাহা ইহারই মধ্য দিয়া সর্বাপেক্ষা সার্থক ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং ইহা কেবল মাত্র যে সঙ্গীতের আনন্দ দিয়াছে, তাহাই নহে—দর্শনের দৃষ্টিও খুলিয়া দিয়াছে। ইহা একদিক দিয়া যেমন গীতি, আর একদিক দিয়া তেমনই দর্শন।

বর্তমানে এক শ্রেণীর 'সহুরে' ভাটিয়ালির সঙ্গে আমাদের পরিচয় স্থাপিত

হইয়াছে। তাহার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, নানা বাদ্য-যন্ত্র সহযোগে তাহা গীত হয়; সুতরাং পল্লীর ভাটিয়ালির প্রধান বৈশিষ্ট্যই ইহাতে রক্ষা পায় না। ইহার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, অনেক সময় পল্লীর ভাটিয়ালির নিজস্ব ভাষা পরিবর্তিত করিয়া ইহা সহরের রুচি অনুযায়ী নূতন করিয়া রচিত হইয়া থাকে। এই ভাবে পল্লীর ভাটিয়ালিতে যাহা দেহতত্ত্ব বিষয়ক বলিয়া পরিচিত, তাহাই সহরে আসিয়া সাধারণ প্রেম-সঙ্গীত হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, সহরের সঙ্গীত-বিলাসী অধিবাসীরা তত্ত্ব অপেক্ষা প্রেম-বিষয়টিই অধিকতর আকর্ষণীয় বলিয়া অনুভব করে। পল্লীর ভাটিয়ালিতে দীর্ঘায়িত চড়া স্বরের মধ্যে আন্দোলন বা কম্পন অধিক থাকে না; এমন কি, থাকে না বলিলেও চলিতে পারে; কিন্তু সহরে নানা রাগ-সঙ্গীতের প্রভাব বশত তাহা বিচিত্র আন্দোলন যুক্ত হইয়া থাকে। এই ভাবে ভাটিয়ালির যাহা প্রকৃত রস, তাহা 'সহুরে' ভাটিয়ালির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁহার জমিদারী পরিদর্শন সম্পর্কে পাবনা ও রাজসাহী জেলার গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিতেন, তখন সেখানকার কৃষক ও মাঝি-মাল্লা-দিগের মুখে ভাটিয়ালি শুনিতে পাইয়া নিজে সেই অনুযায়ী কয়েকটি ভাটিয়ালি রচনা করেন। কিন্তু তিনি ভাটিয়ালির প্রচলিত বিষয়-বস্তু গ্রহণ না করিয়া নূতন বিষয়-বস্তু তাহাদের মধ্য দিয়া গ্রহণ করেন। তাহাদের মধ্যে এই প্রকার দেশাত্মবোধক ভাটিয়ালিই তিনি প্রধানত রচনা করিয়াছেন।

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে
বাজায় বাঁশী॥
ও মা, ফাল্গুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেত আমি কি দেখেছি মধুর হাসি॥

এই গানখানি গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাব তারে' এই বাউল গান খানির সুরে রচিত হইয়াছে—ইহা সর্ববাদী সম্মত; সুতরাং ঐ গানখানিকে ভাটিয়ালি ঢঙের বাউল বলা যায়। পল্লীর ভাটিয়ালির দীর্ঘায়িত চড়া স্বরের মধ্যে যেমন কোন মাত্রা নাই, গায়ক তাহার মেজাজ ও রুচি অনুযায়ী যত খুসী তাহা দীর্ঘায়িত ও চড়া করিতে পারে, রবীন্দ্রনাথের ভাটিয়ালিতে তাহা

হইবার উপায় নাই—কারণ, তাহা যত দীর্ঘায়িতই হোক, তাহা সুনির্দিষ্ট মাত্রা দ্বারা সীমায়িত ; মাত্রার শাসন এখানে লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই। পল্লীর ভাটিয়ালির অনিয়মিত বিস্তারিত স্বরকে রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত করিয়া লইয়া ভাটিয়ালির স্বর সম্পর্কিত স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। পল্লীর ভাটিয়ালির কথা অপেক্ষা স্বর প্রাধান্য লাভ করে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাটিয়ালিতে তাহার অন্যান্য রচনার মত স্বর অপেক্ষা কথাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের আর একটি উল্লেখযোগ্য দেশাত্মবোধক ভাটিয়ালি—

গ্রাম ছাড়া এই রাঙা মাটির পথ আমার মন ভুলায় রে।
ও রে কার পানে সে হাত বাড়িয়ে লুটিয়ে যায় ধূলায় রে॥
ও যে আমার ঘরের বাহির করে, পায়ে পায়ে পায়ে ধরে—
ও যে কেড়ে আমায় নিয়ে যায় রে, যায় রে কোন চুলোয় রে।
ও যে কোন বাঁকে কোন ধন দেখাবে, কোন খানে কী দায় ঠেকাবে—
কোথায় গিয়ে শেষ মেলে যে, ভেবেই না কুলায় রে॥

ইহরে মধ্যে পল্লীর ভাটিয়ালির বৈশিষ্ট্য যে আনুপূর্বিক রক্ষা পাইয়াছে, তাহা নহে। কারণ, পল্লীর ভাটিয়ালির প্রথম পদটিই যেমন চড়া স্বরের দিকে ধাবিত হইয়া পরবর্তী পদে তৎক্ষণাৎ খাদে নামিয়া আসে, ইহাতে তাহার পরিবর্তে দ্বিতীয় পদটি চড়া হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বাংলার পল্লী-সঙ্গীতের ভিত্তিটি অবিচল রাখিয়াও ইহার বহিরঙ্গে কারুকার্য করিয়াছেন, ইহার মধ্যেও তাহারই পরিচয় পাওয়া যায় ; সেই জন্যই একজন রবীন্দ্র-সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন, 'ভাটিয়ালি ঢঙে'র গান তাঁহার আছে। উদ্ধৃত গান দুইটি তাহার প্রমাণ।

সর্ব শেষে ভাটিয়ালি শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করিতে হয়। এই সম্পর্কে কতকগুলি মতই প্রচলিত আছে। ভাটি অঞ্চলের সঙ্গীত বলিয়া ইহার ভাটিয়ালি, ইহাই সাধারণের বিশ্বাস। বাংলা দেশের নিম্নভূমি অর্থাৎ রণত যে সকল অঞ্চল বর্ষায় জলমগ্ন হইয়া যায়, তাহাই ভাটি বলিয়া পরিচিত। এই অর্থে ভাটি বলিতে পূর্ববঙ্গ এবং প্রধানত ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, ঢাকা অঞ্চলই বুঝায়। প্রকৃত পক্ষে ভাটিয়ালি এই অঞ্চলেরই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় লোক-সঙ্গীত। তথাপি ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও যে এই সঙ্গীতের প্রভাব বিস্তারলাভ করিয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

ভাটি বলিতে কেবল মাত্র পূর্ববঙ্গের উপরোক্ত অঞ্চলই যে বুঝায়, তাহা নহে, নিম্নবঙ্গ অর্থাৎ খুলনা, বরিশালের দক্ষিণ অংশও বুঝায়। সুন্দরবন অঞ্চলের অরণ্যাকীর্ণ নিম্নভূমিও ভাটি বলিয়াই পরিচিত; সেই সূত্রে সেই অঞ্চলের লৌকিক দেবতা দক্ষিণ রায়কে ভাটীশ্বর বা আঠার ভাটির অধিপতি বলিয়া উল্লেখ করা হয়। কিন্তু সেই অঞ্চলে যে লোক-সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রধানত ভাটিয়ালি নহে। এই অঞ্চলে পরবর্তীকালে জনবসতি স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া এখনও তাহাতে সুসংহত সমাজ-জীবন গড়িয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। সেই জন্য ইহার লোক-সঙ্গীতও বিশেষ কোন রূপ লাভ করিতে পারে নাই। মুসলমান ধর্মপ্রচারক বা গাজীর গান এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য লোক-সঙ্গীত, কিন্তু তাহা ভাটিয়ালি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহার অরণ্যপ্রকৃতির মধ্যে যে ছায়াচ্ছন্ন রূপ দেখা যায়, তাহার মধ্যে ভাটিয়ালির স্বর-বিস্তারের প্রেরণা আসিতে পারে না; কারণ, ইহার মধ্যে বিস্তার ও উদারতা নাই, যাহা আছে তাহা গভীরতা ও রহস্যময়তা, সুতরাং ইহা ভাটিয়ালির জননী হইতে পারে না। সুতরাং ভাটি শব্দ দ্বারা সাধারণভাবে নিম্ন-ভূমি বুঝাইলেও এখানে পূর্ববঙ্গে প্রচলিত বিশেষ প্রকৃতির এই লোক-সঙ্গীতকেই ভাটিয়ালি বলিয়া উল্লেখ করা হয়। দক্ষিণ বঙ্গে ভাটিয়ালির প্রচলন নাই।

এখানে আরও একটি কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়, তাহা এই যে, দক্ষিণ বঙ্গের নদ-নদীর প্রকৃতির সঙ্গে পূর্ব বাংলার নদ-নদীর প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। দক্ষিণ বঙ্গের নদ-নদী সর্বদাই জোয়ার-ভাটা দ্বারা আন্দোলিত হইয়া থাকে। ইহা ভাটিয়ালির অনুকুল অবস্থা নহে। একদিকে নদী কিংবা জলাভূমির বিস্তার, আর একদিক দিয়া ইহার অলস মন্থর গতি, এই উভয়ের সহযোগেই ভাটিয়ালির উদ্ভব হইয়া থাকে; এই অবস্থার মধ্য দিয়াই মাঝি কর্মে যথার্থ অবসর লাভ করিতে পারে, এই অবসরের মুহূর্তই ভাটিয়ালির পক্ষে অনুকুল মুহূর্ত। সেইজন্য আবার কেহ কেহ মনে করেন, নদীর ভাটিতে নৌকা ছাড়িয়া দিয়া অলস বৈঠাটি এক হাতে স্থির করিয়া ধরিয়া রাখিয়া মঝি এই গান গাহে বলিয়াই ইহা ভাটিয়ালি বলিয়া পরিচিত। কিন্তু পূর্বেই আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, ভাটিয়ালি কেবল মাঝিরই গান নহে, ইহা গো কিংবা মহিষরক্ষক, রাখাল বা মহিষালেরও গান। সুতরাং ইহাকে পূর্ববঙ্গের নিম্নভূমি অর্থে ভাটি অঞ্চলের গান বলিয়া ভাটিয়ালি মনে করাই সঙ্গত। পূর্বেই বলিয়াছি, শিল্প-

সঙ্গীতের রাগিণী ভাটিয়ালির সঙ্গে লোক-সঙ্গীতের সুর ভাটিয়ালির কোন সম্পর্ক নাই।

উপসংহারে বাউলের সঙ্গে ভাটিয়ালির সম্পর্ক লইয়া কিছু আলোচনা করিতে চাই। বিশেষ এক সাধন-ভজনের প্রণালীর নাম বাউল, ইহার সাধক-সম্প্রদায়কে বাউল সম্প্রদায় এবং সাধন-ভজন সূত্রে ইহা যে সঙ্গীতের অনুশীলন করিয়া থাকে, তাহাকে বাউল গান বলে। বাউল গান বাংলার কোন বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, অর্থাৎ বাউল আঞ্চলিক সঙ্গীত নহে; পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের কোন কোন স্থানে বাউল সম্প্রদায়ের আখ্ড়া আছে। বাংলার এই বিভিন্ন অঞ্চল জুড়িয়া গীত বাউল সম্প্রদায়ের গানের বিশেষ কোন একটি নিজস্ব সুনির্দিষ্ট সুর নাই। প্রত্যেক অঞ্চলের বাউল গানে আঞ্চলিক লোক-সঙ্গীতের সুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যেমন পূর্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের বাউল গানে প্রধানত ভাটিয়ালি ও সারি এবং পশ্চিম বঙ্গের বাউল গানে প্রধানত ঝুমুর ও কীর্তন গানের সুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং 'বাউল সুর' বলিয়া কিছু নাই।

এখানে আরও একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, বাউল গানের সঙ্গে নৃত্যের সম্পর্ক আছে, সুতরাং যে সুর নৃত্যের সহচর হইবার যোগ্য প্রধানত সেই সুরই বাউল গানে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং সারি শ্রেণীর গানের সুরই প্রধানত বাউল গানের পক্ষে উপযোগী; কিন্তু তথাপি পূর্ববঙ্গে ভাটিয়ালির প্রভাব বশত কিছু কিছু ভাটিয়ালিও ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ভাটিয়ালির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার মধ্য দিয়া জীবনের সুগভীর তত্ত্বকথা অতি সহজে প্রকাশ পাইতে পারে; সেই সূত্রেই বাউল, দেহতত্ত্ব, মুর্শিদ্যা, মারফতী ও নানা বৈরাগ্য-মূলক সঙ্গীত ভাটিয়ালি আশ্রয় করিয়াই রূপ লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু যেখানে নৃত্য অপরিহার্য, সেখানে সারি শ্রেণীর গান ব্যতীত ভাটিয়ালি ব্যবহৃত হইতে পারে না। একজন রবীন্দ্র-সঙ্গীত বিশেষজ্ঞের কথা একবার পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। তিনি অন্যত্রও বলিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ 'বাউল সুর নিয়ে প্রথম ব্যাপক ভাবে গান রচনা সুরু করেন বাঙলায় স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ১৩১২ সনে, তাঁর ৪৪ বৎসর বয়সে। এ ছাড়া সারি গানের সুরও তিনি ব্যবহার করেছিলেন এ'যুগেই।'

'সারিগানের সুর' কি জিনিষ, তাহা বোধগম্য হয় না। পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে বাউলের নিজস্ব গানের সুর কিছু নাই, বিভিন্ন আঞ্চলিক

লোক-গীতির সুর বাউল গানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথও স্বদেশী আন্দোলনের যুগে পল্লী-সঙ্গীতের সুরে যে সকল গান রচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে যেমন ভাটিয়ালি ঢঙ্গের গান আছে, তেমনই সারি শ্রেণীর গানও আছে। পুর্ব-বাংলার বাউল গানে এই দুইটি সুরই ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহারা 'বাউল সুর' বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু কীর্তনের মত বাউলের একটি নিজস্ব সুর বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে বিকাশ লাভ করিয়া সমস্ত বাংলাদেশের বাউল গানের কোন সুনির্দিষ্ট এবং আদর্শ গীত-রীতি রূপে গৃহীত হয় নাই। সুতরাং বাউল গান থাকিলেও 'বাউল সুর' বলিয়া নির্দিষ্ট কিছু নাই। উক্ত রবীন্দ্র-সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ রবীন্দ্রনাথের 'বাউল সুরের' নিদর্শনরূপে তাঁহার রচিত 'ক্ষেপা তুই আছিস আপন ক্ষেয়াল ধ'রে' ও 'তোমরা সবাই ভালো'—এই গান দুইটির উল্লেখ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য প্রথমটি অর্থাৎ 'খ্যাপা তুই আছিস আপন খেয়াল ধ'রে' ভাটিয়ালি ঢঙের গান এবং দ্বিতীয়টি অর্থাৎ 'ওগো তোমরা সবাই ভালো' মিশ্র ঢঙের সুরে রচিত। তারপর স্বদেশী আন্দোলনের যুগে রচিত রবীন্দ্রনাথের বহু দেশাত্মবোধক সঙ্গীতই একদিকে যেমন ভাটিয়ালির ঢঙে রচিত হইয়াছে, তেমনই অন্যদিক দিয়া সারি শ্রেণীর সুরে রচিত হইয়াছে, কোথাও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ইহাদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট ভাবে 'বাউল সুর' বলিতে কিছু নাই। ভাটিয়ালি এবং সারিরই বিশেষ ঢঙ রবীন্দ্রনাথ রচিত তথাকথিত 'বাউল সুরে'র মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

এইখানে একটি কথা বিশেষ ভাবে স্মরণযোগ্য; তাহা এই যে, সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, শাস্ত্রীয়-সঙ্গীতই হউক কিংবা লোক-সঙ্গীতই হউক, কাহারও নিখুঁত স্বরলিপি করা সম্ভব নহে। মাত্রা ও তালহীন ভাটিয়ালির যে গীত-রীতির কথা উপরে উল্লেখ করিলাম, তাহারও নিখুঁত রূপটি কোন স্বরলিপির মধ্য দিয়াই প্রকাশ পাইতে পারে না। অথচ কোন বিষয়কে অনুশীলন করিতে হইলে ইহার কতকগুলি সাধারণ নিয়মেরও সন্ধান করিবার আবশ্যক হয়। এইজন্য ভাটিয়ালি গানের যে স্বরলিপি রচনা করা হয়, তাহা কেবল মাত্র নাগরিক সমাজের এই বিষয়ক অনুশীলনের কতকটা সুবিধা দিবার জন্যই করা হয়, পল্লীর ভাটিয়ালির নিখুঁত রূপটি সর্বত্রই ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে মাত্রা ও তাল রক্ষা করিয়া তাঁহার ভাটিয়ালি ঢঙের গান রচনা করিয়াছেন, সেখানে মাত্রা ও তালের

উপর ভিত্তি করিয়াই স্বরলিপি রচিত হয়; কারণ, স্বরলিপি রচনার যে একটি সুনির্দিষ্ট প্রণালী আছে, তাহা এখানে পরিত্যাগ করিবার কোন উপায় নাই। সুতরাং পূর্বে যে সহুরে ভাটিয়ালির কথা সলেখ করিয়াছি, এই স্বরলিপির ভিতর দিয়া পল্লীর ভাটিয়ালির কতকটা সেই রূপই প্রকাশ পায়, লোক-সঙ্গীতকে নাগরিক উপায়ে শিক্ষণীয় বিষয় করিবার জন্যই ইহার সম্পর্কে এই নাগরিক পদ্ধতি অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নাই। কারণ, পল্লী-সঙ্গীত পল্লীতে শিক্ষণীয় বিষয় ছিল না, সহজাত শক্তি দ্বারাই তাহা লাভ করা হইত; সহরে আসিয়া তাহা শিক্ষণীয় বিষয় হইয়াছে বলিয়াই শিক্ষার সুনির্দিষ্ট প্রণালীটিও ইহার উপরে অনিবার্য রূপে আরোপ করা আবশ্যক হয়।

ভাটের গান

মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা প্রধানতঃ এই সকল অঞ্চলে ভাট নাম একটি সম্প্রদায় আছে। বিভিন্ন পর্ব উপলক্ষে পর্বের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া গান করা তাহাদের ব্যবসায় ছিল। শ্রীহট্ট অঞ্চলেই ইহাদের বাস ছিল। দুর্গাপুজা কিংবা অন্যান্য কোন কোন পার্বণ অথবা বিবাহাদি পারিবারিক উৎসব উপলক্ষেও তাহারা গান গাহিয়া বৃত্তি লাভ করিত। পুজার পূর্বে আগমনী গান, পুজার পর বিজয়া গান, বিবাহোপলক্ষে বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্রের বিবাহের বিষয় গান গাহিয়া শুনাইত। ইহা ভাটের গান বলিয়া পরিচিত। ইহারা সাধারণত আচার্য ব্রাহ্মণ শ্রেণীভক্ত। কুষ্ঠী ঠিকুজী নির্মাণ করাও তাহাদের বৃত্তি ছিল।

ভাত-কাপড়ের গান

বিবাহাচারের পরের দিন শুভরাত্রি, ঐ দিন মধ্যাহ্নকালে বধূকে বরের আনুষ্ঠানিক ভাবে ভাত-কাপড় দিবার বিধান আছে। একখানি বস্ত্রসহ অন্ন-ব্যঞ্জনাদি থালায় সাজাইয়া বধূর হস্তে সমর্পণ করাকেই 'ভাত কাপড়' দেওয়া বলে; তখন এই গীত গাওয়া হয়—

১

নাগর, তুমি বৈদেশে যাইও না।
একলা ঘরে কাইন্দ্যা মরে সুন্দরী ললনা।
এখন অইতে নাগর তোমার পায় লাগল বেড়ি,
সুন্দর মুখ তার মলিন অইব কর যদি দেরী।

চুপি দিয়া চাইয়া থাকবো আম গাছের তলায়,
যেখানে সোনার কোকিল আমের মুকুল খায়,
আমের মুকুল খাইয়া কোকিল কুহু কুহু করে,
বিরহিণী নারী বল কেমনে ধৈর্য ধরে ?
থাক থাক সুন্দরী গো, ধৈরয ধরিয়া,
তোমার লাইগ্যা আন্‌বাম সিন্দূর থানেতে ভরিয়া।
থাক থাক, সুন্দরী গো, তিন দিনের লাগিয়া,
পাটেশ্বরী শাড়ী আন্‌বাম তোমার লাগিয়া।
থাক থাক, সুন্দরী লো, পথের পানে চাইয়া,
ঢাকা থাইক্যা শাঁখা চুড়ি আন্‌বাম কিনিয়া।
এরে বুল্যা হাতে তুইল্যা ভাত কাপড় দিল,
চারিদিগে নারীগণ জোকার করিল। —মৈমনসিং

২

দেখ দ্বারকা ভবন, রুক্মিণীরে অন্ন বস্ত্র দিছে নারায়ণ।
শঙ্খ বস্ত্র সঙ্গে নিয়া ফুলমালা চন্দন,
স্বর্ণ থালে শাইলের অন্ন অতি সুলক্ষণ।
চতুর্দিকে খণ্ড খণ্ড বাটীতে ব্যঞ্জন
দধি দুগ্ধ ঘৃত আর অপূর্ব মাখন।
বেষ্টন কইর‍্যা বইস্যা আছে নন্দের নন্দন,
সামনে আইস্যা রাজকুমারী দিলা দরশন।
ভাত কাপড় দিয়া কৃষ্ণ তোষিলেন মন,
মঙ্গল জোকার দিল যত সখীগণ। —ঐ

ভাদু গান

ভাদ্র মাসে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং দক্ষিণ বীরভুম অঞ্চলের কুমারী মেয়েরা ভাদু গান গাহিয়া থাকে। ছোট ছোট ছেলেরাও সময় সময় গান করে। ইহার গান ও সুর অনেকাংশে টুসুর গানের ন্যায়। ভাদু মানভূমের সমাজ-জীবনে একটি বিশেষ গণপর্ব। শাস্ত্রোত্তর সমাজ-জীবনে 'ভাদু দেবী' মানভূমের লোক-সঙ্গীত মাধ্যমে চিন্ময়ীরূপে জন মনে আদৃতা।

প্রধানত মানভূমের আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে এই পর্ব সানন্দে উদ্‌যাপন করে থাকে। কথিত আছে যে, পঞ্চকোট রাজ তাঁহার একমাত্র কন্যা ভাদু দেবীর স্মৃতি-রক্ষার্থে এই পর্ব প্রথম উদ্‌যাপন করেন। তাই এখনও তাঁহার স্মরণার্থে ভাদুগান গীত হয়। এই গানটিতে তাহার উল্লেখ আছে।

চল কাশীপুরে রাজ দরশন করবো গো নয়নভরে,
কাশীপুরে ভাদুর পুজা, মানভূমেতে কে করে
পঞ্চকোট রাজার দৌলতে দেখ এখন সবার ঘরে ॥

শ্রাবণ সাঁকরাইত (শ্রাবণ সংক্রান্তি) হইতে সুরু করিয়া ভাদ্র সাঁকরাইত (ভাদ্র সংক্রান্তি) পর্যন্ত এই পর্ব উদ্‌যাপিত হয়। কিন্তু পর্বের জের চলে শারদীয়া পুজা পর্যন্ত। সাধারণত নূতন পাত্রে গোবরের উপর ধান ছড়াইয়া দিয়া ভাদুর রূপ দান করা হয়। কোথাও বা নানারকম ফুল দিয়াও ভাদুর প্রতিষ্ঠা করার প্রথা প্রচলিত আছে। পরে সেই পাত্র আনিয়া কোন নির্দিষ্ট স্থানে বাড়ীর কুলুঙ্গীতে স্থাপন করা হয়। আজকাল অনেক ক্ষেত্রে এই একটি মৃৎ প্রতিমা নির্মিত হয়। ছেলেমেয়েরা সমবেত হইয়া ভাদুদেবীকে ঘিরিয়া আবেগভরে আবাহন গান করে।

ওগো ভাদুমণি, নমি ও রাঙা চরণ দুখানি ॥

গানের মাধ্যমে মেয়েরা নিজেদের মনের কথা ব্যক্ত করে। সাধারণত বিবাহিতা মেয়েরা শ্বশুর ঘরের ও বাপের ঘরের সুখ্যাতি আর ভাইদের গুণ-গরিমা করিয়া থাকে। প্রায় কৈশোরেই মেয়েদের বিবাহ হইয়া যায় এবং শ্বশুর ঘরে থাকে, তাই পিতৃগৃহের প্রতি তাহাদের আকর্ষণ দুর্নিবার। আর শ্বশুর ঘরের মধ্যে আবদ্ধ নিয়মে কিশোরী মেয়েদের মন সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। তাই এই পর্ব উপলক্ষে বিবাহিতা মেয়েদিগকে শ্বশুরবাড়ী হইতে পিতৃগৃহে আনা হয়। যদি না আনা হয়, তবে মেয়েরা গানের মাধ্যমে আক্ষেপ জ্ঞাপন করে।

শ্বশুর ঘরের গঞ্জনাতে প্রাণ আমার থাকে নাগো,
ওগো মা, তুই এমনি নিঠুর নিতে না পাঠালি গো ॥

মেয়েরা সাধারণত শ্বশুর বাড়ীতে অনেক গঞ্জনা সহ্য করে—তবু আপন জননী ও জন্মভূমিকে ভুলিতে পারে না। তাই তারা গায়—

শ্বশুর বাড়ীর গঞ্জনাতে মন আমার সদাই ভারী,
মা জননী জন্মভূমির স্নেহ যে ভুলতে নারি।

কুমারী মেয়েরা সাধারণত শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন হইতে ভাদু-সঙ্গীত গাইতে সুরু করে এবং প্রতিদিনই বাড়ীর মেয়েরা একত্রিত হইয়া ভাদু-সঙ্গীত গায়, তাহার পুজা করে। বিশেষত ভাদ্র সংক্রান্তির আগের দিন সমস্ত মেয়েদের মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। কেন না সেইদিনই ভাদু দেবীর পুজা ও জাগরণ। তাহারা সেদিন সমস্ত রাত্রিই জাগরণ করে। ভাদু সঙ্গীত গাহিয়া রাত্রি অতিবাহিত করে। তাই মেয়েরা সেদিন ভাদু পুজার জন্য মা-বাবার কাছে নানারকম আব্দার জানায়—

আমার ভাদুধনে
ভাল ভাল বড় মিষ্টি দাও এনে ॥
খাজাগজা জিলাপী মণ্ডা গো পান্তুয়া ক্ষীরমোহন,
লেডিকেনি আর কাল জাম আনিবে দেখে শুনে ॥

গান গাইতে গাইতে ভাদু দেবীকে নিরঞ্জনের জন্য জলাশয়ে লইয়া যায় এবং বেদনার্ত চিত্তে প্রতিমা নিরঞ্জন করে। তাই ভাদু দেবী আক্ষেপ করিতে করিতে বিদায় গ্রহণ করে। বলে—

আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা সবাই পরে নীলশাড়ী,
আমি কি তোর ছেলে নয়, মা, পাঠালি শ্বশুরবাড়ী ॥

ভাদ্র মাসের প্রথম দিন হইতে আরম্ভ করিয়া সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতি রাত্রিতে পরিবারের প্রধানত কুমারী কন্যারা একত্র হইয়া ভাদুর গান গায়। বিষয় অনুযায়ী গানগুলিকে কতকগুলি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন, রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক, রামায়ণ-বিষয়ক ইত্যাদি। বিষয়-অনুযায়ী গানগুলি এইবার উল্লেখ করা যাইবে।

রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক

১

ভাদু গো, সাজাব বিবিধ ফুলে,
গেঁথেছি সাধের মালা পরাব গলে।
নব বৃন্দাবনে কি শোভা হয়েছে ভাদুর জাগরণে
বৃন্দা যেতে বল কালারে
লম্পট যেন কুঞ্জে প্রবেশ না করে। —বাঁকুড়া

২

ভাদু, হেরবি যদি আয়, কদমতলায় দাঁড়িয়ে কালা আড়নয়নে চায়,
আয় ললিতা, আয় বিশাখা, হেরবি যদি জীবন-সখা,
আমরা হে কুলবালা, জানি না, প্রাণ, কোন ছলা
ঘরে গুরু গঞ্জনা হে, ঘরে যাওয়া দায়।
যমুনাতে হ'ল খেলা, খেলব বলে চিকণকালা,
আর ভেবনা চিকণকালা ধরি তোমার পায়।
শুন, ওহে বংশীধারী, কোর না আর বসন চুরি,
বসন চুরি করলে, হরি, ঘরে যাওয়া দায়।
ধর হে মুরলী ধর, নটবর বেশ কর,
এনেছি বনফুলের মালা পরাব গলায়।
মস্তকেতে মোহনচূড়া, তাহে আছে গুঞ্জবেড়া,
হেলিয়ে দুলিয়ে ধড়া পরে ধরাব পায়, সখি, হেরবি যদি আয়। —ঐ

৩

দেখ দেখি, সখি, উড়ে যায় পাখি রাধারই নাম লেখা,
নবনী খাবার বেলা হোল শ্যাম, লুকালে হে কোথা।
উড়িল পালান পাখী, যে পার সে ধরবে,
ধরিলে চরণ দুটি, পাখি, গৌরবরণ আঁখি রে। —ঐ

৪

যশোদা কহেন বাণী, শুন, বাছা যাদুমণি,
ঘরে বসে ক্ষীর ননী খাও।
হ্যারে, আমার কপাল খেয়ে নিরবধি বুলো ধেয়ে,
চুরি করে খেতে কেন যাও।
কারু কাঁচা এনে পা দিই না, মা, করতে পারি কিবা,
ওদের পাড়া গেলে লাগে মা ছেড়া ছেড়া পারা।
বালায় বালায় বেঁধে দেয় মা মুখে দেয় ধুলা
পীতধড়া কেড়ে লয়, মা, সব বেশ বাহুলা। —ঐ

৫

দেখে এলাম বৃন্দাবনে তিন রঙের তিন ফুল ফুটেছে,
ফুটেছে নীল গোলাপ সাদা,
কোন্ ফুলে কৃষ্ণ আছেন কোন ফুলে শ্রীমতী রাধা।
তোরা দেখগো চেয়ে যাচ্ছে বেয়ে সোনার তরণী,
ওই যে তরীর উপর চাপ্যে আছে রাম রঘুমণি।
বারণ কর বারণ কর বাঁশী বাজাতে, ও সাধের ললিতে,
বাঁশী ভাঙ্গবো না চুরবো না ফেলে দেব জলেতে,
ও সাধের ললিতে। —ঐ

৬

আজ কেন, রাধিকালো, তোর এত বেলা,
কৃষ্ণের মন্তনা পেয়ে ঘুম ভাঙ্গলো সকাল বেলা।
বল দেখিনা, শুকসারি, তোর তো কুঞ্জের দ্বারে খিলি,
কোন পথে পালালে আমার ননীচোরা বনমালী॥ —ঐ

৭

বাজিল শঙ্কের বাঁশী, শ্রীরাধা রাধা বলে।
বাঁশী শুনে কমলিনী বিন্দে দূতীরে বলে।
কাক কালো, কোকিল কালো আর কালো তমালের বন,
কৃষ্ণ কালো দেখতে ভালো, শ্রীরাধিকার প্রাণধন। —ঐ

৮

রাধে, অভিমানী তোমার জন্য হই আমি নাপিতানী,
খেলার রসে ছিলেন কানাই সিদামের সনে।
হেনকালে প'ড়ে গেল শ্রীরাধাকে মনে॥
কে ঘরে আছ গো তোমরা রায় বিনোদিনী,
আলতা পরাইবার জন্য আসিয়াছি আমি।
'ওগো ওগো নাপিতানী, নিবে কয় কড়ি,
নাপিতানী বলে, 'নিব ছয় কড়া কড়ি'।
কম্বল আসন পাতি হেলাইয়া গা,
অগ্রেতে বাড়িয়ে দিলেন দক্ষিণের পা।

নখ খানি মাজেন কৃষ্ণ ভাবেন মনে মনে,
আপনারি নামটি প্রভু লিখিলেন চরণে।
ওগো ওগো, নাপিতানী, কী কর্ম করিলে,
আমার বন্ধুয়ার নাম চরণে লিখিলে।
ওগো ওগো সখী, সব আন গিয়া জল,
চরণে বন্ধুয়ার নাম রেখে কিবা ফল।
যত সব সখী মিলে চরণ ধুয়ালো,
আলতাখানি উঠে গেল, নাম নাহি গেল!
এতেক বুঝিয়া তখন মিলন হইল,
সদানন্দে আনন্দেতে হরি হরি বলো। —বাঁকুড়া

৯

কৃষ্ণের উক্তি

জাগো জাগো, রাধা, চেয়ে দেখ তোমারি অঙ্গ আধা,
তোমার জন্য বৃন্দাবনে রইছি নন্দের বাঁধা।
পথ মাঝে বড় বিপদ গো, পেয়েছি অনেক ব্যথা,
একবার মেল আঁখি, পান করাও সুধা।
চন্দ্র কোলে তুললে একবার মিটবে গো সকল ক্ষুধা।
তুমি যদি না চাহিবে গো দাঁড়াব আমি কোথা।
মণিহারা ফণির মত বেড়াব হেথা হোথা॥ —ঐ

১০

বৃন্দার উক্তি

ওহে বনমালী, এবারে বুঝিব চাতুরালী,
দ্বার ছেড়ে দিছি আমি হে শুনিয়ে মধুর বুলি,
কেমনে মান ভাঙ্গাবে রাধার দেখিব নয়ন মেলে।
নাম ধরে বাজাও একবার হে তোমার করের মুরলী,
মান ভাঙ্গিবে তোমার পরশে দেখিব নয়ন ভরি। —ঐ

১১

কৃষ্ণের উক্তি

বৃন্দে, ছাড় গো দ্বার,
আমি গিয়ে মান ভাঙ্গাব শ্রীরাধার।
আমারে হেরিলে রাধা গো থাকিতে নারিবে আর,
মান ভাঙ্গিবে মোর পরশে খুলিবে ভিতর দুয়ার।
মুরলি বাজাব আমি গো নামটি লয়ে শ্রীরাধার,
কেমনে থাকিবে মানি, সমগত প্রাণটি যার। —ঐ

১২

বৃন্দার উক্তি

ফিরে যাও হে, কানাই, মোদের কাল বরণ হেরবে না,
নিশি শেষে এলে তুমি হে, মান করেছে মোদের রাই।
কার কুঞ্জে বঞ্চিলে নিশি তোমার একটু লজ্জা নাই,
রতি চিহ্ন অঙ্গে আছে হে তবু কি শ্যাম লজ্জা নাই।
আশা দিয়ে আশা ভঙ্গ এ পাপ বিধি সইবে নাই।
নিশিশেষে এমন রূপ হেরিবে না মোদের রাই॥ —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত পদুটির সঙ্গে 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে'র 'বংশীখণ্ডে'র একটি পদের তুলনা করা যাইতে পারে—

১৩

রাধিকার রান্না

আজ কেন, সই, রাঁধতে গেলাম আপন মাথা খেয়ে,
হেনকালে দিলেন শ্যাম বাঁশরী বাজায়ে।
বাঁশরীর গান শুনে ঘরে না রয় প্রাণ,
প্রথমে ডাল বড়িয়ে দিলাম যে সার। (সরিষা)
অম্বলে দিলাম তাম্বুল ঝালে শুক্তানি,
শুধু হাঁড়ি চাল দিয়ে ভেজাইলাম জ্বাল,
আস্ত ব্যাস্ত হয়ে তখন ঢেলে দিলাম জল।
ভাজা ভাজা চালগুলি ভাসিল সকল,
কটুর তেলে বেগুন ভেজে নিম দিয়েছি গুলে,

আমড়াতে করলাতে রেঁধেছি তায় দিয়েছি বড়ি,
ভাগর মাছের খানি রেঁধেছি খন দিয়েছি খাড়ি।
দুধ ছানাও দুধ তপ্ত বলে' হিং দিয়েছি গুলে,
অবশেষে ক্ষীর চড়িয়ে নিম দিয়েছি ফেলে ॥ —ঐ

১৪

নিতি আমি নিতি দেখি কদম তলায় দাঁড়িয়ে,
কবে থেকে কৃষ্ণ ঠাকুর ঘাটের লাইড়া হয়েছে।
ওরে লাইড়া, বাঁধরে ভেলা পার করেছে সখীগণ;
তোর নৌকাতে পার হব না চলে যাব বৃন্দাবন ॥
বৃন্দাবনে যেয়ে পরে পড়ে রব রাসমূলে,
বৃন্দাবনে এসেছ, ঠাকুর, এই রাসলীলা করিতে,
বৃন্দাবনে থাক, ঠাকুর, কাঠের কি এতই দুঃখ,
ভাঙ্গা নৌকা নও, গো সখী, অসুরের ও গাড়ী।
সব সখিকে পার করিলে লিব গো আনা আনা,
রাধিকাকে পার করিলে লিব গো কানের সোনা।
হে হরি, চরণে ধরি দাও হে কানের সোনা,
শাশুড়ী ননদে আমার করিবেক গঞ্জনা।
করেছ গোপের বাগালী বেড়াইছ মাঠে মাঠে,
চিঠি লিখতে জান, শ্যাম, ক অক্ষর নাই পেটে।
লিখিতে পড়িতে, বৃন্দে, তখন আমায় দিল কই,
আমি ত লেখাপড়া জানি না শ্রীরাধা বই।
এত কেন দেরী হ'ল, মা কি বাধা দিয়েছে,
আজকার মত তোরাই যারে, কৃষ্ণ, আমরা যাবো না,
দুঃস্বপ্ন দেখেছি রাতে বনে যেতে দিব না।
নাতিনী ধবলী এল, কৃষ্ণ আমার এল কই,
থালের ননী থালেই রইল মন গুমানে বসে রই।
মঞ্জরাধন পাখি দিল, উড়ে বসল কার চালে,
আমার যদি হ'ত মঞ্জর, বেঁধে রাখতাম প্রেমডোরে।

হাতে দিলাম প্রেম সুতো পায়ে দিতাম প্রেমডোর,
লোক শুধালে বলতাম তারে শ্রীরাধিকার মনচোর।
শ্রীরাধিকার মানের জন্যে ধরেছিল চরণে,
চরণ ধরে গড়াগড়ি সেদিন কি, শ্যাম, নাই মনে ॥ —ঐ

১৫

যত গোপ গোপীগণে, শুভক্ষণে হয় মনে
বৃন্দাবনে করেন গমন,
উঠিল প্রবল রোল, ঘন ঘন হরিবোল
আগে সবে চালায় গোধন ॥
কৃষ্ণ বলরাম সঙ্গে ব্রজের বালক রঙ্গে
নানা বেশ ভূষা করি যায়,
কেহ গায় কেহ নাচে করতালি কেহ দিছে
কেহ শিঙ্গা মুরলী বাজায় ॥
নবীন পল্লব ডাল, কারো উরে করে আলা
কারো গলে দোলে গুঞ্জা ছড়া,
ঘনশ্যাম রাম সঙ্গে, ব্রজ সখা যায় রঙ্গে
নব কোটি গোপের নন্দন।
ব্রজের যুবতী যত, যায় কত কোটিশত
পূর্ণচন্দ্র গগনে যেমন ॥
বৃষভানু কলাবতী, হরষ হইয়া অতি
মণিরথে করিল গমণ
দাস দাসীগণ কত সঙ্গে যায় কোটি শত
গজ বাজী রথ অগণন
রাধা সহচরি বালা সুশীলাদি শশীকলা
নানামত বেশবাস করি,
কেহ যায় শিবিকাতে কেহ কেহ যায় রথে
মধ্য রথে রাধা রাসেশ্বরী।
যশোদা রোহিনী রথে যায় অতি আনন্দতে
সঙ্গে কত দাসদাসীগণ ॥ —ঐ

১৬

আমার নীলরতনে ও যশোদা কোলে নাও কি কারণে,
পালনি পেল্যেছ বটে গো সে ধর্ম আছে মনে।
পুরস্কার পেতে পার পাবে না কৃষ্ণ ধনে। —ঐ

রামায়ণ-বিষয়ক

১

ও রামের মা ও রামের মা, একি রামের দুর্দশা।
বস্ত্র বিনে গাছের বাকল তেল বিনে মাথায় জটা॥
রাম নাকিরে বনে যাবে, মাকে কেন বল না।
মায়ের প্রাণ কি ধৈর্য ধরে, এই রাম বনে যেও না॥ —ঐ

২

রামের বনবাস।

ঐ দেখ সূর্যের কিরণ চেয়ে দেখ না রে, মন।
কত গোপীগণ এসে দ্বারে দ্বারে বসে' জাগলো ভাদু ধন।
রামের মা কৌশল্যা রাণী ধূলায় পড়ে অচেতন।
উঠ, কৌশল্যা, কর, মা, চেতন আসছে তোর ঐ রাম রতন।
ঐ দেখ ভাদু ধন।
রামের হাতে সোনার ছাতি আজ কি রামের অধিবাস।
চৌকাঠাতে লেখা আছে, চৌদ্দ বৎসর বনবাস।
রাম নাকি রে বনে যাবে মাকে কেন বল না।
মায়ের প্রাণ কি ধৈর্য ধরে ও রাম বনে যেয়ো না। —ঐ

৩

সীতার উক্তি

মুনির তপোবনে দেখ আজি আমায় এসে কাঁদাও কেনে,
দুষ্ট বাণী কানে শুনি, পঞ্চবটীর কাননে।
বামেতে আজ সর্প হেরি, দক্ষিণে শিবাগণে।
ঘরের বাহির হলাম কেনে এই ছিল বিধির মনে॥
শুধাইলে কওনা কথা, নীরব হ'লে আজ কেনে॥ —ঐ

৪

লক্ষ্মণের উক্তি

মুখে সরে না বাণী, শুন মাতা জানকী ঠাকুরাণী,
শক্তিশেলে মৃত্যু হল্যে গো জুড়াইত পরাণী।
এ কার্য সাধনে মোদের পাঠালেন, ভুনন্দিনি,
তোর বিসর্জন আমার বর্জন হবে না আমি জানি।
তোমার গহন বনে তপোবনে কে দিবে অনুমানি।
আমি মা বলিয়া ডাকব কারে শুনব কার মধুর বাণী। —ঐ

৫

রামের উক্তি

শুন, সুলোচনা, তোমার দুঃখ সহিতে আর পারি না,
পতি সনে আর আগুনেতে ভস্ম তুমি হবে না।
যুগে যুগে লঙ্কা রাজ্য ভোগ কর বীরাঙ্গনা,
যদি চাও বর দিব রে যা হয় তোমার কামনা।
তোর ঘরেতে সীতা রবে করিস্ না সে ভাবনা।
আছে হেথা ইন্দ্রজিতের মাথা এই যে দেখ না,
লইয়া যাও, দিলাম অভয় পুরাই তোমার কামনা। —ঐ

৬

দয়াল নামটি জেনে, দোলা নিয়ে এলাম অবস্থানে
রাবণের পুত্রবধূ গো, নাম আমার সুলোচনা।
প্রাণপতি হারায়ে সতী, পাব না এ জীবনে,
দয়াল শ্রীরাম হবে না রাম পাব না শ্রীচরণে।
পতির মাথা আছে কোথা রেখেছ সঙ্গোপনে,
আমার সত্য পার হইতে গো হাত আসে মোর উঠানে।
কাটা হাতে লিখে দিল, প্রাণ যায় লক্ষ্মণের বাণে,
পতি যথা যাব তথা গো, ভস্ম হব আগুনে।
এ লঙ্কাতে শঙ্কা সদা, শান্তি আসবে না প্রাণে। —ঐ

৭

রামের মা কৌশল্যা রাণী ধূলায় পড়ে' অচেতন,
উঠ, কৌশল্যা, কর গো চেতন ঐ আসছে তোর রাম রতন। —ঐ

৮

রামের হাতে সোনার জাঁতি আজ কি রামের অধিবাস।
চৌকাঠাতে লেখা আছে চৌদ্দ বৎসর বনবাস॥
রামের মা কৌশল্যা রাণী ধূলায় প'ড়ে অচেতন।
উঠ, কৌশল্যা, কর গো চেতন ঐ আসছে তোর রাম-রতন। —ঐ

৯

পাহাড়ে উঠিলে, রাম রে, জমি জরিপ করিতে,
এত কেন দেরী হল্য অজয়ে বান পড়েছে।
পড়ুক পড়ুক অজয়ে বান, মিঠাই ভেঙ্গে জল খাব,
কাঁদছ কিসের সাধের, ভাদু, কোলে নিয়ে পার হব॥ —ঐ

অনেক সময় সুদীর্ঘ কাহিনীমূলক গীতিও ভাদুগানে শুনিতে পাওয়া যায়।

১০

রামসীতার বিবাহ

ও রাম দয়াল হরি, তুমি ভবনদীর কাণ্ডারী।
ভবসিন্ধু তরব এবার হে, তুমি ত পারের তরী॥
পাপী তাপী উদ্ধারিতে হে, জন্মেছ জটাধারী।
বিশ্বামিত্র মুনির সঙ্গে গো গেলেন মৈথিলাপুরী॥
প্রথমে পরীক্ষা দিল তাড়কাকে বধ করি।
গৌতম মুনির পত্নী হয়ে আছে পাষাণী।
অহল্যাকে উদ্ধার কর, দিয়ে চরণ দুখানি॥
অহল্যাকে মানব করলে হে, বাঁচিয়ে পাষাণ হেরি।
কাষ্ঠের নৌকা স্পর্শ করে গেলেন মৈথিলাপুরী॥
মৈথিলা যাইয়ে রামধন গো হরধনু ভাঙ্গিল।
হরধনু ভঙ্গ করে' অযোধ্যায় লোক পাঠাল॥
মিথিলার লোক এসে দশরথকে বলিল।
তোমার পুত্র শ্রীরামচন্দ্র হরধনু ভাঙ্গিল॥

দশরথ রাজা তখন কৌশল্যাকে বলিল।
তোমার রামধন মিথিলাতে হরধনু ভাঙ্গিল॥
ও রাম, গুণমণি, কেমন করে' ভাঙ্গলি ধনু তাই শুনি।
আমার রামের বিয়ে পাত্রমিত্র ডাক, রাজা, এইবারে।
পাত্রমিত্র ডেকে, রাজা, রথ সাজাতে বলিল।
দুটি পুত্র সঙ্গে নিয়ে রাজা রথে চাপিল॥
দুটি পুত্র নিয়ে রাজা মিথিলার পথে গেল।
জনক রাজা সংবাদ পেয়ে রাজা নিতে আসিল॥
দশরথ রাজা তখন মিথিলাপুরে গেল,
শ্রীরামলক্ষ্মণ দুটি ভায়ে পিতার কাছে দাঁড়াল।
চারটি পুত্র নিয়ে রাজা, রাজসভায় বসিল।
মিথিলার লোক সবে রাজা দেখতে আসিল।
জনক বলে, ও মুনিবর, চারটি পাত্র আইল।
দু'ভায়েরি চারটি কন্যা চারটি পাত্রকে দিব॥
জনক বলে, ও মুনিবর, বিয়ের গল্প কর,
রাজার অনুমতি নিয়ে জনক বিয়ায় বসিল।
সীতার সঙ্গিনী সবে বাসরে নিয়ে গেল॥
সুখের নিশি পোহাইয়ে নিশি ভোর প্রভাত হ'ল,
দশরথ রাজা বলে, বরকন্যা বিদায় কর।
দান দিল, যৌতুক দিল, সঙ্গেতে দাসী দিল
দশরথ রাজা তখন অযোধ্যার পথে এল।
রাস্তার মাঝে ভৃগুরাম ধনুক ধরে দাঁড়াল,
ভৃগুরামকে বধ করিয়ে অযোধ্যাপুরে এল।
অযোধ্যার পুরবাসী দাঁড়াল সারি সারি
যেমনি রামধন গুণের সাগর তেমনি সীতা সুন্দরী।
রাম-সীতা দেখিব বলে এল সব নরনারী,
রামের মা কৌশল্যা রাণী, লক্ষ্মণের মা সুমিত্রা।
ভরতের মা কেকয় রাণী এস গো গেলে কোথা।

আম পল্লব পূর্ণঘট স্বর্ণ থাল হাতে নিয়ে,
উলুধ্বনি দাও ধনীকে ভাগ্যস্তি বলুক লোকে ॥
যেমনি রামধন গুণের সাগর, তেমনি সীতা সুন্দরী।
রাম-সীতাকে ঘরে করে দেখব গো নয়ন ভরি ॥ —ঐ

নিম্নোক্ত বৃত্তান্তটি পূর্ব মৈমনসিংহ হইতে সংগৃহীত চন্দ্রাবতীর রামায়ণেও শুনিতে পাওয়া যায়। মূল সংস্কৃত রামায়ণ কিংবা কৃত্তিবাসী রামায়ণেও ইহা নাই।

১১

তোমরা সব সখী মিলে মাথায় দিলে চিরুণী,
হেই, দিদি, মিনতি করি রাবণ দেখ এখনি।
তোমরা সব সখী মিলে চঞ্চল ঘটাইলে,
কেমন যে সে রাবণ বটে দেখি নাই দু'নয়নে।
কেবল কায়া অভ্র ছায়া দেখেছি সাগর জলে,
কেমন যে সে রাবণ গঠন দেখি নাই দু'নয়নে।
রাম গেলেন মা সিনান করিতে হাতে ঝারি নটবর,
রাবণ মূর্তি আঁক্যে সীতা শুয়ে আছেন তার উপর।
বিন্দু বিন্দু টোপা টোপা ঘাম পড়িছে সীতার মুখে
রাম তুলিছেন হাতে ধর্যে মুখ পুছায়ে কোঁচার টেপে।
ভূমিতলে লেখন দেখে রাম শুধালেন সীতাকে,
পাশরিতে নাল্লে সীতা দশমুণ্ড রাবণকে।
লক্ষ্মণকে ডাকিয়ে বলে এই সীতা দাও বনেতে,
এই সীতা রাখিলে ঘরে বিঘটন ঘটায় পাছে।
কুথায় আছ, ও ভাই লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ গুণমণি,
কুন বনে রাখিবে সীতা বলয়ে, ভাই, তাই শুনি।
উপরে সূর্যের ছটা লাগে বড় পিপাসা,
অরণ্যের ডাল ভাঙ্গ্যে লক্ষ্মণ শিরেতে ধরে ছাতা।
ভাঙ্গিয়ে অরণ্য ডাল, লক্ষ্মণ ধরে শিরেতে,
ইয়ার ছায়াতে সীতা চল ধীরে ধীরেতে।

কি বিপদ আমার ঘটিল মাঝ রাস্তাতে,
আরো পা চার চল সীতা পাতের কুটির দেখাছ্যে।
এইখানেতে থাক, সীতা, এই হে অশোকের বন,
এইখানেতে থাক, সীতা, আমরা করি দেশ গমন।
আন্‌গো ছুরি কপাল বারি, কি লিখেছে ভগবান,
আন্‌গো গরল খায়্যে মরি আপনি ঘুচাব প্রাণ।
সীতা নামের বড় কষ্ট, সীতা নাম কেউ রেখ্যনা,
হায়রে, জনম দুখিনী সীতা পাটে বসতে পাল্য না।
কপালে কলঙ্ক ছিল জলে ধুয়া গেল না,
হায়রে, বিধি, কি লেখ্যেছে মরণ কেন হল্য না।
সীতা গেলে সিনান করতে মুনিকে ঘরে রাখ্যে,
কুশের ছিলা বেনাই মুনি শুয়াইছে অশোক খাটে।
সীতা আলেন সিনান করিয়ে মুনিকে শুধান আস্তে,
কোলে লাও মা সীতালক্ষ্মী তোমারই লব কুশ বটে।
জয়পতাকা লেখ্যা ঘোড়া রাম ছাড়্যেছে কাননে,
মুনির পুত্র দুটি বালক ধর্‌য়্যেছে আপন মনে।
ছাড়্যে দে, ছাড়্যে দে ঘোড়া, ছাড়্যে দে বিনা রণে,
কুন্ দুখিনীর বাচ্চা তুরা মরবি রে রামের বাণে।
ছাড়ব না, ছাড়ব না ঘোড়া ছাড়ব না বিনা রণে,
আসুক কেনে শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধ দেক আমার সনে।
রাজ্যপাশা দাও, মা সীতা, খেলতে যাব তপুবনে,
এই আশীর্বাদ কর, মাগো, আমরা যেন জিনি রণে।
জিনিতে জিনিতে, বাপরে, প্রাণে বধে আস্য না,
হাতের শঙ্খ সীথার সিঁদুর আমার যেন ঘুচে না।
বাঁধ্যে দাও, মা, পঞ্চচূড়া গলায় দাও মা স্বর্ণহার,
পায়ে দাও সোনার নূপুর বাজে যেন চমৎকার।
কি বল্লিরে অবোধ, শিশু, শুনালি দারুণ কথা,
জনম-দুখিনী সীতা স্বর্ণহার পাব কুথা।

বাঁধ্যে দিব পঞ্চচূড়া গলায় দিব ফুলের হার,
পায়ে দিব ফুলের নূপুর বাজবে অতি চমৎকার।
ওরে আমার লবন চাঁদ রে, ওরে আমার কুশান চাঁদ রে,
কোন্ বনে বাপ মার্যো আলি, রামের বুকে দারুণ বাণ।
ভেব না ভেব না, মাগো, রামচন্দ্র কার স্বামী।
মারিলে মরিবে না সে জগতের চিন্তামণি ॥ —ঐ

বিবিধ পৌরাণিক

১২

দৈব প্রবল দৈবই বল মানুষের, বল, কি আছে হাত,
অদৃষ্ট যখন দৈবের অধীন কেন কর, মাতা পরিতাপ।
কাঁদেরে সুভদ্রা পুত্রের শোকে প্রবোধিয়ে কত কুলাঙ্গন,
অভিমন্যু বধ শুনিয়া দুঃখিত সহসেনা পাণ্ডবগণ।
পিতা যাহার পার্থ মহারথী মাতুল শ্রীকৃষ্ণ ভগবান,
সেও মরে রণে অসম্ভব একতা অদ্ভুত এই বিধি বিধান।
কেউ কার নয়, অনিত্য সংসার আসা যাওয়া শুধু সার যে লো,
এ সংসার শুধু খেলার বাজার কেহ নয় পরিবার যে লো ॥
দৈব প্রবল দৈবই বল মানুষের বল কি আছে হাত,
মায়া মোহময় এই সংসারে শুধু আসা যাওয়া সদা এই রীতি।
এসেছে যে কেহ যাবে একদিন তবে কেন দুঃখ তার প্রতি
বীরের কার্য সাধি অভিমন্যু বীর গতি প্রাপ্ত হইয়াছে।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন করিয়া অক্ষয় যশ রাখিয়াছে।
সুভদ্রা জননী ধৈর্য ধর তুমি এতো নয় যে দুঃখের সময়,
বীরজায়া বীর জননীর যে গো এত ব্যাকুলতা উচিত নয়।
পুত্রবধূ উত্তরার মুখ চাহিয়া পরাণে প্রবোধ দাও,
তার গর্ভস্থিত বালকে বাঁচাতে প্রাণপণে সবে যত্ন নাও।
শ্রীকৃষ্ণ ভগিনী অর্জুন গৃহিণী উঠ পরিহর পুত্রশোক,
কৌরব হাসিবে পাণ্ডবদের দায় হবে লাজে দেখাতে মুখ;
নিয়তির খেলা না হয় খণ্ডন বলে যে গো চরাচর
বলে শশাঙ্ক হে মতি ভদ্রে হয়োনা গো এত কাতর। —ঐ

১৩

মা দুর্গা ত্রিনয়নী, দশভুজা এসেছে,
একলাতো আসি নাই, মাগো, শিব সঙ্গে এসেছে।
বলগো, মাতা, মম জামাতা ফণি ধরে শ্রীহাতে
অম্বর কি দিগম্বর বাঘের ছাল গায়ে আছে।
মা দুর্গা গো দাঁড়িয়ে আছে যেন বাঘে পা দিয়ে,
অসুর দাঁড়িয়ে আছে মোষের পেটে পা দিয়ে,
লক্ষ্মী, সরস্বতী আছে, কার্তিক আছে ময়ূরে,
হস্তি মুণ্ড কেটে এনে গণেশেরে দাও জড়িয়ে।
কার বাড়ী গেছিলে, মাগো, কে কয়েছে পুজাগো,
হাতে তোমার রক্ত চন্দন পায়েতে লাল জবা গো ॥
শনির দৃষ্টিতে উড়ে মা দুর্গার হয় মনের দুঃখ,
পঞ্চ দেবতার হুকুম আছে, গণেশের পূজা এগু।
পাতালেতে ছিলে তুমি হয়ে ভদ্রকালী গো,
অসুরের মুণ্ড কেটে করতে রাশি রাশি গো ॥
বাঁ হাতে যার দড়ি ডান হাতে মা টাঙ্গি গো,
আড় নয়নে চেয়ে দেখ পদতলে ভোলা গো।
শিব আছেন গো আমার কাছে শিব আছে মাথার উপর।
এখানেতে রব না, মা, দশমীতে যাব ঘর। —বাঁকুড়া

১৪

শৈব্যার রোদন

ক্ষমা কর, রাজন, তোমার রোহিত হারালাম জন্মের মতন,
কি দিব কর তুমি যে বর গো কর আমায় নিরীক্ষণ।
করে কর দিয়ে যে আমি করেছি তোমায় বরণ,
মোর রোহিতে ফুল তুলিতে গো বাগানে পাঠায় ব্রাহ্মণে,
দেখে দেরি ভেবে মরি, বাগানে করি গমন।
কালবরণ মুখে ফেন গো সর্পে করেছে দংশন,
নয়ন-তারা হলেম হারা জীবনে নাই প্রয়োজন।

বামুন বলে দাও গো ফেলে গো শ্মশানে কর গমন,
দুঃখ জুড়া ধন নাও হে রাজন, এই ছিল ভাগ্যধন।
রোহিত যথা যাব তথা গো মিছে রাজ্য ধন জন।
এই মিনতি, ওগো পতি, চিতায় কর আরোহণ। —ঐ

১৫

শৈব্যার নিকট হরিশ্চন্দ্রের উক্তি

তুমি কার রমণী শশ্মান ঘাটে আসিলে ঘোর রজনী,
মৃত ছেলে কোলে নিয়ে গো কেউ নাই তোমার সঙ্গিনী।
কাশীর ঘাটে সাহস বটে এসেছ একাকিনী,
এমনি ছেলে রোহিত বলে গো ছিল আমার পরাণী।
ছেলে সহ বিক্রি করি, কাশীতে শৈব্যারাণী।
বিশ্বামিত্র ঋণের দায়ে গো এ বিপদ ডেকে আনি।
(ওদের) আমার তরে আঁখি ঝুরে ব্রাহ্মণ ঘরে রন্ধনী,
এ ঘাটে আসে যে সব হয়েছি আমি দানী।
শবদাহ করিবে পরে কর দাও আমায়, দুঃখিনী,
দাও আগে কর আমি নোকর কগো কালু হাড়ির এই বাণী।
শূকর রাখাল আমি চণ্ডাল শুন দুঃখের কাহিনী॥ —ঐ

১৬

ধর্মের উক্তি। সত্যবানের পুনর্জীবন

বলি ও মা সতি, বালিকা বয়সে তোর ধর্মে মতি,
রাজকুমারী বনচারী রে তোর দুঃখে যে ফাটিছে ছাতি।
বেলা গেল সন্ধ্যা হল গৃহেতে কর গতি।
রাজ্য পাবে, চক্ষু হবে রে, তোর শ্বশুর গুণবতী।
ও সাবিত্রী নয় অন্যথা শুন আমার ভারতী।
পতি সনে এসে বনে রে চতুর্দশী আজ রাতি,
এই উপবাস করবে সবে, জগতে নারী জাতি॥
দিলাম বর তোমার পিতার হবে সন্তান সন্ততি।
নাম সত্যবান শত সন্তান, দিলাম দেখে ভকতি॥

জিনলে শমন অজয় চরণ রে অন্তে পাবে শ্রীপতি,
তোমার কথা রইল গাথা জগতে রইল সৃষ্টি। —ঐ

১৭

ধর্মের প্রতি সাবিত্রীর কথা।

ফিরে যাও গো শমন, কোল হইতে লিবে না আর সত্যবান।
তুমি ধর্ম ভেবে কর্ম গো কর সত্ত অনুক্ষণ।
যথা ধর্ম তথা জয়, তার শুনেছি বেদের বচন,
মিছে মায়া এই ত কায়া গো পঞ্চভূতে হয় মগন।
যেমন স্রোতের কাষ্টে সংযোগ, বিয়োগ, আসে আর করে গমন,
এ সংসার মায়াডোরে গো সকলে আছে বন্ধন,
সুত, দারা, স্বামী, দেখ, সকলি নিশার স্বপন,
এই নাও পতি, এই মিনতি গো তব পায় নিলাম শরণ।
স্বামী যথা, যাব তথা, এই আশা কর পূরণ।
এ সংসারে পুনঃ ফিরে গো আসিতে না হয় রাজন্,
সঙ্গে করে' নাও আমারে দুঃখিনীর এই নিবেদন। —ঐ

১৮

সত্যবানের সাবিত্রীর সহিত বনে গমন ও মৃত্যু।

আমার নিকট শমন তোমার কোলে শুই প্রিয়ে জন্মের মতন,
ও সাবিত্রী মাথা ব্যথা গো শিরের পীড়ায় যায় জীবন।
না শুনিলে আমার কথা, কেন সঙ্গে এলে বন,
চিরতরে ছেড়ে তোমায় গো অজানা দেশে গমন।
তোমায় ফুলের মালায় বন্দী ক'রে রেখে যাই বিজন কানন,
রাজকুমারী মুই ভিখারী গো আমায় করিলে বরণ।
বিবাহ করিয়া আমায়, দুঃখে দিন কর যাপন,
অন্ধকের নাড়ী আমি গো এই ছিল ভাগ্যে লিখন।
পিতামাতার আর কে আহার জোগাবে বল এখন।
ধর্মে মতি রাখ, সতি গো, ফিরে যাও মোর নিকেতন,
পিতামাতার সেবাতে ভার দিয়ে যাই আমার ভুবন। —ঐ

১৯

শুন, ভাদুমণি, কীর্তন শুন্‌তে আসিল সঙ্গিনী,
শুন শুন, গো ভাদুমাতা, গো শুনগো সঙ্গিনী।
শ্যামসুন্দরের কত শোভা দেখিলেন ভাদুমণি,
ভাদ্র মাসের পুর্ণিমাতে কীর্তন শুনিলেন হরি,
বংশীধারী মদনমোহন, বামে লয়ে কিশোরী
ননীগোপাল কীর্তন করেন, শুনিলেন বনমালী॥
লোকে সবে শুনে শুনে দেয় বলি করতালি।
পুরুষ যুবা বৃদ্ধ নারীর গো কপালে চন্দন ফোঁটা,
গলে পরে ফুলের মালা দেখিতে কত শোভা।
শত শত লোক এসে গো কীর্তন শুনিতে বসিল,
শীতল ও আরতি হয়ে বৃন্দাবন ক্ষেত্র হলো।
এই কীর্তনটি কে করিল গো ননীগোপাল সুন্দর।
শ্যামসুন্দরের কৃপাতে এই কাজটি হইল।
চাঁচর খেলা, দোল খেলা, রাসলীলা হইল।
ভাদ্র মাসের পূর্ণিমাতে আরেক খেলা বাড়িল,
সভাপতি বসে' পড়ে গো ভাগবত গীতা করিল।
ফল ও মিষ্টান্ন লইয়া ননীগোপাল আসিল।
শীতল আরতি পরে প্রসাদ দিতে লাগিল,
প্রণাম করে প্রসাদ লয়ে সবে মিলে ঘর গেল। —ঐ

২০

কল্যাণেশ্বরীর শঙ্খ পরা

বান্‌লা দহে চান করিছেন, করেছেন দেবরাণী,
মাথাতে পসরা নিয়ে দাঁড়ায়ে আছে শাঁখারি।
ও শাঁখারী, শঙ্খ আন, ঐ শঙ্খ পরব আমি,
যা পাঁচজনে বল্‌বেক মূল্য তাই মূল্য দিব আমি।
তোমার মত কত নারী, আছে কত জন গো,
হাতে পদ্ম পায়ে পদ্ম দেখি নাই, মা, কারো গো।

আমার মত কত নারী আছে কত ঠাঁয়ে গো,
কুরূপা সুরূপা নারী আছে কত জনগো।
শঙ্খত পরিলি, কন্যা, মূল্য নিব কার কাছে,
অভয় আমার পিতা বটে মূল্য লাওগা তার কাছে।
ও ভাই অভয়, ও ভাই অভয়, মূল্য দাও, ভাই, আমারে,
তোমার কন্যা শঙ্খ পরলেক বানলা দহের ঘাটেতে।
আমার কন্যা নাই হে, ব্রাহ্মণ, কারে শঙ্খ পরালে,
দেখাই যদি দিতে পার মূল্য দিব তোমারে।
অভয়েতে ব্রাহ্মণেতে চলেন গো ধায়াধায়ি,
বানলা দহের ঘাটে যায়ে হরমনমোহিনী গো,
মূল্য দিবার ভয়ে, মাগো, লুকাইলি কোন্‌খানে।
দহের মাঝে হস্ত তুলে শঙ্খ দুটি দেখাল।
অভয় বলে, ও ভাই ব্রাহ্মণ, মূল্য লাও আমার কাছে।
ব্রাহ্মণ বলে, ও ভাই অভয়, মূল্য নাহি লিব,
বছর বছর মাকে আমি শঙ্খ দুটি পরাব॥ —ঐ

২১

কেনে নিতাই হলি, শচীমাতায় জন্ম নিয়ে, বিষ্ণুপ্রিয়ায় কাঁদালি
অগো শচীমাতা গো, তোমার নিমাই যায় চল্যে,
পুরুল্যারি শান্তিপুরে দু ভাইএ বইস্যে আছে।
(কেন নিতাই হলি)।
অগো লাপিতানী গো, দেগো আমার চুল কেটে,
কোন্ রমণী ছিলা, বাবা, কেবা তুদের মা বটে।
অগো শচীমাতাগো তোমার নিমাই যায় চল্যে,
কাল ঘুমে ঘুমাইছি—বিদায় দিতে হয় পাছে।
অগো শচীমাতা গো, তোমার নিমাই যায় চল্যে,
নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হয়েছে।
(কেনে নিতাই হলি)। —ঐ

২২

বৃন্দাবনে মধুর লীলা ত্রবিল যায় বনলীলা
লুপ্ত হয়ে গেল যখন জীবের স্মৃতি হ'তে
কে আনলো তায় গোলোক তেজে ভেবেছ কি কভু
সে যে আমার শ্রী অদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু।
হয়ে স্বয়ং রমণ রাধা বলে করে রোদন
রাধা ভাবা আর দ্যুতি সুবলিতা দেহা
কৃষ্ণ বন্যা তৃষা কৃষ্ণা সবার দেহাং তেহাং
এক আধারে যুগল রূপটি দেখতে চাও কি কভু
সে যে আমার ভাবে ভোলা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু।
আর কত দিন ভবের খেলা ফুরিয়ে এল বেলা
সামনে যে তোর অকুল সিন্ধু তুফান ভারি তায়,
হেলায় সেথায় মত্ত রইলি সময় বয়ে যায়
এই তুফানের কাণ্ডারী কে ভেবেছ কি কভু,
সে যে আমার কৃপা অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু॥ —ঐ

২৩

পাতালেতে ছিলে, মাগো, হয়্যে, মাগো, ভদ্র কালী গো,
অসুরের মুণ্ডু কেটে কর রাশি রাশি গো।
পাতালেতে তো ছিলে, মাগো, হয়্যে ভদ্রা কালী গো,
শিব আছে মা আমার সঙ্গে শিব আছে তার উপর।
ই'খেতে তো রব না দশমীতে যাব ঘর,
আশ্বিনেতে দিয়েছে, মা, প্রিতিমা গড়িয়া রাম
সপ্তমীতে বারি এনে পূজা করে রাধাশ্যাম।
সম্বৎসরে গত হ'ল, পিতা, মনে হ'ল,
শীঘ্র শীঘ্র বলুন পিতামাতা আছেন ভাল।
রথ সিংহাসন এনে গো পিতা বসতে দিল,
উপহার মিষ্টান্ন এনে পিতা হে ভোজন কর!
আমপল্লব সারি সারি ঘট পেতেছে ঘরেতে,
উলুধ্বনি দাও, ধনি লো, ভাগ্যন্তী বলুক লোকে।

সিঁদুর গুলগুল ধুনা বসাইব স্থানে স্থান,
আরতি দিবার সময় আল্যেন প্রভু রাধাশ্যাম।
কানন মাঝে দুর্গাপূজা সীতা উদ্ধার করিতে,
রাম করিবেন দুর্গাপূজা এক শত নীল পদ্মতে।
এক লম্প দুই লম্প তিন লম্প হইল,
চার লম্পর বেলায় হনু দেবী দহেতে গেল।
আয়রে হনু, যারে হনু, দেবীদহের নিকটে,
রাম করিবেন দুর্গাপূজা এক শত নীলপদ্মতে।
একশত নীলপদ্ম তুললেক হনু ডাঙ্গালে,
তুমারি মন ছল্‌বার জন্য গউরা লুকাঁই রেখ্যেছে।
একশত নীলপদ্ম হরিলি, মা, তারিকা।
সংকল্প করেছি পূর্ণ চক্ষু দিব এখুনি॥
কাঁদিতে কাঁদিতে রাম চক্ষু গেলেন উপড়াতে,
হেনকালে কাত্যায়নী ধরিলেন রামের হাতে। —ঐ

২৪

এ্যাবার আমার আল্যে আর উমা পাঠাব না,
ভবের সনে ঝগড়া ক'রে জামাই ব'লে মান্‌ব না।
মিছা ঝঞ্ঝু কর, মাগো, ঝঞ্ঝু করা অকারণ,
আসবে না তোর পাগল জামাই শুনবে না কারো বারণ।
শ্মশানে মশানে শিবগো গাঁজা ঘটায় সিদ্ধি খায়,
গলে পরে হাড়ের মালা ডম্বুরা বাঁজাই বেড়ায়॥ —ঐ

২৫

আশ্বিনের নবমী দিনে নববস্ত্র সবাই কিনে,
ভাদুর জন্যে এনে দিব ঢাকাই রঙের শাড়ী ভালো।
কার্তিক মাসে কাত্যায়িনী এলেন গো করাল-বদনী,
ভাই ফোঁটারই কলা ভালো ভাদুকে লিব বলেছি।
অগ্রহায়ণেতে অন্নপূর্ণা সর্বলক্ষ্মী অবতীর্ণ,
সুখ লাগে না ভাদু বিনা ক্ষেতের ধান তো ক্ষেতে রইল।

পৌষের দারুণ শীতে শীত ভাঙ্গে সালবোনাতে,
মকরে গঙ্গা সিনাতে, ভাদু যাব বলেছিল।
মাঘেতে সরস্বতী পুজা হাঁড়িতে সিজান সিজা,
তিলাড়ু করকরে ভাজা ভাদুর জন্মে সাজা রইল।
ফাল্গুনেতে দোলের দিনে দোল খেলিব ভাদুর সনে,
মাখাবো চন্দ্র বদনে আবিরেতে করবো লাল।
চৈত্র মাসে রামনবমী
বৈশাখে গ্রীষ্ম কালে ভাদুর গরমে গা গলে
দু'তালারও বারান্দার জলে।
মাখাব গোলাপ জল। —ঐ

২৬

সমবৎসর গত হল্য, কৈগো আমার ভাদু এল্য,
দুর্গাপূজা হয় আশ্বিনে, নববস্ত্র সবাই কিনে,
ভাদুকে কে কিনে দিবে ঢাকাই রং এর শাড়ী ভাল।
কার্তিকেতে কাত্যায়নী এলেন মা করালবদনী,
ভাদুকে কে আন্‌তে যাবে, ভাইফোঁটা কে দিবে বল।
অগ্রাণেতে অন্নপূর্ণা গোটাই অন্ন অবতীর্ণ,
ভাদুর জন্য ভেবে ভেবে মাঠের ধান সব মাঠে রহিল।
পৌষেতে পরম শীতে, শীত ভাঙ্গে না শাল বোনাতে,
মকরে গঙ্গা সিন্যাতে ভাদু যাব বল্যেছিল,
মাঘে সরস্বতী পুজা হাঁড়িতে সিজান সিজা,
তিললাড়ু কড় কড়া ভাজা ভাদুর জন্য রহিল সাজা।
ফাগুনেতে দোলের দিনে দোল খেলিবে ভাদুর সনে
মাখাব চন্দ্রবদনে, আবীর দিয়ে‍্য লাল করিব।
চৈতেতে চাতকী পাখী, দেখিলে জুড়ায় পাতকী,
শুশুনিয়া ধারা সিনাতে ভাদু যাব বলেছিল। —ঐ

এখানে শুশুনিয়া পাহাড়ের ঝর্নায় স্নান করিবার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

সমসাময়িক

১

জাপানে জার্মানে লড়াই লেগেছে,
কুন্টিতে বরাকরে পল্টন নেবেছে।
তোমরা বল আমরা শুনি, ফেরি দিব চার আনি,
পুলিশ দারোগাকে আমরা ডরাই না
পাকি সড়কে চল্যে যাব, কেউ ঘুরাস না। —বাঁকুড়া

২

ওগো ভাতুরাণী, উপায় কি শুনি পণের দায়ে যে সব অধীন,
গরীব ও মধ্যবিত্ত মেয়ের পিতার চক্ষে বয় যে নীর।
পণপ্রথার হাঁক ডাক, মাগো, মেয়ের পিতার কাঁদিছে প্রাণ,
গেছে নিদ্রাহার চিন্তাই সার পাইবে সে কিসে পরিত্রাণ।
যতদিন যায় ভারতবাসী যে অভাবগ্রস্ত হয়েছে গো,
পণপ্রথার এই পরিণাম মানবতা সবে হারিয়েছে।
অর্থের মোহে দেশ ও জাতির কল্যাণ নাহি দেখিতেছে।
মেয়ের পিতার কাকুতি মিনতি শুনিবারে যেনো কেহরে নাই,
অর্থ নেশায় সকলে বিভোর মতামত পণ লওয়াতো চাই।
ভিটে মাটি যাক্, অনাহারে থাক্, দিতে হবে যে অবশ্য পণ,
মেয়ের বিয়েতে দিতেই হইলে প্রাণ রবে যে গো যতক্ষণ।
মেয়ের বিয়েতে মেয়ের পিতায়ে সর্বস্বান্ত হতেছে গো,
কোথাও বা শুনি মেয়ের কারণে পিতা নিজ প্রাণ ত্যজেছে গো।
পিতা ও মাতার দুঃখ ঘুচাইতে মেয়ে আত্মহত্যা করিয়াছে।
সমাজের মাঝে প্রাণ রাখিবারে পিতা বৃদ্ধে কন্যা প্রদানিছে।
গ্রামে গ্রামে দেখ অরক্ষণীয়া কন্যাতে দেশ ছেয়েছে গো,
পণপ্রথার হাঁক ডাক তবু দ্বিগুণ ত্রিগুণ বাড়িছে গো,
পিতা ও মাতার দায়েতে গো বলে কাকুতি মিনতি প্রার্থনা,
কিন্তু কন্যাদায় মহাদায় আজ কেহ কোন কিন্তু সুধাবেন।
কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের দশা দেখিয়া শশাঙ্ক ম্রিয়মাণ,
হে মাতঃ, করগো এই দুর্দিনে কন্যাদায়গ্রস্ত পরিত্রাণ। —ঐ

৩

পুলিশ দারোগাকে আমরা ডরাই না,
পাকি সড়কে চলে' যাব কেউ ঘুরাইস না।
গ্রামের কুলি কাদায় কত বৌ ঝি ডুবেছে,
সরকারি বাকিতে ওগো সড়প দিতে লারেছে।
বাড়ীর নামই নীল বুনেছি নীলের খুঁটি ধরে না,
ঘরে আছে দেবর নীল পেড়্যা বই পরে না।
দেয়ালে বাড়িতে ঝিঙ্গা, ঝিঙ্গা, তুই ধরিস্ না,
আমার ভাদু ছোট মেয়ে ঝিঙ্গা রাঁধিতে জানে না।
হলুদ বনের, ভাদু, তুমি হলুদ কেন মাখো না,
শাশুড়ী ননদে বলে হলুদ মাখা সাজে না।
রাম ছাড়ছেন যজ্ঞের ঘোড়া তপোবনের কাননে,
লবকুশে ধরেছে ঘোড়া সীতা বলেন দাও ছেড়ে।
ছাড়ব না ছাড়ব না ঘোড়া ছাড়ব না বিনা রণে।
রাম কত যে যুদ্ধপতি যুদ্ধ দেক আমার সনে। —ঐ

৪

যদি বাঁচবি, শ্যামা, সব ছেড়েছি খাদির পিরাণে পাজামা,
পাবি কত ঠিকাদারি লো রিলিফেরি হুকুমনামা।
না হয় পে মাষ্টার হবি শ্যাম থেকে শ্যামা। —ঐ

৫

ভাদু, বলি তোরে, এম্.বি. ডাক্তার এসেছে এবারে,
ধুরে ধুরে রোগী আসে গো আসে গরুর গাড়ীতে।
কামিখ্যা পরীক্ষা করে, বদরী ওষুধ দিছে,
পেটে বাজা, মাথা ধরা গো, ট্যাবলেট দিলে হয় ভালো।
টাইফার রুগী দেখলে পরে মেক্চারে করে ভালো,
কাটা ছিটা ডেলিভারী কামিখ্যা নাম উঠেছে।
যত রুগী আস্তে পরে কামিখ্যাকে দেখাইছে।
(ভাদু, বলি তোরে) —ঐ

৬

আহা মরি মরি আমরা নূতন কুঞ্জেরি শোভা হেরি,
দোলের দিনে কুঞ্জবনে এলেন সুহৃদ্ চৌধুরী।
রাধামাধবে দর্শন ক'রে আনন্দ কত তাঁহারি,
কুঞ্জ তৈয়ারী ক'রে দিব ভাব জাগিল তাঁহারি,
নিজেও যুগল হয়ে করবো ভজন এই মনে করি।
যত নারীর দল হয়ে গো নিল সভাপতিতে বরণ করি।
কুঞ্জ তৈয়ারী করে' দাও, বাছা, নাম হবে তোমারি।
টিমুবাবু হলেন ঠিকাদার তার নাইগো রাতে ঘুম,
কুঞ্জ তৈয়ারী ক'রে টিমু এবার গো নিশ্চিন্ত হলো।
চন্দ্র সূর্য রেখে পরে জোনাকি পোকা বাতি দিল।
সুহৃদবাবু কুশলে থাকুন তার ষ্টাপ গো সকলে,
তিলুড়ীর মঙ্গল হলো আশে পাশের লোক বলে।
সুখে এবার কীর্তন করুক রাধামাধবের ভক্তদলে,
পদঠাকুর সায় করেছেন রাধারাণীর চরণ তলে।
আসছে বছর লিখবো এবার যদি কিছু আছে বাকী,
এসো, ভাদু, সবাই মিলে আমরা যুগলরূপ দেখি,
মিস্ত্রী দুজন মনের মতন বেশ করেছে কারখানা,
ফুলে ফুলে শোভা ঝরে রাধামাধবের আঙ্গিনা। —তিলুড়ী, বাঁকুড়া

৭

নববর্ষের উৎসব হ'ল কত কাঙ্গালী ভোজনে,
সকলের মন তৃপ্ত হ'ল নিরঞ্জন গোঁসাইর কীর্তনে।
বাহবা দিবার হয়না সময় সবাই শুনে একমনে,
তার জন্য গো, গোঁসাই ঠাকুর, আপনার আক্ষেপ ক্যানে।
আপনার কীর্তন শুনে গোঁসাই কিবা দিব পুরস্কার,
কীর্তন শুনে কৃতার্থ হয়ে কেবল করি নমস্কার।
আর গোঁসাই এসেছিলেন কাছারিতে হরিবোলে,
মধুর কীর্তন গায়ন শোনা মেয়েছেলেদের গোলমালে।

দেখলাম রাধামাধবের কুঞ্জ হচ্ছে তৈয়ারী,
ইহাতে আনন্দ কেবল অষ্ট সখীদেরই।
ললিতা, বিশাখা, আদি চিত্র চম্পক লতা,
সকল স্থলে শুনতে পাই রাধামাধবের কথা।
কুঞ্জ তৈয়ারী হচ্ছে ভাদু ইঁট পাথর সিমেণ্টে,
এই কুঞ্জ তৈয়ারীতে, কি গো, ভক্তগণের আশা মিটে।
যারা ভক্ত অনুরক্ত তারা রেখেছে হৃদয়-মন্দিরে,
তারা যুগলরূপ আলিঙ্গনে পেয়ে বসে আছে ধ্যান করে।
শ্রাবণের ধারা বেশ পড়ে নাই এবৎসরে,
তার বদলে সেনিটারী ইন্‌জেকসান দিয়ে করে।
বলিহারী সেনিটারী সত্য-সুশীল দুজনা,
তিলুড়ীর ভালর জন্য রোজ করে আনাগোনা।
ভাঙ্গ কেটে করাই জমি গো ফসল হবে অঙ্কে করে,
বড়লোক হইব আশা বাঁধবো মরাই দুয়ারে।
প্রতি বৎসর অনাবৃষ্টি মাঠে শস্য যায় মরে,
এমন মতে বলগো, ভাদু, কেমনে চাষীরা বাস করে।
টাকাতে দুসের ক'রে চাল সংসারে হে আঁটে না,
বাবুরা সব কাবু হলেন, টাকা আর কুলায় না। —ঐ

৮

ভাদু, বলি তোরে,
কানাই গরাই প্রেসিডেণ্ট এই বৎসরে,
আই, এসি, বি-এসি, এম-এসি, গেল, ম্যাট্রিক কত ঘরে ঘরে,
কানাই গরাই হলেন প্রেসিডেণ্ট কেবল গো বুদ্ধির জোরে।
পুলিশ জোড়া, পাল্কি চড়া, সে সাধ তার গো মিটেছে,
অন্য সকল বোর্ডের মেম্বার, কানাই গরাই উচ্চপদ পেয়েছে।
রামেন্দুবাবু শক্তিপদ আরও কত লোক আছে,
কত গরীব দুখী হয়গো সুখী তাদিকে অন্ন দিছে।

৯

চল চল শ্রীহরি—কোর না দেরি,
তুষ্ট ভাবে ভুলবে না রাই, বরং রুষ্ট হবেন কিশোরী।
এস, ভাদু, শীঘ্র করে, ইস্কুলে ভর্তি করি,
লেখাপড়া শিখতে হবে চলবে না বাক্‌চাতুরী।
বালিকা যুবতী সবাই পড়ে, পড়তে কারো নেই মানা।
চাকরী করে খেতে হবে মেয়েরা থাকবে না পরাধীনা।
পরের ঘরে গেলে পরেও সহজে ভাত মিলে না,
বিয়ের আগে চুক্তি করে কত দিবে গহনা,
ভাদু পুজবার আমরা পেলাম কতই দেখ মিনারী,
আই এ-সি, বি-এসি, ম্যাট্রিক সবাই করে মাষ্টারী।
মাষ্টারদের সব নাম ধরিয়ে আমরা বর্ণনা করি,
এখন কালের হাওয়া যুবক বৃদ্ধ করবে সবে চাকুরী।
সতীশবাবু, ইন্দ্রনারায়ণ, রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী,
হরিনারাণ, দ্বিজপদ আর উদয়পুরের কিশোরী।
চিত্তরঞ্জন, সত্যরঞ্জন, অমলেন্দু চৌধুরী,
এরা সবে চাষবাস ছেড়ে মাষ্টারীতে দিল মতি।
মহাদেব আর রবি রায় কাশীহিড়ের পুলিন,
সবাই ঘরে ভাত খেয়ে গো সুখেতে কাটাবে দিন॥ —ঐ

১০

পনেরই আগষ্ট স্বাধীন ভারত জয় জয় বন্দেমাতরম্।
জয় জয় সব নেতাজী তোমাদের কাজে তারোত্তম।
ভোর পাঁচটায় প্রভাতফেরী আটটায় পতাকা উত্তোলন।
আনন্দিত হয়ে যত নরনারী বার করেছিল প্রসেশন।
প্রথমে কাছারি বামাজোড়া সারি বাঁধা বোলতলায় শ্রীহরি,
ময়রা পাড়ায় গণেশ জননী সকলে নমস্কার করি।
এতদূর কি আছেন ভগবান তিন ঘরে তিন মূর্তি ধরি,
বামভাগে রেখে এসো, প্রণাম করিয়ে চল-গো যত নরনারী।

সামনে রয়েছেন গ্রামদেবতা আর বা কারে ভয় করি,
যথার রাস্তায় শ্রীরঘুনাথ যাই গ্রামের বলিহারী।
মহেশ রায়ের শিবদুর্গা সকলেই নমস্কার করি,
বোর্ডিংএতে লেকচার দিলেক শ্রীশ্যামাপদ চৌধুরী। —ঐ

১১

ভাদু, হল্যো কি দেশে, সোলজাররা দেশ চাপ্যেছে,
ঘরের মানুষ উঠাই দিয়ে সোলজাররা ঘরে বসে।
এরুপালেন, বোমা কামান, ছাড়িয়ে ঘনে ঘনে,
সাঁতারবাবু ভেয়েরা উঠে গো জনে জনে।
বাঁকুড়া কোলকাতা আবার গো আসানসোল বন্ধ হছে,
বাঁকুড়ার খেতু গরাই গো, মটর বন্ধ করেছে।
ভুতাগেড়ার জলের বারণ জলকে যায় না তাই লোকে,
সভাপতি কাছে দাঁড়ায় সবকে বারণ করেছে,
ভাদু, হল্যো কি দেশে, সোলজারে দেশ চাপ্যেছে। —ঐ

১২

১৩৪৭ সালে ধান না হওয়ায় আকাল দেখ এইবারে,
আষাঢ় মাসে জল হইয়ে গো শাবণে ধরন ধরে।
ভাদর মাসের জল দেখে ধান হবার আশ করে (১৩৪৭ সালে)।
যাদের ছিল জলের আশ্রয় গো সেনি ধর্য়ো জল তুলে।
যার ছিল না জলের আশ্রয় ধান দেখে নয়ন ঝরে (১৩৪৭ সালে),
কাস্তে হাতে ক্ষেতের আড়েৎ গো চাষারা ইনকাম করে,
বার মাপ ধানের জায়গায় বার মণ হত্যে পারে।
যাদের ধানে যায় না গাড়ী গো, ধান আনে মাথায় কর্য়ো,
বাদের ধান হয় না মাড়তে গো আন্যে দেয় গরুর মুখে।
(১৩৪৭ সালে)
মুলুক খেপে ধান হল্যো নাই গো সংসার চলে কী কর্য়ো,
বার সের ধানের দর গো পাঁচ সের চাল বলে (১৩৪৭ সালে)।
বেপারীরা বেপার করে মাথার চুল যায় উড়ে,
চরণ দুটি কলাগাছ হয়, দু'আনা পয়সার তরে।

কোলের ছিলা ঘরে রাখ্যে সাঁতার হাটে দিন কাটে,
সন্ধ্যা হল্যে ঘরকে আসে, মা বল্যে ছিলারা কাঁদে।
১৩৪৭ সালে ধান না হওয়ায় আকাল হলো দেখ এইবারে।
'সি' ফরম ও দিতে হবেক তার জন্য সব বুঝেছি,
বারে বারে ফরম কাগজ গো, চিষ্টি ডোম ঢোল দিছে।
যাদের বেশি জমি জায়গা ভাবে গো দিনে রাত্যে,
পঁচিশ একর রাখ্যে পরে গো কাড়্যে লিবেক কংগ্রেসে।
রাইয়তরা সব ভাবছে বস্তে আইন কড়া হয়্যেছে,
আইন কড়া পড়েছি ধরা কি হবেক আবার শেষে।
আটুইষ্টিশান (attestation) খুলা খাতা তিনধারা যে হঁয়্যেছে,
সাতধারা যে হবেক বলে বাঁকুড়াকে সব যেছে।
বন জঙ্গল পোখর, গোড়্যা গো রইবে না বাজার খাসে।
দেবোত্তর আর ব্রহ্মোত্তর গো আইনে বিচার হছ্যে।
ভাদু, হল্যো কি দেশে,
ভাদু আমার যাদুমণি গো সমবছর পর আসে,
সমবছরের দুখের কথা, দেবু বলে, বলবো, ভাদু, তোর কাছে। —ঐ

১২

দেখনা চেয়ে যেছে বয়ে সোনার পৃথিবী,
আড়াই পাই চাল কিনে খাওয়া বড় কারদানী।
সে বছরের বড় আকাল অঘ্রাণ মাসে হয়েছ্যে,
ভাদর মাসে ধান লাল হয়ে দেশময় আকাল বটে,
আলস বালস শিশু ছিলা সকলে সব ভাবিছে,
ধান হইলে সকল হোত ধানের সঙ্গে সব যেছে।
অঘ্রাণ মাসে ধানের দর সাত সের ধান ৫ পাই, ওগো, কত চাল বলে,
মাঘ ফাগুনে সুখের দিনে কত দুখে দিন কাটে।
চৈত বৈশাখে ডাগর বেলা টাকাতে দুসের চাল,
জ্যৈষ্ঠ মাসে আবার জ্বালা 'ইন্‌কুয়ারী' আল্য গাঁয়ে।
গাঁয়ে আল্য 'ইন্‌কুয়ারী' আগে চাষা পাড়াতে,

চাষা পাড়ায় 'ইন্‌কুয়ারী' সব লোকে দাঁড়াই দেখে,
জলের কলসী ভাতের হাঁড়ি চাষা পাড়ায় দেখ্যেছে।
আড়াচে পাড়ানে দেখে মাটির তল গোবর খুঁড়ে,
চাষা পাড়ায় সিদ্ধ হল্য, আল্য বামুন পাড়াকে।
বাঁউন বৈশ্ব ঘর সিমায় না, উঠানে দাঁড়াই থাকে,
মালিকদিকে শুধাই দেখ, কার ক মণ ধান চাল আছে।
ক'মণ বলিবে বল, লেখয়া দাঁড়াই আছে,
'ইন্‌কুয়ারী' সিদ্ধ হল্য, মানুষ গুণে ঘরে ঘরে।
বাগাল মাইদার, মুনিষ কামিন সকলের ল্যাখে খরচ—
সকলে সব লিখে লিল্যেক গো দড় বাড়িল চমৎকার।
আড়াই পাই চাল, সাত পাই ও ধান শুনে লো সব মাথায় হাত,
আষাঢ় শ্রাবণ রুয়ে পুতে, ছোটো লোকরা খাটো খায়,
ময়দা বেসন বুটের ছাতু, ইসব খেয়্যে দিন কাটায়।
শ্রাবণ গেল ভাদর হল্যো, হল্যো লোকের সর্বনাশ,
সাঁও জনারের দিন লাগল আচম্বিতা রোগ এল্য।
ভাদর যেয়ে আশ্বিন আল্য হবে গো উমার পূজা,
আনন্দময়ীরও পুজা যা করবেন মা দুর্গা,
আশ্বিন যেয়ে কার্তিক হল্য হবেক গো শ্যামার পুজা,
দুখ যেঁয়্যে সুখ হবেক বুঝি নতুন ধান্য হল্যো,
সে বছরের বড় আকাল বাঁচি যদি জীবনে,
সমবছরের গত হল্যে, দেবু বলে, বলবো, ভাদুর জাগরণে॥ —ঐ

১৩

ভাদু, হল্যো কি দেশে, একি আইন করেছে গো কংগ্রেসে,
রাজাকে সব খাজনা দিত গো, দিত গো রঁয়ে বসে,
কংগ্রেস রাজার আইন কড়া এক সঙ্গে দিতে হচ্যে।
সকল প্রজা কেড়ে লিলেক গো লিলেক রাজা কংগ্রেসে,
রাজাকে বলে টাকা দিব গো রাজা থাকে সেই আশে,
তিন চার সনের টাকা দিবে গো আর দিব না কিছুতে। —ঐ

ভাদুর বিজয়া

১

ভোরের তারকা উদিত দেখিয়া দুরু দুরু কাঁপে হিয়া যে লো,
ভাদুরে বিদায় দিতে হবে ভাবি পরাণ কাঁদিয়া উঠে যে লো।
সমবৎসর ধরে কত আশা নিয়ে পথ পানে চেয়ে বসে ছিলাম,
নিত্য নতুন মনের মধ্যে কত শত মালা গেঁথেছিলাম। —ঐ

২

বল্, ভাদুধন, বল্ ভাদুধন, কোন্ দেশে যাবি ?
কোন দেশেতে গেলে তুমি প্রাণে শান্তি পাবি ?

—বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

৩

ভাদর মাসে ভাদুপুজা (আমরা) করি সকলে।
এবার ভাদু চলে গেলে আঁমরা মরব গো প্রাণে ;
ভাদুধনকে নিতে এল মহুল বনের চিনিবাস ;
ভাদুধনকে বিদায় দিয়ে আমরা নিব বনবাস ॥

৪

ওগো ভাদুমণি, চলে' যাবে প্রভাত হ'লে রজনী।
জন্মদিনকে প্রণাম করে যাত্রা কর কো তুমি।
নারায়ণের কাছে যাব বলিয়া দিচ্ছি আমি।
সতীশ সেনেদের ভবনেতে আছেন দামুদর চাঁদ,
তিনি আশীর্বাদ করলে পরে পুরে যাবে মনস্কাম (ও ভাদুমণি)।
পার হয়ে আসিবে, ভাদু, শশাঙ্কের বৈঠকখানা,
ডানহাতে জাগাতি বাবুর বাড়ী দেখেন গো দলিলখানা।
রামপদ'র দোকানে, ভাদু, নিবেগো পান সুপারী,
সামনের দিকে চেয়ে দেখ ডাক্তারের ডিস্পেনসারী।
রাজার সায়েরের ছোট মাছ গো, কেমনে বিদায় দিব,
কল বসিয়ে জল মেরেছে বড় মাছ কোথায় পাব।
দশের মেলা করে' আলো ছেলেরা বসে বেটজ ঘরে,
আর কত শোভা হ'ল বজ্র নিবাসের তরে।
পূর্বদিকে উমাশঙ্কর পশ্চিমে আছে থালি,

ফুলের বাগান হতো ভালো থাকলেগে নূতন মালী,
রামময় বাবু ম্যানেজার সে যদি করিত মন,
ছোকরাদের সঙ্গে মিটিং করে' করিত কুসুম কানন।
গ্রাম্য দেবী আছেন ভাদু মোড়ের মাঝেতে,
প্রণাম ক'রে বোস ভাদু দ্বিজপদয় ধারিতে।
আলো জ্বালা ঘড়ি সারা কত বুদ্ধি শিখিবে,
তোমার চুল পাকিয়ে গেলে তখন কলপ লাগাবে।
ফটিক বক্সীদের ঘর পেরিয়ে দেখবে গো সাইন বোর্ড টানা,
সে বটে গো বঙ্কিম ডাক্তার হাঁসপাতালে কারখানা।
মিকচারে আর ইনজেকসানে রোগীরা সব যায় সেরে,
সাইকেল নিয়ে বঙ্কিম ডাক্তার ফিরেছেন গো গ্রাম ঘুরে।
বুড়া রায়ের দোকানে ভাদু শাড়ী নাও ভাল পারা,
হেমেন্দ্রের ঔষধালয়ে বসে রইলাম আমরা।
সেখান হতে' যাব আমরা শক্তি পদ'র দোকানে,
লোকে দোকান ভ'রে আছে দাঁড়াব কোন্‌খানে।
দুর্গা, মাগো, বড় শান্ত তাই নিলেগো খড়ের ঘর,
তাই বলিগো তোমার স্বামী হয়ে থাকেন দিগম্বর।
বাসিনীর ভাদুর সঙ্গে তোমার ফুল পাতিয়ে দিব,
এখন যে জল হচ্ছে গো তার উপায় কি করিব।
বড়িংএতে যেয়ে, ভাদু, দৈ কুসুমে দেখিবে,
সরস্বতী পুজায় থিয়েটারের গান রাখালের কাছে শিখিবে।
আগেতে প্রেসিডেন্ট ছিলেন আমাদের সেন মহাশয়,
রাস্তাঘাট পরিষ্কার থাকতো এই কথাটি মনে হয়।
চৌকিদার দিত পাহারা চোরেরা থাকত আধমরা,
এখন সে চৌকিদার কোথায় গেল দেন না কেন পাহারা।
ওহে প্রেসিডেন্ট মশায় আজ আমাদের ভাদু পুজা,
রাস্তাঘাট নাই পরিষ্কার ঝুনঝুনীর খাড়ার বোঝা।
এই বৎসরের মত, ভাদু, যাওগো তুমি এমনিতে,
আমাদের গ্রাম ভাল থাকলে আনবো পাকা রাস্তাতে॥ —ঐ

ভাদুই গান

ভাদুই গান নামে মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল অঞ্চল হইতে এক শ্রেণীর গান সংগৃহীত হইয়াছে, ভাদু গানের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না। এখানে দেবতার নাম ভাদুই—রচনাটি ছড়াজাতীয়।

১

আয় আয়, গৌরী, চল ফুল বাড়ী,
ফুল বাড়ীতে আছে আমার খেলার যশোমতী।
ফুল তোল, ফুল তোল বেছে তোল কুঁড়ি।
আয় আয়, গৌরী, চল ফুল বাড়ী॥
ফুল তুলতে জানি না যে মানা করে—
হাতের সাঁজি কেড়ে নিল তিন ঠুকনা মেরে।
ঘর নিকাতে জানি না যে মানা করে—
হাতের ঝেঁটা কেড়ে নিল তিন ঠুকনা দিয়ে—
চাপড় তাই, ঠুনকা তাই, গালে মারে চড়—
ভাদুয়ের মায়ের নাম শতেশ্বর॥ —ঐ

ভাদুরিয়া ঝুমুর

পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গ অঞ্চলে ভাদ্রমাসে ভরা বর্ষার প্রকৃতিকে বন্দনা করিয়া যে নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হইতে তাহাকে ভাদুরিয়া বলিত। এই উপলক্ষে নৃত্যের সঙ্গে যে সঙ্গীত ব্যবহৃত হইত, তাহাকে ভাদুরিয়া ঝুমুর বলে। বর্তমানে ভাদ্রমাসের প্রকৃতি বর্ণনা ব্যতিরেকেও ভাদুরিয়া ঝুমুর রচিত হয়; কিন্তু একদিন ইহাদের মধ্যে বর্ষাপ্রকৃতির রূপ বর্ণনা ব্যতীত আর কিছুই শুনিতে পাওয়া যাইত না। ইহারা এই অঞ্চলের ভাদু গান। ভাদুরিয়া ঝুমুরের কয়েকটি নিদর্শন এখানে উল্লেখ করা যায়।

১

ছা'টিও পড়ব তারটিও মারব
বাঁসাটি বানে ভাসাব, ভাইরে ধুতিয়া। —পুরুলিয়া

২

খাওয়ালি দাওয়ালি পীরিতে মজালি
কিছুদিনে, বঁধু, আমারে কাঁদালি। —ঐ

৩

থালা গেল বাটি গেল, তাও আমরা পারি গো,
মাথা বাঁধা মোর ডুরি গেল সেই ভাবনায় মরি গো। —ঐ

নারী-প্রকৃতির চিরন্তন একটি পরিচয় ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ঘরের থালা-বাসন হারাইয়া গেল ; সেইজন্য নারীর মনে কোন ক্ষোভ নাই ; কিন্তু তাহার প্রসাধন করিবার ক্ষুদ্র একটি উপকরণ মাথা বাঁধিবার ডুরিটি যে হারাইল, তাহার বেদনা তাহার বুকে সূঁচ হইয়া ফুটিয়া রহিল।

৪

ভাদর মাসে পিয়া পর দেশে
বলে দিও হে যেন নাগর আসে।
না দেখি হাটে, না দেখি বাটে
গুণমণিরে মন ভাঙ্গিল কিসে॥ —ঐ

৫

দে গো, মাতা, দে গো, পিতা, দে গো পদধূলি,
রাম যাবে বনবাস কাঁধে নিয়ে ঝুলি।
মাতা, দে গো, দে গো, ভিখ্‌ যাব দূর দেশে,
কোন্‌ বনে কাঠ কাটি, কোন্‌ বনে জড় করি।
কোন্‌ বনেরই দাদা জুড়ন পীরিতি।
ফুটল গরয়া ফুল টুটল পীরিতি॥ —বাঁকুড়া

ভাদুলী ব্রতের গান

ভাদ্র মাসে যখন নদনদী দুইকূল ছাপাইয়া উঠে, তখন বাংলার কোন কোন পরিবারের কুমারী এবং সধবা নারীরা তাঁহাদের প্রবাসী আত্মীয়-স্বজনের কথা স্মরণ করিয়া নদী এবং সমুদ্রপথে তাহাদের নিরাপত্তা কামনায় এক ব্রত উদ্‌যাপন করে, তাহাকে ভাদুলী ব্রত বলে। সেই উপলক্ষে যে গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই ভাদুলী ব্রতের গীত। সাধারণত বাংলার সদাগরেরা যখন

অনির্দিষ্ট কালের জন্য সমুদ্র বাণিজ্যে বাহির হইয়া যাইত, তখনই তাহাদের নিরাপত্তা কামনায় এই ব্রত ও ইহার গীতির উদ্ভব হইয়াছিল। তাহারই ধারা আজ পর্যন্ত কোন কোন অঞ্চলে চলিয়া আসিতেছে। কোন কোন গীতে বাপ-ভাইয়ের বাণিজ্য করিতে যাইবার কথা আছে—

১

এ-নদী সে-নদী একখানে মুখ,
ভাদুলি ঠাকুরাণী ঘুচাবেন দুখ।
এ' নদী সে' নদী একখানে মুখ,
দিবেন ভাদুলী তিন কুলে সুখ। —২৪ পরগণা

২

নদী নদী কোথায় যাও,
বাপ-ভায়ের বার্তা দাও।
নদী নদী কোথায় যায়,
আমার সোয়ামী শ্বশুরের বার্তা দাও। —ঐ

৩

কাগারে বগারে কার কপালে খাও ?
আমার, বাপ ভাই গেছেন বাণিজ্যে, কোথায় দেখলে নাও ! —ঐ

ভাসান গান

মনসা-মঙ্গল বর্ণিত বেহুলাকে লখীন্দরের মৃতদেহের সঙ্গে নদীর জলে ভাসাইয়া দিবার অনুষ্ঠানের নাম ভাসান। প্রতিমা নিরঞ্জনকেও ভাসান বলে, কিন্তু ভাসান গান বলিতে যে গানে বেহুলাকে মৃত পতি সহ নদীর জলে ভাসাইয়া দিবার বিষয় শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই বুঝায়। ব্যাপক অর্থে মনসা-মঙ্গল গানও ভাসান গান বলিয়া পূর্ববঙ্গে প্রচলিত। ইহার নানা বিচ্ছিন্ন অংশ লোকমুখে ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছে। তাহা সঙ্কীর্ণ অর্থে ভাসান গান। বেদে বেদেনীরা সাপ খেলাইবার সময় এই শ্রেণীর গান গাহিয়া থাকে।

১

বেহুলা, কাঁদিসনা কাঁদিসনা মরা পতি লইয়া।
মরা পতি বাঁচে যদি সতী বলবে তোরে।

আমি কাঁদবো গো জোড়ের ভাই ভাই বলে,
আমার নাইকো মাতা নাই কো পিতা,
হা রে নাইকো জোড়ের ভাই ভাই,
ও গুণাই, কাঁদিসনে কাদিসনে, গুণাই, আর কাঁদিস না,
তোর ঐ কান্না শুনলে পরে আমার প্রাণতো বাঁচে না।

মনসা-মঙ্গলের গান অনেক সময় বিচ্ছিন্ন ভাবে লোক-মুখে প্রচারিত হইয়া থাকে, তাহাকে ভাসান গান বলে। মনসা-মঙ্গল গান কাহিনীমূলক, কিন্তু ভাসান গান গীতিমূলক (lyrical)।

২

ওঠো, বালি, জ্বালো আলো বিষে হলো শরীরও কালো রে,
বক্ষস্থলে ঢালো গঙ্গার জল হে ॥
তোমরা বাবা দিয়েছিলে মাণিক আঙ্গুরী প্রিয় হে,
তাহার মধ্যে মনসার নালও হে ॥
তোমার বাবার নীল ঘোড়া ওমা দান করেছেন বসবার ঘোড়া হে,
তাহার মধ্যে ছিল মনসার নাগও হে ॥

—বালিয়াডাঙ্গা, নদীয়া

৩

মলাম, মলাম প্রাণে জ্বলে মলাম, কাল নাগিনী করিল দংশন,
প্রাণেশ্বরী, শীঘ্র করি করহে উপায় অন্বেষণ।
কালনাগিনী করিল দংশন ॥ —ঐ

৪

হায়, আমার একি হলো শেষে ॥
ও বাসর ঘরে ও প্রাণেশ্বরে দংশিয়েছে কিসে ॥
বড় সাধ ছিল মনে হব রাজরাণী—
ও তাহাতে আমার হতে হল চির জনমদুঃখিনী ॥
কাজ কি বল ই ছার প্রাণে আমি ত্যজিব প্রাণ বিষ পানে,
আমি কি করিতে কি করিলাম, বাসর ঘরে কেন পতি খেলাম,
আমি কাঁচা চুলে কেন রাড়ী হলাম
মলাম, মলাম, জ্বলে মলাম, ও পতির শোকে ও বিষেগো। —ঐ

৫

আমি ওঝা বিনোদ খোঁড়া আসছি তোদের বাড়ী ॥
হা রে, আসছি তোদের বাড়ী ॥
আর কেঁদো না, আর কেঁদো, না বেহুলা সুন্দরী,
যে খাবে আমার বড়ি সে যাবে যমের বাড়ী।
রাত পোহালে নিয়ে যাব গঙ্গাসাগরে ॥ —ঐ

৬

ধুয়া— ওটা কেরে সুন্দরী রমা জলে ভেসে যায়।
যেন কাল মেঘের কোলে সৌদামিনী বিজলী খেলায়।
পয়ার— জলে ভেসে যায় সতী করি দরশন।
রমা ভাসে গোদা কহিছে তখন ॥
কে তুমি কাহার রাণী কহ সত্য বাণী
মান্দাসে ভাসিছ কেন, কহ ও গো ধনি ॥
এ নব যৌবনে তব নাহি যোগ্য জন
জলেতে ভাসিয়া যাও কিসের কারণ ॥
সতী কহে, নিশা রাত্রি ভুজঙ্গ দংশনে,
মরেছেন পতি মম সেই পতি সনে ॥
বাঁচাব বলিয়া জলে চলিছে ভাসিয়া
হবে তাহা বিধি যাহা লিখেছে কপালে ॥
শুনি গোদা কহে শুন আ মরি আ মরি
জলেতে ভাসিছ কেন এমন সুন্দরী ॥
মরিলে বাঁচিবে পুনঃ শুনেছ কোথাও।
জলেতে ফেলিয়া মরা আইস ত্বরায় ॥
সুন্দরী রমণীমম রহে চারি ঘরে,
একজন দুই বেলা রন্ধনাদি করে ॥
গৃহের মার্জন করে আর একজন
অন্ন তুলি দেই মুখে অন্য একজন ॥
একজন রাত্রিকালে গোদ সেবা করে
সবার প্রধান হয়ে রবে তুমি ঘরে ॥

খাবে শোবে নিদ্রা যাবে মনের ইচ্ছায়
তোমারে রাখিব সতী করিয়া মাথায় ॥
ধরিয়া মৎসের কাঁটা বানাইয়াছি চৌকি
কন্যা পুত্র সুখে নিদ্রা যায় দিবা রাত্রি ॥
হেন কটু কথা শুনি বেহুলা সুন্দরী
দূর দূর করি যান মান্দাসেতে চড়ি ॥
বেহুলারে ধরিবারে সে গোদা তখন
ঝাঁপ দিয়া জলমধ্যে হয় নিমগন ॥
ভীষণ গোদের ভার সাঁতারিতে নারে
জলে পড়ে হাবু ডুবু খেয়ে গোদা মরে ॥
মুখ তুলি বেহুলাকে কহিছে তখন
ডুবে মরি এ দাসের করহ রক্ষণ ॥
আর নাহি ধরিবারে যাইব তোমারে
এতশুনি বর দিলা বেহুলা তাহারে ॥
বর পাইয়া গোদা তখন তীরেতে উঠিল
বেহুলা মান্দাসে চড়ি পুনশ্চ চলিল ॥

ভাসান যাত্রা

বেহুলা লখীন্দর এবং মনসা দেবীকে কেন্দ্র করিয়া যে এক শ্রেণীর লোক-নাট্য রচিত হয়, তাহাই ভাসান যাত্রা। ইহার সমস্ত বিষয় এখানে আলোচনা না করিয়া বেহুলা-লখীন্দরের এক এক সময়ের দুই একটা গান এখানে উদ্ধৃত করিলাম। সমগ্র অংশটি মুর্শিদাবাদ জিলা ংগৃহীত।

চাঁদ সদাগর যখন কোন মতেই মা মনসার পুজা দিলেন না, তখন মনসা দেবী চাঁদকে বিপদে ফেলিবার জন্য চাঁদের পুত্র অর্থাৎ বেহুবার স্বামী লখীন্দরকে তাহার অনুচর কাল নাগিনীকে দংশন করিবার আদেশ করিলেন।

যদিও চাঁদ সওদাগর লোহার বাসর তৈরী করিলেন, যাহাতে কোন প্রকারেই তাহার পুত্রকে সর্পাঘাত করিতে না পারে, তবুও কিছুই হইল না। কালনাগিনী প্রথমে লখীন্দরকে বিনা দোষে বা তার রূপ দেখিয়া দংশন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল, এব সময়ে সে দুঃখের সঙ্গে মা মনসাকে বলিল,—

গান

আমার নয়ন জলে বুক ভেসে যায়,
কোন খানে দংশাব রে, বাছা, এ সুন্দর গাথানি, নয়ন জলে—
আমি নাকে যদি দংশন করি, বাছার ওযে কৃষ্ণের হাতের বাঁশি,
কোনখানে দংশাব রে, বাছা, এ সুন্দর গাথানি, নয়ন জলে।
আমি মস্তকে যদি দংশন করি বাছার ওযে বিধির হাতের লিখা,
কোন খানে দংশাব রে, বাছা, এ সুন্দর গাথানি, নয়ন জলে।

এ গানটির আরও অংশ আছে, অর্থাৎ লখায়ের প্রত্যেক অঙ্গের বিবরণ এই গানের মাধ্যমে দেওয়া আছে। মা মনসা কিছুতেই শুনিলেন না, কালনাগিনীকে পুনরায় আদেশ দিলেন। তখন কালনাগিনী বাসরে প্রবেশ করিয়া লখায়ের পায়ে দংশন করিল। সে সময় বেহুলা পাশেই ঘুমাইতেছিল। লখাই বিষের যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতে করিতে কাঁদিতে কাঁদিতে বেহুলাকে বলিল,

গান— ওঠরে, বালি, জ্বালোরে আলো বিষে হল শরীর কালো,
বক্ষস্থলে ঢালো গঙ্গা জল হে।

তার পরে বেহুলা তার স্বামীর প্রাণ ফিরিয়া আনিবার জন্য মৃত দেহের পার্শ্বে বসিয়া কলার মান্দাসে চড়িয়া নদীতে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া যাইতে লাগিল। ঐ সময় অনেকে বেহুলার রূপ দেখিয়া ভুলিয়া গিয়া অপমান জনিত ভাষা প্রয়োগ করিয়া বলিতে লাগিল—

গান— কে যায় কে যায় কন্যা বাহির গঙ্গা দিয়ে।
বেনে ভাই ডাক ছাড়িছে সিঁদুর লও আসিয়ে।
জলে ভেসে যায় রে সোনার কমলা।

বেহুলা উত্তর দিতেছে:—

সিঁদুর নিব কি ভাই বেনে হাতে নাই মোর কড়ি,
কত শত সোনার কোটা রেখে এলাম বাড়ি।

এবারে তাঁতী বলিতেছে,

কে যায় কে যায় কন্যা বাহির গঙ্গা দিয়ে
ওযে তাঁতি ভাই ডাক ছাড়িছে কাপড় লও আসিয়ে।
জলে ভেসে যায়রে সোনার কমলা।

বেহুলার উত্তর :—

কাপড় নিব কি, ভাই, তাঁতি হাতে নাই মোর কড়ি।
কত শত চেলির শাড়ি রেখে এলাম বাড়ী ॥

এবারে স্বর্ণকার একজন বলিতেছে—

কে যায় কে যায় কন্যা বাহির গঙ্গা দিয়ে।
স্বর্ণকার ভাই ডাক ছাড়িছে হার লও আসিয়ে ॥

বেহুলার উত্তর :—

হার নিব কি, ভাই, স্বর্ণকার, হাতে নাই মোর কড়ি,
কত শত হীরের হার রেখে এলাম বাড়ি !

লোক যতই তাকে বিরক্ত করুক তার একমাত্র চিন্তা কি করে তার স্বামীকে যমের কাছ থেকে ফিরে আন্‌বে। ঐ ভাবে যেতে যেতে পথের মধ্যে এক বীর তার পায়ে ছিল গোদ্ সেইজন্য তাকে বীর গোদা বল্‌ত। ঐ বীর গোদা ছিপ দিয়ে মাছ ধর্‌ছিল, সে বেহুলার মাড় আটকাবার জন্য দুই পা ফাঁক করে দাঁড়াল আর বেহুলাকে অপিষ্ট ভাষায় বল্‌তে লাগলো :—গান।

আমার বাড়ী যাবি সুন্দরী ঘরের নাইরে দুখ,
শুয়ে থেকে দেখতে পাবি চাঁদ সূর্যের মুখ।
সুন্দরী লো কেন ভাস যমুনার জলে।
আমার বাড়ী যাবি সুন্দরী কাপড়ের নাইরে দুখ,
নেংটী ছিঁড়ে আংটি দিব পরে পাবি সুখ।
সুন্দরী লো কেন ভাস যমুনার জলে।

যতই যে চেষ্টা করুক সতী বেহুলার মান্দাস আটকতে পারলনা। এই ভাবে যেতে যেতে এক জায়গায় দেখ্‌ছে একটি ধোপার মেয়ে (নেতা মাসী) তার মেয়েকে মেরে রেখে কাপড় কাচ্‌ছে। বেহুলা যখন কাছে গেল, তখন বল্‌ল—

গান

ওগো মাসী, তুমি বস আমি কাপড় কাচি,
নেতা-ধুপানি কাপড় কাচে ক্ষারে আর জলে
আর বেহুলা সতী কাপড় কাচে শুধুই গঙ্গার জলে।
ওগো, মাসি, তুমি বস আমি কাপড় কাচি।

কাপড় কাচা হয়ে গেলে দেখ্‌ছে সে ঐ ধোপানী এক আঁজল জল মরা

মেয়ের গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে তাকে তাজা করে বাড়ি যাচ্ছে, এমন সময় বেহুলা বুঝতে পারল যদি একে ধরা যায়, তার স্বামীকে বাঁচাতে পারবে। তখন সে নেতাকে খুব করে অনুনয় করার পর, নেতা সন্ধান দিল যদি তুমি নাচে গানে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করতে পার, তবে তোমার স্বামীর প্রাণ ফিরে পাবার সন্ধান তিনিই দেবেন। তাই মহাদেবের কাছে গিয়ে তাঁকে নাচে গানে সন্তুষ্ট করে তার স্বামীর প্রাণতো ফিরে পেলই, উপরন্তু আরও ছয় ভাসুরের প্রাণ ফিরে পেল। ঐ ছয় ভাসুরও মা মনসার কোপানলে পড়েছিল বলে ঐ দশা। একমাত্র মা মনসার পূজা চাঁদ সওদাগর না দিবার দরুণ এই সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটেছিল চাঁদ সওদাগরের, বেহুলার স্বামী লখিন্দরের প্রাণ ফিরে পাবার পর চাঁদ সওদাগর বাম হাত দিয়ে মনসার চরণে ফুল দিয়েছিল। এই সময় থেকে পৃথিবীতে মনসার পূজা ঘরে ঘরে হতে লাগলো। তারপর বেহুলা স্বামীকে নিয়ে সুখে ঘর করতে লাগিল।

ভূতের গান

ভূতের গান নামে একশ্রেণীর গান সংগৃহীত হইয়াছে। সম্ভবত লোক-নাট্যে কোন কোন সময় যে ভূতের চরিত্র থাকে, তাহাদের মুখে একশ্রেণীর গান শুনিতে পাওয়া যায়, সেই গানকেই ভূতের গান বলা হইয়াছে।

চিৎপট্টাং দিয়ে আছে দাঁত গিজুরে
মরেছে না বেঁচে আছে দেখরে শালা চোখ তেড়ে।
মার শালাকে ধর শালাকে ফেল শালাকে কুল ঝোরে।
চিৎপট্টাং দিয়ে আছে দাঁত গিজুরে॥ —বাঁশপাহাড়ী

মকর কীর্তন

সই পাতানোর গান কোন কোন অঞ্চলে মকর কীর্তন বলিয়া পরিচিত। কারণ. সই পাতানোকে মকর পাতানো বলে। নিম্নোদ্ধৃত গানটি ঝাড়গ্রাম মহকুমার এক গ্রাম হইতে সংগৃহীত।

ওহে, মকর বলে ডাকব হে,
আজরে বড় আজরে বড় সাধ হয়েছে মনে।
মকর পাতাব আজ শ্যাম বন্ধুর সনে॥
রাধা কানু একই তনু একই করে বর।
সাধ করেছি শ্যামের সনে পাতাব মকর॥
ওহে, মকর বলে ডাকব হে·········
ইন্দুরেখা বলে, আমার যাক জাতির কুল।
সাধ করেছি শ্যামের সনে পাতাব বকুল ফুল॥
ওহে, মকর বলে ডাকব হে········ ···
সত্যভামা বলে আমরা পিরিতের মোরা।
সাধ করেছি শ্যামের সনে পাতাব নয়ন-তারা॥
যখন বাঁশি মুরলীতে পুরবে বদনে,
তখনই জানিবে আমার সফল হইল বিধি।
ওহে, মকর বলে ডাকব হে······
গিরিবর দাস বলে চরণতলে পড়িয়া।
ফুল পরাণ পাতাতে গেলে লাগে লাড্ডু গুড় চিড়া॥
বলি, ওহে মকর বলে ডাকব হে! —বেলপাহাড়ী (ঝাড়গ্রাম)

মঙ্গল গান

মধ্যযুগের দেবমহাত্ম্যসূচক যে এক শ্রেণীর আখ্যায়িকা-গীতি রচিত হইয়াছিল, তাহাকে মঙ্গল গান বলিত। বিভিন্ন দেবদেবীরই তাহাতে মাহাত্ম্য কীর্তিত হইত। যেমন বৈষ্ণব বিষয়ক—জগৎ-মঙ্গল, কিশোরী-মঙ্গল, স্মরণ-মঙ্গল,

গোকুল-মঙ্গল, রসিক মঙ্গল জগন্নাথ-মঙ্গল ইত্যাদি ; পৌরাণিক বিষয়ক—গৌরী-মঙ্গল, ভবানী-মঙ্গল, দুর্গা-মঙ্গল, অন্নদা-মঙ্গল, কমলা-মঙ্গল, গঙ্গা-মঙ্গল, চণ্ডিকা-মঙ্গল ; লৌকিক বিষয়ক—শিবায়ন বা শিব-মঙ্গল, মনসা-মঙ্গল, চণ্ডী-মঙ্গল, ধর্ম-মঙ্গল, কালিকা-মঙ্গল (বা বিদ্যাসুন্দর) শীতলা-মঙ্গল, রায়-মঙ্গল, ষষ্ঠী-মঙ্গল, সারদা-মঙ্গল, সূর্য-মঙ্গল।

প্রাচীন ভারতীয় রাগ-রাগিণীর মধ্যে মঙ্গল রাগ অন্যতম। বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীও মঙ্গল রাগে গীত হইত বলিয়া জানিতে পারা যায়। প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীত-শাস্ত্র বিষয়ক পুস্তকাদিতে অবশ্য মঙ্গল রাগের খুব ব্যাপক উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না ; তাহাতেই মনে হয়, ইহা স্থানীয় একটি রাগ মাত্র ছিল। বলা বাহুল্য, কোন সঙ্গীত-শাস্ত্রকারই মঙ্গল রাগকে ষড়্‌রাগ বা জনক-রাগের অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, ইহা রাগিণী বা উপরাগের পর্যায়ভুক্ত। ক্ষেমকর্ণ পাঠক রচিত 'রাগমালা' গ্রন্থে মঙ্গল রাগকে হিন্দোল রাগের অন্তর্গত একটি উপরাগ (পুত্র) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। নারদ রচিত 'চত্বারিংশচ্ছত-রাগ-নিরূপণম্' নামক গ্রন্থে ভৈরব রাগের পুত্রবধূরূপে মঙ্গল-কৌশীকী নামক একটি রাগিণীর উল্লেখ করা হইয়াছে। মনে হয়, ইহা উক্ত মঙ্গল রাগ ও কৌশীকী রাগিণীর একটি মিশ্র রূপ। উক্ত পুঁথি দুইখানির একখানিও খ্রীষ্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে এবং ইহাদের প্রচারও খুব ব্যাপক ছিল না। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন ও মধ্যযুগের পদ্য-সাহিত্য মাত্রই গানের উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল, মঙ্গল গানেও ইহার ব্যতিক্রম ছিল না। সেইজন্যই মনে হইতে পারে, অদ্যোপান্ত মঙ্গল রাগে কিংবা প্রধানত মঙ্গল রাগে যাহা গীত হইত, তাহাই সাধারণ ভাবে মঙ্গল গান বলিয়া অভিহিত হইত। কিন্তু মঙ্গল গানের যে সকল প্রাচীন পুঁথির মধ্যে রাগ-রাগিণীর নির্দেশ দেওয়া আছে, তাহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, মঙ্গল গান আদ্যোপান্ত যে মঙ্গল রাগেই গীত হইত, তাহা নহে—তাহাতে অন্যান্য রাগ-রাগিণীও ব্যবহৃত হইত। তবে ইহাতে মনে হইতে পারে যে, হয়ত তাহা প্রধানত মঙ্গল রাগেই গীত হইত বলিয়া এই শ্রেণীর গানের নামও মঙ্গল গান হইয়াছে। প্রাচীন বাংলায় পাঁচালীর সুরে যে গান গাওয়া হইত, তাহাও সাধারণ ভাবে পাঁচালী নামেই অভিহিত হইত। যদিও প্রাচীনকাল হইতে উত্তর ভারতীয় রাগসঙ্গীত নানা রূপান্তরের ভিতর দিয়াই অগ্রসর হইয়া আসিতেছে সত্য, তথাপি বর্তমানে মঙ্গল রাগের যে পরিচয়

পাওয়া যায়, তাহা উক্ত ধারণার পোষকতার অনুকূল নহে ; কারণ, বর্তমানে মঙ্গল রাগ ভৈরব রাগের অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয় ; সেইজন্য তাহা একমাত্র প্রভাত কালেই গেয়। কিন্তু মঙ্গল গান প্রভাতে আদৌ গীত হইত না। অতএব এই বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই। মঙ্গল গানের মধ্যে পাঁচালীর সুরও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইত বলিয়া একমাত্র পাঁচালী বলিয়াও প্রাচীনতম মঙ্গলগানগুলিকে উল্লেখ করা হইয়াছে। ক্রমে পাঁচালীর উপর মঙ্গল রাগের ক্রমবর্ধমান প্রভাব বশতই সম্ভবত ইহা মঙ্গল নামে পরিচিত হইতে থাকে। পদ্মা বা মনসার গীতের উপর সংস্কৃত পুরাণের প্রভাব বশত ইহার নাম হয় পদ্মাপুরাণ। অবশ্য সাধারণ ভাবে ইহা মনসা-মঙ্গল নামেও পরিচিত।

কিন্তু কোন্ বিষয়ক গান প্রধানত এই মঙ্গল রাগে গাওয়া হইত, এখন তাহাই বিবেচ্য। ব্যাপক অর্থে দেব-মহিমা প্রচারক গীত মাত্রই মধ্যযুগের বাংলায় মঙ্গল গীত নামে অভিহিত হইত। এই অর্থেই জয়দেব গোস্বামী রচিত 'গীত-গোবিন্দ' কাব্যে মঙ্গল শব্দটি এদেশে সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে ; যেমন, 'শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি' (১।২৫)। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কবি-রচিত ইহার পরবর্তী আরও বহু পদ ইহার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে ; যেমন,

'প্রভু কন গাও কিছু কৃষ্ণের মঙ্গল।
মুকুন্দ গায়েন প্রভু শুনিয়া বিহ্বল॥' —চৈতন্য-ভাগবত,২।২৫

বিবাহাদি অনুষ্ঠানে যে সকল গীত গাওয়া হইত, সাধারণ ভাবে তাহাদিগকেও মঙ্গল বলিয়া অভিহিত করা হইত বলিয়া মনে হয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তরা কাণ্ডে শিবদুর্গার বিবাহোপলক্ষে বর্ণিত হইয়াছে—

'নানা মঙ্গল নাট গীত হিমালয়ের ঘরে।
পরম আনন্দে লোক আপনা পাসরে॥' (সা. প. সংস্করণ, পৃ—৬)

হিন্দীভাষায় বিবাহ অর্থে কোন কোন সময় মঙ্গল কথাটি ব্যবহৃত হয়। কাশীতে কিছুদিন পূর্বেও 'বুঢ়ুয়া মঙ্গল' নামক যে অনুষ্ঠান হইত, তাহা বুঢ়ুয়া বা শিবের সহিত পার্বতীর বিবাহানুষ্ঠান ব্যতীত আর কিছুই নহে। 'মঙ্গল' শব্দটি সম্ভবত 'আঙ্গুল', 'লাঙ্গুল', 'গঙ্গা', ইত্যাদির ন্যায় ভারতীয় কোন অনার্য ভাষা হইতে আগত। মূলত মিলন অথবা বিবাহ অর্থে শব্দটি দ্রাবিড় ভাষায় আজ পর্যন্তও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মালয়ালাম্ ভাষায় বিবাহ অর্থে 'মঙ্গল্যাম্' শব্দ অদ্যাপি ব্যবহৃত হয়।

কুর্গদেশে ব্যাঘ্রের বিবাহ নামক একটি লৌকিক উৎসব আছে। সাধারণ লোক ইহাকে 'নরী-মঙ্গল' বলিয়া জানে। নরী শব্দের অর্থ দ্রাবিড় ভাষায় শৃগাল, কুর্গদেশের শিকারিগণ ব্যাঘ্রকে শৃগাল বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। মালয়ালাম্ দেশের স্থানের নাম ম্যাঙ্গালোর, তীরুমঙ্গল প্রভৃতি শব্দের মধ্যে মঙ্গল শব্দের অস্তিত্ব আছে। এ'কথা অবশ্য সত্য যে, আধুনিক দ্রাবিড় ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কে বলিবে এই মঙ্গল শব্দটি সংস্কৃত হইতে গৃহীত, না কোন প্রাচীন দ্রাবিড় শব্দেরই কোন সংস্কৃত রূপ? যদিও বিবাহ একটি মাঙ্গলিক ব্যাপার সন্দেহ নাই, তথাপি সোজাসুজি বিবাহ অর্থে মঙ্গল শব্দের ব্যবহার ত সংস্কৃত অভিধানেও দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ তামিল ভাষায় মঙ্গল শব্দের অর্থ বিবাহাদি শুভ অনুষ্ঠানে ক্ষৌরকর্মের জন্য ব্যবহৃত ক্ষুর। তামিল ভাষায় নাপিতানীকেও 'মঙ্গলৈ' বলা হয়। তেলেগু ভাষায় মঙ্গল শব্দের অর্থ ক্ষৌরকার। বিবাহাচারে ক্ষৌরকারের বিশিষ্ট স্থান আছে। অতএব দেখা যাইতেছে, বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইলেও শব্দটি দক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রাবিড় ভাষার বিভিন্ন আধুনিক শাখায় বিবাহ-সম্পর্কিত কোনও শব্দের অর্থে অদ্যাপি রক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং মনে হইতে পারে যে, দ্রাবিড় ভাষায় মঙ্গল শব্দের অর্থই বিবাহ।

কেহ কেহ অনুমান করেন, 'there were several kinds of *mangala* and the narrowing down of *mangala* to marriage exclusively is a fairly recent phenomenon'. কারণ, কিছুকাল পূর্বেও দ্রাবিড় ভাষাভাষীর দেশে, বিশেষত কুর্গ অঞ্চলে, প্রায় প্রত্যেক জাতকর্মকেই মঙ্গল নামে অভিহিত করা হইত; যেমন বয়ঃপ্রাপ্ত বালকের কর্ণভেদ অনুষ্ঠানকে বলিত 'হেম্মিকুট্রী-মঙ্গল', বয়ঃপ্রাপ্ত বালিকার কর্ণভেদ অনুষ্ঠানকে বলিত 'পোলেকণ্ড মঙ্গল', নারীর প্রথম গর্ভধারণ উপলক্ষে যে পারিবারিক অনুষ্ঠান পালন করা হইত, তাহাকে বলিত 'কুলিয়ম্মে মঙ্গল', দশটি জীবিত সন্তানের জন্মদাত্রী জননীর সম্মানার্থে একটি সামাজিক অনুষ্ঠান হইত, তাহাকেও 'মঙ্গল' বলিত। গৃহারম্ভকালে যে পুজানুষ্ঠান হইত, তাহাকে বলিত, 'মনে মঙ্গল' ইত্যাদি। কিন্তু মনে হয়, বিবাহ অর্থ হইতেই মঙ্গল শব্দটি অন্যত্র প্রসারিত হইয়াছে। অথবা অন্যান্য অর্থ হইতে কালক্রমে কেবল মাত্র বিবাহ বুঝাইতেই দ্রাবিড় ভাষায় ইহার অর্থ সঙ্কুচিত (contracted) হইয়াছে।

অতএব দ্রাবিড় ভাষায় মঙ্গল শব্দের অর্থই বিবাহ এবং ইহা হইতেই বিবাহ উপলক্ষে প্রচলিত লোক-সঙ্গীতের রাগকেই প্রাচীন বাংলায় মঙ্গলরাগ বলা হইত,—পরে ইহার অর্থ সঙ্কুচিত হইয়া দেব-দেবীর বিবাহ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এই অর্থেই শব্দটি হিন্দীভাষায়ও প্রচলিত আছে। অতঃপর বাংলায় দেব-দেবীর মাহাত্ম্য-সূচক রচনা মাত্রই মঙ্গল নামে পরিচিত হইয়াছে।

এখানে আরও একটি কথা মনে হইতে পারে। কোনও অপ্রিয় বিষয় বা নামকে অনেক সময় সম্পূর্ণ বিপরীতার্থক শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এই প্রবৃত্তিকে ইংরেজিতে euphemism বলে। মঙ্গলগানের দেবতার চরিত্র মাত্রই অমঙ্গলকারী (malignant)। অতএব ইহাদের অমঙ্গলকারিণী শক্তিকে প্রশমিত (pacify) করিবার, কিংবা মনোমধ্যে ইহার বিষয় স্থান না দিবার প্রবৃত্তি হইতেও তাঁহাদিগের মাহাত্ম্যসূচক গীতিকে মঙ্গল গান বলিয়া উল্লেখ করা হইতে পারে। বসন্ত রোগের নিদারুণ অন্তর্দাহের জ্বালার মধ্যেও মানসিক শান্তি লাভ করিবার জন্য এই রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে এই কারণেই 'শীতলা' বলিয়া উল্লেখ করা হয়। কালক্রমে সকল শ্রেণীর দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তনই মঙ্গল নামে পরিচয় লাভ করে।

মতুয়ার গান

ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত ওড়াকান্দি গ্রামে যুগাবতার শ্রীশ্রীহরি ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রবর্তিত মত বা নীতিবাক্য এবং অনুশাসনাদি যাঁহারা মানিয়া চলেন, তাঁহাদিগকেই মতুয়া বলিয়া অভিহিত করা হয়। মতুয়া বলিতে বুঝায় যাঁহারা হরিনামে মত্ত, মাতাল বা মাতোয়ারা। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, 'কলিযুগে হরিনাম সাধনাই মুক্তির একমাত্র উপায়—ইহা ভিন্ন কলির জীবের মুক্তির অন্য পথ নাই।' সর্বদা 'হাতে কাম ও মুখে নাম করিবে।' ইহাই মতুয়া সম্প্রদায়ের নিকট ঠাকুরের প্রধান নির্দেশ।

তিনি বলিয়াছেন—

নামময় এ ব্রহ্মাণ্ড, নামে কর রতি।
ভক্তি, মুক্তি, শক্তি করে নামেতে বসতি ॥
যেই নাম সেই হরি ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিতে আছেন আপনি শ্রীহরি ॥

গানের ভিতর দিয়াই এই ধর্ম মতের প্রচার হইয়াছে ; এই সম্প্রদায়ের গানকে মতুয়ার গান বলে।

১

একবার দাঁড়াও এসে বিনোদ বেশে হৃদি-বৃন্দাবনে।
তোমার নব জলধর রূপ হেরিব নয়নে।
শুনে কালের ডঙ্কা, মনে হ'লো শঙ্কা, তুমি কাল নিবারণ,
মধুসূদন হের নয়ন কোণে।
হরি করে দয়া, ও দেহ পদ-ছায়া,
আমি ভজন বিহীন, দীনেরও দীন, রেখো ঐ চরণে।
একবার দেওহে দেখা, হয়ে ভঙ্গি বাঁকা,
বাজাও মুরলী সদা, বলি জয় রাধা শুনিব শ্রবণে,
বড় বাঞ্ছা মনে, আমি সচন্দনে, পুজিব মনোফুলে,
নয়ন জলে ও রাঙ্গা চরণে।
হরি চাঁদের চরণ, পেলে করতেম সাধ,
ও ভাই, তারকচন্দ্র হরের জন্ম গেল অকারণে। —ফরিদপুর

২

তোরা কেন গৌর বলিস্, কেঁদে ফিরিস পুড়ে মরিস প্রেমের পোড়া,
ও নামে লোভ মেটে না, ক্ষোভ ছোটে না,
গৌর প্রেমের এমনি ধারা ॥
জানিস না, ঐ যে গৌর ছিল মধুর বৃন্দাবনের কাল ছোঁড়া।
নারীর মন করে চুরি সাধু ভারী হয়েছে বৈরাগীর গোড়া ॥
ছিল ও ব্রজের বালক, রাধার খাতক, রাই পদে বিক্রীত সারা,
দাসখতে নাম লিখিয়া, দাইক হয়ে শোধ দিল কই তার এক কড়া।
চিরকাল জানি ওটা স্বভাব শঠা শিকলী কাটা না লয় পড়া।
চাউল ছোলা খেয়ে মিঠে, ঠোঁটে ঠোঁটে উড়ে পালায় না যায় ধরা।
গোকুলের শ্যাম শুক পাখী সুখের পাখী পায় ছিল প্রেম শিকলি পরা।
শিকলের কল খসায়ে এল ধেয়ে আর গেল না গোয়াল পাড়া,
সইরে গোলোকের চাঁদ এই হরিচাঁদে গোলোক চাঁদের দুখ পাশরা,
চাঁদে চাঁদে মিশে গেল তারক হলো সে চাঁদ বিনে ছন্ন ছাড়া। —ঐ

মনঃশিক্ষার গান

বৈরাগ্যমূলক একশ্রেণীর গান মনঃশিক্ষার গান বলিয়া পরিচিত। মুর্শিদাবাদ জিলা হইতেই এই গান অধিক সংগৃহীত হইয়াছে।

১

মিছে ভাবছ কি, মন, বসে,
সাক্ষাতে থাকতে বস্তু খুঁজে বেড়াও দেশ বিদেশে।
ভাবলে নাই ভাবের অন্ত, কেন, মন, এত ভ্রান্ত,
কিসে আর হবি শান্ত, অশান্তি কু রণে ?
রলি রিপুর বশে বদ্ধ হয়ে সদায় কামুল্লাসে,
তোর নাইরে চেতন পিতৃ-রতন লুটরে ভজনায় এসে।
রইল, মন, অন্ধকারে সদায় ধুন্দুকারে,
চক্ষু জ্ঞান না হলে, মন, দেখবি কিসে,
জন্ম অন্ধ কর্ম মন্দ বাঁধা অষ্ট পাপে, যেমন চক্ষু বাঁধা বলদের মতন
ঘুরিতেছে কাম-ফুলের গাছে ॥
সুজনার সঙ্গ নিলে অন্ধকার ছায়নি তুলে,
ভাবের দ্বার খুলে দিলে, দেখবি রূপ প্রকাশে।
তত্ত্ব পরতত্ত্ব যত ঐ রূপেতে ভাসে।
স্তবনে ভেদিলে জ্যোতি স্বরূপের রূপ দেখবি বৈসে।
বিশুদ্ধ রতির দ্বারে নবরস সাদ্ধ করে,
এঁটে, মন, ধর তারে, সদানন্দে বইসে,
নবীন চাঁদ কয়, ওরে খেল, আর ভাবনা কিসে,
তার অন্তরে বাহিরে মানুষ, অহরহ সদায় ভাসে —মুর্শিদাবাদ

২

এখন বলিরে তোরে, এমন একটি বৃক্ষ আছে ভবনদীর তীরে,
কাটিলে যে জীয়ে গো বৃক্ষ না কাটিলে মরে।
সেই বৃক্ষের চূড়ার উপর শুক শারী চড়ে।
শুক বলে, ওগো শারী, প্রাণ কাঁদে ডরে।
না জানিয়া করলেম বাঁশা ত্রিপাতার উপরে।
কখন জানি ব্যাধ এসে শরাঘাত করে।

ও মনরে, একমন চিত্ত দিয়া শুন মধুর বাণী।
সেই বৃক্ষে ধরিয়াছে সাত সমুদ্রের পানী।
লবণ, ইক্ষু, সুরাসুর, দধি, দুগ্ধ, ক্ষীরে
জলন্ত কয়াদি নামে সপ্ত পাতায় ঝরে॥
মনরে, গোঁসাই বলে দেখ রে নেহার করে।
আপন বুঝে না বুঝিলে কে বুঝাইতে পারে,
একটি গাছের তিনটি ফুল, চারটি কলি ধরে।
সেই ফুলের মধু খেয়ে রসিক ভ্রমর উড়েরে।
মন, বলিরে তোরে,
এমন একটি বৃক্ষ আছে ভবনদীর তীরে। —ঐ

৩

কি বলব মন-রসনা, গণার দিন ফুরাইয়ে গেলে আসবে না।
ও তোর দমে দমেরে দমকল চলেরে, আমার মন,
খবর জেনে শুনে মরম বুঝলি না॥
দশে ছয়ে ১৬ জনা, তারা কেহ তোমার বড় রাণীর কথা শুনে না,
তারা লুট করে তোর মণিকোঠারে
মন, শেষে জমার ঘরে কিছু থাকবে না॥
দিন থাকিতে না করলি রুজি, কিসে মহাজন বুঝাবি রে,
ও তোর না থাকলে পুঁজি, ও তোর পুঁজি-ভাঙ্গা রুজির ব্যাপার রে,
মন, শেষে দায় মহলে খালাস পাবি না॥ —ঐ

মনসার গান

বাংলা দেশের সুপরিচিত কাহিনী মনসা-বেহুলা-চাঁদ সদাগরের কাহিনী। এই বিষয়ক গান মনসার গান। বিচ্ছিন্ন এই প্রকার গীতিগুলি কাহিনীর আকারে একত্র সংগ্রথিত হইয়াই মনসা-মঙ্গল গানের রূপ লাভ করিয়াছে।

১

লোহার বাসরে দেখি কোথাও নাহি সন্ধি,
তিন প্রহরে তিন নাগকে করিয়াছি বন্দী।

চতুর্থী প্রহরে কালী কোন পথে ঢোকে,
প্রাণপতি লক্ষীন্দরের চরণ তলে কাটে।
তাহার জ্বালায় দেহ জ্বলে গেল,
কাঁচা সোনার বর্ণ ই তখন কালী হলো।
গায়ের হরিদ্রা আমার গায়েতে রহিল,
বিবাহ রাত্রে আমায় রাড়ি হতে হলো।
নাথের বিরহ-জ্বালা সহিতে না পারি,
চিতাশয্যা করে দাও দোহে পুড়ে মরি।
নতুবা শোক আমি কেমনে পাসরিব,
গলে শিলা বেঁধে আমি জলেতে ঝাঁপ দিব।
বেহুলা সতী হাতে ছুরি নিল,
সিজুয়ায় থাকেন দেবী অমনি আসিল।
আমার দাসী মরে যদি তবে কিবা হবে,
এ জগতে আমার পূজা কেবা প্রচারিবে।
লক্ষীন্দর দাস আমার, তুমি দাসী হও,
আমার পূজা লাগি তোমরা পুনর্ জনম লও। —মুর্শিদাবাদ

২

প্রভাতে উঠিয়া দেখে চাঁদ সদাগর,
গৃহে ধন নাহি কিছু হইল ফাঁপর।
চাঁদবেনে বলে আমি ভিক্ষা মেগে আনি,
হেন ধন নিল চোর চ্যাঙ্গ মুড়ির কানি।
মনসাকে গালি দিয়া বনে বনে যায়,
মনসার হাতে সাধু আরও দুঃখ পায়।
শ্বেত মাছির রূপ ধরে বিষহরি চলে,
উঠিয়া বসিল গিয়া আস ফটিক ডালে।
এ বৎসর তারা না পায় শিকার,
সেই দিন মৃগয়াতে হইল আগুসার।
আটা কাঠি সাত নলা লইয়া জাল দড়ি,
শিকার করিতে গিয়া বনে লাগে বেড়ি।

কাননে বেষ্টন করি যত বেদগণ,
আহার ফেলিয়া পক্ষী না পায় যতন।
আহার পাইয়া পক্ষী চলে মনের সুখে,
চাঁদবেনে, হায় হায়, করে মনোদুখে।
সাধু পদ শব্দ পাইয়া যত পক্ষী উড়ে,
যতেক আট কাটি পক্ষী চাঁদবেনের টিকি ধরে।
না মার না মার বলে চাঁদ অধিকারী ॥
কোন দোষে মার, ভাই, নাহি করি চুরি।
তারা বলে কেন তুই পক্ষী দিলি ছেড়ে,
কোথা হতে কাল এলি তুই ভেড়ের ভেড়ে।
তথা হইতে চাঁদবেনে কাঁদিতে কাঁদিতে,
উপস্থিত হইল গিয়া মিতার বাড়ীতে।
ধর্মশীল মিতা তার চন্দ্রকেতু নাম,
জুড়াবার তরে আশা সাধু গেল তার ধাম।
মিত্য মিতা বলে করে সে সম্ভাষণ,
মনসার ভাসান গীত হইল সমাপন। —মুর্শিদাবাদ

৩

আশ্বিনের সংক্রান্তিতে এই গান গাওয়া হয়—

বিনোদিনী বিনোদিনী রায়, পুণ্য মাসী সঙ্গে লয়ে সজ্জ পুজায় যায়।
সজ্জর মন্দিরে তোমরা বস পুণ্য মাসে,
যমুনার তীরে আমরা পুষ্প তুলে আনি,
যমুনার জলে ছিল কাল সাপ দংশিল চরণে,
বাঁচে কি না বাঁচে, মাগো, কাল সাপের বিষে।
ললিতা বলেন, শুন, রাধা ঠাকুরাণী,
আপনারই টেঁপ খুলে মুছাব মুখখানি ॥ —বাঁশপাহাড়ী (ঝাড়গ্রাম)

৪

সাপের বিষ ঝাড়া মন্ত্র—

সাঁই সাঁই ডাকে গরুড় আপনার পাখাতে,
তেত্রিশ কোটি লাগে দাঁড়াল রাধিকার ঘাটে।

রাধিকার ঘাটে লাগ কিছু খুঁজে রেজা—
কালকুটে সাপের বিষ দধিতে দি সাজা।
সেই দধি ভক্ষণ করেন কৃষ্ণ চাঁদ।
গৌরবরণ দেহ কৃষ্ণের বিষে হল কাল,
ললিতা বলেন, শুন, রাধা ঠাকুরাণী,
আপনার গান মন্ত্র ঝাড়েন বিনোদিনী॥ —ঐ

৫

মনসা পুজার ঘট বা বারি আনিবার সময় গীত হয়—
ওলাওঠায় মরল বুড়াটা বুড়ীটা হল রাঁড়ী,
খেতে নাই দেতে নাই প্রাণ টানাটানি।
ধন নাই দৌলত নাই একটা ভাঙ্গা রেখা,
খেলে এসে খেতে খুঁজে নারীর বেটা গুঁছা।
তিন ঠ্যাঙা বুড়ী সেটা কুব্জ হয়ে চলে।
অষ্টভুজের ঠ্যাঙ্‌টা বুড়ী হাতে নিয়ে বুলে—
মনে মনে করে বুড়ীটা সমুদ করব কাকে।
কুলি আছে কুলি কুদলির বিটি সমুদ করব তাকে।
এই মনে মনে করে বুড়ীটা তিনটি টাকা জোগাড় করিল,
আষাঢ় মাসের ব্যাঙের বাজনায় বুড়ী বেটার বিয়া দিল।
পাড়ার লোকে বলে বুড়ীটাকে কি কি গয়না দিলি—
বাঁক দিলাম বাঁকী দিলাম একটা চিন্তামণির কণা।
পাড়ার লোকে বলে বুড়ীটাকে থাক না বনের বাঘে—
কোন দিক থেকে এলে বুড়ীটা বৌটার সঙ্গে লাগে।
বৌটা করে মুখটা বাঁকা,
কোন কথা বলতে গেলে ঝাঁজকে উঠে শাঁখা।
রাগে মাগে বুড়ী তখন ছেঁড়া তলায় নিয়ে গেল কুলি মুড়া।
কুলি মুড়াকে যাইবে বুড়ী বিজয়া মাইকে ডাকে—
এই ভাই করিলাম বুড়ীর কাহিনী খাড়া,
দোহায় সন্ধ্যা মুড়া॥ —ঐ

৬

ওমা গঙ্গে গো ! গভীর গম্ভীরা বট,
তারিণী গো মা। ও মা গঙ্গে গো !
উত্তরেতে জানি আমি কত তাল জল,
ষাট তাল বেন্ধেছি আমি নৌকা না পড়িবে তল ॥
পশ্চিমেতে জানি আমি কত তাল জল,
সাত তাল বেন্ধেছি আমি নৌকা না পড়িবে বল ॥
পুবেতে জানি আমি ষোল তাল জল।
সাত তাল বেন্ধেছি নৌকা না পড়িবে তল ॥
দক্ষিণেতে কত জল তাহা নাহি জানি,
স্বর্গের থেকে পদ্মা বলে, আমি তাহা জানি ॥ —ঢাকা

মনসা-মঙ্গল

মনসার মাহাত্ম্য সূচক সুদীর্ঘ আখ্যায়িকা-গীতি মনসা-মঙ্গল নামে পরিচিত। ইহা লিখিত সাহিত্যের অন্তর্গত ইহলেও ইহাতে লৌকিক উপকরণ প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। সামান্য অংশ উদ্ধৃত হইল।

১

ভলে করে বাঁধরে বাসর ঘর, আমার কথা শুন বিশ্বেশ্বর,
যেন ঘরে রয় না ফুটো থাকবে কেবল কন্যাবর ॥—ধুয়া

লখিন্দর জন্ম নিল সনকা উদরে।
আকাশেতে দেবগণ পুষ্প বৃষ্টি করে ॥
পঞ্চম বয়সে তার হাতে দিল খড়ি।
পড়িতে পাঠায়ে দিল শিক্ষকের বাড়ী ॥
সুশীল সুশান্ত শিশু সবে ভালবাসে।
কেবল মনসা দেবীর দিবা নিশি হিংসে ॥
বিশ্বকর্মা ডাকি বলে, ওহে কর্মকার।
লখিন্দরের বিবাহ হেতু বাঁধ বাসর ঘর ॥

লোহার নির্মিত ঘর না রবে দুয়ার।
মনসার কোপে যাতে বাঁচিবে কুমার॥
শিব স্মরণে কর ঘর শুন হে বিষয়।
রোগীর অঙ্গের বিষ শিব স্মরণে নাই॥ —মুর্শিদাবাদ

মনসার জাত, জাত মঙ্গল

যাত্রা শব্দ হইতে জাত বা যাত শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। মনসার কাহিনী অবলম্বন করিয়া যে লৌকিক যাত্রা বা লোক-নাট্য রচিত হইয়াছে, তাহাই মনসার জাত। ইহাকে জাত-মঙ্গলও বলে। ইহা দীর্ঘ রচনা। সামান্য উদ্ধৃতি দেওয়া হইল।

১

দেবী চলিল রে আনন্দ অন্তরে,
ইন্দ্র সুরপুরী হইতে মেঘ আনিবারে॥ —বাঁকুড়া

২

কি আনন্দ কথা শুনি সুচম্পা নগরে।
লখিন্দর জন্ম নিল সনকা উদরে॥ —ঐ

৩

বাসর জাগায় রে কি দিব তুলনা,
দিনের মতন রাতকে করেছে চাঁদ বেনা॥ —ঐ

মনোহরসাহী

বাংলা কীর্তন গানের যে চারটি ধারা প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে মনোহর সাহী ধারা অন্যতম। নরোত্তম দাস ঠাকুর প্রবর্তিত কীর্তন গানের কঠিন গীতরীতির মধ্যে লৌকিক উপকরণ মিশ্রিত করিয়া যিনি কীর্তন গানে এক নূতন ধারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম মনোহর দাস আউলিয়া। তাঁহার নাম অনুসারেই কীর্তন গানের এই ধারার নাম মনোহার সাহী হইয়াছে। মনোহর সাহী ধারার প্রচারের সঙ্গে আরও একজনের নাম যুক্ত আছে, তিনি বংশীবদন ঠাকুর। বংশীবদন আউলিয়া মনোহর দাসের নিকটই কীর্তন শিখিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়।

মন্দারিণী

বাংলার কীর্তন গানের বিশিষ্ট একটি ঢঙের নাম মন্দারিণী। সরকার মন্দারণের কোন স্থান হইতে এই ধারাটির প্রবর্তন হয়, তাহা জানিতে পারা যায় না। খেতরি এবং পরে শ্রীখণ্ড এবং কাটোয়াতে মধ্যযুগে যে বৈষ্ণব মহোৎসব হইয়াছিল, তাহা হইতেই কীর্তন গানের মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হয় এবং তাহার ফলে গরাণহাটী কীর্তন গানের পদ্ধতি হইতে চারটি নূতন ধারার উৎপত্তি হয়, মন্দারিণী তাহাদেরই অন্যতম।

ময়নামতীর গান

নাথসম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্ভূত রাজমাতা ময়নামতীর জীবনীমূলক গীতিকার নাম ময়নামতীর গান। ইহার অন্যান্য নাম মাণিকচন্দ্র রাজার গান এবং গোপীচন্দ্রের গান। (পূর্বে গোপীচন্দ্রের গান দেখ)

মর্শিয়া গান

মুসলমান সমাজের মহরম উপলক্ষে কতকগুলি গান গাওয়া হয়। তাহাদিগকে মর্শিয়া গান বলে ইহাদিগকে মহরমের গানও বলা যায়।

১

বাজিল রণের ডঙ্কা সাজিল কাসেম আলী,
ঢাল নিল, খঞ্জর নিল সাজাইল ঢুলঢুলি।
কাঁদিয়া কহে মাজান, শুনরে, বাপ, আমার কথা।
আজকে রণে যেয়োনা, বাপ, এজিদা কাটবে মাথা।
কাসেম বলে, মামাজি গো, শুনবো না তোমার কথা।
যে দাগা দিয়াছে এজিদ কাটিব তাহার মাথা।
হোসেন বলে, ও বাপ কাসেম, আয়রে, বাবা, আয় ফিরে।
ভায়ের সত্য পালন করি সখিনার সঙ্গে দেয় বিয়ে। —বীরভূম

২

এলো রে মহরমের চাঁদ মোমিন লোকের কোঠিন দিন।
হোসেনের নামেতে সবে রোজা রাখ দশ দিন।

হোঁসেনের নামেতে যেবা চোখেতে ফেলে পানি।
আখেরেতে তরাইবে রশুল রতনমনি। —ঐ

৩

কাসেম আব্দুলা কাঁদে পেয়ে তারা মনে দুঃখ,
কাঁদনা শুনে তাদের ফেটে যায় সবার বুক।
বাপের মুখে মুখ দিয়া করে সবে হায় হায়,
আগেতে দেখ না সবে মোর দুনিয়া অন্ধকার। —ঐ

৪

হোসেনকে ঐ এজিদা কি দোষে হয়রান কোলে।
কি দোষে হাসেন সাহাকে ময়মুনা জহর দিলে।
কি দোষে ময় মুন চিঠি লেখে জিয়াদ কমিন,
কি দোষে খঞ্জর মালি ওরে শিমর লান্নতি।
কি দোষে তীর মারলি, ওরে কাফের কমিনা।
ফোরাত নদী বন্ধ কলি পানি কেন দিলি না।
পানি পানি করে মল যত ছিল মোমেনা।
ঐ এজিদা হারামজাদা আখের দিনকে ভাবলি না।
নবীর বংশ ধ্বংস কলি শূন্য কলি মদিনা। —ঐ

৫

কাঁদিয়া কদবানু বলে, শুন, ইমাম পানি চায়,
পানি বিনে মায়ের কোলে দুধের আসগর প্রাণ হারায়।
হোসেন আলি কোলে তুলি আসগরে লইয়া যায়,
কাফের যেথায় হাঁকিয়া কয় থোড়া পানি দাও আমায়।
সে হাঁক শুনে কাফেরানে লক্ষ্য করে বক্ষকে।
মারিল তীর বিঁধিল সেই আসগরের কচি বুকে।
কাঁদিতে কাঁদিতে হোসেন ছেলে দিল বানুকে,
শহীদের সরবত খেয়ে আসগর আলি ঘুম গেছে। —ঐ

মহরমের গান

মহরম উৎসব উপলক্ষে নানাপ্রকার গান গাওয়া হয়, তাহাদের সুর তাল বিভিন্ন। কারণ, মহরমের বিষয়-বস্তুর মধ্যে বীর রস এবং করুণ রস উভয়েরই সংমিশ্রণ হইয়াছে।

১

ময়দানেতে সেরা তাঁবু হোসেন যখন গাড়িল,
আসমান কাঁদে জমিন কাঁদে, হায় গো, আল্লার কি হইল।
খুটলে জমিন লউর উঠে তাই না দেখে হোসেন বলে,
ইহাই দোস্তর কারবালা,
বলে গেছে নানা নবি যেহাদে যাবার বেলায়। —নদীয়া

২

দশরথ মহরমে গেলেন সাহা ময়দানে,
কুনের সাগরে সাঁতার দিলেন ইমামবাড়া বলে।
ও সে কারবালা ময়দানে পুঁচালে
সাহার বানু কেঁদে কয় হায়গো আল্লা, হায়গো আল্লা। —ঐ

মন্ত্রের গান

অনেক সময় গান গাহিয়া সাপে কাটার ঝাড়ফুকের মন্ত্র বলা হয়।

শুন শুন বিষ শুন দিয়া মন,
প্রহ্লাদ করিল রক্ষা দেব নারায়ণ।
অল্প বুদ্ধি শিশুমতি কিছুই না জানে,
হরি হরি সদাই মত্ত হরিনামে।
সকলের বিষদৃষ্টি হইল প্রহ্লাদ,
পুত্র হয়ে শত্রু হলি বড়ই প্রমাদ।
দেব হস্তীর পদতলে দিল ফেলাইয়া,
হরিনামের বলে প্রহ্লাদ আইল উঠিয়া।
অগ্নির কুণ্ডে প্রহ্লাদে ফেলে দিল,
মহাভক্ত বলে ব্রহ্মা কোলে তুলে নিল।

বিষ পান করাইল, প্রহ্লাদ না জানে,
মরিবিরে, প্রহ্লাদ, এই বিষ পানে।
না মরিল প্রহ্লাদ দেখে হলো ভয়,
তুলে নিয়ে ফেলে দিল পর্বত গুহায়।
পর্বত গুহায় হরি কোলে তুলে নিল,
বাঁচিল রে প্রহ্লাদ হরি হরি বল।
বড় অভিলাস মনে হরি আরাধনে,
থাকিব না ছার গৃহে যাইব কাননে।
ওরে ওরে, ভাই, মাকে বলো গিয়ে,
তোমার প্রহ্লাদ গিয়েছে সন্ন্যাসী হইয়ে।
সেই কথা শুনে মাতা না করে রোদন,
হরি হরি বলে প্রহ্লাদ চলিলেন বন।
সেই কথা মাকে গিয়ে বলে বালকগণে ;
তোমার প্রহ্লাদ গিয়েছে হরি-আরাধনে।
কি শুনালি, ওরে বালক, কি শুনিলাম কানে,
জীবন প্রহ্লাদ গিয়েছে হরি আরাধনে।
কোথা যাস্ প্রহ্লাদ মায়েরে ছাড়িয়া,
দুঃখিনী মাতা রহিল পড়িয়া।
শুন শুন, ভগবান, দেবচক্রপাণি,
দুধের বালক মোর দংশিলা ফণি।
যে মতে বাঁচালো হরি প্রহ্লাদের প্রাণ।
সেই মতে বাঁচাও আজ অমুকের প্রাণ।
নাই বিষ বিষহরির আজ্ঞায়
নাই বিষ্ বিশ্বনাথ ধর্মের আজ্ঞায়। —মুর্শিদাবাদ

মহীপালের গান

'ধান ভানতে মহীপালের গীত' বলিয়া একটি প্রবচন বাংলায় প্রচলিত আছে। চৈতন্য-ভাগবতেও যোগীপাল, ভোগীপাল ও মহীপালের গীতের উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রকৃত তাহা কি, জানিতে পারা যায় না। নিম্নোদ্ধৃত গীতটিকে কেহ কেহ পাল রাজা মহীপালের গীতের একটি অংশ বলিয়া মনে করেন।

শুন শুন সবে মহীপালের গীত।
শুনলে পরে গো হয় সবাকার হিত॥
মহীপাল রাজার দুক্ষ দেখ্যা পরাণ কাঁদে রে,
হায়, হৈল কি মহীপালের ঘরণী ধূলায় গড়ায় রে॥
মহীপালের বাড়াবাড়ীত জমিদার উঠ্‌ল ক্ষেপ্যা।
হরা মোড়লের মাও মৈল খাঁপ্যা খাঁপ্যা॥
মহীপাল আর পোজার হৈল লড়াই।
ও ভাইরে, এমনত কোনও দিন শুনি নাই॥
কুরুক্ষেত্তরের লড়াইর মত ধরম যুদ্ধ হৈল।
মহীপালের ছিল সেনাপতি সেই শেষে পোজার পক্ষ নিল॥

—রাজসাহী

২

রাজা পোজায় দুয়ে শুন সবে মন দিয়া।
চাষী কৈবত্ত দিবুক রাজা দিল মইপালক হটাইয়া॥
দিবুক রাজার জয় হৈল, দিকে দিকে স্বর পৈল,
পোজা সব হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।
পোজারা আবার বাঁধল বাঙেলা ঘর,
গাঙে গাঙে লাও আবার ভাসে॥
দিবুক যৈবন গেল॥
তারি ভাইপুত ভীম রাজা হৈল॥
ভীম রাজার কীর্তি কথা শুনলে পুণ্যি হবে বহু।
সিঠাইপুরের ভীম সায়র তারি কীর্তি হৈল॥ —ঐ

৩

হরগৌরীর ভক্ত রাজা ভীম সবাই তোমরা জান।
সুক লাগ্যা ঘরে ঘরে কর আঘনের লবান॥
দিবুক রাজা সগ্‌গে গেল,
চাঁদ সুরুয রাজা ভীমের কীর্তি দেখল সগ্‌গে গেল তালি।
মইপালের গীত শুন্‌তে শুন্‌লে তোমরা পুণ্য কাইনী
আমার কথা ফুরলি॥ —রংপুর

মহুয়া

পূর্ব মৈমনসিংহ হইতে সংগৃহীত একটি পালা গানের নাম মহুয়া। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'মৈমনসিং গীতিকা'য় ইহা স্থান পাইয়াছে। কাহিনটি এই—

বেদের দলের সর্দারের নাম হুমরা। একবার সে তাহার দলবল লইয়া ধনু নদীর তীরে কাঞ্চনপুর নামক গ্রামে আসিয়া পৌছিল। সেই গ্রামের এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের একটি শিশুকন্যা ছিল, হুমরা তাহাকে চুরি করিয়া পলাইয়া গেল। কন্যাটিকে হুমরা নিজের সন্তানের মত করিয়া লালন পালন করিতে লাগিল, তাহার নাম রাখিল মহুয়া; তাহাকে নানা ক্রীড়া-কৌশল শিখাইল। তাহাকে লইয়া দেশ বিদেশে খেলা দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল। মহুয়া যৌবনে পদার্পণ করিল, তাহার সৌন্দর্য সকলকে মুগ্ধ করিল। হুমরা তাহার দল লইয়া একবার বামনকান্দা নামক এক গ্রামে গিয়া পৌছিল। তরুণ ব্রাহ্মণ যুবক নদের চাঁদ সেই গ্রামের তালুকদার; তাহার গৃহে বেদের দল খেলা দেখাইয়া আসিল। নদের চাঁদ মহুয়াকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল। মহুয়াও নদের চাঁদকে দেখিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। নদের চাঁদ বেদের দলকে সেই গ্রামে বাস করিবার জন্য বাড়ী ও জমি দিল—তাহারা যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করিয়া সেই গ্রামেই বাস করিতে লাগিল। নিভৃত স্থানে মিলিত হইয়া নদের চাঁদ ও মহুয়া পরস্পরের প্রতি প্রণয় নিবেদন করিল। হুমরা তাহা জানিতে পারিয়া একদিন দলবল সহ মহুয়াকে লইয়া গ্রাম হইতে পলাইয়া গেল। নদের চাঁদ মহুয়ার সন্ধান করিবার জন্য গৃহত্যাগ করিল, বহু অনুসন্ধানের পর তাহার সাক্ষাৎ পাইল। হুমরা তাহাকে দেখিতে পাইয়া মহুয়াকে তাহার প্রাণবধ করিতে বলিল, কিন্তু তাহার পরিবর্তে মহুয়া নদের চাঁদকে লইয়া বেদের দল ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। পথিমধ্যে এক সদাগর নদের চাঁদের প্রাণবধ করিবার চেষ্টা করিয়া মহুয়াকে লাভ করিতে চাহিল। মহুয়া কৌশলে সদাগরেরই প্রাণনাশ করিয়া পলাইয়া গেল। অনেক অনুসন্ধান করিয়া মহুয়া মৃতপ্রায় নদের চাঁদের সন্ধান পাইল; মহুয়া পুনরায় এক ভণ্ড সন্ন্যাসীর কবলে পড়িল। কোনমতে রুগ্ন নদের চাঁদকে কাঁধে লইয়া সন্ন্যাসীর আশ্রয় হইতে মহুয়া পলাইয়া গেল। কিছু দূরে গিয়া তাহারা একস্থানে সুখে বসবাস করিতে লাগিল। এমন সময় তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিতে করিতে বেদের দল আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। হুমরা নদের

চাঁদকে বধ করিবার জন্য মহুয়ার হাতে বিষলক্ষের ছুরি তুলিয়া দিল, মহুয়া সেই ছুরি নিজের বক্ষে বসাইয়া দিয়া প্রাণত্যাগ করিল। সেই মুহূর্তে বেদের দল নদের চাঁদের প্রাণনাশ করিল। তারপর সেইখানেই দুইজনকে এক কবরের মধ্যে স্থাপন করিয়া তাহারা ফিরিয়া গেল। কেবল মহুয়ার আজন্ম সুখদুঃখের সঙ্গিনী পালঙ্ সই সেইখানে লুটাইয়া পড়িয়া চোখের জলে কবরের মাটি ভিজাইতে লাগিল।

মলুয়া

পূর্ব মৈমনসিংহ হইতে সংগৃহীত 'কুড়াশিকারীর গান' নামক পালা গানটি 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় মলুয়া নামে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার কাহিনীটি এই—চাঁদ বিনোদ প্রতিবেশী গ্রামের মোড়লকন্যা মলুয়াকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল। কিন্তু সে অর্থহীন। সেইজন্য মলুয়ার পিতা তাহার হাতে কন্যা সম্প্রদান করিতে চাহিল না। সে অর্থোপার্জনের উপায় সন্ধান করিতে লাগিল। অবশেষে বিদেশ হইতে প্রচুর অর্থ অর্জন করিয়া দেশে ফিরিল, এইবার আর মলুয়ার পিতা তাহার নিকট কন্যা সম্প্রদান করিতে আপত্তি করিলেন না। বিনোদ মলুয়াকে বিবাহ করিয়া নিজের গৃহে তুলিল। একদিন কাজি মলুয়াকে দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হইল ; এক কুট্টিনী নারী তাহার নিকট পাঠাইয়া তাহার পাপ-অভিলাষ ব্যক্ত করিল। মলুয়া কুট্টিনীকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিল। মিথ্যা দেনার দায়ে কাজি এইবার বিনোদের জমিজমা বাজেয়াপ্ত করিয়া লইল, ফলে বিনোদের সংসারে পুনরায় দারিদ্র্য দেখা দিল। শাশুড়ীকে লইয়া সুতা কাটিয়া পরের বাড়ীতে ধান ভানিয়া মলুয়ার দিন কাটিতে লাগিল। কাজি এইবার এক নূতন বিপদের সৃষ্টি করিল—বিনোদের উপর এক পরওয়ানা জারি করিয়া নির্দেশ দিল, 'সাতদিনের মধ্যে তোমার সুন্দরী স্ত্রীকে দেওয়ান সাহেবের হাউলিতে লইয়া উপস্থিত কর, নতুবা তোমাকে জীয়ন্তে কবর দেওয়া হইবে।' বিনোদ আদেশ অমান্য করিল। কাজির পাইক-পেয়াদা বিনোদকে জীয়ন্তে কবর দিতে লইয়া গেল, মলুয়াকে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেওয়ান সাহেবের অন্তঃপুরে উপস্থিত করিল। মলুয়ার পাঁচ ভাই বিনোদকে বাঁচাইল ; কিন্তু মলুয়ার উদ্ধার করিতে পারিল না। কৌশলে নিজের নারীধর্ম রক্ষা করিয়া মলুয়া তিন মাস পর দেওয়ান সাহেবের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইল ; কাজির শূলদণ্ড হইল।

কিন্তু বিনোদের আত্মীয়গণ মলুয়াকে গৃহে লইতে অস্বীকার করিল। বিনোদ আত্মীয়-স্বজনের কথায় মলুয়াকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় বিবাহ করিল। মলুয়া স্বামিগৃহ পরিত্যাগ করিল না, সেইখানেই দাসীবৃত্তি করিতে লাগিল। একদিন বিনোদকে সর্পে দংশন করিল, বাঁচিবার কোন আশা রহিল না; মলুয়া তাহার পাঁচ ভাইয়ের সহায়তায় তাহাকে বাঁচাইল। তথাপি আত্মীয়-স্বজন তাহাকে গৃহে লইতে নিষেধ করিল। বাঁচিয়া থাকিলে স্বামীর কলঙ্ক ঘুচিবে না মনে করিয়া মলুয়া নদীর জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিল।

মাগনের গান

প্রধানত পৌষ সংক্রান্তির সময় গৃহে গৃহে মাগন সংগ্রহ করিবার কালে যে গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাকে মাগনের গান বলে। তবে ইহাদের মধ্যে গান অপেক্ষা ছড়ার বৈশিষ্ট্যই অধিক প্রকাশ পায়। সেইজন্য ইহারা মাগনের ছড়া বলিয়াই সাধারণত পরিচিত।

মাঘমণ্ডল ব্রতের গান

মাঘ মাসে পূর্ববাংলার কুমারী মেয়েরা যে মাঘমণ্ডল ব্রত নামে সূর্যের এক ব্রত করে, তাহাতে এক শ্রেণীর ছড়া শুনিতে পাওয়া যায়, কচিৎ তাহা গানের সুরও গীত হয়, তাহাকে মাঘমণ্ডল ব্রতের গান বলা যায়। তবে ছড়ার বৈশিষ্ট্যই ইহাদের মধ্যে অধিক প্রকাশ পায়।

সূর্যের ঘুম ভাঙানির গান—

উঠ উঠ, সুরুযাই, ঝিকিমিকি দিয়া।
তোমারে পুজিব আমি রক্ত জবা দিয়া॥
উঠ উঠ, সুরুযাই, ঝিকিমিকি দিয়া।
উঠিতে না পারি আমি হিমালীর লাগিয়া॥
উত্তর আলা কদম গাছটি দক্ষিণ আলা বাওরে।
গা তোল গা তোল সূর্যাই ডাকে তোমার মাওরে॥
শিয়রে চন্দনের বাটি বুকে ছিটা পড়েরে।
গা তোল গা তোল সূর্যাই ডাকে তোমার মাওরে॥ —ফরিদপুর

মৎপ্রণীত 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' ৪র্থ সংস্করণ (১৯৬৪) পৃঃ ৭৬৭—৭৭৩ দ্রষ্টব্য।

মাঝির গান

যে প্রেম-সঙ্গীতের নায়ক মাঝি বা নৌকার চালক, তাহাকে কখনও কখনও মাঝির গানও বলে।

১

ওরে, রঙ্গিলা মাঝি, কি গান গাও আজি,
কি বাজাও এত বাঁশী।
ওরে রঙ্গিলা মাঝি, কি ডাক ছাও ঐ সুরে।
আমার পরাণডা কেমন করে।
কি গান গাও রূপসী নদীর বুকে।
জলে আগুন গো বিরহণীর বুকে।

মাঠের গান

মাঠে চাষের সময় যে গান গাওয়া হয়, তাহাই মাঠের গান। তাহা কর্মসঙ্গীত। প্রেমের ভাব ইহাদের মধ্যে ব্যক্ত হয়।

১

পথে চলিতে ওগো, কত নিষ্ঠুর হয়, সখি,
কুল লিল সেই নাগর, সখি। —বেলপাহাড়ী (ঝাড়গ্রাম)

২

ঘরের বাদী ননদিনী।
বাইরের বাদী লোক রে।
যবুনার লদীর বাদী শ্যাম রে ॥ —ঐ

৩

সরল দেখে প্রেম করিলাম।
বধু, কেন এত নিঠুর হলে ?
দেখা পালে ফিরেও তুমি চাও না,
দেখা পালে মুখেও তো শুধাও না ॥
অবলারে শেল দিয়া কখন ভালো হবে না ॥ —বাঁশপাহাড়ী

৪

এসেছি পথ ভুলে।
বসে আছি নদীর কুলে ॥

ওগো, যাবার বেলা হলো আমার
হিদয় মাঝে উদয় না হলো ॥ —ঐ

৫

এক খিলি পান ছিল।
দোক্তাতে মিশায়ে নিলে গো ॥
দেখা দেখি হলো সার।
কবে আসিবে বধূ আর ॥

৬

তোর বেগুন চাই না আমি।
হাটের বেগুন সস্তা ॥
দেখা দেখি হল সার।
কবে আসিবে বধূ আর ॥ —ঐ

৭

পাঞ্জরের পোষা পাখী,
কোন দিন ছেড়ে যাবে।
পালাবে সে গগনে ॥
ও ভাব করবে সাবধানে।
ও বিদেশীর সনে ॥ —ঐ

৮

কুথা যাবে, গো! বঁধু,
ভাসে সরোবর ॥
সুখেও প্রাণ কাঁদে, সখি ॥
ও যে ফির গো সাগর। ঐ

৯

ও পার বাঁধে গাই ছেড়েছে।
নামো বাঁধে গাই ছেড়েছে ॥
পাত্‌তু লিবার লোচনা করে।
যাবে রাই এর বাড়ী ॥ ঐ

মাণিক চাকলাদার ও কমলার পালা

পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলে মাণিক চাকলাদার ও কমলার পালা নামে এক পালা গান শুনিতে পাওয়া যায়। কাহিনীটি এখানে উল্লেখ করিতেছি—কমলা মাণিক চাকলাদারের কন্যা। তাহার বিবাহের বয়স হইয়াছে, তাহার মত সুন্দরী বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। মাণিক চাকলাদারের এক কারকুন (হিসাব-রক্ষক কর্মচারী) তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল, তাহাকে লাভ করিবার জন্য চিকন গয়লানী নামক এক কুট্টিনীকে তাহার নিকট পাঠাইল। কমলা গয়লানীকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল। কারকুনের ক্রোধ বাড়িয়া গেল, সে দেশের রাজার নিকট চাকলাদারের বিরুদ্ধে এক মিথ্যা সংবাদ দিল যে, চাকলাদার মাটি খুঁড়িয়া বহু মোহর পাইয়াছেন, তাহা নিজে একাই ভোগ করিতেছেন। মোহরের লোভে রাজা চাকলাদার ও তাঁহার একমাত্র পুত্রকে বন্দী করিলেন। তারপর কারকুন নিজেই চাকলাদারীর সনদ লইয়া মাণিকের সম্পত্তি অধিকার করিয়া লইল। বিপন্ন কমলা মাতাকে লইয়া মাতুলালয়ে চলিয়া গেল। সেখানেও কমলার মাতুলের নিকট কারকুন এক পত্র লিখিয়া জানাইল যে, কমলা ব্যভিচারিণী, তাহাকে গৃহে স্থান দিলে তিনি সমাজচ্যুত হইবেন। এই পত্র পাঠ করিয়া কমলা একাকিনী গৃহত্যাগ করিয়া গিয়া এক বৃদ্ধ মইষাল বা মহিষ-পালকের আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেখানেই তাহার দিন কাটিতে লাগিল। একদিন রাজার ছেলে মইষালের গৃহে কমলাকে দেখিল, দেখিয়া মুগ্ধ হইল; মইষালকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া কমলাকে সঙ্গে লইয়া রাজবাড়ীতে গেল। রাজার ছেলে কমলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার নিকট নিজের সুগভীর প্রণয় নিবেদন করিল। কমলা বলিল, 'সময় মত পরিচয় দিব, এখন নহে।' প্রত্যহ রাজার ছেলে কমলাকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, কমলা তাহাকে অপেক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ জানায়। একদিন রাজবাড়ীতে পূজার বাদ্য বাজিতে লাগিল। কমলা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, নরবলি দিয়া রাজা রক্ষাকালীর পূজা করিবেন—বন্দী পিতাপুত্রকে দেবীর নিকট বলি দেওয়া হইবে। কমলা সকলই বুঝিতে পারিল। রাজার ছেলেকে ডাকিয়া বলিল, 'আজ আমার পরিচয় দিব, তাহার পূর্বে আমার কথার সাক্ষি-স্বরূপ চিকন গয়লানী, কারকুন, মামা, মাসী, বৃদ্ধ মইষাল ইহাদিগকে রাজ-দরবারে হাজির

কর।' তাহাদিগকে রাজার সম্মুখে হাজির করা হইল, কমলা রাজার সম্মুখে সকল বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল। শুনিয়া রাজা মাণিল চাক্‌লাদার ও তাঁহার পুত্রকে মুক্ত করিয়া দিয়া কারকুনকে দেবীপুজায় বলি দিবার জন্য আদেশ দিলেন। রাজার ছেলের সঙ্গে কমলার বিবাহ হইল।

মাণিকপীরের গান

পীর বা মুসলমান ফকির দরবেশদিগের অলৌকিক মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া যে সকল গীতি-কাহিনী রচিত হইয়াছিল, মাণিক পীরের গান তাহাদের অন্যতম। ইহারা কাহিনীমূলক গীতি।

১

আসমানেতে ম্যাঘের খেলা করে সিংহনাদ,
আর দিনের বেলায় স্থর্য্যি ওঠে রাত্তির বেলায় চাঁদ।
পাহাড়ের প্রকাণ্ড হাতী শিকলি বাঁধা পায়;
আর ঘর জামায়ে শ্বশুরবাড়ী মেগের লাথি খায়।
কত কেরামত জান রে, বান্দা, কত কেরামত জান,
মাঝ দরিয়ায় ফেলে জাল, ডাঙ্গায় বসে টান।
দুদীর ছাওয়াল কার্তিক, রে ভাই, মোরগ চেপে যায়,
আর পুজো পালি বাঁজা বিবির ছাওয়াল করে দেয়।

* * *

ষাড়ের মাথায় শিং দিয়েছে মান্‌ষির মাথায় কেশ
আল্লা আল্লা বল রে, ভাই, পালা করলাম শেষ। —নদীয়া

২

বেগম, বেগম, বলে মাণিক ছাড়িল জিগির।
কানুঘোষের মা বলে, এলো সত্যপীর।
কানুঘোষের মা আর নন্দঘোষের ঝি,
বলে—সকালে এসেছে ফকির ভিক্ষে দিব কি ?
—চাল কড়ির ফকির নই, মা, চাল কড়ি নিব ;
একটুখানি দুগ্ধ পেলে দোয়া করে যাবো।
যার যেমন ভাগ্য, মাগো,—তেমনি করবে দান,
গোয়ালেতে বাড়বে গরু বংশে বাড়বে মান॥ —২৪ পরগণা

মাঝি গান

সাঁওতালী ঝুমুর নাচের গানকে মাঝি গান বা মাঝি নাচের গানও বলে। মাঝি শব্দের অর্থ এখানে মণ্ডল বা গোষ্ঠীর প্রধান বা নায়ক। তাহার গৃহাঙ্গনেই সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয় বলিয়া এই গানকে মাঝি গান বলে। সাঁওতাল-দিগকে সাধারণভাবে মাঝি বলা হয়, তাহা হইতেই সাঁওতালি ঝুমুর গানকে সাধারণভাবে মাঝি গান বলে।

মাণিক্য মিত্রের গান

উত্তর বাংলায় মাণিক্য মিত্রের গান নামে এক পালা গান প্রচলিত আছে। ইহার কাহিনীটি সংক্ষেপে এই—এক রাজপুত্র, নাম হীরাধর। তাহারা চারি বন্ধু মিলিয়া বিদেশে যাত্রা করিয়াছেন। এক সরোবরের তীরে আসিয়া তাহারা স্নান ও শৌচাদি করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তাহারা তীরে বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া জলে নামিলেন। প্রথমে মদনমন্দার স্নান শেষ করিয়া তীরে উঠিয়া বস্ত্র পরিলেন, তিনি রাজপুত্রের বস্ত্রের মধ্যে তাঁহার বহুমূল্য মাণিক্যটি দেখিতে পাইয়া তাহা হরণ করিয়া নিজের উরু চিরিয়া তাহার মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। রাজপুত্র সকলের শেষে স্নান সমাপন করিয়া তীরে উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার মাণিক্য নাই। বন্ধুবিচ্ছেদের ভয়ে তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহারা মণিপুর রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মণিপুরের রাজকুমারীর নাম মদনমঞ্জরী। তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী। তিনি কৌশলে বন্ধুবিচ্ছেদ না ঘটাইয়া হীরাধরের মাণিকটি উদ্ধার করিয়া দিলেন। রাজপুত্রের সঙ্গে তাহার এবং রাজপুত্রের আর তিন বন্ধুর সঙ্গে রাজকন্যার তিন সখীর বিবাহ হইল।

এই সুদীর্ঘ গীতি কাহিনীর প্রথমাংশটি এইরূপ :

বেহার নগরে নৃপ শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ।
দানী মানী বিদগ্ধ যুবক পঞ্চানন॥
দানে কর্ণ হরিশ্চন্দ্র সকলে কহয়।
পূর্ণচন্দ্র হেন যুদ্ধে চাহন না যায়॥

ধর্মমন্ত শান্তমূর্তি সকলে কহয়।
বুদ্ধিত ভক্তিত বৃহস্পতি সমলয়॥
মন্ত্রী বহুসমে রাজা ধর্মক করিয়া।
আনন্দে থাকয় নিজ কীর্তি প্রকাশিয়া॥ —গোয়ালপাড়া

মাদার-নামা সারী গান

মাদার শাহ্ পীরের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া এই গান রচিত হইয়াছে—

আল্লা আল্লা বল বান্দা মুর্শীদত্ত ভাবনা,
যেখানে আলাজীর নাম সেইখানে বেহস্ত্‌খানা।
আলি আলম্ বাপ গোমত আসিয়া পৌছিল,
নবীজীকে খবর দিতে বেল্লালও চলিল।
বড় খুসী হইল নবী পাইয়া সমাচার,
সেইখানেতে বসেছিল বন্দে সমাদ্দার।
মাদার বলে, ওগো নানা, শুন মনেরই যন্ত্রণা,
তোমরা যা পড়িবে নামাজ আমি তো যাব না,
বেগোসোলে নাম নিলে শের কাটা যায়,
তার সঙ্গে পড়িবে নামাজ সে তা সঙ্গে যায়।
চার এয়ারে খাতির করে বড় পীরের তরে,
গোসাদেলে নাহি বসে বিছানা উপরে।
বৃক্ষের উপরে যেমন ঘেরে তরুলতা,
আজ দেখি মাদার তোমার মোটা মোটা কথা।
পরের পোষ্য পুত্র তোরে আনল কে,
তোর আদি গোঁড়ার খবর মাদার, আমার সঙ্গে লে,
একদিন আলি সাহাজ জঙ্গলেতে গিয়ে,
সারাদিন হয়রানেতে জঙ্গলেতে ফিরে।
আলি তোকে আনলাম ঘরে করিয়া যতন,
দিবস কতক ফতেমা তোকে করেছে পালন।
এমামকে তুই ভাই বলিস্ কোন ওয়াছ তা,
ফতেমা জহুরা হয় তোর কোন সম্বন্ধে মা,

মালসা গান

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মালশ্রী রাগিণীকে বাংলায় মালসী বলে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামপ্রসাদ যে এক শ্রেণীর ভক্তিমূলক শ্যামাসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণত মালসী রাগিণীতে গাওয়া হয় বলিয়া সাধারণ ভাবে তাহা মালসী গান বলিয়া পরিচিত। মালসী গানে শাস্ত্রীয় মালশ্রী রাগিণী ব্যবহৃত হয় না। তাহার সঙ্গে বাংলার লৌকিক রাগরাগিণী মিশ্রিত হইয়া এক নূতন সুর সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাই মালসী বলিয়া পরিচিত। (শ্যামাসঙ্গীত বা ভক্তিসঙ্গীত দেখ)

মারফতী গান

মধ্যযুগের বাংলা সূফী সাধকগণ রচিত এক শ্রেণীর ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক গান মারফতী গান বলিয়া পরিচিত।

১

দিন গেল তোর মিছা বড়াই কর না,
(মন পাগলা রে) গুরু বোঝ না।
অহো রে অবোধ মন, বুঝ গুরুর শ্রীচরণ,
নৌকা সাজাইয়া রে কিবা রঙ চাইয়া রে,
নৌকা খুলিয়া দেশে চল না (মন পাগলা রে)।
দুনিয়ার সকল ফাঁকি, আর কেন বৈসা থাকি,
দুনিয়াদারী ছাইড়া রে গুরুর নাম লইয়া রে,
মাওলার দেশে এবার চল না (মন পাগলা রে) —চট্টগ্রাম

ভবে আপনা তোর কেহ নাই,
ভাবি চাও রে দুনিয়াতে আপনা কে ভাই।
মা বাপ ত নয় রে আপন জনম দিল সার,
ছেমর বানাই ছাইড়ল যখন দুনিয়া আঁধার।
ভাই ত আপনা নয় রে একই বিন্দুর কায়া,
পরের মাইয়া ঘরে আনি ছাইড়ল ভাইয়ের মায়া

তিরি ত আপনা নয় রে রথের কামাই খায়,
কঠোর একটা কথা কইলে রাঁড়ী হৈত চায়।
ছাবাল ত নয়রে আপন রক্ত দিয়া পুষি।
মনের কথা বুঝে নারে কারে করি দোষী।
পাড়া পড়শী নয়রে আপন বাক্য বানায় সার,
ছেমর দুঃখীরে ধরি করে ছারখার।
পীর মুরশিদের কথা কিছু বুঝি না রে ভাই,
বেগানা দুনিয়ার মাঝে কোন দোসর নাই। —ঐ

৩

মন আমার চিনির বলদ চিনি বয়, চিনে না চিনি,
ও! ভুলে কল্লি না একদিন চিনির সাথে চিনা চিনি।
কার কি কুমন্তনা পেলে, ঘোল খেতে চাও মাখন ফেলে,
ওহে! বুঝবে মজা নোকরি পেলে,
(তখন) সার হবেই শুধু কাঁদুনী,
ওহে! সোনার কমল গেছ ভুলে, মজে আছ শুকনো ফুলে ;
আবার সোজা পথে কাঁটা দিলে, কি সাহসে বল শুনি।
ওহে! জমির বলে অবোধ মন, বাঁচবে যদি চিনি চিন,
কেন কড়ি দিয়ে জহর কিন, আপন হাতে খাও আপনি।

—মৈমনসিং

মাহুত বন্ধুর গান

যে প্রেম-সঙ্গীতের নায়ক মাহুত বা হস্তীর চালক, তাহাতে মাহুত বন্ধুর গান বলে। এই শ্রেণীর গান আসামের গোয়ালপাড়া, উত্তর বাংলার জলপাইগুড়ি এবং পূর্ব বাংলার চট্টগ্রাম অঞ্চলে শুনিতে পাওয়া যায়।

১

হস্তী কন্যা হস্তা কন্যা বামুনের নারী
মাথায় নিয়া তাম কলসী ও সখি হাতে সোনার ঝারি ও
ও মোর হস্তী কন্যা খানিক দয়া নাই মাহুতক লাগিয়া রে।

পাত্তিরা করিয়া হস্তী বারেয়া দিলং পাও,
মাথার উপর কাল জেঠি, সখি, করে পঞ্চ রাও।
ফাঁন্দ লাদিলং ফারা লাদিলাম লাদিলাম ভাতের হাড়ী,
মাহুত ফান্দী যুক্তি করিয়া ও গেইলাম শিকার বাড়ী।
আইও ছাড়িলাম ভাইও ছাড়িলাম ছাড়িলাম সোনার পুরী,
বিয়াও করিয়া ছাড়িয়া আসিলামও অল্প বয়সের নারী।
বালু টিল টিল পঙ্খী কান্দে বালুতে পড়িয়া,
কোচবেহারীয়া মাহুত কাঁন্দে, ও সখি, ঘর বাড়ী ছাড়িয়া।
আগারি পিছারি হস্তীর ফেলাইলাম বান্ধিয়া।
হরিনাম নিয়া সখি বসিলাম ভিড়িয়া॥ —কোচবিহার

মিলন গান

রাধাকৃষ্ণের মিলন বিষয়ক গানকে মিলন গান বলা হয়—

১

সুন্দরী রাধিকার সনে মিলিল কানাই গো,
সুন্দর সুন্দর কথা কইয়্যা॥
ময়ুর বলে, ও ময়ুরী, আয় ত্বরায় করিয়া
আমরা দোহা জনে নৃত্য করবো পেথম ধরিয়া গো॥
শুক বলে, ও সারী, আয় ত্বরায় করিয়া
আমরা দোহা জনে গান করিব ঘুরিয়া ঘুরিয়া গো,
সুন্দর সুন্দর কথা কইয়্যা॥ —নদীয়া

মুকুট রায়ের পালাগান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যায় 'মুকুট রায়' নামক একটি পালা গান সংগৃহীত হইয়াছে (পৃঃ ১৩৩—১৫৪)। দক্ষিণ মুলুকের রাজা মুকুট রায়ের বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত। ইহার একটু নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১

শিশুই রাজা আছিল, ভাইরে, ও ভাই, দক্ষিণ মুলকে ঘর,
হাইকো হাজারী পাইকো পাছারী পুরান্দর॥

লোকলস্কর, আরে ভাই, খেজমতকার না যায় গণন।
হাতী ঘোড়া লাখ বিলাখ গুণ সভাজন॥

২

আরে ভাইরে—
সাত জঙ্গল তের নদী দুরন্ত হাওররে।
পার হইয়া যায় কুমার নেয়াজা সহরে॥
নেয়াজা হইয়া পার রে পুর্বমুখী চলে।
বেইল ভাটি দখিল হইল বেহুরা জঙ্গলে॥
ভাইরে ভাই—
মুখের বরণ কন্যার সোনা চাম্পা কলি।
দুই হস্ত তুলছে কন্যার বেলাইনাত বেলি॥
পিষ্ঠেতে বাহিয়া পড়ে উদাম দীঘল চুল।
দুইত কন্নেতে শোভে ধামনার ফুল॥

মুর্শীদ্যা গান

মুর্শীদ শব্দের অর্থ গুরু। মুসলমান পীর ফকিরদিগের গান সাধারণভাবে মুর্শীদ্যা গান বলিয়া উল্লেখিত হয়। হিন্দু সমাজের এই শ্রেণীর গান গুরুবাদী সঙ্গীত (পুর্বে দেখ) বলিয়া উল্লেখিত হয়। মুর্শীদ্যা গানের ধারা মধ্যযুগের বাংলার স্থফী সাধকগণই প্রবর্তন করেন। ইহা বাংলার স্থফী সাধকদিগের গান বলিয়াও পরিচিত।

১

ও আনল ধীক ধীক ধীক ধীক জ্বলে রে,
আমার মনের আনল নেভে না।
আজ আনল কি দিলে জুড়াবে রে,
আজ আনল কে দিল জ্বালায়া রে,
আমার মনের আনল নিভে না।
মনের আনল তনে জানে আর জানিবেন কে,
আর জানিবেন সাহেব আল্লা পয়দা করছেন যে রে।
আমার মনের আনল নেভে না।

বনের হরিণে বলে আমি কার বা ধার ধারি,
আপনার রক্তে মাংসে জগৎ করলাম বৈরী রে,
আমার মনের আনল নেভে না।
পানী কাউড় উইঠ্যা বলে, আমরা নিতুই নিতুই নাই,
মনের গৈরবে আমরা কাল হয়্যা যাই রে,
আমার মনের আনল নেভে না। —ফরিদপুর

২

পাগল মন আমার রে—
তোর মুখেতে আল্লার নাম ক্যান শুনি না।
নিমিই ঝিমিই দুই গাছ পন্থ তরুতলা দিয়া,
যমরাজা পাইয়াছে ক্ষান বুঝি মরবার লাগিয়া।
সাইল সুয়া দুড়ী পাখী গহীন নদীত চরে,
স্যাও গহীন শুকায়া গেলে শুনিৎ উড়াল ছাড়ে।
ধবল বরণ কবুতর চিরল বরণ আঁখি,
তুই আমারে ছাইড়া যাবি দিয়া মিছা ফাঁকি। —ঐ

৩

কঠিন বন্ধে দেখা না দেয় মোরে॥
বন্ধু যদি আপন হৈত—তারে নাগাল পাইতাম,
কইল্‌জ্যা ছিঁড়্যা দুভাগ কর্যা বন্ধেরে দেখাইতাম গো॥
পিরীতি পিরীতি সবে বলে, রাইয়া গো, মৃদ না দানে কেউ,
ও মোর দেহার মাইঝে জলছে রে আনল, রাই,
আমি কারে বা দেখাই গো॥
শুইলে স্বপনে দেখি, রাইয়া গো, জাগলে পরে নাই,
ভাগ্যের গুণে পাইয়াছিলাম, রাই,
আমি হারাইলাম জাগিয়া গো॥ —ঐ

৪

কতকাল রাখিব রে বাদুই নৌকা ডুবিল রে॥
আগা ডুবলো পাছা ডুবলো ডুবলো নায়ের গোড়া,
ডুবিতে ডুবিতে ডুবলো মাস্তলের চূড়া॥

গুরু যায় নায়ে নায়ে রে, শিশু যায় রে তরে,
হুঁশ করিয়া বাইও নৌকা, ভাইরে, নাওনি ডুবে চাইও ॥
গুরুর বাড়ীর ফুল বাগিচা রে, শিশুর বাড়ীর কালি,
ভালা কর‍্যা দিও মন্ত্র যুগে যুগে তরি ॥ —ঐ

৫

মন, তোর নাও ডুবলো রে রাখিতে না পারি, নাও বাইও ॥
উজান থাক্যা নৌকা ভর‍্যা ভাট্যাল বায়্যা যায়,
দশে বিশে খিঁচে গুণ নাও ভিড়ান না যায় ॥
নৌকা হৈল লোনা জড়া, বাইনে ধরলো পানি,
শুক্‌নায় তুলিয়া নাও কর‍্যা লও গাব গাইনী ॥
পাঁচ ভাই কাণ্ডারীর হাতে নাও খান রৈল বান্ধা,
পাঁচ ভাই যাইব পাঁচ পন্থে নাওখান যাইব ভাঙ্গা ॥
রঙ্গের নাও রঙ্গের বৈঠা রঙ্গে রসে বাইও,
চৌকিদারে ডাক দিলে সদর ঘাটে যাইও ॥ —ঐ

৬

ওরে, নাও বাইও রে ভাই, বাইও রে আ-কাঠর নাও,
সুজন কামেলার দিক চাইও ॥
আকাঠার নাও খানি সমান টানে বাইও,
উজান পানি বন্ধ কর‍্যা ভাট্যাল পানি বাইও ॥
নৌকাতে থাকিয়া চোরা নৌকা চুরি করে,
মাস্তুলে উঠিয়া চোরা চতুর্পানে ঘুরে ও ॥
ডুবুরের রশি দিয়া বান্ধ্যা রাখ্য তাঁরে ;
সুজন কমেলা হৈলে বান্ধ্যা রাখত পারে ও ॥ —ঐ

যদিও মুর্শীত্তা গানে সর্বদাই রূপক ব্যবহৃত হয়, তথাপি নিম্নোদ্ধৃত গানটি সাধারণ প্রেম-সঙ্গীত বলিয়া মনে হয়—

৭

কোন্ দিন ছাড়িবে নাও, কোন্ দিন খুলিবে নাও,
অভাগী যে শুনি, ও রঙ্গিলা নায়ের মাঝি !!

ও মাঝিরে, আমার দেশে থাক রে মাঝি, ধর্মে দেওরে মন,
আমার দেশে থাক্যা মাঝি রঙ্গের ব্যাপার করো ॥
ও মাঝিরে, বাড়ীর কাছে পুষ্করিণী, শানের বান্ধ্যাল ঘাটখানি,
হস্তি ঘোড়া না খায় ঘাটের জল ও কলসী না হয় তল,
সেই ঘাটের জল খাইয়া রে মাঝি, নায়ের মাল্লা দাঁড়ী হৈল পাগল ॥
—ঐ

৮

আমার দীনবন্ধু এক সিন্দুক গইড়্যে দিয়েছেন ভবে পাঠাইয়ে,
দুই পায়ারি চলে সিন্দুক, ওরে মন, দিনের দিন ভাসে।
সিন্দুকেতে সোনার মানুষ বন্ধ করা আছে ॥
সিন্দুকেতে চার চিজে হয় চাবির কটা তৈয়েরি ;
হায়াত, মৌত, রেজাক, দৌলত, ওরে মন, সকল হাত তাইরি।
একজন তার আছে বিশ্বাসী তারি হাতে চাবি ॥
যেদিন হুকুম হইবে শুনি,
সেদিন সিন্দুক লয়ে করবে টানাটানি।
পলকে শুকিয়ে যাবে সাত দরিয়ার পানি।
সিন্দুকেতে সোনার মানুষ কাইন্দ্যে হ'বে অনার দিনে ;
সোনার মানুষ চইল্ল্যে যাবে
সিন্দুক তোমার পইড়্যে রবে।
খাকের সিন্দুক খাকে হবে মাটি। —ঐ

'হায়াত' শব্দের অর্থ আয়ু, 'মৌত' মৃত্যু, 'রেজাক' খাওয়া পরা এবং 'অনার' শব্দের অথ অনাথ।

৯

মইলাম তোর পিরীতির আশায়, শ্যাম কালিয়া ও ॥
ও শ্যাম কালিয়া ও, কালা কালা বলি যারে,
সে থাকে গোয়ালার ঘরে,
সে কি জানে পিরীতির বেদনা—বান্ধরে নিয়া এত প্রেম জ্বালাও ॥
ও শ্যাম কালিয়া ও, অধীন শেখ ভানু শা বলে,
ঠেক্যা রইলাম মায়াজালে আমি বাহির হইবার রাস্তা নাহি পাই ও ॥

ও শ্যাম কালিয়াও, তোমারি যে প্রেম-সায়রে আমারে ভাসাইলা,
আমি সাঁতারিয়া না পাইলাম কূল কিনারা ও ॥ —ঐ

১০

অ মন পাগলারে ! হর্‌দমে গুরুর নাম লইও।
হর্‌দমে গুরুর নাম মুরসিদ্ বল্যা ডাক্য, মন পাগলারে,
হর্‌দমে গুরুর নাম লইও !
আসমানে চাইয়া ত্যাকরে, মন, আছে কয় তারা,
অকূল সায়রের মধ্যে বয় কত ধারা ;
অ মন পাগল রে ! হর্‌দমে গুরুর নাম লইও !
আসমানে গাছের জড়োরে, জমিনে তার ডাল,
এক ডালে বর্‌মা বিষ্ণু, আরেক ডালে কাল।
অ মন পাগেলা রে ! হর্‌দমে গুরুর নাম লইও। —মৈমনসিং

১১

মুর্শিদ বিনোদিয়া, তনের মাঝে মনের মন্দির আমারে দেখাও নিয়া।
মাটি দিলে হয় (ওরে) মাটি, আগুন দিলে ছাই,
শিয়ালে শকুনে ঘৃণায় না ছোঁয় (রে),
এ তনের এত বড়াই।
(মুর্শিদ বিনোদিয়া) কেমন কামেলায়, বানাইছে ঘর (ও),
রগে রগে খিচুনী।
বিনা ছনে তৈয়ারী ঘর আল্লার ছাউনী। —ঐ

১২

বইলা দে, বইলা দে মোরে গো, কি করিমু বন্ধেরে পাইলে ॥
মনে অনুভব করি গো বস্যা নিরালে—
জুড়ায় না তাপিত অঙ্গ, অঙ্গ পরশিলে, পরশিলে গো ॥
বিনা কাষ্ঠে জলচে আনল গো, নিবে না জল দিলে,
আবার সঙ্গগুণে রঙ্গ বাড়ে, বারণ হয় কি দিলে কি দিলে গো ॥
দীন হীনে বলে বন্ধু ও, তোরে রাখিমু কোন্ ছলে—
জুড়ায় না তাপিত হৃদয় রূপ নেহারিলে, নেহারিলে গো ॥ —ঐ

১৩

ওরে, পন্থ পানে চাইয়া গো রইলাম মনের বিলাসে গো।
দেখি বন্ধে আসে কি না আসে ॥
সখি গো, আইত যদি প্রাণের বন্ধু, ধরিতাম চরণে,
কহিতাম মনেরই কথা পুরাইতাম বাসনা ॥
সখি গো, কালার ভাবে যে মইজাচে সে কি গো বাঁচে প্রাণে,
বিষে অঙ্গ জর জর, সই, বুকে না মানে ॥ —ফরিদপুর

১৪

আরে, মন ভাইয়া!
মিছা গৈরব কৈর না রে পরের ধন লইয়া ॥
আবাল কাল গেল হাসিতে খেলিতে যৌবন কাল গেল হেলায়।
বৃদ্ধ না কাল গেল ভাবিতে চিন্তিতে, মুর্শিদ ভজিবে কোন কালে ॥
কেশ না পাক্যাছে, দন্ত না পৈড়াছে, যৌবনে দিয়াছে ভাটি।
দিনে না দিনে খসিয়া পড়িল, রঙ্গিলা দেওয়ালের মাটি ॥
মনা যে ছাড়িবে তনা যে পড়িবে, নিশ্চয় জানিও খাঁটি।
খাকের তনু খাকে যে মিশিবে খাক হইবে বিছানা পাটি ॥
—মৈমনসিং

১৫

মুর্শিদ, তোমা বিনা কে আছে, মনের বেদনা কই তোমার কাছে,
নিগূঢ় তত্ত্ব পাব বলে খেপা মন আমার ক্ষেপেছে।
একটি কথা হদিসে শুনি হাফাৎ নেফাৎ দুই চিজ হয় জগৎ রমণে।
ইহার হায়াৎ বিনে নবীর জিনে কয়টি সন্তান হয়েছে।
একটি কথা রাখি দাবি এহি দিন কি ছিল নবী সে যে কেতাবে আছে,
সেই সন্তানটি কার ঘরেতে হয়,
অনুমান শুনব না, মুর্শিদ, দেখাও বর্তমান,
ইহার পিতার নামটি বলব খাঁটি কার বেটি কোথায় আছে,
সে যে বলি মারে কোন্ সহরে কি হয়েছে,
কয় চিজে হয় দুনিয়ার গঠন,
অনুমান শুনব না গো, মুর্শিদ, দেখাও বর্তমান। —রাজসাহী

১৬

আমার মনের মানুষ না হইলে দিলের ভাব সুধাব কারে রে,
মনের ভাব সুধাব কারে ॥
দুনিয়ার মাঝে সকল দেখি গইড়েছেন যে খোদারে।
কোন চাইর চিজ করে না খোদা দুনিয়াতে পয়দারে।
বিসমিল্লা কালমার গোড়া কোরাণের মাথারে ॥
তার আগে কোন কালমা জাইন সাধুর কাছে রে।
সাত দিনের নামটি শুনি সকলে তা জানে রে।
সাত রাতের কি বানান শুইন সাধুর কাছে রে ॥
ব্যোমযান বলে কালা চান্দে, মৈলে কেবা বাঁচেরে।
কেবা মরে কেবা বাঁচে কে যায় গোরের নীচেরে ॥ —মৈমনসিং

১৭

আমি যা ভাবিলাম তা ও না হইল, আমার বিফলে দিন গেল।
আজ আমার উপায় কি তাই বল।
দেখি তোমার পৈতা গলে,
তাজ মাথায় তসবি হাতে কোন জাতের ছেলে।
তোমার কোন দিকে হিন্দু কোন দিকে যবন কোন তরিফে চল।
আজ আমার উপায় কি তাই বল ॥
যবে তোমার পিতা মল,
গোর দিলে কি দাওন দিলে সেই কথা বল।
আমি যা ভাবিলাম তাও না হৈল আমার বিফলে দিন গেল ॥ —ঐ

১৮

আগুন পানি মাটির হাওয়া কোন জায়গায় ছিল।
তারে কে আনিল কে ঘটাইল, ও মন, তাই বল, তাই বল।
জিব্দার থিকা মাটি নিল সুরিন্দি যাইয়ে মুখুস হইল।
সেই মুখুনে ছানা হইল, ও মন, বল তাই বল ॥
আগুন পানি মাটির হাওয়া কোন জায়গা ছিল ॥
আজ কাইল মাটি আনে সেই মাটিতে মানুষ গড়ে।
সেই মাটিতে তুমি হইলে, সেই মাটিতে আমি হইলাম রে ॥ —ঐ

১৯

আশ্চর্য এক কার্য দেইখে প্রাণ বাঁচে না,
ঐ এক ঘর বাইন্দাচে নিরঞ্জন—
মুক্তি কর্তা মুক্তারণ করণ তারে বুঝতে পারলাম না।
এমন চতুর্থ পিরথ্যিবির মধ্যে এমন মস্ত ঘর আর হবে না।
তোরে বইলবো কি আর বইলবো কি আর ধন্য ঘরের আট কোণা।
এক ঘরেতে চার জিলা বার আনা,
সে ঘরের মধ্যে কি তার উদ্দিশ হইল না।
ভাইরে, উস্কি আমদ রোজ ঘরেতে হচ্ছে প্রলয়,
ঘরের দক্ষিণেতে সরোবর গিরিবর পূর্ব অংশে নবিদ্দি উদয়।
ঘরের পশ্চিম অংশে খোশ মহলে এক মহাশয়,
ঘরের মধ্যে চব্বিশ চন্দ্র নিত্যি চন্দ্রের উদয় হয়।
তথা ঘরের মধ্যে অন্ধকার হয়।
এ ঘরের উদ্দিশ করা সাধ্য কি আমার,
ঘরের মধ্যে ব্যক্তি বহু জন অয় অন ;
কত ফকির বোষ্টম এসে করে ঘরের অন্বেষণ।
ও ঘর হেলে দুলে শূন্যের পরে হাওয়া ভরে,
ও ভাই, ভাইব্‌তাছ ইন্দু বিশ্বাস, ঘর দেখিয়া নাই বিশ্বাস,
অবিশ্বাস কেবলই বল রে।
আমি ভাবি রে তাই ভরসা নাই কোন দিন,
যেন এ ঘর ভেইঙ্গে পড়ে, জিলার আমলা
পালারে সব জিলা ছাইড়ে,
সাধের ঘর ভেইঙ্গে যাবে মাঝরাতে প্হরে।
ঝড় আসিবে যেই দিন প্যালা দিবে সেই দিনে,
প্যালাতে ঘর খাড়া রবে না।
ইন্দু বিশ্বাস বলে, সেই না ঘরের আজু বাজু কারখানা।
এ ঘরেতে চার জিলা আর বার আনা,
সে ঘরের মধ্যে কি তার উদ্দিশ হইল না॥

২০

এই ঝিল্ মিল্ ঝিল্ মিল্ করে রে নাও,
সেই না বাতাসে, রে দয়াল, আমি রইলাম তোর আশায় ॥
নায়ের আগা দিয়া উঠে জলরে পাছা দিয়া যায়,
আমি ভরিলাম রতনের ভরা স্রোতে লইয়া যায়,
ও দয়াল, রইলাম তোর আশায় ॥
এই নাহুর দরিয়ার মধ্যে কিসের বাত্ত হয়,
ওই আমার দেহ ছাইড়ে প্রাণ পালাবে সেই না বাত্ত হয়।
ওরে দয়াল, রইলাম তোর আশায় ॥ —ঐ

২১

এবার গুণ ছাড়িয়ে বাদাম তোল, ওরে মন-মাঝি।
তুমি কিসের গৌরব কর ভাস্না তরী ভাসাইয়ে,
নোনা গাঙের তুফান ভারি, ওরে আমার মন ব্যাপারী,
দেখনা ত'র সাধের তরী নোনাতে গেল খাইয়ে,
একে ত'র ভাসনা তরী মানে না রে জল,
তুই যে মদ খাইয়ে মদে মইজে হইলিরে মদ হারা,
মানবতরী এই না ছিলি, গরল কি না বোঝাই দিলি,
দেখনা তোর সাধের তরী বাইন্ হইল জরা-জরা।
এবার বিষধরা তুফান তরী যাই কবে মন,
খুব সামাল তুফান দেইখে হয়।
আতঙ্ক তরে আমার মন মাতঙ্গ
আজ বুঝি ত্রিপর্ণির ঘাটে করবিরে তুই রসাতল ॥ —ঐ

২২

ওরে মন, বিধি মৌতের আর আছে কতক দিন।
ভাই বল বন্ধু বলরে কেউ তো কারু নয়।
ম'লে তো সম্বন্ধ নাইরে বাড়ীর বাহির করবা নাই ॥
মুর্শিদ বল তোমরা রে, মুর্শিদ কেমন জনা।
দেহের মধ্যে আছে মুর্শিদ হারে ঐনে কাঁচা সোনা, রে মন ॥

আশা কইরে আইলাম আমি রে মুর্শিদ জনার বাড়ী,
সে ও মুর্শিদ পালাইয়া গেল
আমার পাতক দেইখা ভারি, রে মন ॥
আর এক কথা শুইনে আইলাম রে ত্রিপর্ণি নদীর ঘাটে,
ওরে মরা মানুষ আহার করে জ্যান্ত মানুষের প্যাটে,
রে মন, রে মন ॥ —ঐ

২৩

ওরে মন, তুই নায়ের বড়াই মিছারে বসতি।
আমি যার সাথে আইলাম গো ভবে তার সাথে নাই পিরীতি ॥
আমি যার সাথে আইলাম গো ভবে,
সে বনে গেল কোন পথে ওরে মন।
আমার ডান চক্ষে নি কইতে গো পারে,
বাম চক্ষের ওই কাহিনী ॥ —ঐ

২৪

নিম্নোদ্ধৃত গান দুইটিতে লালন ফকিরের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে—

কে কথা কয় রে দেখা দেয় না।
হাতের কাছে নড়ে চড়ে, খুঁজলে যেমন ভোর মেলে না ॥
খুঁজি তারে আসমান জমি, আমারে না চিনি আমি।
সে বড় ভেমির ভেমি সেই কোন জনারে।
কে কথা কয় রে দেখা দেয় না ॥
হাতের কাছে হয় না খবর, খুঁজি যারে দিল্লী সহর,
ফকির লালন কয়, ওরে সিরাজ, মিছা মনের ঘোর গেল না।
কে কথা কয়রে দেখা দেয় না ॥ —ঐ

২৫

কারে শুধাবরে নরম কথায় কে বুঝবে আমায়। ধ্রু ॥
একদিন সাঁই নিরাকারে ভেসেছিল ডিম্বভরে।
কি রূপ ছিল তাহার মাঝে কি রূপ শয্য হয় ॥ ধ্রু ॥
একদিন শায়ী শর হানে বরকেতে মা বইলে। —ঐ

কহানে মার কড়ি নাই কি পাই সেখানে।
ফকির লালন বলে তাই ॥ ধ্রু ॥ —ঐ

২৬

কোন দিন খুলি বা নৌকা তা যেন আমি জানিরে,
বাংলা নায়ের মাঝি।
আগের নাইয়া পাছের নাইয়া মধ্যের নাইয়া ভাই,
ঐ যে তরঙ্গে ফালাইও বৈঠা কিনারে যেন পাই।
ওরে বাংলা নায়ের মাঝি।
মন হল পোঁয়ারে, ভাই, পবন হল জিন,
কোন জানি রসিকের গোড়া দাঁড় বায় রাত্রদিন।
ওরে, বাংলা নায়ের মাঝি ॥ —ঐ

২৭

দিন গেলরে, খোদা বান্দা, হাতে বৈসে, ভাই রে, কর কি।
কখন জানি আসবে গো শমন লয়ে সদরের চিঠি ॥
যে দিন আসবে শমন বান্ধবে কইসে।
হাতে দুই হস্ত দিয়ে প্রেম ডুরী
ছাইড়ে যাবে, দয়াল গো, বাপ মাও কিসের আমার ঘরবাড়ী ॥
আইয়াল ঘর মা বাপের মস্তকে হাড়ে দেয় মা ঘর।
মায়ের উদরে, তিন ঘরে করিয়ে আরেক ঘর থাকেরে নীচে ॥ —ঐ

২৮

দেখ, ঘর দীনবন্ধু বাইন্দাছে কি ভাবেতে,
দেখছি যেমন নাটমন্দির ঘর মন্দির যোগেতে।
আরে অষ্টদশ বিনস্বতি কল্লে হেলে দুলে ভবেতে,
খাড়া শূন্যেতে ঘর পবন বেগেতে।
আছে চার চার বিনে স্থিতি হৃদয়, দশত রিপুর ভাগেতে,
পাইবা তো সরো চৌদ্দ পোয়ার আগেতে।
ও তাই বলে ইন্দু জরা বিন্দু অন্ধ সে আট পোহালে,
অন্ধ বন্ধ ইন্দু বিশ্বাস তাই বলে।
আছে আট গজানের অন্য হাকিম তারই মইধ্যে এরা সকলে চলে।

চব্বিশ কাছারি এই ঘরেতে মিলে, ও সে অন্ধ নয়নে ধন্ধ বাট।
বলার শক্তি হবে কার; ধন্য ধন্য ঘরের প্রবীণ কর্মকার ॥ —ঐ

২৯

দেল দরিয়ায় সোনার মানুষ তারে চিনিয়া ধরবে মন,
তারে চিনিয়া ধর।
জানিস নাকি বাঁয় যমুনা মধ্যে বালুর চর।
সেই চর যদি পার হইতে চাও ঘাট-মাঝি ঠিক কর।
ঘাট-মাঝি উঠিয়া বলে,
আমি টাকা নেই না কার, পয়সা নেই না কার,
তুই দাঁড় যদি বাইতে পার নৌকায় আইসা চড়।
আছে দিল দরিয়ায় সোনা মানুষ তার কিনারা ধর।
ও সমান চাঁদ ফকির বলে, কথা বিচার করিয়া দেখ
হাওয়ার সনে মিলন হইয়ে আইসা কর ॥ —ঐ

৩০

দীন হীন কাঙ্গাল ডাকে, এস মুর্শিদ এ সময়।
একদিনে সই হবে কাজি দলিলে তাই শুনতে পাই।
জমার মেদী খাজনা ওশীল হিসেব নিকেশ মালিক সই,
এস, মুর্শিদ, এ সময়।
ফেরেস্তা ডাকছে সবাই হাজারের ময়দানে যাই।
সেযে নিক্তি ভাবে আছে কাঁটা ওজন হবে সেই পাল্লায়।
এস, মুর্শিদ, এ সময় ॥
হারাণ বলে, শোনরে স্বরূপ ঠেকিলাম নিকাশের দায়।
এস, মুর্শিদ, এ সময় ॥ —ঐ

৩১

বাওহা ঘর ভবের পরে, বান্ধছে কোন কারিগরে,
রাত্র দিন তালাশ কইরে পেলাম না তারে।
বাওহা কি হেগমতে ঘর বেইন্ধছ তেরব্ধুয়া
ষাট গিরু, ভাই, ধারক নাই তার,

গড়ছে দুই পাইরের পরে, দুই খুঁটি সাধের ঘরে,
দেয় নাই তার ঠেক্না ছাড়া ভাঙ্গবো বইলে আমার ভয় করে।
সে ঘরের মইধ্যে চারজন ফকির
তারা থাইকে থাইকে ভরে জিগির,
তাই শুনে বিধই না জহির বন্ধ নাইগাছে
আমি বলি দশের কাছে।
দশ দশ দরজা ঘরের মুর্‌শিদ ভাই বলবে মোরে।
আজ্‌কে এক তাম্‌শা দেখলাম আগুন ভাসে পানির পরে॥ —ঐ

৩২

মন, কেবল পাগলামি তোমার।
যত ভাব আমার আমার সকলই সরকারী খামার।
আমার মাতা, আমার পিতা
আমার জায়া, আমার সুতা,
চোখ বুজলে কে থাক্‌বে কোথা কবরটি তোর হবে রে সার॥
এই যে দেহ চতুর্ভূতে মাটির নিচে দিবে পুঁতে
চিহ্ন কিছু থাকবে না আর।
সময় থাক্‌তে তারে ডাক,
ভবপারে যেতে হলে যার চরণ-তরী হবে রে সার॥ --ঐ

৩৩

মন, ভুইলনা রে, ছার ভবের মায়া।
উড়িয়ে যাবে সোনাপাখী পড়িয়া থাক্‌বে কায়া।
রাম নামের ঘরখানি কৃষ্ণ নামের বেড়া,
হরিনামের দুয়ার খুলিয়া দেখ বন্ধে বন্ধে জোড়া।
ঘরখানি ভাঙা চুরা দুয়ার কেন বান্ধ,
আপনি মরিয়া যাবে পরের তরে কান্দ।
মন, ভুইল না রে।
যার লাগি করি গো চুরি সেই ডাকে চোরা,
চাক্‌রী কইরা দরমা পাই না নশিব আমার বুড়া॥ —ঐ

৩৪

মন পাগলারে, হরদম আল্লাজীর নাম লইও। ধ্রু ॥
লইও রে মুর্শিদের নাম, ঠাকুর বলে ডাক মনা।
আসমানে চাইয়া দেখরে, মন রে, আছে দুই তারা।
ভাব কইরে দেখ্ ভাবের ভাবে বয় কোন ধারা ॥
আস্‌মানে গাছের গুঁড়িরে, মনরে, জমিনে তার ডাল।
এক ডালে ব্রহ্মা বিষ্ণু আর এক ডালে কাল ॥ ধ্রু ॥
এই রাজ্যে ভ্রমিয়া দেখরে আছে এক নারী।
যখন আছিলে মায়ের উদরে কোন শিয়রে, মন পাগলারে ॥
ভুখ নাগি রে খাইছ্‌লে কোন বা বৃক্ষের ফল,
তিয়াস লাগ্‌লে খাইছ্‌লে কোন নদীর জল, মন পাগলারে ॥ —ঐ

৩৫

মোমিন চান্দ, মুখেতে বল আল্লার নাম।
আমার আল্লা আছে মেহেরবান,
তিনির নাম ধরে ডাকি মালেক ছোবাহান ॥
আমার করিম রহিম কুদরতের ধনি,
আমার মুর্‌শিদের মুখে শুনি।
আর এক নাম তার ছেব কাদের শুনি,
আল্লা নবীর দুইটি নাম ভাই পুরাণ হয় না কি জানি।
তাই বসিয়ে ভাবি রাত্রদিন, উহার নামের গুণে,
পাষাণ মুক্তি সে কথা কোরাণে শুনি।
আর এক কথা শুন্‌ছি কোরাণে, রোজহাসরের ময়দানে,
লোক যদি বুঝবে রোজনে, ও সে রোজানামা দয়াধর্ম,
সাক্ষী দিবে চারজনে।
তুমি আসান পাবা কেয়ামত দিনে।
ওযে করতে নেকি পাবে ভেস্ত বান্দিক দিবে দোজকে ॥ —ঐ

৩৬

মুর্শিদ আমার বানিয়া রে।
মুর্শিদ আমার বানিয়া দিয়াছে দোকান রে ॥

এই বিনা পাল্লায় বিনে দাঁড়িয়ে করছে বেচা কেনারে।
মাও মরিলে মাও পাব বেটি আছে ঘরে।
আমার গুণের ভাই দশরা মইলে ভাই বলিব কারে।
ওরে, ভাই বলিব কারে॥
এই মরিলে, খোদার গো বান্দা, খবর যাবে দূর,
দূর থাইকা কাইন্দা আস্‌বে আইবো ইষ্টি আর কুটুম।
মুরশিদ আমার বানিয়া রে॥
ইষ্টি আইল কুটুম আইল আর আইল পর,
মরিলে সম্বন্ধ নাই কো ঘরের বাহির করে রে।
মুর্শিদ আমার বনিয়ারে॥ —ঐ

৩৭

যদি এই তরণীরে জাগে,
মুর্শিদা তোমার নামের গুণে রবে।
যার সঙ্গে আইলাম রে ভবে
মুর্শিদ, তারে খাইল বনের বাঘে॥
বাকি নৌকায় বাদাম রে টানি
আমি ক্যামনে যামুরে সে পারে॥
নৌকাখানা উটুরে ডুবো,
আমি মাঝি পইলরে বিপাকে।
দৌড়াদৌড়ি পাইড়ে গো আইলাম
আমি পার হইবার আশে।
নাও আছে কাণ্ডারী নাইরে,
মুরশিদ, আমার আপন কর্মদোষে॥ —ঐ

৩৮

যে দিন মাঝ দরিয়ায় তুফান হবে।
যে দিন দিল দরিয়ায় তুফান হবে॥
যে দিন হাল ছাড়িয়ে মাঝি পালাবে রে মাঝি পালাবে।
মায়ে কাঁদবে যাবৎ জীবন
বাপে কাঁদবে, আর কেউ কাঁদবে না,

ও মন, আর জউল্যা থাকি বলে সোনার ওরে যাদুমণি।
আও মোর কোলে কোলে ॥ —ঐ

৩৯

শুন ভাই এক তরীর কথা, বিনে লোহার তক্তায় গাঁথা,
বিধি কইরাছে কি কাজ।
সে তরী পানি থুয়ে ডাঙ্গায় চলে রে,
কি কলে খাটাইছে বাদাম।
সে তরীর যে দিক্ চালায় সেই দিক চলে রে,
হাইল ধরেছে মণিরাম সেই তরীতে,
(আর) বত্রিশ ওড়ো সারি সারি ইমান উল্যা তরীর ব্যাপারী,
বেটার কুয়ারী ভারি।
সে যে দাঁড়ী মাল্লা শাসন রাইখে নিজের বস্তু করলো চুরি,
আমি মহির হচ্চি বেকুব এখন উপায় কি করি,
এখন খুব হুঁশিয়ারি ॥
সাড়ে তিন হাত তরী গইড়ে,
দিয়াছে ভব-সংসারে, তরী চলে দুই দাঁড়ে ;
সে তরী যে দিক চালায় সেই দিক চলে রে, দীনবন্ধু ছুতারে।
সে তরী যে দিক চালায় সেই দিক চলে রে,
হাল ধরিবে মণিরাম সেই তরীতে। —ঐ

৪০

সাধের তরী কোন মিস্তিরি গড়াইয়া দিছেন ভবের পর।
মুর্শিদে কয়, গড়ছেন তরী দীননাথ ছুতার ॥
তরীর আড়ে পাশে সমান সমান গড়াইয়া দিবে ভবের পর।
আছে স্বর্গ মঞ্চ পাতলাদি আছে সে তরীর ভিতর।
কত হাজার কামিল করে তার মহিমা অপার।
তরীর আগবাতে খোম্বা দিয়ে কইরেছে তরীর পত্তন,
মাঝখানে মন রায় বইসে জোগানদার দুইজন।
এখনই যতন দিচ্ছে যোগান ছুতার বেটার হুকুম মত,
দিয়া তিন খানা জোড়া কইরাছে খাড়া আমি পাই না অন্বেষণ।

মইধ্যে এক ঘার কি মজার গঠন ও তার পরী ষোল জন—
সে তরী পানি থুয়ে চলে ডাঙ্গার পরে,
আকুল নদীর বিধাতা দিছেন সেই তরীর ভিতরে।
দিবানিশি রবি শশী বইসা বাঁকে ভাগে বায়।
মাঝখানে মন রায় বইসে সেই তরী চালায়।
ও সে দাঁড়ি মাল্লা ছয়জনা রিপু,
সে ও বেটারা থাকে কোথায়—
আছে পবনা খুড়া বইসে বুড়া সে তো বইসা বাদাম খাটায়।
আসর কদম এই তরী বাইয়া যায়॥ —ঐ

৪১

সবলোকে কয়, লালন কি জাত সংসারে।
ছুন্নৎ দিলে হয় মোসলমান নারীলোকের কি হয় পরমাণ॥
বামুন চিনা যায় পৈতাতে তার বাম্‌নী চিনা যায় কিসে॥
সবলোকে কয়, লালন কি জাত সংসারে॥
কেউ মালা কেউ তসবি গলে, তাই তো রে জাত ভিন্ন বলে,
ফকির লালন বলে, আমার এ জাত ভাসালি ভব বাজারে।
সব লোকে কয়, লালন কি জাত এ সংসারে॥ —ঐ

৪২

সাঁই খোদার কুদরত কেমন জাহির বাতল, কে বুঝিতে পারে।
কত পীর পয়গম্বর হই যে নাচার গিয়েছে একেবারে॥
পোদ্দা ছাড়া সিদ্ধহাস্তা শিখেছে আর সের কালান।
সিরজা দিলে না তাই তে দেখ দোষী কোন বিচারে।
এদিক ওদিক দুদিক হুকুম বুঝইবো কেমন।
কোথায় আদম পরে, হুকুম করে, দোষী হইলাম সন্ধান পেইলে।
আদমের বার আঁখি হতে বিধি, হাওয়া পয়দা করলেন তাতে,
দুইজন মিলন হল ভেস্তের মাঝারে।
বাপ বেটি হইল সাদি, হইল কোন বিচারে।
গোলাম বলে বাড়ী চলা, বুঝলাম নারে তোমার খেলা,
গেল না মনের ঘোলা, পইড়ে রইলাম বিষম ফেরে।

তরাও বারি তবে তাড়ি নইলে দন্দিকারে।
সাঁই খোদার কুদরত কেমন জাহির বাতল কে বুঝিতে পারে॥ —ঐ

৪৩

দয়াল, এই ছিল তোর মনে রে,
ওরে ঘরে রইতে দিল না আমারে।
আরে বোবায় যেমন স্বপ্নরে দেখে,
ও তার, মনের দুঃখ মনে না থাকে।
ডা'নে চাইলে ডাইনে রে শূন্য, বামে চাইলে বামে না শূন্য,
আমার শূন্য নদীর কুল রে॥
মায়ে যেন জানে বেটার দরদ যার বুকের শেল রে।
আর জানে ছায়ে পোর আল্লা ভবে পয়দা করছে যে ওরে॥ —ঐ

৪৪

আমার অসময়ের ঘুম ভাঙ্গাইস্‌নে,
দেহের যত্ন মিছে রে দুনিয়া।
দেহের বিছকানে জানে কাত করে
দুই বাতি দেখে নয়নে।
রমজান বলে কালা চান্দে, মরিস কেনে গুণ টেনে,
দেহের যত্ন মিছেরে দুনিয়া॥ —ঐ

৪৫

আল্লার বাতুলের ভেদ রসুল জানে,
বাতুলি যে জাহির করবে সে বান্দা ফকির হবে।
মোমিন ফকির জানা যাবে হাসরের দিনে।
নবী যেমন মেরাজ গেল নব্বই হাজার কালাম পাইল।
ত্রিশ হাজার জাহির দিল ষাইট হাজার বাতুলে॥ —ঐ

৪৬

ই ভাবে আর সে ভাবে ফুল ফুইটে জগৎ আলো,
শিয়ালি বনে ফুলটি ফোটে দেখতি অতিলাল বাবুর দালান।
ফুলের ভ্রমর যত পাগল হইয়ে রয়,
ফুলের লগ্ন ফুলের তিথি হয় গো হয়॥

সে ফুল কয় মনের কথা (আয়-আহা-আয়),
একটি ফুল উদয় হয় কালীদহের ঐ পুরের ঘাটেতে,
কত যোগী অলা যোগ সাধনে বইসা আছে সেই নদীর কূলে,
সে ফুল ধরতে গেলে মোটে না আটে,
কাজল বরণ ফুলটি ফোটে, সই গো সই,
সে ফুল ধরতে গেলে মোটে না আটে,
কাজল বরণ ফুলটি ফোটে সই গো সই,
সে ফুল ত্রিপর্ণীর ঘাটে (এ—এহে—এ)।
জানি না তোমার ভজন সাধন, ঐ চরণে করি মিনতি,
আছে ধর্ম সভার যত মোমিনগণ,
সেলাম রাখি দেশের চরণে (এ—এহে—এ)।
আমি অতি মূর্খমতি, ভাবতে ভাবতে হইলাম রে সারা,
(আ—আহা—আ)॥
যেদিন গাছের গোরে জোয়ার আসে,
এক কালে কুইটা হয় সারা,
আছে কাল যমুনা ভাসে নয়ন তারা ;
আকাজউদ্দিন বলছে, সাধের ফুল গো ফুল,
যে ফুলমালিকে ভরা (আয়—আহায়—আয়)॥ —ঐ

৪৭

এক নরীতে মারলি রে তিন সাপ, তুই লায়েতে পা দিয়ে,
হলি রে তুই কাটা কাক।
এক নরীতে মারলি রে তিন সাপ॥
ধর্মপথে দিলি রে কাঁটা, সত্য পথে চাও না যেতে,
তোমার মিথ্যা গাব কাটা।
দারুণ নরে পাইরে দইরে কি রে কাম-সাগরে দিলে ঝাঁপ,
এক নরীতে মারলি রে তিন সাপ॥
দিয়ে তিনকুলে কালী ত্রিপর্ণীর ঐ মাঝামাঝি ভরা ডুবালি।
তুই নয় মর্ত্য, নয় স্বর্গ পাইলি, হইলি উন্মত্ত, কাটা কাক,
এক নরীতে মারলি রে তিন সাপ॥

এবার কুবের বলে চরণ ভুলে পরকে বললি ধর্মবাপ।
এক নরীতে মারলি রে তিন সাপ ॥—ঐ

৪৮

এলাহি আলীমীন সে, আল্লা বাদ্‌শা আলম কালা তুমি,
জাবা গোবীর নামটি লও না মোহিত কাকের তারা,
রাখো মারো হাত তোমারি মোরে দয়া কর স্বামী,
লোহ নামে নোরা ছিল, ভাসাইলেন বিষম পাথারে।
তোমার আউলীর খাতায় নাম লেখিলো, সে নাম
খুঁজি না পাইলাম।
তুমি রাজা তুমি প্রজা আল্লা বিচার কইরে দিবেন সাজা,
এই তারে দয়া কইরে কিনারায় লাগাও গো বাড়ী
এলাহি আলীমীন সে আল্লা বাদ্‌শা আলম কালা তুমি ॥ —ঐ

৪৯

এই ভবে এক গাছ গড়ছে মালেক ফুল (খোদা),
আমি তাই দেইখে হইলাম আকুল।
খোদার ছোট নবীর বরণ ফুল ॥
দশ মাসে গাছের স্থিতি ভিতরে তার ধরে ফুল।
তাই দেইখে লাল চাঁদ উদ্দি হইল নামাকুল ॥
ওরে দীনবন্ধু গাছে গইড়াছে,
আগে তার ফল পাইরা যায় শেষে ধরে ফুল।
লগ্নযোগে ধরছে দুই গাছে এক ফল,
ও সে দারুণ বিধির কেমন কল ॥
রাত্রি দিবস পানিত ভাসে কল।
ওই যে এক গাছে ফুল আর এক গাছে মূল,
দুই গাছে এক ধরে ফল রাত্রি দিবস।
দুই ফেরেস্তায় করে তদাস্তব।
ভবে চাঁদের ঋতু অমূল্য ফুল,
সমুদ্দুরে সে ফুল ভাসে তোলায় সাধ্য কার।

মুনি যোগী তারা বেড়ায় উদ্দিশে,
ঐ বসে সেই দেড়াক তলে রাত্র দিবস কলের হুতাশে,
ও ভবে যার কপাল লেখ্‌ছে বিধি সেই যোগে মিলন হবে।
লাল চাঁদ উদ্দি বসে ভাবে কপালের দোষে ॥ —ঐ

৫০

ওরে সব খোদার একই বার্তা মানুষেরই কেবল ভিন্ন রায়,
ছোট বড় সাধু চোর তাদের কর্মগুণে দেখা যায়।
যে খোদা সেই আল্লা সেই ব্রহ্মা সেই শিব।
নির্বুদ্ধি মানুষ মোরা না বুইঝে বইলি বিবিধ ॥
ওরে, সব খোদার একই বার্তা, মানুষেরই কেবল ভিন্ন রায় ॥
রে মন, শোন শোন, চল ঠিক পথে
দেখবি জীবন সন্ধ্যে কত মুখে ভাতে।
সাত পাঁচ ছাইড়ে দিয়ে এক পথ ধইর
দেখিবি একেই তোমার মিলিবে সবই ॥ —ঐ

৫১

ওরে, সন্ধ্যা হয়ে এল এই বেলা নাও তোল পসার।
দোকান পাতি তুলে নে রে শেষ হল তোর ভবের বাজার।
ছয়জন দস্যু সবাই জুটে,
সবই তোর সে নিল লুটে,
তোর লাভে মুলে সব হারিয়ে পড়লি এখন বিষম ফেরে।
মনিব যখন ধরবে চেপে,
পড়বি তখন বিষম চাপে।
তোর জমা খরচ মিলবে নারে এই বেলা দেখ উপায় কি তার ॥
আসবার বেলায় বলে এলে
বুঝে দেবে লাভে মুলে
লাভ দূরে থাক মুল খোয়ালে এ বিষম ব্যাপার ॥
তাই বলি তোরে, ওরে মন,
সার কর তার যুগল চরণ
যার কৃপাগুণে হবি রে পার ॥ —ঐ

৫২

ও মন, করলি কি তুই সারা জীবনে,
কেবল মরবি তুই দাঁড় টেনে।
তোর পাড়ির বহর জমল না রে সব গেল বিফলে।
তোর সার হল রে টানাটানি,
তরী ডুবল বুঝি মাঝখানে।
উজান বলে ছাড়লি তরী রে,
তোর থাক্‌লো উজান পড়লি এখন ভাঁটির কিনারে।
ঐ দেখ সামনে আছে দোটানা বাঁক,
পাড়ি জম্‌বে বল কেমনে।
এই বেলা দে খোদার নামে বিবেক পানে টেনে,
নইলে পার হবি তুই কেমনে॥ —ঐ

৫৩

গোলমালে দিন ফুরাল মনের সাধ মিটলো না,
সাঁইজীর পীলের অন্ত পেলাম না।
ভবের পরে মানুষ একজনা হাতুর বাটাল
চিমটে হাতে ধরে চারিখানা।
আমি জিজ্ঞাসা করি দরবেশে, দেহের আগা-গোড়া কোন খানা॥
ভবের পরে মানুষ তিন জনা,
এক জনা কানা, একজন বোবা, একজন খোঁড়া।
আমি জিজ্ঞাসা করি দরবেশে, আগে ভেস্তে যাবে কোন জনা॥—ঐ

৫৪

কোন রঙ্গে বাইন্ধাছ ঘর।
মিছা দ্বন্দ্ব বাজি গোঁসাইজি
হাড়ের ঘরখানি চামড়ার ছাউনি বান্ধে বান্ধেরে জোড়া।
এই যে তারই না মইধ্যে মন রা মনোহারী
করছে রসের খেলা গোঁসাইজি।
গুরুর বাড়ীতে কলেরই গাছটি চিরল চিরল পাতা,
শিষ্য পুছে গুরুর গো, কাছে পাক্‌লে কোন ফল চা'বে গোঁসাইজি।

শিশুকাল গেল হাসিতে খেলিতে যৌবন গেলরে রঙ্গে।
আমার বৃদ্ধ না কাল গেল ভাবিতে চিন্তিতে।
গুরু ভজিব কোন্ কালে, গোঁসাইজি।
আমার দন্ত তো পড়িল চুল তো পাকিল যৌবন ছুটিল ভাটি,
দিনে দিনে খসিয়া পড়িল রাকিলা দালানে মাটি, গোঁসাইজি। —ঐ

৫৫

কে বলিতে পারে সাঁইর কুদরতি।
যে আপনি ঘুমায় আপনি জাগে আপনি জুড়ায় সাত পতি ॥
কে বলিতে পারে সাঁইর কুদরতি ॥
অনুরাগের রাগ না ধইরে সংসার কইরলেন উৎপত্তি।
কে বলিতে পারে সাঁইর কুদরতি ॥
গগন চাঁদ মগনে রয়, ঘটে পটে তার জ্যোতি হয়,
অমনি খোদা খোদ রাজ্যেতে অনন্তরূপ আকৃতি!
কে বলিতে পারে সাঁইর কুদরতি ॥ —ঐ

৫৬

নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে আবার বাউল লালন ফকিরের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। অনেক সময় বাউল গানের সঙ্গে মুর্শীদ্যা গান একাকার হইয়া যায়। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে।

ঘাটে তরী আছে বাঁধা, ছাড়াইবে তোর মনের ধাঁধা ॥ ধ্রু ॥
বুইঝে শুইনে চলিসরে, মন, পাল্ নে রে খাটিয়ে এখন ॥ ধ্রু ॥
আছেরে নোঙ্গর কইরে চইলবে যখন ছাইড়বে নারে ॥
ভাবছ মনে কতই মজা, তুই রাজা তুমিই প্রজা ॥ ধ্রু ॥
বৈঠে যেদিন চইলবেরে, ভাই, সকল আশাই হইবে যে ছাই;
লালন বলে, কি করিলে সকল যেরে পণ্ড এখন ॥ ধ্রু ॥ —ঐ

৫৭

ঠিক মোছল্লী কে গর মোছল্লী বল কারে।
একটি মাইসের পাচ কাল্লা, কোন কাল্লাতে বলে আল্লা;
লালন বলে এসব কুষ্টি খাইটবেনা আর এ সংসারে।

তবন পইরে হইছ খাঁটি, নিচে নেংটি উপরে কোপনী,
গলায় খৈল কে কোথায় পেইলে,
বইল্‌তে হবে বিচার করে ঠিক মোছল্লী কে এ সংসারে ॥ —ঐ

৫৮

নাইকো সিকে কড়া হাতে ও ফুট মাদারী,
বেরাইস্‌ গোপকুলে কোঁচা দুলায়ে যেন নবাবের ভাণ্ডারী।
শিখেছো আগমনী যুঁইও, তোমার কথাতে সুবুদ্ধি ভুঁইও।
ভুঁইওর দাই হইলে আছে তোমার গুপ্ত দেনা,
শোধ হইল নাকো পাশরী ভারী ॥
কথায় কেন ছাগল গরু কিনে হও পাগল,
এবার ঘি তোল কালাল মাথায় পড়ে ভেঙ্গে কইলে জারি।
নাইকো সিকে কড়া হাতে, ও ফুটো মাদারী ॥ —ঐ

৫৯

নাড়া দরবেশ কি বইলা গেলে রে, জীবের আকুব হল না ;
আকুব হল নারে বান্দার গিয়ান হইল না।
কার ভাজনে ভেস্তে তারে চিন্‌লা না।
খোদার দিল চাইল-ডাইল মুরশিদে দিল খড়ি।
আসমান জোড়া ফকির রে, ভাই, জমিন জোড়া খেতা ;
সে ফকির মরিয়ে গেলে মাটি দিবে কোথা ॥ —ঐ

৬০

পরথম করি আল্লাকে স্মরণ।
আমার আল্লা যদি সখা হয়
বন্দি আমি নবীজির চরণ (অয়-অহয়-অণ্‌)।
আল্লার নামটি বন্দি আমি গো
নবীর ইয়ার চারিজন (অয়—অহয়—ওণ)।
নবীর আর আবুকার ছিদ্দি তিনি বড় দোস্তদার
নবীর ইয়ার চারিজন (অয়—অহয়—গুণ)।
নবীর রে আর আবুকার ছিদ্দি তিনি বড় দোস্তাদার
ছড়ি হাতে রুস্তম নাম যাহার (আয়—আ-হায়—আর)

ওরে, তিনি হাতে আমার কেতাম ছাপ্নেতে অলি সাব,
পঞ্চমাসে আবদুল্লা আয় মন (আয়-অহয়-অয়)।
ইমাম হোসেন হোসেন বন্দি আমি
আল্লা গুণা কর মাপ (আয়-আহায়-আয়)।
নবীর পদে রাখি হাজার সেলাম,
তিনির কুর্চিদানার বন্দিলাম,
শিক্ষ ওস্তাদ বামন হাটা গেরাম (আয়-আহায়-আর),
ওস্তাদ আমার মহম্মদ হানিফ,
ছাপি নাই তাঁর কোন কাম আমি তিনার চরণ বন্দিলাম ॥
সভার পঞ্চজন বন্দি আমি সভাতে আমার এই সেলাম ॥

—ঐ

৬১

পরথম বন্দনা আল্লাজির চরণ,
দোয়াজ বন্দম্ নবি তিন রায় বন্দম হজরতালি (ই-ইহি-ই)।
চাইরমে বন্দিয়া গাব কয় তোমার দুই চরণ,
তার বাদে বন্দিয়া গাব গো আমার ইমাম আর হোসেন
(আয়-অহয়-হ)।
যবন আমরা গাহন করি
সরস্বতীর নামটি ধরি আনন্দ মহিমা কোরাণে শুনি
(ই-ইহি-ই)।
একবার দয়া কর অধমেরে তরাও, হে মা তারিণী।
আজ তুফান দেইখে ছাইড়া যাইও না,
আমার মা সরস্বতী (ই-ইহি-ই)।

—ঐ

৬২

বাপের ঔরসে জন্ম মা ছিল না দেশে।
মা হইতে ছেলের জন্ম দেখ না নজর কইরে ॥
আল্লা তুমি কাদের গুণী থেইছে ভাবের পাশে,
গুরুশিষ্য একই তা আর দুই ভাগ হইল কিসে।
যথায় গুরু তথায় শিষ্য মানুষের মনেই যত পার্থক্য।
বাপের ঔরসে জন্ম, মা ছিল না দেশে ॥

আরেক কথা কাতর ছেলে বলি যে তোমারে।
একশ মাথা হাজার মুখ কোন ফেরেস্তার আছে ॥ —ঐ

৬৩

মুরশিদ, তরাও আমারে, দয়াল, তরাও আমারে।
তোমার নামটি দয়াময় ও দয়া ত নাই।
একবার দয়া করে লয়ে যাও পারে ॥
তোমা ভিন্ন আমার গতি নাই,
(তুমি) অগতির গতি বিগতির পতি,
রাবণ বংশ করেছ ক্ষতি তাতে আমার ক্ষতি নাই,
কেবল মরি তোমার ঐ চরণ বিনে ॥
তুমি হচ্ছ আমার জন, হৃদয় মাঝে বইস কালাচাঁদ,
গগন মণ্ডলে চান্দ দীমু জাতে কালে,
কানে না দেও, তাহাও অমনি যাও সইরে ॥ —ঐ

৬৪

মুরশিদ, ঘোচাও আমার মনের ব্যথা শুনি আজব কথা।
বিসমিল্লা বল যারে, বল বিচ্ কোথা কারে।
কে আনিল ভবের পারে কোথায় কার পাত্তা,
কোথায় তার প্রাণ রয়েছে কোথায় তার পাতা ॥
তোমার বুদ্ধি আর রইলো কোথায়,
মোরগ-মুরগী ছাইড়ে গেছে আণ্ডা পাইড়ে, শুইনে দিলে ব্যথা।
মুরশিদ, ঘোচাও আমার মনের ব্যথা ॥ —ঐ

৬৫

মুরশিদের বাক্য যে সত্য কয়,
গুরুর বাক্য যে সত্য কয়,
গুরুর বাইথনে ধর্ম পাবা মর্ম মত তুফান যাবে তরে ॥
আত্মায় গাঁথা যায় হায় কিশোরীর ভাবনা কি তাহার,
খুঁজিলে মানুষ মিলে, ও মন, খুঁজলে নিরঞ্জনকে,
মুরশিদের বাক্য যে সত্য হয় ॥

দয়াল বলে, ওরে আদম, তুমি তুইলো না মুরশিদের বচন।
আদম হয়ে এলে পরে, তুমিও পাবা ভক্তির জোরে,
মুরশিদের বাক্য যে সত্য হয়॥ —ঐ

৬৬

সাধ্য কার সুখ-সাগরে মাছ ধরে।
আছে কাম নামের কুমীর মানে না পীর, শির ছিঁড়ে ভক্ষণ করে॥
যত সব ভাসা জেলে, সাধ্য কি যে নামে জলে,
গিরনাল লাচ্ছে সব ভেসে নদীর কুলে যেতে পারে।
এক বেটা ময়লা মালো, সে বেটার কপাল ভালো,
কিছু মাছ ধরে ছিল মা কালীর কৃপাবলে।
কত বাগদী দিবা হয়ে হাবা তারা বাউটি কানে ধরে।
সাধ্য কার সুখ-সাগরে মাছ ধরে॥
বাগা আইর ঝিট্‌কে বটে নোর মদ দমক উঠে,
পাকা জাল ফেলল কেটে ক্রোধ কাছিমে হাতা মারে।
সে যে কুবের চান্দের তেজ্য পুত্র, হাড় পেকে ভব ঘোরে।
সাধ্যকার সুখ সাগরে মাছ ধরে॥
এই যাদু-বিন্দু ভৈইরো জাল ফেলল জঙ্গল জুড়ে,
একেবারে ফেলল ছিঁড়ে কেঁদে বেড়ায় ঘরে ঘরে।
সাধ্যকার সুখ সাগরে মাছ ধরে॥ —ঐ

৬৭

সঙ্গের সাথী কেবল আল্লার নামটি
কেউ তো সঙ্গে যাবে না রে।
কেউ তো সঙ্গে যাবে না রে॥ ধ্রু॥
এক মূর্খের বাড়ীতে ছিল তুলসীর গাছ,
তুলসী বসাইয়া মূর্খ বসাইছে কাপাস॥ ধ্রু॥
সেও মূর্খের মৃত্যু হইল গরুর হালটে,
সেও মূর্খ খাইতে আইল শিয়াল আর শকুনে রে॥ ধ্রু॥
শিয়াল উঠিয়া বলে, শকুন, ওরে ভাই,
এও মূর্খের শরীরে দেখ, নেজির অংশ পাই রে॥ ধ্রু॥

শকুন উঠিয়া বলে, শিয়াল, ওরে ভাই,
ঠোঁট হইতে পড়ব টুকরা মক্কার জমীনে ॥ ধ্রু ॥
সেও মূর্খ ভিস্তে প্যাইল আল্লার কুদ্‌রতে।
কেউ তো সঙ্গে যাবে না রে ॥ —ঐ

৬৮

সাঁই, দিন দুনিয়ার কথা, সাঁই, যখন বসে কাছারি,
খাড়া আছে চার জন দ্বারী ;
আছে দ্বারে দ্বারে সকল জীবের একই আত্মা।
পুর্ব দেশে আছেরে আত্মা পশ্চিম দেশে কইছে কথা,
আছে দ্বারে দ্বারে সকল জীবের একই আত্মা ॥
জানাইলে ঘোরে ফেরে হস্ত নাই যে বাজাইছি রে,
ধোনাই সা ফকিরে বলে, শুনো, ভাই,
সকল হেমাদ উধারে সাগরে ॥
গুরুপদে শিষ্যের মাথা, সাঁই দিন দুনিয়ার কথা ॥ —ঐ

৬৯

সদাই চেতন এই ত্রিভুবন নিরাকার সদাই রয়।
নিরঞ্জন দেখা নারে দেয় ॥
নিহার কইরে ছিলেন বিবি
দুই নয়নে না দেইখলে খোদার রূপছবি।
মিছা বিবি ঘরে নেইছে নিরঞ্জনকে দেখিতে চায়।
নিরঞ্জনকে দেখা না রে যায় ॥
ইমাম মান্দা গাথের গোরে শরীয়ো তব ফুল ॥ —ঐ

৭০

আমার জাগা হ'ল না এ সংসারে।
আমি কোথায় বা চলিয়া যাব রে।
আমার জলে জাগা নাই স্থলে জাগা নাই
আমি সদাই থাকি বিকলে ॥
অবলার জান কোথায় গেলি তোর লাঙ্গল কাঁদবে গলি গলি,
জন্মাবধি কলঙ্কের ডালি শ্রীরাধার মাথায়।

আমি পড়ছি সাঁতারে অকূল পাথারে
আমায় চরণ-তরী দাও হে ॥ —ঐ

৭১

পিয়ারের খসম আমার দেশে আইল না।
কত পানি-পান্তা পইড়া রইল খসম আমার খাইল না ॥
খসম আমার কইয়া গেছে কাইলের হাটে যাই।
তিনদিন পরে আস্‌বো আমি মানের কার্য নাই ॥
আমি সাজ্জে রাত্রে বিছানা ফালাই আমি ঘরের মাইঝায়।
চেয়ে দেখি আমার খসম ঘরে নাই।
আমি খোস নারী এ চেয়ে কান্দি পথ।
কোন পথে আসবে খসম আমার লএর কত ॥ —ঐ

৭২

আমি মন পাইলাম, মনের মানুষ পাইলাম না।
আমি (ও) তোর মধ্যে আছি মানুষ তাহা চিন্‌ল না।
ওরে শয়তানের আঠার খানা,
কোনখানে তার বারামখানা,
আমি মানুষ জনম খুঁইজে পাইলাম না।
যত ছিল বোঝাই নাইয়া
তারা গেল গোপে বাইয়া,
ও মোর খালি নৌকার উপায় দেখি না।
আমি মন পাইলাম, মনের মানুষ পাইলাম না। —ঐ

৭৩

আট কুঠুরি ষোল চাকা রে মধ্যে হীরার ধার,
তোর মুর্শিদ আছে নিগমেতে সেবক হলি কার ?
দেখ দেখি, মন, তোরে।
এত বড় অচরিত, রে ভাই, গাছের গোড়ার ফুল,
তার লতায় লতায় চাঁদ ধরেছে উবুদ গাছের মূল।
চা'র যুগের মানুষ হোনখানে হয় বিরাজ রে। —ঐ

৭৪

মানুষ হাওয়ায় চলে, হাওয়ায় ফিরে, মানুষ হাওয়ার সনে রয়,
দেহের মধ্যে আছরে সোনার মানুষ ডাকলে কথা কয়।
দিনের কালে অমাবস্যা রে মন,
(ও মন) ধর গিয়া সেই গুরুর চরণ।
সে ভাব-অনুরাগে ডুইবা থাক রে মন।
তোমার মধ্যে আর এক মন আছে গো,
তুমি মন মিশাও সেই মনের সাথে।
দেহের মধ্যে আছে রে মানুষ ডাক্‌লে কথা কয়। —ঐ

৭৫

(আমার) গুরুর চরণ সাধন আর হইল না, দিবানিশি ঐ ভাবনা।
বনের পশু পালিলাম আমি, পুরাইতে মনের বাসনা॥
জিঞ্জির কাইটে পাখী গেল জাঁহাগীরের নাম লইল না।
মহাজনের দেনা রে, ভাই, দেনার জ্বালায় প্রাণ বাঁচে না
হিসাব কিত্তাব কই, দেখলাম, খাতার উশুল পাইলাম না।
বিলাত গিয়ে দেখলাম আমি, ইংরাজ বিনে কল চলে না॥
ধুঁয়ার জোরে জাহাজ চলে, বাঙ্গলা লোকে টের পাইল না।
(আমার) গুরুর চরণ সাধন আর হইল না, দিবানিশি এ ভাবনা॥ —ঐ

৭৬

ভবনদীর তুফান দেখি ভারি,
ডাকাত নদীর তুফান দেখি ভারি,
(ভোলা) মন রে, আমার উলঙ্গ নদী।
বাগ বুঝিয়া খাটাইও বাদাম হস্তে রাখিয়া দড়ি,
(ভোলা) মন রে, ডুবিয়া যেন না মরি। —মৈমনসিং

৭৭

প্রেম-নদী বাইতে জান নি,
ও তুই সামাল সামাল, মন-মাঝিরে, নদীতে নোনা পানি।
বাইতে জানে রসিক জনে, যে জন নদীর বাঁধ চিনে,
ও সে বাইতে পারে বর্তমানে যার আছে কাজ-করনি॥

অনুমানে বাইলে পরে, অমনি বিন্দু যায়গো ছুটে,
আমি বারে বারে কই তোমারে, উজানের ভাব জানমি ॥
যার হৈয়াছে করণ আঁটা, তার অনুরাগে বাঁধা বৈঠা,
রাখ্‌ছে সেতো করণ আইটা, কি করবে ঝড় তুফানে ॥
উজান বাইতে যে জন পারে, তার তরে কি লোকসান পড়ে,
মুর্শিদ দয়াল কয় তোমারে, ছাইড় না ইন্দ্রমণি ॥ —ঢাকা

৭৮

মুর্শিদ দয়াল বলে, মদনরে তোর বুঝের ভুল,
(ভাবনা কি তার) রসে প্রেমে যে দিয়েছে ডুব ॥
গোপতলাতে তালাস করি, আয় দেখি, মন, ভবে সাঁতার খেলি,
শমনে কি করতে পারে, গুরু যারে দিচ্ছে হুঁস ॥
তিন রত্তিতে হয়রে মানুষ, সে মানুষের আছে হুঁস,
অটল মানুষ বৈসা আছে, ভাব নাই রে তার চুপরে চুপ ॥ —ঐ

৭৯

মনের মানুষ যেখানে, আমি কোন সন্ধানে যাই সেখানে ?
(ভোলা মন) সাতালি পর্বতের নীচে, সেইখানে মন রায় আছে,
কত সাধুর তরী যাচ্ছে মারা, পড়িয়া নদীর ঢেউ তুফানে।
রসিক যারা পার হয় তারা, তারা নদীর ঢেউ চিনে ;
কত সাধুর তরী যাচ্ছে মারা পড়িয়া নদীর ঢেউ তুফানে। —মৈমনসিং

৮০

মন, তুই ভুলিলি রে, আপন সাধন-জ্ঞান কারে দিলি রে।
আগে যদি জান্‌তাম রে, সাধু এত চোর,
তবে কেন দিব জাগা তেতলার উপর,
চোরের বাড়ী, চোরের ঘর, চোরে চোরে মেলা,
আটকুঠুরীর ধন লুটিল, ভাঙ্গল ষোল তালা। —ঐ

৮১

কুকাষ্ঠ শিমুলের নৌকায়ে, (ভাই রে) গুড়া সারি সারি,
কোন সুতারে গড়ছে নৌকা, নাই হাতুড়ের বাড়ি।

কুকাষ্ঠ শিমুলের নৌকারে গুড়া পাটে পাটে,
কাণ্ডারী বিহনে নৌকা ফিরে ঘাটে ঘাটে।
মুরসিদ আমার সোনার মুরসিদ, নাও আমার ঘাটে বান্ধা রইল।
ঠাট করে বাঁধিলাম নৌকা পার হইবার আশে,
সেও নৌকা তলাইয়া গেল আপনার দোষে।
আগা তলাল, পাছা তলাল, তলাল রসের গুড়া,
আস্তে আস্তে তলাইয়া গেল সা মাস্তলের চূড়া।
ঠাট করে বাঁধিলাম ঘর রে বাস করিবার আশে,
সেও ঘর ফেলিয়া দিল হুড়কা বাতাসে।
তার পরে বাঁধিলাম ঘর চামের ছাউনী,
সেও ঘরে লাগলো আগুন জ্বলে দিবানিশি।
দয়াল মুরসিদ, নাও আমার ঘাটে বান্ধা রইল। —ঐ

৮২

উন্থুর ঝুন্থুর বাজে নাও আমার,
নিহাইল্যা বাতাসে রে, মুরশীদ, রইলাম তোর আশে।
পশ্চিমে সাজিল ম্যাঘ রে, ছাওয়ায় দিল রে ডাক,
আমার ছিঁড়িল হাইলির পানস, নৌকায় খাইল পাক রে,
মুরশীদ, রইলাম তোর আশে।
আগা বায়া ওঠে ঢেউ রে পাছা বায়্যা রে যায়,
আমার হীর্যালাল মাণিক্কির বারা, সোতে বাইয়্যা যায় রে,
মুরশীদ, রইলাম তোর আশে। —ফরিদপুর

৮৩

ওপার আমার মুর্শীদের বাড়ী ;
এ পার বইসে কান্দি আমি রে।
বিধি যদি দিত রে পাখা, উইড়্যা যায়া দিতাম দেখা ;
উইড়্যা পড়তাম দাগুসার পায় রে।

৮৪

ঘাটে লাগাও রে নাও আমি চিনে লই বেপারীরে,
নাও ঘাটে লাগাও রে।

কাল হেন মাঝি হারে বিটা নৌকা বায়্যারে যায়,
মরণকাষ্ঠ ধইর‍্যা রে কান্দে, ও সাধু, তোমার বাপ মায় রে,
নাও ঘাটে লাগাও রে।
আগা নৌকার ঝামুর, হারে ঝুমুর, পাছা নৌকায় রে ছয়া,
তারি মদ্দি বইস্যারে আছে, মনুয়ারে, তনু হেলান দিয়া রে,
নাও ঘাটে লাগাও রে।
নায়ের কাটা নৈলাম কাছি রে নইলাম আরও নৈলাম রে গুণ,
জনম ভইরে টাইনে রে মইলাম, আমি না পাইলাম তার কুল রে,
নাও ঘাটে লাগাও রে।
এই না নৌকার আগা বায়্যা ওঠে ঢেউ রে, পাছা বায়া রে যায়,
মরণ-কাষ্ঠ ধইরে রে সোনাই-ও মোনাই কান্দে হায় হায় রে,
নাও ঘাটে লাগাও রে। —ঐ

৮৫

গুণের ভাই মোনাইরে, তুমি জঞ্জালে না রে দিও মন।
জঞ্জাল বেষম জঞ্জাল জঞ্জালে বড়রে জ্বালা,
জঞ্জালে না দিয়া মন সোনার শরীল করলাম কালারে,
জান মোনাই রে।
ফিরাও এ পাগেলার মন রে, পাপের পথ রে হইতে,
যেমন রাখালে ফিরাইছে ধেনু পরের শস্য খাইতে রে,
জান মোনাইরে। —ঐ

৮৬

চল যাইরে—আমার দরদীর তালাসেরে,
মন, চল যাইরে।
ইস্ত্রী হৈল পায়ের বেড়ী পুত্র হৈল কাল,
এড়াইতে না পারলাম, রে দয়াল, এই ভব জঞ্জাল রে,
মন, চল যাইরে।
হাল বাও, হালুয়া ভাই রে, হস্তে সোনার নড়ী,
এই পথখানি যাইতে দেখাছাও আমার সোনার চান সন্ন্যাসীরে,
মন, চল যাইরে।

দেইখ্যাছি দেইখ্যাছি আমরা সোনার চান সন্ন্যাসী,
ও তার গলায় মালা, কান্ধে ঝোলা করে মোহন বাঁশী রে,
চল চল যাইরে।
জাল বাও, জালুয়া বাইরে, হস্তে সোনার ডুরী,
এই পথখানি যাইতে দেখছাও আমার সোনার চান বেপারীরে,
মন, চল যাইরে।
দেইখ্যাছি দেইখ্যাছি আমরা সোনার চান বেপারী,
ও তার হাতে আশা, বেগলে কোরাণ মুখে মধুর হাসিরে,
মন, চল যাইরে। —ফরিদপুর

৮৭

হা রে দয়াল, যাবা রে ছাড়িয়া,
আর হবে না মানব-জনম, ও ডাক আল্লা রছুল বইল্যা রে,
ও ভাই মোনাইরে।
ও ভাই মোনারে,
এই বড় বাড়ীর বড় ঘররে, মোনা ভাই, বড় করছাওরে আশা,
এই রজনী প্রভাতের কালে পক্ষী ছাডবে বাসা রে—
ও ভাই মোনারে।
ও ভাই মোনারে,
বড় ঘর বাইন্দ্যাছাও, অহে রে মনা ভাই, হা'রে, চেকন দিহা রে সলা,
আমার আল্লাজীর বানাইন্যা ঘর রে, মনা ভাই, মাটীর বাঙ্গেলা রে।
ও ভাই মোনারে।
ও ভাই মোনারে,
সমুদ্দুরে উঠে ঢেউ—ওরে মনা ভাই, হারে কুলে আইস্যা রে ঠেকে,
আমার অন্তরে উইঠ্যাছে ঢেউ, ওরে মনা ভাই, কেবা তারে দেখে রে,
ও ভাই মোনারে।
ও ভাই মনা রে,
সাইল সম্বীর ডুডী পাখীরে, মনা ভাই, গম্ভীর নীচেরে চলে,
স্যাও গম্ভীর শুকায়্যা গেল রে, মনা ভাই, অমনি উড়াল ছাড়ে,
ও ভাই মোনারে।

ও ভাই মোনাইরে,
তালাপেতে নাইক্যা জলরে হাতে পাড় ক্যান রে ডুবে,
বাসায় ও ত নাইক্যা ছাও ওরে মনা ভাই, ফইড় কেন ওড়েরে,
রে ভাই মোনাই রে। —ঐ

৮৮

আমার আল্লা রছুলের নাম,
আমার পীর আর মুরশীদের নাম জানিয়া লও রে মন।
হক্ক জানিও হক্ক লইও, হক্ক করিও চিনা,
হক্কের নামে ভইরবে ভারা, ও তার লাভে হবে দুনা।
পাহাড়ের উপর পর্বত রে, পর্বতের উপর চূড়া,
এ দুনে উড়ায়ে নিবে যেমন সিমুইলের তুলা।
পাহাড়ের উপর পর্বত রে, পর্বতে হীরার ধার,
সেই ধারেতে কাটা রে যাবে যত বদী গুলা গার। —ঐ

'হক্ক' শব্দের অর্থ সত্য, 'দুনে'র অর্থ দুনিয়া এবং 'বদী' শব্দের অর্থ বদ।

৮৯

মন যদি বৃন্দাবনে বাস করিতে চাও,
আল্লাজীর কাণ্ডারী নৌকা ধীরে ধীরে বাও।
মাতাপিতার দুখান চরণ মাথায় তুলে লও।
রতি মনে নিহার কইরারে, ও তার দুইখান চরণ মাথায় লও।
সীজদা কাল উঠায়া দিয়া রে, নৌকা ইমান রাইখ্যা বায়া যাও। —ঐ

'সীজদা' শব্দের অর্থ নমাজের সময়কার প্রণাম।

৯০

মন, তুমি গুরুর পাকে রইল্যারে মিছা মায়ায় বন্দী হয়া।
এলাহি দরিয়ার মাঝে নানান রঙের কল,
পাথর ভাসিয়া যায়, সোলা হয় তল।
ইলবিল শুকায়া যায়, মৎস্ত নিল চিলে,
ছাড়িয়া যায় সোনার ভাইধন কামিনীর কোলে।
শুকনা কাষ্ঠের পরে পড়িয়া ডাকি কাকা,
ওই যে ভাজন বেটা মরিয়া গেলে মার শরীলে দাগা। —ঐ

৯১

তত্ত্ব জানিয়া লওরে, মন।
ডাইনে আল্লা বামে রছুল রইছেন এক ঠাঁই।
রছুলউল্লা কাইন্দ্যা বলে, আমি আল্লা দেখি নাই।
দুবুলার শীষের, ভাই, নিগুলের পানী,
ডাইন চক্ষে নি কইতে পারে মুনা বাম চক্ষের কাহিনী।
কোথায় গুণে আইল রে ফকীর মাংস নাই তার ধড়ে,
হাড়ের উপর নাইক্যারে মাংস রক্ত ভাইস্যা পড়ে। —ঐ

৯২

পহেলা আল্লা দুয়ামে মওলা,
তিয়ামে মহম্মদ চৌঠাতে হজরত আলী—
পঞ্চমে বরকত মারে—হরদমে আল্লার নাম। —ঐ

৯৩

আমার হয়্যা জন্ম বৃথা গ্যাল, ভাই, নাও আন রে,
নাও আন রে বাই—না—ও আন রে।
ঘাটে বান্দা আছে রে নাও গুরা সমান পানি,
আমি নিশ্চয় জাইন্যাছি এই নাও ছুইট্যাছে গহিনীরে,
ভাই, নাও আন রে।
গুরুজীর বানাইন্যা নাও শ'গুণ কাণ্ডারী,
বনের শৃগাল বলে আমি এই নৌকার বেপারী রে,
ভাই, নাও আন রে। —ফরিদপুর

৯৪

ধীরে ধীরে বাইও রে নৌকা, দয়াল চান রে, ধরি রাঙা পায়।
আমি কি অপরাধ কইর‍্যাছি, সোনার চান রে, তোমার রাঙা পায়।
লাভ করিবার আইস্যা রে ভবে আমি খালি হস্তে যাই।
মহাজনের ভরা নাও আমি ডুবাইয়া দেই। —ঐ

৯৫

ও সোনার মুরসিদ,
জানলে তোর ভাঙ্গা নৌকায় চড়তাম না।

লৌকায় গোলই ভাঙ্গা, তরী চেরা গাব গাহিনী মানে না।
সহজে খাটাও বাদাম চাঁচড়ে যেন ঠেকে না॥
নয়্যা নাও গড়াইলে রে মোনা 'ব্যাপার' করল্যা না,
ভাব্তে ভাব্তে হৈলাম সারা কুল কিনারা পাইলাম না॥ —ঐ

মেঘমতী কন্যার পালাগান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৪র্থ খণ্ড ২য় সংখ্যায় 'জীরালণী' নামে একটি অসম্পূর্ণ পালা গান সংগৃহীত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ইহা মেঘমতী কন্যার পালা গান (পৃ. ৪২৭—৪৫১)।

১

কুশাই নদীর উত্তরি, ময়াল ভাইরে, নয়াগঞ্জের হাট
ভাইরে, নয়াগঞ্জের হাট।
গঞ্জের রাজা চক্রধর, শুন কহি তার ঠাট॥
বড়ই ক্ষেমতা রাজার চৌধুরি বিস্তর।
কুশাই নদীর পাড় জুড়িয়া তার নয়া নয়া ঘর।

* * * *

পরথম যৌবন লো কন্যা পরথম বয়সে।
মেঘমতী নাম কন্যা চন্দ্র যেমুন হাসে॥
কি কব কন্যার রূপ কইতে না জোয়ায়।
যেই জন দেখে কন্যা করে হায় হায়॥
মেঘমতী নাম কন্যা মেঘের বরণ চুল।
মুখখানি দেখি কন্যার চন্দ্র সমতুল। —মৈমনসিংহ

মেচিনি খেলার গান

উত্তর বাংলার মেচ জাতির সকল বয়সের নারীগণ বৈশাখ মাসে তিস্তা নদী বা তিস্তা বুড়ীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া বাড়ী বাড়ী যে গান গাহিয়া এবং নৃত্য করিয়া বেড়ায়, তাহাকে মেচিনি খেলার গান বলে।

১

আসিয়া লছুমী মাঁও মোর দুয়ারে দিল পাঁও,
আগো বাড়ির সুধন করেছে গিরহী বাপো মাঁও।

ক্যানেরে পুত দীঘল পাঁও যদি তোমার চাউল নাই,
ধান ভুকিয়া হামাক চাউল দেও, চাউল ধরিয়া বেড়াই হামেরা,
উদনা সুন্দরী গে তোমার যে চাউল কোরি,
তোমারে বিলামো তোমার চাউল কোরি।
তিস্তা বুড়ি সেবিব তোমার ঘরের হামরা
বিঘিনী খণ্ডাইব। —জলপাইগুড়ি

২

আসিয়া লখমী মাও মোর দুয়ারে দিবে পাও,
আগোবাড়ি শূদ করেছে বিধুর বাপ মাও।
ক্যানেরে পুতা ঘন পাও, লখমী সরস্বতী এই ঠে
ন্যাও বাস ঘর, সাইন্‌জা হলে সাইন্‌জা বাতি
বিহানে ছান ছর। —ঐ

৩

নয়া কুলা খান বেতের বান সে
বেতের বান কোটকী দিলে ধান
এই গুটিক ধান দিয়া নীচালে গো সিকোই চুলি
ভাতার শুনিলে ডাহাবে তোক। —জলপাইগুড়ি

৪

আসিয়া নছুমী মাও মোর দুয়ারে দিলে পাঁও,
আগো বাড়ির সিদো করেছে বিদো বাপ মাঁও।
ক্যানে পুতরে ঘন পাঁও, তোমার চাউল নাই,
ধান ভুকিয়া তামাক চাউল দ্যাও।
চাউল ধরি বেড়াই হামরা অঞ্জনা সুন্দরী গে। —ঐ

মেলার গান

গাজনের মেলা উপলক্ষে যে গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাকে সাধারণ ভাবে মেলার গান বলে—

১

শুধা হাতে যাইও না, জিরা ডাল (পয়সা) যাইও না।
জিসম পাতা চাই চাই শুধা হাতে খাইও না।

জিসম পাতা চাই চাই বড় পাতা দলরে,
বাদলদল দলরে—বাদল শুধা হাতে যাইও না।
নানাহুমার পানের দোকান পানে রে। —বেলপাহাড়ী

২

হাতে শাঁখা ছুঁয়ো ছুঁয়ো গায়ে হাত দিয়ো না, বাছা, দিয়ো না।
গায়ে হাত দিলে, বাছা, জাতিরি গেলো।
কি দিয় দেহরে রাখিব তুমি যেরে বামুনের বিটী,
গায়ে হাত দিও না বাছা, দিয়ো না।
গায়ে হাত দিলে, বাছা, জাতিরি গেলো॥ —ঐ

৩

মা যদি তোর সয়ে না কথা।
বাবারে তুই ডাক্॥
মা আছে তোর সিংহাসনে।
সিংহাসনেই থাক॥
একটি শুধু বিল্বদলেই।
প্রাণ ঢেলে দে চরণ তলেই॥
ও তুই শিবশম্ভু বলে।
একটা দেতো হাঁক॥
এক ফোঁটা অশ্রু জলে রে।
পাগল ভোলা যাবে গলে॥
চাই না রে তোর তন্ত্রমন্ত্র।
চাই না রে তোর যজ্ঞ যাগ॥ —ঐ

৪

সুকন রাথায় মেলা বসেছে, আহা, কি শোভা না হয়েছে।
সতী ঘাটে জয়দা দহে একই শোভা হয়েছে।
টুসু মায়ের চরণ তলে লুটে সবাই পড়েছে॥ —ঐ

৫

কেউ পড়েছে রেশমী শাড়ী, শাঁখা চুড়ি কার বাজে,
কেউ পীরিতির টানে, সখি, আড়ে আড়ে হাসিছে।

লাজের মাথা খেয়ে, সখি, কেউ তালে নাচে,
বিপিন বলে, মেলায় এলে দুঃখ জ্বালা যায় ঘুচে ॥ —ঐ

৬

মনকে বাঁধা গেলো না, সখি,
ভবে আর কটা দিন বাকী।
এই ভবের লীলা খেলা ধূলা গেল বেলা দেখাদেখি।
অকাজে কুকাজে বাজে দিয়েছে নিজে ফাঁকি,
কামনা বাসনা দেনা ভাবনা অনেক বাকি।
বিপিন ভণে কেমনে শমনে যে দিব ফাঁকি। —ঐ

মেয়েলী গীত

পল্লী-সমাজে স্ত্রীলোক কর্তৃক গীত গান মাত্রই মেয়েলী গান বলিয়া পরিচিত। কয়েকটি ব্যঙ্গ রসাত্মক মেয়েলী গান এখানে উদ্ধৃত হইল।

১

আমের পাতা চিকন চাকন, ভাই ধন, বাঁশের পাতা কেন মানায় না,
বারে বারে লেখন লেখি, ভাই ধন, জামাই চাঁদ কেন আসে না।
ছাতার লেগে হ'য়েছ ব্যাজার, বাবা, এবার ছাতা দিতে পারব না,
ধুতির লেগে হ'য়েছ ব্যাজার, বাবা, এবার ধুতি দিতে পারব না।
ঘড়ির লেগে হ'য়েছ ব্যাজার, বাবা, এবার ঘড়ি দিতে পারব না।
আমের পাতা চিকণ চাকন, ভাই ধন, বাঁশের পাতা কেন মানায় না।

২

নদীর ধারে মরিচ গাছ, বলি টিয়া পাখীতে খায়,
সোনার ঝাঝুরি রূপার ডালা, বলি মরিচ তুলতে যায়।
হেন সময়ে রাজার বেটা বলি হরিণ শিকারে যায়,
কপালের মানান টায়রা দিব, ছুঁড়ি, আমার মহলে আয়,
কানের মানান পাশা দিব, ছুঁড়ি, আমার মহলে আয়,
নদীর ধারে মরিচ গাছ, বলি টিয়া পাখীতে খায়। —মুর্শিদাবাদ

৩

মেয়ে আমার অতি সুন্দরী।
জামাই আমার ধান সিদ্ধ হাঁড়ি।

আহা তাইতে মেয়ে পাঠাই না।
কাল জামাই মনে লাগে না।
হ্যাংলা জামাই মনে লাগে না।
আহা তাইতে মেয়ে পাঠাই না॥
মেয়ে আমার অতি সুন্দরী,
জামাই আমার ধান সিদ্ধা হাড়ি
আহা তাইতে মেয়ে পাঠাই না। —ঐ

'মৈমনসিং গীতিকা'

পুর্ব মৈমনসিংহ হইতে সংগৃহীত গীতিকাগুলি যে গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'। ইহা ১৯২৩ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়।

মেয়েলী রামায়ণ

কোন কোন অঞ্চলের মেয়েরা প্রধানত সাধভক্ষণ, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে রামায়ণের কোন কোন অংশ গান করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে বাল্মীকি কিংবা কৃত্তিবাস কাহারও আদর্শ রক্ষা করিবার পরিবর্তে নারী জাতির জীবন আদর্শ অনুযায়ী কাহিনী পুনর্বিন্যস্ত হইয়া থাকে। পুর্ব বাংলা বিশেষত পুর্ব মৈমনসিংহের এই শ্রেণীর গানে চন্দ্রাবতীর ভণিতা পাওয়া যায়। তিনি মনসা-মঙ্গল রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। অনেকের বিশ্বাস, তিনি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই মেয়েলী রামায়ণ বা বাংলার মহিলা কৃত্তিবাস চন্দ্রাবতী রচিত রামায়ণ বলিয়া মনে করা হয়। সামান্য অংশ উদ্ধৃত করা হইল।

১

সাগরের পারে আছে গো কনক ভুবন।
তাহাতে রাজত্ব করে গো লঙ্কার রাবণ॥
বিশ্বকর্মা নির্মাইল গো রাবণের পুরী।
বিচিত্র বর্ণনা তাহার গো কহিতে না পারি॥

যাত্রা গান

বাংলা লোক-নাট্যকে (folk-drama) সাধারণ ভাবে যাত্রা গান বলা হয়। অভিনয় অর্থে যাত্রা শব্দটির উৎপত্তি লইয়া মতবিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও সংস্কৃত অভিধানে উৎসব অর্থে যাত্রা শব্দটি গৃহীত হইয়াছে, তথাপি এ কথা সত্য যে, শব্দটি যদি মূলত ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দ হইয়া থাকে, তবে 'যা' ধাতু হইতে ইহা উৎপন্ন বলিয়া গমন অর্থেই ইহা সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইত। এই গমন উপলক্ষে উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া কালক্রমে উৎসব অর্থেই যাত্রা শব্দটি সংস্কৃতে ব্যবহৃত হইতে থাকে। এইভাবে দেবযাত্রা শব্দের অর্থ দেবতা-সম্পর্কিত কোন উৎসবের অনুষ্ঠান। কিন্তু 'যা' ধাতু অর্থে যে গমনের কথা পুর্বে উল্লেখ করিলাম, তাহা কাহার গমন এবং কোথায় গমন? প্রাচীন কালে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই গ্রহ-নক্ষত্রাদির কক্ষ হইতে কক্ষান্তর গমন উপলক্ষে উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইত। গ্রহদিগের মধ্যে সূর্যই প্রধান এবং সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ; শুধু তাহাই নহে, ইহা নানাভাবে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে জড়িত। ইহাই পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন জাতির মধ্যে সূর্যোপাসনার উৎপত্তির মূল। পুর্বভারত অঞ্চলেও যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই সূর্যোপাসনার ব্যাপক অস্তিত্ব ছিল, তাহা জানিতে পারা যায়। বৎসরের মধ্যে সূর্যের চারি বার চারিটি উল্লেখযোগ্য 'যাত্রা' বা কক্ষান্তরগমন অনুষ্ঠিত হয়, তাহাদের মধ্যে দুইটি প্রধান ও দুইটি অপ্রধান। সূর্যের প্রধান দুইটি গতি-পরিবর্তন বা নূতন যাত্রার মধ্যে একটি ইহার উত্তরায়ণ ও অপরটি দক্ষিণায়ন। কৃষি সমাজের নিকট সূর্যের উত্তরায়ণ অপেক্ষা দক্ষিণায়নের ব্যবহারিক মুল্য অনেক বেশী; কারণ, তখনই গ্রীষ্মের অবসানে বর্ষার সূচনা হইয়া থাকে এবং এই সময়ের মধ্যেই সমগ্র কৃষিকার্য শেষ করিয়া কৃষিজাত দ্রব্যাদি গৃহে তুলিয়া লওয়া হয়। সেইজন্য এক হিসাবে সূর্যের দক্ষিণ দিকে যাত্রা আরম্ভ হইবার মুহূর্তেই যে সূর্যোৎসব অনুষ্ঠিত হইত, তাহা পুর্বভারত অঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ সূর্যোৎসব। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সূর্যের দক্ষিণায়নে এবং শীতপ্রধান দেশে সূর্যের উত্তরায়ণেই প্রধান সূর্যোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেইজন্য যেদিন হইতে বড়দিন আরম্ভ হয়, পাশ্চাত্ত্য জগতের তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসবের দিন এবং যেদিন হইতে 'ছোট দিন' আরম্ভ হয়, প্রাগার্য ভারতীয় সমাজে তাহাই সর্বাপেক্ষা

উল্লেখযোগ্য উৎসবের দিন ছিল। তাহার প্রমাণ, উড়িষ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া দাক্ষিণাত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব রথযাত্রা। বাংলাদেশেও যে এক কালে রথযাত্রাই অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব ছিল, তাহার এখনও প্রমাণ পাওয়া যায়। এই রথযাত্রা সূর্যের দক্ষিণায়ন উৎসব ব্যতীত আর কিছুই নহে। উত্তরায়ণ পথে অগ্রসর হইতে হইতে সূর্য যখন আষাঢ় মাসে উত্তরায়ণ বিন্দুতে আসিয়া উপনীত হইত, তখন পুনরায় তাহার দক্ষিণায়ন যাত্রার সূচনার মুহূর্তেই রথযাত্রার অনুষ্ঠান হইত। পরবর্তী হিন্দু, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বশত উড়িষ্যা ও বাংলায় এই রথযাত্রা জগন্নাথদেবের রথযাত্রা, মাধাই বা মাধবের রথযাত্রা ইত্যাদি বলিয়া পরিচিত হইলেও, ইহা যে মূলত সূর্যেরই দক্ষিণায়ন যাত্রার উৎসব ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়।

অয়নের শেষ বিন্দুতে উপস্থিত হইলে সূর্যের প্রতীক্‌কে রথে স্থাপন করিয়া সেই রথ টানিয়া লইয়া সূর্যের নূতন যাত্রা সুরু করাইয়া দেওয়ার প্রবৃত্তির মধ্যে আদিম সমাজের একটি ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাকে ইংরেজিতে sympathetic magic বলে। আদিম সমাজের ধারণা ছিল, সূর্যের প্রতীককে রথে তুলিয়া যাত্রা করাইয়া না দিলে আকাশস্থ সূর্য নূতন যাত্রাপথে অগ্রসর হইতে পারিবে না—তাহাতে নানা অঘটনের সৃষ্টি হইবে। সেইজন্য সূর্যের এই যাত্রা উপলক্ষে সমাজে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইত। যদিও গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সূর্যের দক্ষিণায়ন যাত্রাই সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব, তথাপি রাশিচক্রে সূর্যের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য যাত্রা উপলক্ষেও উৎসবের অনুষ্ঠান করা হইত। সূর্য বিষুবরেখায় অবস্থিত হইলে যখন দিনরাত্র সমান হয়, তখন বঙ্গদেশে যে চড়কোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহাও সূর্যোৎসব ব্যতীত আর কিছুই নহে, এই সময়ে সূর্যের যে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হইত, তাহাই বৈষ্ণবপ্রভাব বশত বর্তমানে শ্রীকৃষ্ণের পুষ্পক রথ বলিয়া পরিচিত। মাঘ মাসে দক্ষিণায়ন বিন্দুতে সূর্য অবস্থিত হইলে সূর্যের যে রথযাত্রার অনুষ্ঠান হইত, তাহা এখনও 'রথাখ্যা সপ্তমী' নামে বাংলা পঞ্জিকাদিতে উল্লেখিত হইয়া থাকে। সূর্যের নব নব যাত্রা উপলক্ষে এই সকল উৎসবের অনুষ্ঠান হইত বলিয়া কালক্রমে দেবতা-বিষয়ক যে কোন উৎসবকেই যাত্রা বলিত। ইহার সঙ্গে অন্য কোন দেবতাকে লইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাত্রা কিংবা 'মিছিল ক'রে যাওয়া'র কোন সম্পর্ক নাই। কালক্রমে বাংলা দেশের উপর যখন বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপক প্রভাব বিস্তৃত হইল,

তখন কৃষ্ণবিষয়ক উৎসবাদিই এই দেশে প্রাধান্য লাভ করিল, এই কৃষ্ণোৎসবসমূহ কৃষ্ণযাত্রা নামে পরিচিত হইল। যেমন ঝুলন বা হিন্দোলযাত্রা, রাসযাত্রা, দোল-যাত্রা ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, রাসযাত্রাও দ্বাদশ রাশির পথে সূর্যের পরিক্রমণই বুঝায়। বৈষ্ণবপ্রভাব বশত সূর্যই এখানে কৃষ্ণ ও দ্বাদশ রাশি দ্বাদশ গোপিকার রূপ লাভ করিয়াছে। পুরীর রথযাত্রাও এখন সূর্যের পরিবর্তে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার রথ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ ধামরাইর রথ মাধাইর রথ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। পূর্বে সূর্যের কোন প্রতীক রথারূঢ় করিয়া সেই রথ টানিয়া লইয়া অনুকারক ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া (sympathetic magic) দ্বারা সূর্যকে যে নূতন অয়নপথে গতিদান করা হইত, বর্তমানে সেই সূর্যের স্থান কৃষ্ণ কিংবা জগন্নাথ গ্রহণ করিয়াছেন—সূর্যের নূতন যাত্রাপথে রথ টানিয়া লইয়া যাইবার রীতিটি এখন কৃষ্ণ কিংবা জগন্নাথ সম্পর্কেই প্রচলিত হইয়াছে। নতুবা কৃষ্ণ কিংবা জগন্নাথকে আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে রথে তুলিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার আর কোন তাৎপর্য থাকিতে পারে না।

এইখানে আরও একটি বিষয় গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। যাত্রা শব্দটি প্রকৃতই সংস্কৃত গমনার্থক 'যা' ধাতু হইতে উৎপন্ন, কিংবা ইহা উৎসব অর্থবাচক কোন অনার্য শব্দ হইতেই সংস্কৃতে গৃহীত হইয়াছে! যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে শব্দটির উৎপত্তির মূলে সূর্য কিংবা অন্য কাহারও এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনের কোন সম্পর্কই নাই। এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী ছোটনাগপুরের আদিম অধিবাসী ওরাওঁদিগের মধ্যে যাত্রা নামে একটি অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। ওরাওঁগণ দ্রাবিড়-ভাষাভাষী, ইহাতে শব্দটি মূলত দ্রাবিড় ভাষা হইতে আসিয়াছে বলিয়াও অনুমিত হইতে পারে। এখানে ওরাওঁ জাতির যাত্রা অনুষ্ঠানটির একটু পরিচয় দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ওরাওঁদগের মধ্যে প্রতিবেশী গ্রামসমূহের অধিবাসী অবিবাহিত যুবক-যুবতীদিগের সমবেত নৃত্যানুষ্ঠানের নাম যাত্রা। এই অনুষ্ঠানের একটি প্রধান সামাজিক মূল্য এই যে, ইহার মধ্য হইতেই প্রধানত যুবক-যুবতীগণ তাহাদের ভবিষ্যৎ বিবহিত জীবনের সঙ্গী ও সঙ্গিনীর সন্ধান পাইয়া থাকে এবং ইহার ভিতর দিয়া তাহাদের যে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া থাকে, তাহা কালক্রমে বিবাহ-বন্ধনে পরিণতি লাভ করে। সেইজন্য অবিবাহিত যুবক-

যুবতী মাত্রই এই অনুষ্ঠানটির জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। বহু লোক-সঙ্গীতের মধ্য দিয়া ওরাওঁ যুবক-যুবতীর প্রাণের এই আকুতি প্রকাশ পাইয়াছে।

বৎসরের মধ্যে যে কোন অবসর সময়ে বিশেষ কোন অঞ্চলের গ্রামসমূহের যে কোন এক কিংবা একাধিক স্থানে যাত্রা নামক এই নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে 'জেঠ্ যাত্রা' নামে পরিচিত জ্যৈষ্ঠ মাসে যে নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন হয়, তাহাই প্রধান। সপ্তাহ কাল পূর্ব হইতেই গৃহে গৃহে এই উপলক্ষে পচাই তৈরী করিবার ধুম পড়িয়া যায়। তারপর নির্দিষ্ট দিনে যুবক-যুবতীগণ পত্র-পুষ্পে সুসজ্জিত হইয়া নির্ধারিত যাত্রার স্থানে আসিয়া সমবেত হয়। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গ্রামসমূহ হইতে আগত নিমন্ত্রিতগণকে বিশেষভাবে আপ্যায়িত করা হয়; এইভাবে এক গ্রাম অন্য গ্রামকে নিমন্ত্রণ করিবার ফলে বিবাহযোগ্য যুবক-যুবতীদিগের মধ্যে পরস্পর পরিচয় স্থাপিত হয়। ভাণ্ডের পর ভাণ্ড পচাইর সদ্ব্যবহার করা হইলে পর সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া যুবক-যুবতীদিগের সমবেত সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান চলিতে থাকে। যে স্থানে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়, তাহাকে সাধারণত 'যাত্রাটাঁড়' বলা হয়। উৎসব-ক্ষেত্রে একটি কাঠের খুঁটি ঘিরিয়া এই নৃত্যানুষ্ঠান হইয়া থাকে, সেই খুঁটিকেও 'যাত্রা খুটিয়া' বলা হয়। এই নৃত্যানুষ্ঠানের জন্য যুবক-যুবতীগণ বিশেষ পোষাকও পরিধান করিয়া থাকে, তবে পত্রপুষ্পই অধিকাংশ দেহসজ্জার কাজ করে। দূরবর্তী গ্রাম হইতে নিমন্ত্রিত যুবক-যুবতীগণ রীতিমত শোভাযাত্রা কবিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে বাহির হয়—শোভাযাত্রা-কারীদিগের মধ্যে কেহ পতাকা, কেহ অন্য কোন অভিজ্ঞান সঙ্গে করিয়া লইয়া অগ্রসর হয়। প্রকৃত নৃত্য বা যাত্রা-স্থানটিকে (Jatra-ground) বিশেষ পবিত্র বলিয়া বিবেচনা করা হয়। আনুষ্ঠানিক ভাবে কতকগুলি নির্ধারিত আচার পালন করিয়া বিভিন্ন দল সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া থাকে এবং সমস্ত রাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠিত নৃত্যোৎসবে তাহাদের সাধ্যমত কৃতিত্ব দেখাইয়া থাকে। যে গ্রামে এই যাত্রার অনুষ্ঠান হয়, সেই গ্রামের বর্ষীয়সী কয়েকজন মহিলা 'মঙ্গল কলস' (করসা) মাথায় করিয়া লইয়া সেইস্থানে উপস্থিত থাকে। কোন কোন সময় তাহারাও ঐ ভাবে নৃত্যে যোগদান করে। এই উপলক্ষে বিভিন্ন গ্রামের কর্তৃপক্ষীয় লোকজনও সমবেত হইয়া নিজেদের সমাজিক বিবিধ সমস্যার কথাও আলোচনা করিয়া থাকে।

ওরাওঁ যাত্রার এই বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, পশ্চিম বাংলার প্রান্তবর্তী অঞ্চল হইতে যাত্রা কথাটি গিয়া যে ওরাওঁদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা নহে। ওরাওঁদিগের ইহা একটি বিশিষ্ট সামাজিক অনুষ্ঠান; শুধু সামাজিকই নহে, ইহার মধ্যে ধর্মীয় (religious) সম্পর্কও আছে—বিশেষত ইহার উপরই একটি উপজাতির সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বোধ হইবে; কারণ, ইহার মধ্য দিয়াই তাহাদের সর্বপ্রধান সামাজিক ক্রিয়া বা বিবাহের উপায় হইয়া থাকে। অতএব ইহা বাহির হইতে পরবর্তী কালে অন্যের নিকট হইতে ধার করা প্রথা বলিয়া মনে হইতে পারে না। বাংলা ভাষায় যাত্রা কথা যে অর্থে প্রচলিত আছে, তাহাতে ধর্ম ও আনন্দ এই উভয় ভাবই যুক্ত আছে। অতএব শব্দটি একই ক্ষেত্র হইতে উদ্ভুত বলিয়াও মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে। এই সূত্রে শব্দটি মূলত দ্রাবিড় হওয়াও আশ্চর্য নহে, পরে সম্ভবত সংস্কৃতে গৃহীত হইয়াছে।

কেবলমাত্র ওরাওঁ জাতিই নহে, দ্রাবিড়-ভাষাভাষী দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ অধিবাসীর মধ্যেও ধর্মোৎসব অর্থে যাত্রা শব্দটির ব্যাপক প্রচলন আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দাক্ষিণাত্যের গ্রাম্য দেবী মারী বা মারী-আম্মার বাৎসরিক পুজানুষ্ঠানকে 'মারীযাত্রা' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। মাদ্রাজ উপকূল অঞ্চলের নিরক্ষর পত্তনবান জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্যজীবিগণ গ্রাম্যদেবতার নৈমিত্তিক পুজোৎসবকে এখনও 'যাত্রে' (Jatre) বলিয়া উল্লেখ করে। উড়িষ্যায় সাধারণ লোকের মধ্যে বাংলার গাজনোৎসবের মত যে এক অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে, তাহার নাম 'সাহী যাত্রা'; ওড়িয়া ভাষায় মেলা অর্থে 'যাত' শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল ও ভূইঞাদিগের মধ্যেও 'যাত্রা-পরব' নামক একটি অনুষ্ঠান আছে; ইহা সাধারণত মাঘমাসে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পশ্চিম বাংলার নিম্নজাতির মধ্যে লৌকিক দেবতার উৎসবকে 'যাত' বলিয়া উল্লেখ করা হয়। উড়িষ্যা ও পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত 'জাত' বা 'যাত' শব্দটি ওড়িয়া ও বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় ভাষার দান বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে 'যাত্রা' শব্দটি মূলত দ্রাবিড় ভাষা হইতে আগত বলিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে। দ্রাবিড় ভাষা হইতেই সাধারণ উৎসব অর্থে শব্দটি সংস্কৃতেও

প্রবেশ করিয়া থাকিবে। পূর্বেই বলিয়াছি, তাহা হইলে সৌরযাত্রার সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক কল্পনা করা যায় না। 'যাত্রা' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করিবার পূর্বে এই বিষয়গুলি গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

যাত্রার মত নৃত্যগীতানুষ্ঠানকে মধ্যযুগের বাংলায় নাটগীত বলিত। বৈষ্ণব-ধর্মের প্রভাববশতঃ কৃষ্ণ প্রসঙ্গ ইহাতে প্রবেশ করিবার ফলে ইহা কালক্রমে কৃষ্ণযাত্রা নামে পরিচিত হইল। তারপর উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার যাত্রা গান গতানুগতিক বিষয় পরিত্যাগ করিয়া নূতন বিষয়বস্তু লইয়া রচিত হইতে লাগিল। তখন ইহাকে নূতন যাত্রা বলিত। নলদময়ন্তী এবং বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী অবলম্বন করিয়া 'নূতন যাত্রা' রচিত হয়। এই যাত্রার মালিনীর নৃত্য একটি বিশিষ্ট লোকপ্রিয় অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। গোপাল উড়ে এই বিষয়ের প্রথম প্রবর্তক বলিয়া কথিত হয়। ক্রমে অন্যান্য বিষয়ক যাত্রার কাহিনীর মধ্যেও অপ্রাসঙ্গিক ভাবে এই নৃত্য ও তৎসম্বলিত সঙ্গীতের প্রবর্তন হয়। ইহার সূত্র ধরিয়া ক্রমে ক্রমে 'নূতন যাত্রা'য় কালুয়া-ভুলুয়া, মেথর-মেথরাণী, ঘেসেড়া-ঘেসেড়ানী, নাপিত-নাপিতানী প্রভৃতির অশ্লীল নৃত্যগীতাদি প্রবেশ করিয়া ইহাকে রুচির দিক দিয়া বিকৃত করিয়া তুলে। শিক্ষিত মন তখন হইতেই ইহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কৃষ্ণকমল গোস্বামী তাঁহার তিনখানি রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক যাত্রা রচনার ভিতর দিয়া প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রার আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু ব্যাপক ভাবে সমাজ হইতে মধ্যযুগসুলভ ধর্মভাব বিদূরিত হইয়া যাইবার ফলে, এই প্রয়াস শেষ পর্যন্ত সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই—প্রায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার ধারাটি লুপ্ত হইয়া যায়। ক্রমেই বৈদেশিক আদর্শে প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চের প্রভাব সর্বজয়ী হইয়া উঠিতে লাগিল এবং তাহার কোন কোন উপকরণ গিয়া 'নূতন যাত্রা'র মধ্যে প্রবেশ করিল; তখন যাত্রা আর এক নূতন পরিচয় লাভ করিল—তাহা গীতাভিনয়।

কৃষ্ণকমল গোস্বামীর কৃষ্ণযাত্রা-পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস ফলপ্রসূ না হইলেও কৃষ্ণযাত্রার অনুরূপ একান্ত সঙ্গীত-নির্ভর এক শ্রেণীর গীতিনাট্যরচনা সে যুগে আবির্ভূত হইতে লাগিল, তাহা সাধারণ ভাবে গীতাভিনয় নামে পরিচিত। কৃষ্ণযাত্রা একান্ত কৃষ্ণপ্রসঙ্গ-ভিত্তিক, কিন্তু গীতাভিনয়ের মধ্যে সকল শ্রেণীর

পৌরাণিক কাহিনীই অবলম্বন করা হইত। কৃষ্ণযাত্রার সঙ্গীত-সুরে কোন বৈচিত্র্য ছিল না, প্রধানত প্রচলিত কীর্তনের সুরেই ইহার সঙ্গীত আদ্যোপান্ত পরিবেশন করা হইত, বাদ্যযন্ত্রের মধ্যেও মৃদঙ্গ এবং মন্দিরাই ইহার অবলম্বন ছিল। কিন্তু গীতাভিনয়ের সঙ্গীতের ভিতর সে যুগের বিবিধ রাগরাগিণী ব্যবহৃত হইত, দেশী এবং বিদেশী সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হইত। সুতরাং ইহা কৃষ্ণযাত্রা অপেক্ষা অধিকতর বৈচিত্র্যপূর্ণ হইয়া উঠিল। কৃষ্ণলীলার কাহিনী নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন এবং শিথিলবন্ধ ছিল, সুপরিচিত কৃষ্ণপ্রসঙ্গই ইহার উপজীব্য ছিল; কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ক পুরাণকে অবলম্বন করিবার ফলে গীতাভিনয়ে অতি সহজেই কাহিনীগত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইল। বিষয়ের দৈন্য কৃষ্ণযাত্রার যে ত্রুটির কারণ হইয়াছিল, তাহা গীতাভিনয়ের মধ্যে দূর হইয়া গেল, ক্ষীণতম বিষয়বস্তুর পরিবর্তে বিস্তৃততর কাহিনী গীতাভিনয়ের ভিত্তি হইল, ইহাতে কাহিনীর ক্রমবিকাশের ধারা ও চরিত্র সৃষ্টির অবকাশ রচিত হইল। কেবলমাত্র অহৈতুকী কৃষ্ণভক্তির পরিবর্তে সমাজ-জীবনের উচ্চ নৈতিক আদর্শের প্রচার গীতাভিনয়গুলির লক্ষ্য হইল, সুতরাং ইহা সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ ব্যাপকতর আবেদন সৃষ্টি করিবার সম্ভাবনা প্রকাশ করিল। কৃষ্ণযাত্রাগুলি সংক্ষিপ্ত রচনা ছিল, কিন্তু গীতাভিনয়গুলি পঞ্চাঙ্ক নাটকের মত সুদীর্ঘ রচনা, অনেক সময় প্রয়োজন অনুসারে অঙ্কের মাত্রা আরও বাড়িয়া যাইত এবং দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া ইহার বিচিত্র ঘটনার প্রবাহ অগ্রসর হইয়া যাইত। সেইজন্য অতি সহজেই কৃষ্ণযাত্রার পরিবর্তে ইহার প্রতি সাধারণের আকর্ষণ দেখা দিল।

একথা পুর্বেই বলিয়াছি, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই 'নূতন যাত্রা' শিক্ষিত জনসাধারণের সহানুভূতি হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ, ইহার আঙ্গিকের কোন ত্রুটি নহে, ইহার রুচির বিকার। এদিকে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবারের সখের রঙ্গমঞ্চগুলিতে যে সমস্ত নাটক অভিনীত হইতেছিল, তাহাতে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না বলিয়া, কোন নূতন কৌশল অবলম্বন করিয়া জনসাধারণের মধ্যে নাট্যরস পরিবেশন করিবার প্রয়োজনীয়তাও কেহ কেহ অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, সর্বসাধারণের মধ্যে নাটকের রস পরিবেশন করিবার পক্ষে নূতন যাত্রার আঙ্গিকই সর্বাপেক্ষা উপযোগী, অতএব ইহারই এক

উন্নত রূপের ভিতর দিয়া তাঁহারা এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ইহার মধ্যে কৃষ্ণযাত্রার ও নূতন যাত্রার গীত অংশকে সংক্ষিপ্ত করিয়া তাহার স্থানে আধুনিক নাটকের অভিনেয় অংশের প্রাধান্য দেওয়া হইল; সেইজন্য ইহার নামকরণ করা হইল গীতাভিনয়। ইহা প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রা কিংবা নূতন যাত্রার অবশ্যম্ভাবী ক্রমপরিণতিরূপে আবির্ভূত হইল না, বরং প্রাচীন যাত্রা ও নূতন যাত্রা উভয়েরই ভিত্তির উপর ইংরেজি আদর্শে রচিত বাংলা নাটকগুলির প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে সৃষ্ট হইল। আঙ্গিকের দিক দিয়া স্থুল দৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কৃষ্ণযাত্রা হইতে ইহার গীত, নূতন যাত্রা হইতে ইহার নৃত্য এবং তদানীন্তন বাংলা নাটক হইতে ইহার সংলাপের অংশ গৃহীত হইয়াছে। রসের দিক দিয়া ইহাতে প্রাচীন যাত্রার ভক্তি, নূতন যাত্রার আনন্দ ও ইংরেজী আদর্শে রচিত বাংলা নাটকের কারুণ্য একসঙ্গে গৃহীত হইয়াছে। ইহার সঙ্গে ভিতর ও বাহিরের দিক হইতে দেশীয় প্রাচীন ও নূতন যাত্রার যোগ ছিল বলিয়া ইহা এক দিক দিয়া যেমন দেশীয় রস-সংস্কারের অনুগামী হইয়াছিল, তেমনি অন্য দিক দিয়া যাঁহারা যুগপ্রভাববশতঃ নূতন রসের অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহাদের রস-পিপাসা চরিতার্থ করিতেও সক্ষম হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই কবি, টপ্‌পা, কীর্তন, পাঁচালী, ঢপ প্রভৃতি সঙ্গীত মৌলিকতার অভাবের জন্য জনসাধারণের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইল। তখন এই সকল বিভিন্ন সঙ্গীতের স্বতন্ত্র সম্প্রদায়গুলির স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষা করাও কঠিন হইয়া পড়িল—ইহারা ইতিপুর্বেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়া কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিতেছিল। তবে প্রায় এক শত বৎসর বাংলার রসিক সমাজের মধ্যে রস বিতরণ করিয়া ইহারা যে রস-সংস্কার গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহা তখনও সম্পূর্ণ-ভাবে দেশ হইতে লুপ্ত হইয়া যায় নাই; অতএব ইহারা অধঃপতনের যে স্তরেই নামিয়া যাউক না কেন, ইহাদেরও পৃষ্ঠপোষক একটি সম্প্রদায় এদেশে তখনও বর্ত্তমান ছিল। নব-পরিকল্পিত গীতাভিনয়ের মধ্যে এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিচিত্র উপকরণগুলি গিয়া প্রবেশ লাভ করিল এবং তাহাতেই এই সকল বিলুপ্তপ্রায় সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকদিগের রসপিপাসা চরিতার্থ হইল। ইহাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙ্গালী যে বিভিন্ন প্রকৃতির উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধনা করিয়াছিল,

তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটি রূপকেই কোন না কোন উপায়ে রক্ষা করা হইল। অবশ্য কবি-সঙ্গীতের মধ্যে ইতিপূর্বেই এদেশের সমসাময়িক রাগসঙ্গীত সমূহও প্রবেশ করিয়াছিল ; কবি-সঙ্গীতের ধারা খেউড়, আখড়াই, হাফ্ আখড়াই ও তর্জার ভিতর দিয়া যখন সকল বিষয়ে অধঃপতনের শেষ স্তরে নামিয়া গিয়া বিলুপ্ত হইবার উপক্রম করিতেছিল, তখন দেশীয় সঙ্গীতের উচ্চতর ধারাগুলি গীতাভিনয়কে আশ্রয় করিয়া কোনমতে আত্মরক্ষা করিল। অর্থাৎ একটি উৎকৃষ্ট গীতাভিনয়ের আনুপূর্বিক অনুষ্ঠান শুনিলে তাহাতে সমসাময়িক সকল প্রকৃতির সঙ্গীতের সাক্ষাৎকার লাভ করা যাইত। এইভাবে তদানীন্তন বাংলার বিশিষ্ট সঙ্গীত-সাধনার ধারাগুলি যখন শুষ্ক হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছিল, তখনই গীতাভিনয়ের মত একটি বিচিত্র রসানুষ্ঠানকে অবলম্বন করিয়া তাহারা কোন প্রকারে বাঁচিয়া গেল ; কারণ, স্বাধীনভাবে আত্মরক্ষা করিবার মত জীবনীশক্তি তাহাদের আর ছিল না। অতএব গীতাভিনয়ের সাহিত্যিক মূল্য যাহাই থাকুক না কেন, তাহা উনবিংশ শতাব্দীর সাধারণ বাঙ্গালীর বিচিত্র রস-সংস্কারের এক শক্তিশালী বাহন হইয়া রহিয়াছে।

বাংলা লৌকিক নাট্যরচনার ক্ষেত্রে গীতাভিনয়গুলি ক্রমে এক নূতন প্রেরণার সঞ্চার করিল, তাহার ফলে যাত্রা-রচনার ধারায় কিছু পরিবর্তন দেখা দিল। গীতাভিনয়ের গীত এবং নৃত্য অংশ ক্রমে আরও সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল এবং তাহাদের পরিবর্তে সংলাপ-অংশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে বাংলা সাহিত্যে নাটকের যে বিকাশ দেখা গিয়াছিল, প্রধানত তাহারই প্রভাব বশত গীতাভিনয়গুলি অধিকতর নাট্যধর্মী হইয়া উঠিতে লাগিল। সমসাময়িক বাংলা নাটকের মধ্যে সেক্সপীয়রের ক্রিয়া-বহুল নাটক-গুলির প্রভাব অত্যন্ত সক্রিয় হইয়া উঠিল। তাহার ফলে যুদ্ধবিগ্রহ, গুপ্ত ষড়যন্ত্র, হত্যা, বিদ্রোহ ইত্যাদি বিষয় বাংলা নাটকের উপজীব্য হইল। গীতাভিনয়ের মধ্যে জাতীয় জীবনের আদর্শ প্রচার করাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এবং তাহা প্রচার করিবারও একটি সুনির্দিষ্ট ধারা ছিল ; সুতরাং প্রথমত ইহারা যে আবেদনই সৃষ্টি করুক, ক্রমে ইহারাও বৈচিত্র্যহীন হইয়া উঠিতে লাগিল।

এই যুগে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটকের রচয়িতা গিরিশচন্দ্র ঘোষের আবির্ভাব হয়, তাঁহার রচিত পৌরাণিক নাটকগুলি দ্বারা সমসাময়িক যাত্রাগুলি প্রভাবিত হয়। তাহার ফলে নূতন একশ্রেণীর যাত্রা রচিত হয়,

তাহা সাধারণভাবে যাত্রা বলিয়া পরিচিত হইলেও পৌরাণিক যাত্রা কথাটি ইহাদের সম্পর্কে অধিকতর সার্থক বলিয়া বোধ হইতে পারে। 'নূতন' যাত্রার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবের কোন স্পর্শ ছিল না, ধর্মবোধ-নিরপেক্ষ (secular) আনন্দ ও কৌতুক সৃষ্টিই ইহার লক্ষ্য ছিল; কিন্তু পৌরাণিক যাত্রার মধ্যে ভক্তি ও বিশ্বাসের ভাবটি আত্মপ্রকাশ করিল। ভক্তির কথা হইলেই কৃষ্ণ-ভক্তির কথা আসিয়া যায়; কারণ, কৃষ্ণ-উপাসনা অবলম্বন করিয়াই এই জাতির ভক্তির ভাব বিকাশ লাভ করিয়াছে; সুতরাং পুরাণের যে অংশে কৃষ্ণপ্রসঙ্গ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, পৌরাণিক যাত্রার তাহাই অবলম্বন হইয়াছে। রামায়ণ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, হরিবংশ ইত্যাদিই প্রধানত পৌরাণিক যাত্রার ভিত্তি হইয়াছে। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক রচনায় সমান্তরাল ভাবে পৌরাণিক যাত্রা রচনার ধারা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে; ইহা একদিক দিয়া যেমন পৌরাণিক নাটকের অনুকরণের ফল, আবার অন্য দিক দিয়া বাংলার সমাজের সমসাময়িক যুগের চিন্তা ও সাধনার বাহন। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলি নাগরিক জীবনের মধ্যে সমসাময়িক বাংলার সমাজ-জীবনের আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রচার করিবার যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল, পৌরাণিক যাত্রাগুলি বাংলার সুদূর পল্লী অঞ্চল পর্যন্ত পুরাণের বাণী প্রচার করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। প্রাচীন পল্লীর সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবার ফলে যেখানে একদিন চণ্ডীমণ্ডপে কিংবা বারোয়ারী তলায় যে আসর সহজেই জমিয়া উঠিয়া তাহাকে কথক ঠাকুরের মুখে পুরাণ-প্রসঙ্গ সকলে শ্রবণ করিত তাহা তখন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, অথচ পুরাণ শুনিবার যে সংস্কার এদেশের সমাজে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা চরিতার্থ হইবার আর কোন উপায় ছিল না; সুতরাং পৌরাণিক যাত্রাগুলি অতি সহজেই সেই স্থান অধিকার করিয়া লইল। ইহারা বাংলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জাতিবর্ণনির্বিশেষে বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের উচ্চ নৈতিক আদর্শসমূহ প্রচার করিতে লাগিল। গিরিশচন্দ্র প্রবর্তিত ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুকরণে ইহাদের সংলাপ প্রধানত রচিত হইল, তবে গিরিশচন্দ্রের নাটকের মত অহেতুকী কৃষ্ণভক্তি কিংবা সর্বধর্ম-সমন্বয়বাদ সর্বদাই যে ইহাদের ভিতর দিয়া প্রচারিত হইত, তাহা নহে; অদৃষ্টবাদ, কর্মফলে বিশ্বাস প্রভৃতির কথাও ইহাদের ভিতর দিয়া শুনিতে পাওয়া যাইত। পৌরাণিক নাটকের

মতই পৌরাণিক যাত্রাগুলিও কদাচ বিয়োগান্তক হইত না, কাহিনী বিয়োগান্তক হইলেও পরিণামে সকলের একটি মিলন দৃশ্য বা 'মেল্‌তা' দেখান হইত। সেই মিলন মর্ত্যলোকে সম্ভব না হইলে গোলোক কিংবা বৈকুণ্ঠ কিংবা শিবলোকেও নির্দেশ করা হইত। পৌরাণিক যাত্রাগুলি অনুসরণ করিলেও বুঝা যায় যে বাংলা নাটক যখন যে ভাব ও রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, যাত্রাও তাহাই অনুসরণ করিয়াছে। কারণ, দেখা যায় যে, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রেও ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটক রচনার যুগের অবসান হইয়া যখন ঐতিহাসিক ও দেশাত্মবোধক নাটক রচনার সূত্রপাত হয়, সেই যুগেই যাত্রা রচনার ক্ষেত্রেও এক শ্রেণীর নূতন যাত্রার আবির্ভাব হয়—তাহা স্বদেশী যাত্রা নামে পরিচিত।

খ্রীষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই লর্ড কার্জন কৃত বঙ্গবিচ্ছেদের প্রতিবাদ স্বরূপ বাংলা দেশে যে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তাহার ফলে বাংলা নাট্যসাহিত্যের লক্ষ্য আমূল পরিবর্তিত হইয়া যায়। একদিন সমাজ-সংস্কার ও ভক্তিভাবের প্রচার ইহার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু এই সময় দেশাত্মবোধ প্রচার করিতে গিয়া বাংলা দেশের অতীত ইতিহাস হইতে বীর চরিত্রের অনুসন্ধান করিয়া স্বাধীনতা রক্ষায় তাহাদের ত্যাগ, দুঃখ ও আত্মবিসর্জনের কথা ইহাতে নানাভাবে বর্ণনা করা হইতে লাগিল। এমন কি, যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ কেবল মাত্র পৌরাণিক নাটক রচনার মধ্যে তাঁহার জীবনের প্রায় সমগ্র অংশই নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন, তিনিও তাঁহার চিরাচরিত পথ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার জীবনের সায়াহ্নে নূতন বিষয় লইয়া নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এতদ্ব্যতীত দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলিও সমসাময়িক বাংলার সমাজের মধ্যে নূতন উত্তেজনার সৃষ্টি করিল। বাংলার যাত্রাগানগুলি স্বভাবতই ইহার প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারিল না। পূর্বেই বলিয়াছি, সমসাময়িক নাটক হইতেই যাত্রাগুলি সর্বদা প্রেরণা লাভ করিয়াছে; সুতরাং তখন দেশাত্মবোধক নাটকগুলির অনুকরণে যাত্রা রচিত হইতে আরম্ভ করিল। একদিন যাত্রার আসর কেবল মাত্র রাধাকৃষ্ণ, ভীমার্জুনই অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু নূতন যুগে প্রবেশ করিয়া ঐতিহাসিক চরিত্রও ইহার লক্ষ্য হইয়া উঠিল। এই ঐতিহাসিক চরিত্রের সূত্র ধরিয়াই ক্রমে ইহাতে সামাজিক চরিত্রের আবির্ভাবের সূচনা দেখা দিল। তখন আর কেবল পৌরাণিক চরিত্র

নহে, এমন কি, ঐতিহাসিক চরিত্রও নহে, আমাদের চারি দিককার সমাজের নরনারীও ইহার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিল। স্বদেশী আন্দোলন ক্রমে স্তিমিত হইয়া যখন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত হইল, তখন ইহাতে সাধারণ মানুষের নানা সমস্যার কথাও নানা ভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল। একদিন এই শ্রেণীর যাত্রায় মহাপুরুষের জীবন-কথা কীর্তিত হইয়াছে, কিন্তু ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের জীবনও ইহার বিষয়ীভূত হইল। এই যুগে একজন শ্রেষ্ঠ যাত্রা-রচয়িতার জন্ম হয়, তাঁহার নাম মুকুন্দ দাস। তিনি বাংলায় সর্বশ্রেষ্ঠ স্বদেশী যাত্রার লেখক। শুধু তাহাই নহে, তিনি সুগায়ক, উত্তম অভিনেতা ও স্বয়ং যাত্রাদলের পরিচালক ছিলেন। যাত্রাগানের ভিতর দিয়া দেশাত্মবোধের বাণী তিনি বাংলার দূরতম পল্লী অঞ্চল পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়াছেন। কেবল রাজনৈতিক মুক্তি সংগ্রামই তাঁহার যাত্রা রচনার বিষয় ছিল না, সমাজ সংস্কারও তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই স্বদেশী যাত্রার ধারা এক প্রকার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেবল মাত্র স্বদেশী যাত্রাই নহে, যাত্রার উপর একদিকে কলিকাতার ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চ ও অন্যদিকে চলচ্চিত্রের প্রভাব বশত ইহা কালক্রমে সকল বৈশিষ্ট্য হারাইয়াছে। তবে যাত্রার অনেক উপকরণ বাংলা নাটকের মধ্যে এখনও বাঁচিয়া আছে।

স্বদেশী যাত্রা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা হইতে ভক্তির ভাব দূর হইয়া গেল, এমন কি, এতদিন পর্যন্ত যে রামায়ণের দলে একজন মাত্র গায়েন ৩।৪ জন দোহারের সহায়তায় রামায়ণের এক একটি অংশ দিনের পর দিন পরিবেশন করিয়া যাইত, তাঁহার সেই দল ভাঙ্গিয়া গিয়া রামযাত্রার দল গঠিত হইল। ইহাতে হনুমানের বেশ ধারণ করিয়া অভিনেতাকে আসরে আবির্ভূত হইতে হইত। ভক্তির ভাব দূর হইয়া গিয়া এখানে কৌতুকের ভাব প্রাধান্য লাভ করিল। এইভাবে চণ্ডীমঙ্গলের দল ভাঙ্গিয়া চণ্ডীযাত্রার দল হইল। মনসা-মঙ্গলের কাহিনীরই সর্বাপেক্ষা দুর্গতি দেখা দিল। কাহিনীর কারুণ্য ও উচ্চ নৈতিক আদর্শ বিসর্জিত হইয়া ইহারও যাত্রার রূপ ভাসান-যাত্রা হাস্যরসের ভাণ্ডার হইয়া উঠিল। ইহার চরিত্রগুলি অক্ষম অভিনয় ও অযোগ্য বেশভূষা দিয়া কাহিনীকে কদর্য শৈবালে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। অল্পদিনের মধ্যেই শিক্ষিত দর্শকের মন ইহাদের উপর বিরূপ হইয়া উঠিল।

১

পুতুল খেলার বিয়ে, লো সই, পুতুল খেলার বিয়ে,
গায়ে হলুদ দেবো মোরা উলুধ্বনি দিয়ে।
আমার পুতুলটি বর হবে সই তোর পুতুলটি কনে,
আমার কনের গয়না-গাঁটি নেব গুণে গুণে।
আমরা বরের মাসিপিসি, লুচি মণ্ডায় হবো খুশী,
আমরা এয়ো করব বরণ বরণডালা মাথায় নিয়ে। —বাঁশপাহাড়ী

২

জাগো মাধব কৃষ্ণ মুরারি,
কেশী-বিনাশন কংস-নিসূদন, গিরি গোবর্ধনধারী।
পাতকের তাপে আজ তপ্ত ধরণীতল,
নিভে গেছে পূর্ণের রবিকর নির্মল,
অলস শয়ন ঘোর উঠ ছাড়ি মনচোর।
তৃষিত ধরার মুখে ঢাল অমৃত বারি।
জাগো, মাধব কৃষ্ণ মুরারি ॥ —ঐ

একটি সাঁওতালি যাত্রার গানও এখানে উদ্ধৃত করা হইল—

৩

হর্‌মেন দির্পীলি কাড়া
তিস্মিন্ সাঙিনীর রাণী দাই, ডাডী কুইগুা।
গাতিজ্ঞিয়েল কেদা গাতিংরিলে মালা
রাণী দাই, ডাডী কুইগুা। —ঐ

অর্থ :—একজন জল আনিতে যাইতেছে, জল অনেক দূর। পথে বন্ধুর সঙ্গে দেখা, সে খুব ভাল আছে। কুয়োর জল যেমন পরিষ্কার তেমনি আমার বন্ধুও।

৪

আজি ভরা ভাদরে
তরিটি ডুবল আমার অকুল পাথারে।
ওরে মাঝি, ছুটে আয় তরী যে রে ভেসে যায়,
ঈশানে ধরেছে মেঘ ডাকে গম্ভীরে।
আজি ভরা ভাদরে······ ॥ —ঐ

৫

এমন মোহন নয়নের জল কোথা হ'তে, বঁধু, আন।
আমি যে তোমার তুমি যে আমার তা'ত, বঁধু, তুমি জান॥
এ মধু মাধবী জ্যোছনা নিশীথে
কোথা যাবে প্রিয় প্রেম ঢেলে দিতে,
বেসুরেতে কেন বাঁধিলে বীণা
বাজাতে যদি গো না জান॥ —ঐ

৬

কৃষ্ণ কেশব মুকুন্দ মাধব
গোবিন্দ গোপরাজ নন্দন।
হৃষিকেশ হরি রাসবিহারী
রাধানাথ রাধামোহন॥
গোকুল বিহারী গোবর্ধনধারী
গোপিকা হৃদয়রঞ্জন।
গোলকের পতি অগতির গতি
গোকুলচন্দ্র গোপীমোহন।
নিত্য নিরঞ্জন ব্রহ্ম সনাতন
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত চরণ।
পাণ্ডবের নাথ শ্রীপতি শ্রীনাথ
দীননাথ দীনতারণ॥ —মুর্শিদাবাদ

৭

কেশব করুণা কর করে কৃপা বিতরণ।
অনাদি অনন্ত তুমি, নরকান্ত তুমি নারায়ণ।
কে জানে হে তব তত্ত্ব, ভাব ভেবে ভব চিত্ত,
হইয়াছে উন্মত্ত, তুমি সত্য সনাতন॥
লীলাময় তব লীলা সকলি স্বপনের খেলা।
ওরে মূর্খ চেয়ে দেখ—সাতের সময় এসেছে॥
যাঁর কিস্তিতে জগৎ চালন, সখা তাদের সেই নারায়ণ!
ভ্রমের বশে পড়েছিস্ তুই তোকে বিকারে ধরেছে॥ —ঐ

৮

কাননে যাইয়া যতনে তুলিয়া গেঁথেছি কুসুম মালা।
পরাব যতনে, পরাণ-রতনে, জুড়াবে হৃদয়-জ্বালা॥
ফুল্ল কুসুম বাস ঢালিবে হৃদয়-জ্বালা তখনি নিভাবে।
নয়নে নয়ন চাহিয়া থাকিবে,
সে দৃশ্য সুন্দর অতি মনোহর যাতনা ভুলিবে বালা॥ —ঐ

৯

হ'য়েছে দিবা অবসান।
বহিছে উষ্ণ বায়ু দগ্ধ হয় প্রাণ॥
আসিছে প্রচণ্ড তিমির, অস্ত যেতেছে মিহির,
রুমু রুমু বাজিবে না আর।
জলেতে বিম্ব জন্মিয়া, পুনঃ হয় জলে পতন।
কারে দাও রাধাপদ, অতুল সুখ সম্পদ,
কারও বা ঘোর বিপদ, বিপদ বারি জনার্দন॥
তব ভক্ত পাণ্ডবেরা, হইয়াছে পথ হারা,
তব পদে স্থান দিয়ে কর দুঃখ বিমোচন॥ —ঐ

১০

(মোরা) তরঙ্গে তরঙ্গে চল, লো সই, সোনার কমল তুলিয়া লই।
মৃদুল মলয়ে হেলিয়ে দুলিয়ে জোছনা রাতে জাগিয়া রই॥
যতন করে নিয়ে চল্ যাই আঘাত না পায় তুফানে,
শিশুর রূপে হার মেনে যায় চাঁদ মামা যে ওই॥ —মুর্শিদাবাদ

১১

এবার দাবার চাল আচ্ছা হ'য়েছে।
চালের চোটে কাল ফণী তোর বেড়েছে॥
ঘোড়ার কিস্তী মারবে যখন,
হবে রে তোর দেহ পতন। —ঐ

নিমাই সন্ন্যাস যাত্রা

সূচনা

(স্থান—নিধুবন)

(রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপে শয়ন)

বন্দনা

এসো, এসো গো এসো গৌরাঙ্গ,
এসো নিতাই, এসো নিতাই, এসো নিতাই,
এসো দুটি ভাই গৌর নিতাই,
এসো মণির মণি দ্বিজরাজ হে !
আমি পূজিব চরণ এই আকিঞ্চন,
চরণ রাখিব হৃদয় মাঝে ॥
(আমি) পূজা করিব রাঙ্গা চরণ,
কি দিয়ে পূজি, আমার নাই হে পুঁজি।
(আমায়) দাও হে পুঁজি তবে তো পুজি ॥
একবার হৃদে এসে উদয় হও হে,
আমার বাসনা পুরাও,
দীনহীন কাঙ্গালে ডাকে—বাসনা পুরাও।

বিবেক—একদিন নিধুবনে কিশোর-কিশোরী মনের সুখে নিদ্রা যান, পুষ্পশয্যা 'পরে—মনের কতই না সুখে,—নিধুবনের মাঝে—একদিন রাধাকৃষ্ণ তমাল বৃক্ষের নীচে মনসুখে নিদ্রা যাচ্ছেন। সেই বৃক্ষের উপরে শুকসারী নামে দুইটি পাখী বাস করত। (প্রস্থান)

শুকশারীর প্রবেশ—(শুক শারীকে বল্‌ছে)

শুক—এই দেখ শারী, আমাদের রাধাকৃষ্ণ কেমন ভাবে নিদ্রা যাচ্ছেন !

গীত—শুক

শারী লো, তুই দে গো সাড়া।
আমার সুখের নিশি হয়ে যায় সারা ॥

শারী—গীত

শারী—আমার রাই তো জাগে, রাই তো জাগে।
তোমার কানুরে জাগাও আগে ॥

গীত

শুক—জাগে যদি রাই, উঠে না কেন ?

বল, বলছে শারী।

শারী—উঠবে কেমন করে ?

তোমার কানু সারারাত্রি চোরের মত ঘুরে ঘুরে,

ভোর বেলায় রাই কুঞ্জে এসে, রাই এর বাহুতে মাথা দিয়ে ঘুমায়—

গীত

তাই উঠতে নারে, রাই আমাদের,

তাই উঠতে নারে, ঘুমের ঘোরে উঠতে নারে ॥

শুক—আমার কানু তো চোর, তোমার রাই তো সাধু। তবে—

গীত

চোর কি, আর চোর থাকতে পারে, সাধুর অঙ্গ পরশিলে—

শারী—গীত

শুন, শুন, শুক তুমি, আর কিবা পার,

রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ নয়নেতে হের,

এমন যুগল আর হবে না, নয়ন ভরে যুগল হের ॥

শুক—এসো শারী, আমরা রাধাকৃষ্ণের জন্য কুঞ্জবন সাজাইগে।

(উভয়ের প্রস্থান)

গীত

বিবেক—হেনকালে বিধুমুখী উঠিলেন কু-স্বপ্ন দেখি

হায় হায় গো।

ওহে, কাঁদি কাঁদি, কহে প্রভুর পাশে

উঠ, উঠ, প্রাণনাথ, কি হেরিলাম অকস্মাৎ

একাল ওকাল বুঝি যায় ॥ (প্রস্থান)

গীত

রাধা—জাগোনি, জাগোনি, ওহে বঁধু, জাগোনি।

কেন ঘুমের ঘোরে, এমন জোরে বিভোর হয়েছে ?

কৃষ্ণ—কেন ডাক্‌ছো প্রিয়ে ? (রাধাকে ছোঁবার চেষ্টা)

গীত

রাধা—নাথ, আমায় পরশ করো না

দ্বিচারিণী হয়েছি আমি।

কৃষ্ণ—কিসে, তুমি দ্বিচারিণী হলে প্রিয়ে ?

রাধা—প্রভু, কালরাত্রে স্বপ্নে কি হেরেছি, শুনবে ?

কৃষ্ণ—কি বল তো ? শুনি,

গীত

রাধা—তোমারি গঠন, আমারি বরণ, মুখে বলে হরি হরি,

প্রেমানন্দে গলি, নাচে বাহু তুলি, প্রভু যান গড়াগড়ি।

গড়াগড়ি যায় গো, রাই রাই রাই বলে গড়াগড়ি যায় গো॥

কৃষ্ণ—প্রিয়ে, তুমি স্বপ্নে যা দেখেছো, তার একটি বর্ণও মিথ্যা নয়। গৌর-রূপে তোমার মন হরণ করে নিয়েছে বলে, তুমি দ্বিচারিণী হওনি। কারণ—

গীত

তোমার কি রাই, মনে পড়ে না,

মানের দায়ে খত্ দিয়েছি।

রাধা—তা প্রভু, আপনাকে গৌর হতে দেব না!

গীত

কৃষ্ণ— আমার ধারে ধারে জনম গেলো

চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে।

পার্ঠ—তুমি কি করে রক্ষা করবে, প্রিয়ে ?

রাধা—কেন প্রভু!

গীত

আমি খ'তের পৃষ্ঠে ওয়াশীল দেব,

গৌর হতে তোমায় দেব না, বঁধূ।

কৃষ্ণ—তুমি খতের পৃষ্ঠে ওয়াশীল দিতে পার বটে; তা হলে আমার কর্তব্য পালন হলো কই ?

গীত

আমি ত্যজি কালরূপ তোমারই স্বরূপ

ধরিব, অঙ্গেরও কান্তি।

আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া তব নাম লইয়া
অশ্রুজলে হবো শান্তি ॥
আমার যাবে ব্রজ ভাব হবে প্রেমভাব
এ দেহ ছাড়িয়া দেবো।
আমি ত্যজি বংশীধর হবো দণ্ডধর
রাখিতে নারিবে কেহ।
আমি লয়ে ভক্তগণ, করিব কীর্তন
লইব সকলের স্নেহ।
আমি ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হয়ে ধরাতলে, যাব গো গড়াগড়ি।
গড়াগড়ি যাব গো—রাই-রাই-রাই বলে,— (উভয়ে প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—নবদ্বীপ ধাম।

গীত

বিবেক—ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি, নক্ষত্র ফাল্গুনী, শচীদেবীর গর্ভে জন্ম নিল গৌর গুণমণি ; জনম নিল রে, শচীর উদরে গোরা। (প্রস্থান)

নিমাই—নিমাই—

গীত

আয়রে আয় নেচে নেচে, হরি বলে আয়,
ঐ নাম শুধাতে নদে ভেসে যায়,
অন্ধ খঞ্জ পতি তোরা, ডুব্‌বি যদি আই,

গীত

নিমাই— শুন শুন, নিত্যানন্দ, আর হরিদাস,
সর্বত্র আমার প্রেম করহ প্রকাশ।
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে কর এই ভিক্ষা,
ভজ কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ দীক্ষা।
নাম বিলাও,—প্রতি ঘরে ঘরে নাম বিলাও।

ভাই নিতাই, এই পথে আসবে দু-ভাই,
মদে মত্ত হয়ে জগাই আর মাধাই,
তুমি নাম দাও তাদের কানে,
আমি যাই নগর-কীর্তনে। (কিছু পরে নিমাইএর প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(জগাইর গৃহ)

জগা—এই দেখ্ মাধা, তোরে এখনই বল্‌ছি বোতলটি আমায় ছেড়ে দে।

মাধা—বোতল ছাড়বো কেনরে শালা? আমার বুঝি মুখ নাই, কেন রে শালা।

জগা—কি? ভাইকে শালা? তোর তো একটুকু আক্কেল নাই রে, শালা?

মাধা—আক্কেল না থাকলে মদ্ খাই কেন রে শালা? (জগাকে মারিতে উদ্যত)

জগা—তবে মেরে দেখ না, মাসের কটা দিন যায়।

মাধা—তবেরে শালা……,

জগা—আয়রে শালা…… (উভয়ে মারামারি করিতে করিতে পতন)

গীত

নিতাই—হরি বল, হরি বল, ভাইরে,—
কলিযুগে নাম বিনা আর তো গতি নাইরে॥

জগা—এখানে গোল করে কে আস্‌ছেরে?

মাধা—শালারা বুঝি ভিক্ষা চাইছে।

জগা—কি? ভিক্ষা দেব? এত অপমান।

ধরতো, শালাদের, মারতো, শালাদের। (উভয়ে অর্ধেক প্রস্থান এবং পুনঃ প্রবেশ)

জগা—দেখ মাধা, নিমাই পণ্ডিতের বাড়ীতে এত বড় একটা মহোৎসব গেল, দেশশুদ্ধ সব শালাদের নিমন্ত্রণ হলো, আর আমাদের দুই শালার নিমন্ত্রণ নাই।

মাধা—তবে আমার একটা যুক্তি শুনবে, দাদা।

জগা—কি যুক্তি বলতো ভায়া।

মাধা—এই ব্রাহ্মণগুলো মহোৎসব খেয়ে যখন রাস্তা দিয়ে চলে আসবে, তখন বেটাদিকে ধরে, টিকি ছিঁড়ে সবটুকু বের করে নেবো।

জগা—যুক্তি মন্দ নয়, তবে বাকীটুকু খেয়ে বুঁদ হোয়ে রাস্তার ধারে লুকিয়ে থাকিগে— (বলা মাত্র মাধা মদটুকু খাবে) আমাকে দিলি না।

মাধা—দিইনি, তবে কাল দেবো। (উভয়ে প্রস্থান)

ব্রাহ্মণ—হেও···বাবা, প্রচুর সেবা, এমন আহার কখনও করি নাই। যেমন না মিহি চালের অন্ন, তেমনি না পাটের শাক। হেও···বাবা। তার উপরে আবার গজা ভাজা। তার উপরে আবার লুচিং চিং গজাং চং পাঁপড় ভাজা। খেতে এমন না, খেয়ে ফেলেছি শেষে, (উদরে হাত দিয়ে) কাটিতং না হয় তো কাঁচি। হেও·· বাবা।

(জগা ও মাধার প্রবেশ ও ব্রাহ্মণকে মারিতে মারিতে তিনজনের প্রস্থান। ব্রাহ্মণের পুনঃ প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ—হেও বাবা, জগা মাধার অত্যাচারে দেশ ছেড়ে বা পালাতে হয়। যেমন না আহার, তেমনি না প্রহার। পালাই বাবা, জগা মাধা আসবে আবার।

জগা ও মাধার প্রবেশ—জগা—শালারা ব্রাহ্মণ নয়, ব্রহ্ম ধ্যান্ কাকে বলে কিছুই জানে না। আমি সব জাতির হাতে খেতে পারি, যদি মাংস থাকে।

মাধা—আমারও ঠিক ঐ কথা।

জগা—হারে, ভাই, কিছু পাসনে ?

মাধা—পেয়েছি ভাই, একটা আধুলি পেয়েছি।

জগা—তবে না জানি, আরও কিছু বা ছিল ? তবে ধরতো শালাকে, মারতো শালাকে (বলিয়া ব্রাহ্মণকে মারিতে যাইতে উদ্যত)।

গীত

নিতাই—কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলরে তোরা। কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা।

জগা—ছেলেটি দেখতেও বেশ, গাইছেও বেশ , চিনতে তো পারছি না।

গীত

নিতাই—আমায় কিরে চিনবি তোরা
চিনে ন'দের বাসী যারা।

জগা—আচ্ছা ভাই, ভাই তোমার নামটি কি বল দেখি।

গীত

নিতাই—ন'দে বাসী আমার নিতাই বলে,
প্রেম বিলাই গো দ্বারে দ্বারে।

জগা—নিতাই, জগাই, মাধাই সব শালাই—ই-ই ভাই নিতাই, দু এক বোতল মদ ধার দিতে পাস ?

নিতাই—দু-এক বোতল কেন ভাই, তোমাদের জন্য হাজার হাজার বোতল মজুত রেখেছি।

জগা—তাই না কি ? কখন দেবে ?

মাধা -কখন্ আবার কি, এখনই চাই।

নিতাই—এখনই দেবো।

গীত

নিত্য মদের মাতাল আমি।
জগাই মাধাই কতই খাবি ?
এনেছি মন ভাণ্ড ভরে যতই চাবি, ততই পাবি।
এ মদের কত যে নেশা, থাকে না রে কোন দিশা।
যতই খাবি বাড়বে নেশা, এমন মদ তুই কোথায় পাবি !

জগা—দাও ভাই, নিতাই, দু এক বোতল মদ দাও, নেশা যে ছুটে যাচ্ছে।

নিতাই —ভাই, তোমাদিগকে একটি কাজ করতে হবে।

জগা—কি কাজ করতে হবে, ভাই ?

গীত

নিতাই—হরিবোল বলে নাচতে হবে—
গোলোকের মদ খেতে হোলে হরিবোল বলে নাচতে হবে।

জগা—দাও, ভাই, মদ দাও, নেশা যে ছুটে যাচ্ছে।

নিতাই—হা ভাই, গোলোকের মদ দিয়ে তোমাদের হৃদয় ভরে দিয়েছি। আবার কেন ?

মাধা—দেখছ দাদা, শালা ঠাট্টা করছে ?

জগা—হা ভাই, ঠাট্টা করছে ? দুই এক বোতল মদ দাও !

মাধা—এখনই দাও বলছি, নইলে এই বোতল দিয়ে গোলোকে পাঠিয়ে দেবো। (বোতল মারিতে উদ্যত)

গীত

নিতাই— আমি কি মরতে ডরাই ?
সর্ব মরণ বিধি হয়ে আমি সেই চরণ নিয়েছি যার।

তোদের মুখে হরিনাম শুনি একটিবার,
শুনে জীবন ধন্য করি একবার।
হরিবল, হরিবল।

মাধা—এখনই দাও বল্‌ছি !

নিতাই—হা—ভাই, গোলকের মদ দিয়ে তোমাদের হৃদয় ভরে দিয়েছি, আবার কেন ?

মাধা—তবে, এই দেখ,…(বোতলের দ্বারা প্রহার)

গীত

তিাই— মেরেছিস, ভাই ! ভালই করেছিস ! মাধা, একবার হরিবল্‌রে।

নিমাই—কেরে এরূপ পাষণ্ড। আমার প্রভু নিত্যানন্দের শিরে রক্তপাত করেছিস। না—না, আর সহ্য হয় না। এখনই তোদের কর্মের ফল ভোগ করতে হবে। কোথায় চক্র—কোথায় চক্র ? (চক্রের প্রবেশ)

নিতাই—মেরো না ভাই। ব্যথা লাগে নাই। মাধা মারতে জগা নিষেধ করে। দৈবাৎ একটু লেগেছে।

নিমাই—ওরে জগা, নিত্যানন্দকে রক্ষা করেছিস বলে তুই আমায় আজ হতে কিনে নিলি। আজ হতে তোর প্রেম ভক্তি লাভ হোক্।

জগা—হরিবল। হরিবল।

মাধা—প্রভু ! আমরা দুজন সমান পাপী, তবে দয়ার বিভাগ কেন ?

নিমাই—ওরে ! জগার চেয়ে তোর পাপ অনেক বেশী। আমা হতে তোর উদ্ধার হবে না। প্রভুর শ্রীপাদ যদি তোকে দয়া করেন। তবে তোর মুক্তি হোলেও হতে পারে।

মাধা—প্রভু ! আমরা দুজন সমান পাপী। তবে দয়ার বিভাগ কর্‌ছেন কেন ? (পায়ে ধরিতে উদ্যত)।

নিতাই—ওরে, তোকে আর আমার পায়ে ধরতে হবে না। যদি আমার পূর্বজন্মের কোন সুকৃতি থাকে, সব তোকে প্রদান করলাম। আজ হতে তোর প্রেমভক্তি লাভ হোক।

মাধা—বাহবা ! না ! হরিবল, হরিবল !

গীত

নিতাই ইত্যাদি হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

সুরধনীর তীর

প্রথম দৃশ্য

নৈবেদ্য হাতে সখীগণের প্রবেশ

গীত

নিমাই— সখিগণ! তোরা কার পুজা করিস গো?
নৈবেদ্যাদি সাজাইয়া কার পুজা করিস গো?

সখী—আমরা মা মঙ্গলচণ্ডীর পুজা করি।

গীত

নিমাই— এ পুজাটা আমায় দে। ভজন করব মনের সাধে।

সখী—হারে, পাগল নিমাই! ঐ পুজা যদি তোকে না দিই, তবে আমার কি হবে?

গীত

নিমাই— তোর বুড়ো পতি হবে লো,
দুই সতীনে ঘর করবি।

সখীগণ—পাগল নিমাই, আর গাল দিস্‌নে, এই নে।

গীত

নিমাই— তুই বড়লোকের ঘর কর্‌বি, সোনার স্বামী হবে। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(জগন্নাথ মিশ্রের বাটির সম্মুখস্থ গঙ্গাতীর)

যমুনার তীরে দু-জন ব্রাহ্মণ ধ্যানমগ্ন উপবিষ্ট

গীত

নিমাই— এই কি! এই কি! আমার সেই যমুনে!
খেলা কর্‌তাম গোপীদের সনে।

পাঠ—এই যদি আমার সেই যমুনাই হয়, তবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছি কেন? আমার তাপিত প্রাণ শীতল করবার জন্য ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।

গীত

বিবেক— ঝাঁপ্‌ দিয়ে পড়িল।
সুরধনীর জলে নিমাই ঝাঁপ দিয়ে পড়িল।
সুরধনীর জল উথ্‌লে উঠে লাগল ব্রাহ্মণের পায় গো।

(ব্রাহ্মণের ধ্যান ভঙ্গ হল)

১ম ব্রাহ্মণ—হঠাৎ সুরধনীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল এ ছেলে কে?

২য় ব্রাহ্মণ—এটা কে চিন্‌তে পারছি না?

গীত

এইটা বুঝি সেইটা হবে……আর কে হবে।
জগন্নাথ মিশ্রের কু-পুত্র নিমাই।

১ম ব্রাহ্মণ—আরে ভাই, এই ছেলেটাকে চিনেছি, এই ছেলেটা আর একদিন কি করেছিল, জানো!

২য় ব্রাহ্মণ—কি করেছিল, ভায়া?

১ম ব্রাহ্মণ—আরে……কি করেছিল, ভায়া! কতকগুলি নাগরী এসে বল্লে, নিমাই তোকে কলা-সন্দেশ খেতে দেবো। তুমি এক বার নাচো। কলা-সন্দেশ খাবার লাগি নাচিতে লাগল।

২য় ব্রাহ্মণ—ভগবান উদ্দেশে নিবেদনও করল না?

১ম ব্রাহ্মণ—নিবেদন-টিবেদন কিচ্ছুই করল না। টক করে গিলে নিলো।

নিতাই—হা-ভাই, তোমরা কার নিবেদনের কথা বলছ।

গীত

কারে করবে নিবেদন, নিজে নিবেদনের ধন।

ব্রাহ্মণদ্বয়—বেটা নিজে নিবেদনের ধন, নিজে নিবেদনের ধন।

(নিতাইর প্রস্থান)।

গীত

ওরে বেটা, লক্ষ্মীছাড়া, নদিয়া তুই হবি ছাড়া
সন্ধ্যা পুজা কিছু মাত্র নাই রে তোর।

কিছু নাই কিছু নাই।
ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম নিলে, কিছু নাই কিছু নাই।

১ম ব্রাহ্মণ—আরে, ভাই, জগন্নাথ মিশ্র একজন পবিত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। নিত্য নিত্য গঙ্গাস্নান করতেন, সন্ধ্যা-পুজা করতেন। আর ভাই, এই দুষ্ট ছেলেটা কিছুই করে না। তবে দুষ্ট ছেলে! তোকে আমরা এই অভিশাপ দিচ্ছি, অদ্য রজনীর মধ্যে ন'দে ছাড়া হতে হবে—লক্ষ্মীছাড়া হতে হবে—যা বেটা,—ছেড়ে চলে যা, বেটা টিক্‌টিকির লেজ, গুবরে পোকার ডিম। বেটা অকাল-কুষ্মাণ্ড, বেটা লণ্ড-ভণ্ড। (প্রস্থান)

২য় ব্রাহ্মণ—যা বেটার ছেলে, আমিও তাই বললাম—চলে যা। (প্রস্থান)

নিমাই—হায়রে, ব্রাহ্মণগণ আমায় অভিশাপ দিয়ে গেল না, আমার আশীর্বাদ হল।

গীত

আশীর্বাদ হল, অভিশাপ নয় আমার আশীর্বাদ হল।
লক্ষ্মী যেন আমায় ছাড়ে, সেই আশীর্বাদ কর রে,
ছাড়িতে পারি গো, বিষ্ণুপ্রিয়ে গৃহলক্ষ্মী।

নিতাই—কাঁদছ কেন? ভাই রে, নিমাই, কাঁদ্‌ছ কেন?

পার্ঠ—ভাই নিমাই! এ সংসারে তোমার কি অভাব হয়েছে?

নিমাই—ভাই রে নিতাই! এ সংসারে আমার কিছুর অভাব হয় নি।

গীত

নিতাই— অভাব না থাকলে কেও কাঁদে না,
অভাবের জন্য সকলে কাঁদে, ভাইরে!

নিমাই—ভাইরে নিতাই! এ সংসারে আমার কোন জিনিসের অভাব নাই বটে, কিন্তু একটি জিনিষের অভাব আছে।

গীত

যাবরে, যাবরে, কৃষ্ণ ভজনেতে যাব।
বহুদিনের আশা মনে, কৃষ্ণ ভজনেতে যাব।

নিতাই—তা তো হবে না।

গীত

মা' তো প্রাণে বাঁচবে না রে।
নিমাই, নিমাই, নিমাই বলে ॥
নিমাই বলে প্রাণ ত্যজিবে।
মা' তো প্রাণে বাঁচবে না রে ॥

পাঠ—তা হবে না—

গীত

আমি বলে যে দেব,
মায়ের কাছে গিয়ে, বলে যে দেব,
তোমার ও সন্ন্যাসের কথা, মায়ের কাছে গিয়ে···

গীত

নিমাই— বলিস না রে মায়ের কাছে গিয়ে।
আমার এ সন্ন্যাসের কথা, বলিস না রে মায়ের কাছে।

গীত

শচীমাতা—কি কথা কহিলি ভায়ের সনে
কহিতে কহিতে কাঁদলি ক্যানে ?
ওরে নিতাই, নিতাই আমার কাঁদলি ক্যানে ?

নিতাই— মা গো, কহিতে পরাণ যায়, মুখে নাহি বাহিরায়
তোর শ্রীগৌরাঙ্গ, নবদ্বীপ ছাড়িবে, মা !
নিমাই যাবে গৃহ ছাড়ি, সোনার ন'দে আঁধার করি,
মা তোর নিমাই গৃহেতে রবে না, মা !
মা গো, রবে না, তোর নিমাই গৃহে রবে না।
তার মনের গতি ভাল দেখি না।

গীত

শচীমাতা—একটি ছেলে বিশ্বরূপ, বিষয় ছেড়ে হয় বিরূপ,
আমি সেই দুঃখেতে কেঁদে কেঁদে মরি গো।
আবার তুইও কি যাবি, বলরে নিমাই,
আবার, তুইও··· ·।

শচীমাতা—চল বাবা, তোমার খাবারের যোগাড় করি গে—

(উভয়ে গমনোদ্যত, পুনঃ প্রবেশ)

গীত

নিমাই— মাগো, কোটি জন্মের ফল ভাগ্য,
বিষয় ছেড়ে হয় বৈরাগ্য,
তেমন ভাগ্য সকলের কি ঘটে, মা!
আমার কবে বা হবে গো।
(তেমন সৌভাগ্য), আমার কবে বা হবে গো।

গীত

নিতাই— নিমাইরে কিছু বুঝি নাকো, তুই, সন্ন্যাসী হবি,
যুগে যুগে তুই, মা-বাপে কাঁদালি,—
কলি যুগে কি তাই কাঁদাবি।

নিমাই—মা' যমুনা হতে জলক্রীড়া করে এসে, আমার বড় ক্ষুধা হয়েছে।

গীত

শীঘ্র আমায় খেতে দাও, আমার ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ বাঁচে না…।

কেশব-ভারতী—মা, এইটা কি নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী?

শচীমাতা—হাঁ বাবা, এইটা নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী। কেন, তুমি কি চাও, বাবা?

কেশব-ভারতী—আমি একটুকু স্থান ভিক্ষা চাই, মা!

শমীমাতা—না বাবা, অতিথের স্থান হবে না।

কেশব-ভারতী—কেন, মা, অতিথির স্থান হবে না?

শচীমাতা—না, বাবা, আমি অতিথিকে স্থান দেব না। আমার বিশ্বরূপ বলে একটি পুত্র ছিল। তাকে এক অতিথি এসে চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। সেই হতে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, কোন অতিথিকে স্থান দেব না।

কেশব-ভারতী—আমি কি সেই অতিথি? অন্যের অপরাধে কি আমি অপরাধী হব?

গীত

নিমাই— কর, মা, অতিথি সেবা, পূর্ণ হবে মনস্কাম।
কৃষ্ণপদ পেতে যদি, থাকে, মা গো, অভিলাষ॥

গীত

নিমাই— রূপ-নগরে তার ঠিকানা
পূরণ করে যে মনোবাসনা।

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রভু, সে কতদূর ?

গীত

নিমাই— কার পক্ষে আছে অন্তরে কার পক্ষে বহুদূরে।
বলিলে, পাই সহজে, না বলিলে পাই না জীবনে।

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রভু, আপনার বৈদ্যর থানা কোথায় ?

নিমাই—তলায়—

বিষ্ণুপ্রিয়া—কথাটা ভাল করে বুঝ্তে পারলাম না।

গীত

নিমাই— কদম তলায় থানা, বৈদ্যর কদম তলায়।

বিষ্ণুপ্রিয়া—আপনার বৈদ্যর ডাকঘর কোথা ?

গীত

নিমাই— জটিলা-কুটীলার বাড়ী, ডাকঘর হয় তাঁহারি,
আয়ান করে পোষ্ট-মাষ্টারী।

বিষ্ণুপ্রিয়া—আপনার বৈদ্যর নাম কি ?

গীত

নিমাই— বাঁকা বৈদ্য, নয়ন বাঁকা, ভঙ্গি বাঁকা, তাঁর সবই বাঁকা।
তার চূড়াটী বাঁকা, মাথায় আছে পাখীর পাখা—
নয়ন তার ভঙ্গি বাঁকা।

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রভু! আপনার বৈদ্যর নাম ধাম সবই পেলাম।

গীত

তবে আমি যাই, তবে আমি যাই, তোমার বৈদ্যর বাড়ী।

নিমাই—প্রিয়ে! তুমি বৈদ্য আন্তে যাবে তো, কিন্তু—

গীত

আগে দিতে হয় গো,
আমার বৈদ্যর দরশনি, আগে দিতে হয় গো ?

গীত

বিষ্ণুপ্রিয়া— আগেই দেব—

দরশনি বৈদ্যের আগেই দেব।

নিমাই—প্রিয়ে, তুমি বৈদ্যের দরশনি কী দেবে?

বিষ্ণুপ্রিয়া—কেন, প্রভু! হীরে সোনা দিলে কি বৈদ্য মিলবে না?

গীত

নিমাই— মিলবে না গো,

হীরে-সোনায় কেলে সোনায় মিলবে না গো।

বিষ্ণুপ্রিয়া—তবে কি দিলে মিলবে, প্রভু!

নিমাই—মনের মণি দিতে হবে।

বিষ্ণুপ্রিয়া—আচ্ছা, প্রভু, তাই দেব।

গীত

নিমাই— আট আনাতে হয় না··।

ষোল আনা হইলে··।

বিষ্ণুপ্রিয়া—ষোল আনাই দেব, প্রভু।

নিমাই—একজনকে দেওয়া মন অন্যজনকে দিলে কি হয় জান?

গীত

চৌরাশীতে যেতে হয়,

পর-পুরুষেরে মন দিলে···।

গীত

বিষ্ণুপ্রিয়া—সে তো আনন্দের কথা গো,

চৌরাশী ক্রোশ বৃন্দাবন যাব···।

নিমাই—চৌরাশী ক্রোশ বৃন্দাবন নয়, চৌরশী ক্রোশ নরক ভ্রমণ করতে হবে।

বিষ্ণুপ্রিয়া—আপনার ব্যাধি শান্তি করতে যদি আমায় নরকে যেতে হয়, তবুও আপনার বৈদ্যের বাড়ী যাব।

নিমাই—প্রিয়ে! তুমি একবার যাবে, একবার আসবে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে যদি ...।

গীত

যদি আমার প্রাণ যায়, তবে বৈদ্য এনে ফল কি হবে?

বিষ্ণুপ্রিয়া—তাইতো, আমি একবার যাব, একবার আসব। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে যদি আমার প্রভুর প্রাণ যায়, তবে বৈদ্য এনে ফল কি হবে?

গীত

তবে তুমি যাও……।

তোমার বৈদ্যর বাড়ী·· । আর তোমাকে নিষেধ করব না।

নিমাই—(স্বগত)—চক্রধারীর চক্র বুঝতে পা পেরে, বিষ্ণুপ্রিয়া আজ চির-জীবনের মত বিদায় দিলেন।

গীত

বিষ্ণুপ্রিয়া আমায় বিদায় দিলে,

চক্রধারীর চক্রে পরে ……।

নিমাই—যাব তো। যাবার সময় কতকগুলি উপদেশ দিয়ে যাই।

গীত

গৃহকাজে দিও মন।

হরিনাম নিও স্মরণ।

আশীর্বাদ করি আমি যাও, প্রিয়ে, যাও হে,

(আমার), মা যেন কাঁদে না,

নিমাই, নিমাই, নিমাই বলে……।

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রভু! একদিকে গৃহকাজ, অন্যদিকে মায়ের সেবা, আবার, হরিনাম লওয়া। এতগুলি কাজ আমি কিরূপে করব?

নিমাই—কেন প্রিয়ে?

গীত

তুমি হাতে কর গৃহকাজ, মুখে বল হরি,

অনায়াসে পেয়ে যাবে ভব নদী তরী।

তোমার কোন ভয় রবে না,

হরিনামের গুণে তরে যাবে……

কোন ভয় রবে না॥

নিমাই—চল প্রিয়ে, শত আলাপনে রাত্রি অধিক হয়েছে, শয়ন মন্দিরে শয়ন করিবে। (প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়ার গৃহ

নিমাই—নিদ্রে গো! নিদ্রে গো! নিদ্রে গো!

গীত

নিদ্রা— এত রাত্রি পরে কেন ডাকলে গো আমায়!
ডাকার মত ডাক শুনে কি ঘরে থাকা যায়!
মহান স্বরে ডাক্‌ছ তুমি, আর কি রইতে পারি গো আমি,
বল, এখন আমায় বল, কিবা কার্য করি?

গীত

নিমাই— মহামায়া, আমায় সাহায্য কর।
যাবার পথে আমায় সাহায্য কর··· ॥

নিদ্রা—প্রভু, আপনি যাচ্ছেন পাপী উদ্ধার করতে,

গীত

তবে আমার পিতা যমরাজের গতি কিবা হবে গো,
গতি কিবা হবে গো ··· ॥

নিমাই—সকল পাপীর উদ্ধার হবে না। যে আমায় কেঁদে কেঁদে ডাকবে, সেই মুক্তি পাবে।

নিদ্রা—তবে আমার কোন দোষ নাই, প্রভো!

গীত

আমি তারে দিলাম নিদ্রা, কর তুমি সন্ন্যাস যাত্রা। (প্রস্থান)

গীত

নিমাই— আমি যাই! প্রাণাধিকে যাই গো।
যাইগো তোমায় ছাড়িয়ে,
প্রিয়ে, পার যদি মনে রেখো।
না হয় তুমি ভুলে যেও।
যাই গো তোমায় ছাড়িয়ে, প্রিয়ে, যাই গো,
হবে কি না হবে দেখা বলিতে পারি না।

(আমি) যাই গো তোমায় ছাড়িয়ে প্রিয়ে, যাই গো।
মায়ার বাঁধন ছাড়া কি গো যায়।
যায় যায়, মনে করি।
চলিতে না পারি,
চলে না চরণ কি করি উপায়,
যাইতে পারিলে পারিব কেমনে,
মহামায়া আমার পিছনেতে ধায়। (প্রস্থান)

বিষ্ণুপ্রিয়া—কই প্রভো! কোথায় প্রভো! এ যে সব শূন্য।

গীত

বিষ্ণুপ্রিয়া—আমারি প্রভুর পদের নূপুর, সোনারি গলার হার গো!
আমি এসব দেখিয়া, মরিব জ্বলিয়া, (জীয়ন্তে না রব আর গো)!

পাঠ—হায় নূপুর, তোকে আর কি বলব!

গীত

হার কেন আজ, হার মানিলে,
হারাধনে হারাইলি…।

পাঠ—হায়! হার তোকে আর কি বলব!

গীত

হলো না, হলো না, আমার ভাগ্যে, হলো না পতি-পদ পুজা করা.
আমার ভাগ্যে……
আমি অভাগিনী সারাটি রজনী
আকুল প্রভুর হইয়া প্রেমেতে বাঁধিয়া, গেল পলাইয়া,
আমারে ফাঁকি দিয়া। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

শচীমাতার গৃহ

গীত

নিমাই— মাগো! মাগো! মাগো!
বিদায় চরণে, আর এ জীবন,
দেখিতে পাবে না বলে,

চলিলাম আমি, তোমারে ছাড়িয়ে,
সন্ন্যাস করি ভ্রমণে।

শচীমাতা—কোকিল, আর জ্বালাস নে, সারা রাত্রি হরিনাম করে নিমাই আমার এইমাত্র শুয়েছে। আর জ্বালাতন করিস্‌নে।

নিমাই—মাগো, আমায় কোকিল ভেবে সাড়া দিলেন, তবে আর একবার ডেকে দেখি।

গীত

পূর্বোক্ত রূপ

শচীমাতা—এখানে কেন! ব্রজের কোকিল তুই ......। তুই এখানে কেন?

নিমাই—মা আমায় কোকিল ভেবে বিদায় দিলেন। মায়ের শেষের কাজ আমি আগেই করি সাঙ্গ।

গীত

নিমাই— সপ্ত প্রদক্ষিণ করি,
আমার পিছের কার্য আগে করি।

পাঠ—অগ্নি দেবে কে? লোকে বল্‌বে......।

গীত

ঐ নাকি গো নিমের মা!

পাঠ—কাষ্ঠ দেবে কে? প্রতিবেশী। চিতা জলবে কেমন করে?

গীত

জ্বলিয়া উঠিবে......।
রাবণের চিতার মত, জ্বলিয়া উঠিবে।
পশুপক্ষী আদি সবে শুন মোর বাণী।
কাঁদিলে বুঝাইয়ে রেখো আমার ও মা জননী,
যেন বুঝাইয়ে রেখো......।
আমার মাকে ...। (প্রস্থান)।

গীত

বিষ্ণুপ্রিয়া—উঠ, উঠ, ঠাকুরাণী, নিশি প্রভাত হলো,
কালঘুমে ঘুমাইয়া ছিলাম।

যাবার কালে না দেখিলাম।

অভাগিনী করে মোরে প্রভু আমার কোথায় গেলেন।

শচীমাতা—কেন? কি হলো, গো বৌমা?

গীত

বিষ্ণুপ্রিয়া—সর্বনাশ হলো গো, নদেপুর আঁধার করে,

নদীয়ার চাঁদ গেল গো।

শচীমাতা—বৌমা! নিমাই যখন চলে যায়, তখন তুমি কি করছিলে?

বিষ্ণুপ্রিয়া—মা, আমি ঘুমাইয়া ছিলাম।

গীত

শচীমাতা—নিমাইরে, নিমাইরে, ওরে আমার নিমাইরে,

আমি দশমাস দশদিন গর্ভে ধরে,

না করতাম কোলেরে,

তুই হয়ে কেন মরিস্‌নি বাপ্‌।

বুকের রস না দিতাম তোরে রে,

তবে আমার নিমাই······(মূর্ছা)।

নিতাই—মা, উঠ, শোক সংবরণ কর, আমি তোমার নিমাইকে তোমার কোলে ফিরিয়ে এনে দেবই দেব।

শচীমাতা—এনে দিবি, বাবা!

নিতাই—হাঁ, মা নিশ্চয়ই দেব। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাটোয়া—মধুশীলের বাটী

গীত

নিমাই— মধুরে! মধুরে! মধুরে!

ওরে মধু কইরে মধু?

মধু—ডাকে কেডা? একটু দাঁড়াও, তামাকে দম্‌টি দিয়ে নিই। কেন? ডাকছ কেন?

গীত

তোর লজ্জা কি হয় না !
নাম ধরিয়া, ডাক আমায় ····· ।

নিমাই—মধু ! আমাকে খেউরী করে দিতে পার ?

মধু—হাঁ, আজকাল ঐ ব্যবসাটি ধরেছি। বাস, তামাকে দম্‌টা দিয়ে নিই। কড়ি এনেছ ?

গীত

নিমাই—পথের ভিখারী আমি, কোথায় পাব কড়ি।

গীত

মধু—কড়ি বিনা খেউরী করি না।
যার নাইকো পয়সা কড়ি, তার কি সাজে বাবুগিরি ॥

নিমাই—দেখ মধু ! তোমায় পার করে দেব।

গীত

মধু— নেয়ে কামাই না, ভদ্রলোকের নাপিত
আমি নেয়ে (নাবিক), কামাই না।

পাঠ—তুমি ঘাটের মাঝি নাকি ? তোমার ঘাট কয়টি ?

নিমাই—ঘাট অনন্ত, তার মধ্যে পাঁচটি উল্লেখযোগ্য। শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, মধু ও প্রেম।

মধু—আচ্ছা, তুমি যদি থাক শান্তির ঘাটে। আর, আমি যদি থাকি দাস্যের ঘাটে। তাহলে তুমি কি করে পার করবে ?

গীত

নিমাই— যে জন, হরি হরি বলে দেবে সাড়া
অমনি পাবে ঘাটের ত্বরা।

মধু—কই, কই, খেউরী করে দিই। বাপরে ! এত পুরু চুল তো দেখি নাই ! আমার ক্ষুর তো চলে না।

নিমাই—ক্ষুর চল্‌বে কেন রে বেটা, তুই প্রভুর চরণে হাত না দিয়ে, মাথায় হাত দিয়েছিস।

মধু—আরে তুমি থাম ঠাকুর। আমার ক্ষুরে যে ধার। এই ব্রহ্মাণ্ডকে

দু ফাঁক করে দিতে পারি। এই দেখ না, আমার গায়ের লোমগুলো কেমন কচ্ কচ্ করে কেটে যাচ্ছে।

* * * * *

মধু—প্রভু, আমার পূর্ব পুরুষের গতি কি হবে?

গীত

নিমাই— পিণ্ড দে রে, ও মধু তুই পিণ্ড দে রে।
পূর্ব পুরুষের গতি হবে······।

মধু—পিণ্ড দিতে কি কি লাগে, প্রভু?

নিমাই—ধান, দূর্বা, তিল, তুলসী, চন্দন, এই সমস্ত লাগে।

মধু—আমি দেব পিণ্ড।

গীত

মন তুলসী, ভক্তি চন্দন, উপাসনা তিল গো,
নিষ্ঠা ঘৃত, শ্রদ্ধা মধু, জ্ঞানেরই তণ্ডুল গো,
দিও অক্ষরে নামটি লিখে, পিণ্ড ক'রে দান গো।
ষোল কলাই কলাপূর্ণ, ধান্য রূপাদান গো।

গীত

নিমাই— পিণ্ড পূরণ হলো না,
ও মধু! তুই গঙ্গাজল দিলি না।

গীত

মধু— (আমি), দেব গঙ্গাজল গো,
গৌর বলে কেঁদে কেঁদে দেব গঙ্গাজল গো।

নিমাই—মধু রে, তুই গয়াতে পিণ্ড দিয়ে আয়।

মধু—গয়াতে কি আছে, প্রভু?

নিমাই—গয়াতে, গয়াসুরের মস্তকে শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মের চিহ্ন রয়েছে। সেইখানেতে পিণ্ড দিলে প্রেত মুক্ত হয়।

গীত

মধু— আমার মস্তকে দাও, চরণতরী।
আমি এইখানেতে গয়া করি।

পাঠ—চলুন, প্রভু, গঙ্গার তীরে গিয়ে আপনার খেউরী করে দিইগে। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

কেশব ভারতীর বাড়ী

নিমাই—প্রভো! এই তো আমি মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে এসেছি। এইবার আমায় মন্ত্র প্রদান করুন।

ভারতী—বাপ্‌রে নিমাই! শৈশবে সন্ন্যাস নিলে তোমার মা যে প্রাণে বাঁচবে না।

গীত

নিমাই—কেও দশ, কেও বিশ, কেও প্রভু পঞ্চাশ।
কেও হয় মাতৃগর্ভে বিনাশ।
আমি কাল যদি মরে যাই।
আমার এ জীবন বিফলে যাবে…… (বিফলে যাবে)।

কেশব ভারতী—বাপ্‌রে। নিমাই! আমি তন্ত্র মন্ত্রে মন্ত্র পাচ্ছি না।

নিমাই—প্রভো! কাল রাত্রে আমি স্বপ্নযোগে একটি মন্ত্র পেয়েছি। এইটি সন্ন্যাস মন্ত্র বটে কি না, আপনি বলুন……(কানে কানে)

কেশব ভারতী—এই তো সন্ন্যাস মন্ত্র বটে। এসো, তোমার কানে কানে বলি। এই নাও, আমার কমণ্ডলু ও দণ্ড, হরিনাম বিতরণ করে কলির পাপীদের উদ্ধার করে দিও। দেখ, যেন অসার সংসার ভুলে যেও না। (প্রস্থান)

গীত

নিমাই— হরিনামের কাঙ্গাল আমি,
নগরবাসী আমায় ভিক্ষা দেন গো।
নগরবাসী আমায়………।
(জগতবাসী একবার হরি হরি বল)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শান্তিপুর—অদ্বৈত গৃহ

নিতাই ও শচীমাতা ; পরে নিমাই ভিক্ষা করিতে করিতে প্রবেশ।

শচীমাতা—বাবা নিমাই, তোমার এমন বেশ কে করলে? সে চাঁচর কেশ কে নাড়ালে? এ কাঙ্গাল বেশে কে সাজালে?

নিমাই—মা, আমি সন্ন্যাস মন্ত্র নিয়েছি।

শচী—তবে কি, বাবা, ঘরে ফিরে যাবে না ?

নিমাই—মা, আমার গুরুদেব সংসার করতে নিষেধ করেছেন। তাঁর কথা অমান্য করতে বল্‌ছেন ?

শচীমাতা—না, বাবা, আয়, তোকে কিছু খেতে দিই গে। (প্রস্থান)

গীত

নিমাই—নিতাই—হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে।
জগৎবাসী একবার হরি হরি বল।

যাত্রামঙ্গলের গান

বিবাহ অনুষ্ঠানে বধূসহ বরের নিজগৃহে যাত্রাকালীন যে মেয়েলী সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা যাত্রামঙ্গলের গান।

১

যত যত নারী দিল মঙ্গল জোকার।
যাত্রা কৈল বরকন্যা আনন্দ অপার॥
হাতেতে আরসি মাইজ বান্ধা গামছা দিয়া।
সোনার চান ঘরে যায় রে নয়া বৌ লৈয়া॥
দুয়ারে মঙ্গল ঘট চিত্র আলিপনা।
ধান্য দূর্বা দই পঞ্চ পল্লবে যোজনা।
নবরঙ্গে বাদ্য বাজে মঙ্গল জোকার।
চিরজীবী হৈয়া থাক সুন্দর কুমার॥ —মৈমনসিংহ

যুগীযাত্রা

বাংলা দেশে যুগী বা নাথসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত যুগী সাধকদিগের আলৌকিক জীবন বৃত্তান্তমূলক আখ্যায়িকা-গীতিকে উত্তর বাংলায় যুগীযাত্রা বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ইহা 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান', 'ময়নামতীর গান', 'গোপীচন্দ্রের গান', ইত্যাদি নামেও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। রংপুর

জিলার কৃষকদিগের মধ্য হইতে ১৮৭৩ সনে স্যর জর্জ গ্রীয়ারসন সাহেব-কর্তৃক মাণিকচন্দ্র রাজার গান সংগৃহীত হইয়াছিল। তাহা হইতে সামান্য অংশ উদ্ধৃত হইল—

১

মাণিকচন্দ্র রাজা ছিল ধর্মী বড় রাজা।
ময়নাক বিভা করিল তার নও বুড়ি ভার্যা॥
ময়নাক বিভা করি রাজার না পুরিল মনের আশ।
তারপর দেবপুরের পাঁচ কন্যা বিভা করি পুরি গেল মনের হাবিলাস॥
আজি আজি কালি কালি বার বছর হৈল।
দেবপুরের পাঁচ কন্যা ডাকিনী ময়না কোন্দল লাগিল।
দেখিবার না পারি মহারাজ ব্যাগল করি দিল॥
সেই ময়নাক ঘর বান্ধি দিল ফেরুসা নগরে॥
মাণিকচন্দ্র রাজা বঙ্গে বড় সতী।
হাল খানায় খাজনা ছিল দেড বুড়ি কড়ি॥
সেই যে রাজার রাইয়ত প্রজা দুঃখ নাহি পায়।
কারও মারুলি দিয়া কেহ নাহি যায়॥
কারও পুষ্করিণীর জল কেহ না খায়।
আথাইলের ধন কড়ি পাথাইলে শুকায়॥
সোনার ভাটা দিয়া রাইয়তের ছাওয়ালে খেলায়।
হেন দুঃখী কাঙ্গাল নাই যে ধরিয়া পালায়॥
পাতবেচা হইয়া রাইয়ত পাত বেচেয়া খায়।
স্ত্রীপুরুষে যুক্তি করি হস্তী কিনিবার চায়॥
খড়িবেচা হৈয়া খড়ি বেচেয়া খায়।
স্ত্রীপুরুষে বুদ্ধি করি দালান দিবার চায়॥
সেক্কা রাইয়তের ছিল সরঙ্গা নলের বেড়া।
বেতন করি যে ভাত খায় তার দুয়ারত বান্ধা ঘোড়া॥
ঘিনে বান্দী নাহী পিন্ধে পাটের পাছড়া॥ —রংপুর

যোগের গান, যোগশাস্ত্রের গান

যোগশাস্ত্র বিষয়ক গানকে যোগের গান বা যোগশাস্ত্রের গান বলা হয়। ইহারা তত্ত্বসঙ্গীতের অন্তর্গত, দেহতত্ত্বের গানের সঙ্গে ইহাদের ভাবগত সাদৃশ্য আছে।

১

খেলিবারে তাস, যদি অভিলাস, ভাবটি তার বুঝে নে এখন।
টেক্কা এক ব্রহ্ম, লীলায় হরির জন্ম
তার মর্ম এবে করহ গ্রহণ ॥
তিরি ত্রিগুণ ক্রমে হইয়ে প্রকাশ, চৌকা চতুবর্গ সৃষ্টির বিকাশ,
পঞ্জা পঞ্চভূত ছক্কা সে অদ্ভুত
ষড়্‌রিপু তারে বলে বুধগণ ॥
সাতায় সপ্ত চক্র, আট কুঠরী আটা
নওলায় নবদ্বার যুক্ত এ দেহটা।
দশে দশ ইন্দ্রিয় সদা ভোগপ্রিয় স্থির হয়ে শুন আর বিবরণ।
সাহেব আর বিবি পুরুষ ও প্রকৃতি
লীলার তরে একের দ্বিবিধ মূরতি
গোলাম জ্ঞান গুরু দুই মধ্যে স্থিতি
সবার শ্রেষ্ঠ তিনি বুঝে দেখ মন ॥
তিনের মিলনে বিস্তি তারে কর প্রেম, রঙ্গের হ'লে ইস্তক বিস্তি কয়,
রঙ্গের নওলার তখন মূল্য বেড়ে যায়
চৌদ্দ বলে হয় পরিচয় তখন ॥
শিক্ষা গুরু পাশে শিখ ভালভাবে
নৈলে লাভে মূলে সকলেই হারাবে
ছক্কা পাঞ্জা ভূতে সকলই খোয়াবে ইহা সত্যেনের বচন ॥

—মুর্শিদাবাদ

২

প্রথমেতে থাকে বিন্দু জনকের শিরে।
বিলোম প্রবেশে বিন্দু জননী উদরে ॥

একদিনের হইলে বিন্দু শিয়রে বেড়ায় টলে
দু দিনের হইলে বিন্দু রক্তে মাংসে মিলে ॥
তিন দিনের হইলে হয় ফেনার আকার।
চার দিন হইলে হয় দেহের সঞ্চার ॥
পাঁচ দিন হইলে হয় কাজলের প্রায়।
ছয় দিনে রং ধরে বলি সমুদয় ॥
সাত দিনের হলে হয় দেহের মোহরা।
নয় দিনে দুই আঁখি পুর্ণ ষোল কলা।
আট দিনে হয় দেহে হাড়ে মাংসে জোড়া ॥
এক পক্ষে হয়ে যায় যে ঘোরো উজ্জ্বলা—॥
এক মাসের হইলে গর্ভ জানি বা না জানি।
দুমাস হইলে করে লোকে কানাকানি ॥
তিন মাসের হইলে দেহের ধ্বজা পজা হয়।
চার মাসের হইলে শিশু প্রাণ দান পায় ॥
পাঁচ মাসের শিশু হেলা দুলা করে।
সাত মাসের হইলে হয় বেদনা উদরে ॥
আট মাসের গর্ভবতী পাণ্ডুর বরণ।
নয় মাসে স্তনে কালা ক্ষীর দরশন।
দশ মাসের হইলে হয় এখন তখন।
দশ দিন দশ দণ্ডে প্রসবে নন্দন ॥
গর্ভশালা হইতে দেহ পড়লো ধরাধামে।
গঠিত মানব দেহ আঠারো মোকামে ॥
আঠরো মোকামে স্থিতি আঠারো দেবতা।
পর্বশেষ বর্ণনায় বলি সে বারতা ॥
চুড়াতে চুড়ামণি ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থিতি।
কণ্ঠ মধ্যে মহাবিষ্ণু করেন বসতি ॥
বক্ষেতে কালাচাঁদ বসে করেন ধ্যান।
নাসিকায় দেন নিতাই মধুর আঘ্রাণ ॥

কর্ণেতে চৈতন্য গোঁসাই হয়ে সাবধান।
আলা জিহ্বায় সরস্বতী জিহ্বায় বলবান॥
তার নীচে নদী আছে গয়া গঙ্গার জল।
ললাটে কেশব কণ্ঠায় আছে কানাই লাল॥
তালুতে নারদ মুনি বাহুতে বলরাম।
বক্ষেতে জগন্নাথ পৃষ্ঠেতে শ্রীদাম॥
নাভি সৌর মণ্ডল প্রেমের বসতি।
লিঙ্গ মুলে মহাদেব দ্বিদলে ভগবতী॥
হাঁটুতে শকতি ধরে পায়ে বসুমতী।
আঠারো মোকামের কথা কইতো পার্বতী॥
আঠারো মোকামের তত্ত্ব সেই মহাজন জানেন।
মানবে মানুক না মানুক দেবতায় তারে মানেন॥
এ সকল তত্ত্বের কথা কিছুই নাহি জানি।
ভক্তিহীন শক্তি শূন্য সতীশচন্দ্রের বাণী॥ —মুর্শিদাবাদ

৩

মানব দেহটি দেখ নহে সাধারণ।
ব্রহ্মাণ্ডপতির একটি মায়া নিকেতন॥
মাটি জল, অগ্নি বায়ু আর শূন্য রয়।
মুনি ঋষি সাধুগণে পঞ্চভূত কয়॥
এ ভূতে সচ্চিদানন্দ থাকে সভা হয়ে।
ঘরে ঘরে খেলা করে ক্ষুদ্র অংশ লয়ে॥
তার অন্তর্ধানে সবে কেহ নাহি রয়।
যে যার স্থানেতে তারা করিছে গমন॥
অস্থি মাংস চর্ম লোম নাড়ী ধরাতলে।
লালা মূত্র শুক্র রক্ত মজ্জা মিশে জলে॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা শান্তি আলস্য আগুনে।
ধারণ চালন আর ক্ষেপ সঙ্কোচনে
প্রসারণ আজি করি মিলিবে পবনে॥

রাগ দ্বেষ লজ্জা ভয় মোহ সে গগনে।
আত্মজ্ঞানে না লভিলে বুঝে কোন জনে॥
আমার আমার বলি মিছে দম্ভ করে।
এই সব ধারণাতে দগ্ধ হয়ে মরে॥
তোমার কি আছে তাই ভেবে বল তুমি।
কার সত্তা হয়ে তাই তুমি বল আমি॥
চৈতন্য রূপেতে যাবে হৃদে দেখা পাবে।
তখনি জানিবে, ভাই, তুমি আমি হবে॥
কৃষ্ণানন্দ বলি তবে করিবে স্মরণ।
অনাদির আদি সেই নিত্য নিরঞ্জন॥ —রাজসাহী

'গোপীচন্দ্রের গান' নামে যুগীসম্প্রদায়ের যে গীতিকার কথা পুর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে যোগশাস্ত্র সম্পর্কে সুদীর্ঘ তত্ত্বমূলক গীতি-আলোচনা স্থান পাইয়াছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'গোরক্ষ-বিজয়' নামে যে নাথ-সাহিত্যের একটি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও যোগশাস্ত্রের ব্যাপক আলোচনা প্রকাশ পাইয়াছে। নাথ-সম্প্রদায়ের মধ্যে 'হাড়মালা' নামে একটি যোগশাস্ত্রের গ্রন্থ প্রচলিত আছে। তাহাও কবিতায় লিখিত। 'গোরক্ষ-পদাবলী' নামে যে গ্রন্থ দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও যোগশাস্ত্রের বহু গান সঙ্কলিত হইয়াছে। নাথগুরুদিগের বাণীও সঙ্গীতাকারে পরিবেশন করা হইয়া থাকে। দুই একটির নিদর্শন এই প্রকার,

'নিদ্রা আলিঙ্গনে কাটি গেল সারারাতি,
সংসারেতে সদাকাল বিষয়েতে মতি॥
দুই বাহু তুলি গোর্খ করিছে চীৎকার,
'মূলধন হারায়ো না, রে ভাই আমার॥'

র

রঙ্

রঙ্ কথাটি লোক-সঙ্গীতে নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। পুরুলিয়া জিলায় এক শ্রেণীর বৈরাগ্যমূলক সঙ্গীতকে রঙ্ বলে। বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুর জিলার ঝাড়গ্রাম মহকুমায় রঙ্ কথাটি ধুয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন সময় রঙ্‌গান বলিতে নিতান্ত লঘুবিষয়ক তালপ্রধান সঙ্গীত বুঝায়। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে গান হইবার পর শ্রোতৃমণ্ডলীকে সামান্য একটু সরস অবকাশ দিবার জন্য রঙ্ গান গাওয়া হয়। প্রথম পুরুলিয়া জিলা হইতে সংগৃহীত কয়েকটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করা হইতেছে—

১

আগে আগে মড়া পিছে গোবর ছড়া,
যেহেতু তোমার ভালবাসা ধন।
দিন দুই চারি কান্দিবে বিনয় করি,
ও তার মা জননী কাঁদে যাবৎ জীবন।
ও তার চির দিন সুখে যায় জীবন॥

—কাঁটাদি (পুরুলিয়া)

২

জাননা রে মন, মুদলে দু'নয়ন,
চারি জন মিলে কাঁধে তুলে নিবে
শ্মশানে তো করে আগমন।
হরি হরি মুখে বলো রে মন,
ও তার চিরদিন সুখে যায় জীবন। —কুঁকড়ামুড়া

৩

শ্মশানে তো নিয়ে দিবে হে ফেলিয়ে,
লয়ে তখন তুমার কিছে নাই স্মরণ—
চিল ও শকুনি করবে টানাটানি
আনন্দে খাইবে শৃগালগণ। —ঐ

৪

পথে কাঁটা দিয়ে ডেঁগে পাল হ'ল,
যত বন্ধুগণ তুমারি এই পথ আমারি এই পথ।
কখনো না দেখা হবে রে মন।
হরি হরি মুখে বলো রে মন। —ঐ

৫

নীলকণ্ঠ ব'লে শুনহ সকলে গুরুপদে কিছু রাখ হে মোরে,
এড়াতে রতন হারালে হে ধন আর বাইরাতে কতক্ষণ।
হরি হরি মুখে বলো রে মন। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত গানগুলি নিতান্ত লঘুবিষয়ক, ইহাই রঙ্ গানের বিশেষত্ব—

৬

উপর কলির বংশী কাঁটা নাম' কলির পিটালী,
মা ধরাল কোন চাতুরী কোথায় বেলা ডুবালি।
—অযোধ্যা (পুরুলিয়া)

৭

তবে লাউ ডিঙ্গিলা কারলা ভাজা
আশ নামাই রেখেছি।
আমি কি মন্দ রেঁধেছি—।
মা গো, ডোমনি রাণী ওই তো ময়লা রাঁধ্নী,
লাউ ডিঙ্গিলা কারলা ভাজা রেঁধেছি॥
এক পোয়া মদ খায়ে ভাসুর মেতেছে,
ভাসুর ছুঁবে ছুঁবে গো লতাই লেগেছে।
লাউ ফুলটি সাদা ডিঙ্গিলা ফুলটি লাল,
ভাসুর ছুঁবে ছুঁবে গো লতাই লেগেছে॥ —ঐ

কোন গুরুত্ব-বিষয়ক গানের পর আসর জমাইবার জন্যে হাল্কা ধরণের এই গানগুলো গাওয়া হয়।

৮

সারী-শুক পাখ পুষেছি বাঁশের খাঁচায় সাজে না,
কোন বায়েনা রঙ তুলেছে ঘরেতে মন থাকে না। ঐ

৯

গলে দোলে ফুলমালা হাতে মোহন বাঁশী,
আমি কি রূপে হেরিলাম গো কালো রূপে
শ্যামকে পাসরিতে নারি। —ঐ

১০

শুন গো প্রেম-সর তব প্রেমে রাণী হয় গো,
সারা নিশি জাগিয়া মোরা কাটাবো দুজনে।
দেখা দিও, ধনি, দেখা দিও নিরজনে। —ঐ

রঙ্ পাঁচালী

সুদীর্ঘ পৌরাণিক আখ্যানমূলক পাঁচালী গানের পর কিংবা তাহার মধ্যে-মধ্যে লঘু অবকাশ সৃষ্টি করিবার জন্য যে হাস্যরসাত্মক গান গাওয়া হয়, তাহাকে রঙ্ পাঁচালী বলে। মুর্শিদাবাদ জিলা হইতেই এই গান সর্বাধিক সংখ্যায় সংগৃহীত হইয়াছে।

১

সারগড়িতে ডুবল জাহাজ পিপিলিকার ভয়ে।
কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে ভাবি তাই অন্তরে॥
অধিক কি আর বলব বল, একবারে তলিয়ে গেল,
হাই কপালে ইহাই ছিল, পড়ল কর্মের ফেরে॥
কি করিব কোথায় যাব, কোথায় গেলে শান্তি পাব।
অসম্ভব ঘটল তব দোষ দিব আর কারে॥
শালিক ময়না ঠিকভাবে আর বুলি বলে না।
আতা কি আর বেদানা হবে তাই দেখ বিচারে॥
ভেক থাকে যে জলের তলে তার মর্ম ও জানে।
ভমর গিয়ে কমল প্রাণে বসে গুণ গুণ করে॥
কথাতে পেয়েছি বেটা ও বাবারে যাব কোথা।
গলার দিয়ে ছেঁড়া কাঁথা হাজার টাকার হাঁক ছাড়ে॥
যাহার কর্ম তাহার সাজে অন্য জনার লাঠি বাজে,
বল্লে যে ওই অন্যায় কথা আজকে যে এই সভার মাঝে॥

বেজের পোহানার লেজ বেরালে তাকে কি আর কুম্ভীর বলে।
হয় না সমান তেলে জলে জগত মাঝারে ॥
নিমের পাতায় গুল্লে চিনি মিস কি আর হবে।
তিক্ত গুণ তার যায় গো বেড়ে জানে সর্বজনে ॥ —মুর্শিদাবাদ

২

পুরুষ— দুমালা নারকেলের নারু রোজ দুবেলা খায়।
বাসী হলে উপবাসী রব দুজনায় ॥
নারী— প্রেমে বিসর্গ প'ল উপসর্গ কেন এল,
মন আমার জ্বলে গেল মরি যাতনায়।
জানিহে তোমার ছলনা অজানাতো নাই ॥
পুঃ— বিশ্বাস করেছিলাম আশ্বাস দিলে
নিমেষের নিঃশ্বাসে তুমি ভুলে গেলে।
নারী— পুরুষের মন জানি জানি এক মনই টানাটানি ॥
পুরুষ— তাইতে বুঝি অভিমানী মনে তোমার নাই ॥
বিজনে জীবনের জালা জুড়াব, ভাই ॥
নারী— কত তোমার বয়স হলো আমায় বল খুলে,
তবে তোমায় বাসব ভালো মনে যদি মিলে।
পুঃ— খাইগো আমি গাঁজাগুলি
শুন শুন রসের কলি
অরসিকে মন মজালি ভেবেছ কি তাই।
প্রেমের দায়ে ধরেছিল শ্রীমতীর পায় ॥
নারী— ভাব সাগরে ডুবলে খবর কিগো রাখ
নিশার ঘরে মেঝে জুড়ে চোখ ধরে কি থাক।
পুরুষ— তাতে তোমার তা হলে না প্রেমে তোমার থা মিলেনা,
তুমি তো তা হলে না বুঝনা সময়,
বাজে বাজে কেবল দিন বয়ে যায় ॥
পুরুষ— তুমি আমার ছাঁচি পান তোমায় পেলে বাঁচি,
একবার হও কাছাকাছি সারাবে অরুচি।

নারী— যেথায় সেথায় মাতায় বলো, প্রেমের মর্যাদা ভুল
নয়ন দুটি ঢল ঢল মন মাতায়॥
আর রব না, বঁধু, দূরে সরে যায়॥
পুরুষ— ভালবাসায় লাগে নাকো কোন ভালবাসা।
প্রেম কি হয়রে শুধু যার নাই নিশা।
খোদা বকস প্রেমে পড়ে জ্বেলেছে জহর কাহরে।
নারী— হরিনামের লহরে ভেসে ভেসে যায়,
মূলেতে ভালবাসি হরিগুণ গায়।
পুরুষ— বঙ্গের ভালবাসা আশা ভঙ্গ তরে,
প্রেম তরঙ্গে দূরে যায় সরে॥
নারী— খল কপোট কর নাকো, আসলেতে মতি রাখ,
পুরুষ— ঘনশ্যামে চিনে না কে একবার ডাক যদুরায়।
কুমতি বলে হরি হরি হরি বলা চায়॥ —ঐ

৩

নারী— পরের সঙ্গেতে পিরীত করে বেশী দিনতো রয়না।
মনের কথা মনে মেরে হেরে হই আধখানা॥
পুরুষ— শুন বলি, চাঁদের কণা, তুমি আমায় পর ভেব না,
বুঝি আমার রসে মন ভিজে না মিছে দাও গঞ্জনা।
নারী— সেদিন তুমি কথা দিয়ে কোথা ছিলে কারে নিয়ে,
করি কি আমি রাত জাগিয়ে, তারতো খবর রাখ না॥
পুরুষ— ভুল ভেবোনা, ও প্রেয়সী, ভুলতে নারি মুখের হাসি,
নয়ন দুটি ভালবাসি তুমি আমায় ভালবাস না॥
নারী— তুমি আমার প্রেম-কাটারি তোমার বিচ্ছেদে প্রাণে মরি,
রাতে তোমায় ভুলতে নারি দিনে ভাল লাগে না॥
পুরুষ— ইলেকট্রিক লাইট জ্বেলে বসব দুজনে খাস মহলে।
তুমি তখন ঘুমিয়ে পড়লে ছেড়ে কিন্তু ছাড়ব না॥
নারী— বাজে কথায় দিন কাটালে দিব বলে নাহি দিলে,
সাবান তেলে ফাঁকি দিলে গাছি চুড়ি এলো না॥

পুরুষ— এই আকালে যদি বাঁচি তোমার প্রেমে নাই অরুচি,
টাটকা ফুলেতে মৌমাছি বসে কিন্তু উড়ে না ॥

নারী— সাঁওতালী মাগরী নিব তবে কালকে কথা দিব,
তোমার মতো কত পাব অভাব তো রবে না ॥

পুরুষ— ঘনশ্যাম গায় পাঁচালী সুরে তালে ফুটায় কলি,
বদন ভরি বলুন হরি, নারীর সঙ্গ ছাড়ি না ॥ —মুর্শিদাবাদ

৩

নারী— (পোড়ার) সংসারে মনতো টিকেনা।
চৈতের খড়ায় শুকিয়ে গেছে মোর জোড়া বেদানা ॥
আজ দেব কাল দেব বলে মাসের পরে মাস কাটিলে,
এবার তুমি বল খুলে দেবে কি দেবে না ?

পুরুষ— পটোল গেল পচা লেগে, কেবল মলাম রাত্রি জেগে।
কত খাটি তোমার লেগে, তবু বলতো পেলাম না ॥

নারী— ওগো, এইটুকু মোর মনের আশা, নেবে নভরি হার কানে পাশা।
খাঁটি কথা নয় তামাসা, জেনে রাখো না।

পুরুষ— এই পটোল তুলিয়ে কানে দেব দুল দুলিয়ে।

নারী— সাতই বৈশাখ ভায়ের বিয়ে যেন ভুলে যেও না ॥
ঐ তো তোমার স্বভাব ধারা শুধালে দাও মাথা নাড়া।
একখান কাপড আঁচল ছেঁড়া পরা চলে না ॥

পুরুষ— বল্লে ভাল কথা, তোমার দায়ে যাব কোথা,
আমার দ্যাখ, ছেঁড়া ছাতা ছায়া মেলে না ॥

নারী— এখন বিছানা কর কেন ? ঘরে বিছা ভেন ভেন।
উন ভাতে ক্ষিদে দুনো, খেয়াল রাখো না ॥

পুরুষ— ঘরেতে মেয়ে সেয়ানা তাইতে-গো দুখান বিছানা,
সেকথা মনে করোনা, আমি তা ভুলতে পারি না ॥

নারী— কচি পাতায় রস লেগেছে তাইতে মোরে ভুল হয়েচে।
কোথায় মনে মন মিলেছে, আমায় ভাল লাগে না ॥

পুরুষ— তুমি আমার শিমুল তুলো, তাইতে আমার মনটা ভুলো।
তোমার নিষেধ কথাগুলো আমার মনে থাকে না ॥

নারী— লোকের কথায় কাজ কি আছে পাছে-তে গো দেব বিছে,
পুরুষ— সরকারের রিলিফ বেড়িয়েছে, ভাবনা হবে না ॥
এই গরীবের ঘরে এসে, ফুল ফুটালে বার মেসে।
বাঁধলে মোরে প্রেমের ফাঁসে, দেখ যেন ফাঁসে না ॥
নারী— শুন আমার বাসনা যত
পুরুষ— থাক এই পর্যন্ত কর ক্ষান্ত।
নারী— আমার প্রেমের নাইকো অন্ত।
পুরুষ— তবু ভ্রান্ত গেলনা ॥
কুমারীশের কথা ধর, গুরুপদ অনুসরণা করো,
শঙ্খ চক্র গদাধর কর ভজনা ॥ —ঐ

বোলান ও পালার পাঁচালী শেষ হওয়ার পর শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য এই প্রকার রং পাঁচালী গাওয়া হয়।

৫

প্রথম পণ্ডিত—কলির ব্যাপার দেখে যায় মাথা ঘুরে।
আবার ষোল আনা উঠে গেল নয়া পয়সা এল সংসারে ॥
তোমাদের নাম কি ?
১ম পণ্ডিত—ও ভাই, আমার নামটী ঝাঁটা খেকো হয়।
২য় পণ্ডিত—আমার নামটি ভ্যাভাকান্ত সর্বলোকে কয় ॥
২য় পণ্ডিত—আমার নামটি তাইরে নারে না গো ॥
৪র্থ পণ্ডিত—আমার নামটি আছে গঙ্গার ধারে ॥
তোমাদের বাড়ী কোথায় ?
১ম পণ্ডিত—ও ভাইরে, আমার বাড়ী ড্যাংগা ডহরে।
২য় পণ্ডিত—আমার বাড়ী আঁতুর শালায় থাকি যে পড়ে।
৩য় পণ্ডিত—আমার বাড়ী গো ডহরে গো।
৪র্থ পণ্ডিত—আমি বলবো না এ আসরে ॥
তোমাদের বৌ কার কি রকম ?
১ম পণ্ডিত—ভাইরে, আমার গিন্নী ঘর আলো করে।
২য় পণ্ডিত—আমার গিন্নী কয়লার মত ঘর আলো করে।
৩য় পণ্ডিত—আমার গিন্নী তালগাছের সমান।

৪র্থ পণ্ডিত—গিন্নি খেয়ে আমায় ফিরার করে।

তোমাদের কাজ কি ?

১ম পণ্ডিত—ভাইরে, আমি গাধার গা ধোয়াই ভাল।

২য় পণ্ডিত—আমি গিন্নীর চরণ সাধন করি জ্বেলে যে আলো॥

৩য় পণ্ডিত—আমি কাজটি করি চৌকিদারী গো।

৪র্থ পণ্ডিত—আমি কাজ করি শুঁড়ির ধারে॥

তোমাদের লেখাপড়া কতটুকু ?

১ম পণ্ডিত—ভাইরে, আমি লেখাপড়ায় বড় মন্দ নয়।

২য় পণ্ডিত—আমি ক লিখিতে কলম করি চুরমার।

৩য় পণ্ডিত—আমি শিশুমতির টোলে পড়ি গো।

৪র্থ পণ্ডিত—আমি পড়েছি গো ডহরে॥ তোমরা কি জাত ?

১ম পণ্ডিত—আমার জাতভাই পায়খানায় ঘোরে।

২য় পণ্ডিত—আমি জুতো সেলাই করে থাকি বাজারে।

৩য় পণ্ডিত—আমি হই বোম্বাই ধোপা গো,

৪র্থ পণ্ডিত—আমি বেড়াই গো গঙ্গার ধারে।

তোমরা কেমন মরদ (বীর) ?

১ম পণ্ডিত—আমি মরদ বড় মন্দ নয়।

২য় পণ্ডিত—মশার সঙ্গে যুদ্ধ করে ঘরের ভিতর রই।

৩য় পণ্ডিত—টিকটিকিকে তাড়িয়ে ধরি গো।

৪র্থ পণ্ডিত—আমায় ইঁদুরে লাথি মারে॥

তোমাদের দেশের অবস্থা কেমন ?

১ম পণ্ডিত—আমাদের দেশের এমনি রীতি কুলাই নাগো মান।

২য় পণ্ডিত—আমাদের দেশে জল বেগরে পুড়ে গেল ধান।

৩য় পণ্ডিত—আমাদের দেশে গম হয়নি গো,

৪র্থ পণ্ডিত—শুকিয়ে মরি হা করে।

১ম পণ্ডিত—ওগো এই পর্যন্ত সাঙ্গ করি গান।

২য় পণ্ডিত—ঢেলার ভুঁয়ে হুটরে পড়ে কেটে গেল কাল।

৩য় পণ্ডিত—আমি ঘুমের ঘোরে ঘুরে বেড়াই গো।

৪র্থ পণ্ডিত—বাতিকে এলাম আসরে॥ —বেলডাঙ্গা (মুর্শিদাবাদ)

সর্বনেশে আকাল এসে, কি কাণ্ডটাই করাল দেশে।
কল না থাকলে যে গম পিসে, মরতো মা বহিন ॥
খাবার বলতে আর না ছিল কচুর ঝাল আর রুটি পালো,
গরীব লোকের মরণ ভাল, দেয়নি কেহ ঋণ ॥
কচুর ঝাল আর ভিন্ন, বহুদিন মেলেনি অন্ন ॥
দেহ ভুটি অন্নের জন্য জলশূন্য ঠিক মীন ॥
যতই দুঃখ যাক না কেন, কিছুই আর আসে না মনে।
মনে হয় রাস্তা দরশনে, দুঃখ সুখের অধীন ॥
সতীশের রচনাবলী জানাই হয়ে কৃতাঞ্জলি।
দেন অধমে পদধূলি কি নবীন প্রবীণ ॥
কমলাকান্ত নামটি ধরি, ডাক নাম হয় পথকুড়ি।
বলুন সবে হরি হরি, শেষ হল এ 'সীন' ॥ —ঐ

৮

আয় আয় দেখসে তোরা নূতন বোয়ের গুণটা।
বিয়ের রাতে বাসর ঘরে মলে দেয় যে কানটা ॥
বৌ আমাদের লক্ষ্মী ভালো আসতে মিলতে বাবা মলো।
আবার তার বড়দাদা কাণা হল, মায়ের হল দুখটা ॥
বৌ আমাদের ভাত রাঁধিলে মিশায় না গো জলে চালে।
কতকগুলো গলে পুড়ে, কতক থাকে চালটা ॥
বৌর এমন রন্ধনের ছটা, অম্বলে দেয় পুঁইয়ের ডাঁটা।
আবার সজান সাজের ল্যাটাপাটা পায়েসে দেয় নুনটা ॥
বৌ আমাদের বাঘের মাসি, ঘুমিয়ে থাকে দিবানিশি।
আবার ডাকলে কহে সর্বনাশী, ভাঙিয়ে দিলি ঘুমটা ॥
এক পক্ষের বৌ হেলা-ফেলা, দু-পক্ষের বৌ গলার মালা।
আবার তেজ-পক্ষের বৌ সিকেয় তোলা,
পা ধুয়ে খায় জলটা ॥ —মুর্শিদাবাদ

রতন ঠাকুরের পালা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' (৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা) 'রতন ঠাকুরের পালা' নামে একটি পালা গান প্রকাশিত হইয়াছে (পৃ. ৩২৩—৩৩৭)। ইহাতে রতন ঠাকুরের সঙ্গে এক মালীর কন্যার প্রেমের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমাংশ এই প্রকার—

চান্দের বাগের ফুল না রে সুরজে দিলাইন দড়ি।
এই না ফুল দিয়া আমি মালাখানি গাঁথি॥
গাঁথিতে গাঁথিতে রে মালা, মালা আরে মালঞ্চ উজাড়।
এই না মালার নাম আমার বসন্তবাহার।
শতেক না চম্পা ফুলে আরে গাঁথলাম মালা।
মধ্যে মধ্যে দিছি ফুল কালা না রে ধলা —মৈমনসিং

রম্য-সঙ্গীত

রঙ পাঁচালী জাতীয় গানকে কোন কোন সময় রম্য-সঙ্গীতও বলে। বলা বাহুল্য রম্যগীতি বলিয়া আধুনিক সঙ্গীতে যে একটি কথা আছে, ইহা তাহা হইতে স্বতন্ত্র।

ভাই—দাদাগো শোন না, এক সাথে আর থাকব না।
দাদা—কেন রে তুই পৃথক হবি তাই আমারে বল না।
ভাই—দুজনাতে যুক্তি এঁটে, তোমরা আমাকে চাও ফাঁকি দিতে,
দাদা—কি ফাঁকি দিলাম তোমাকে কথা খুলে বল না।
বড় বৌ—ঠাকুরপোর আর কি দোষ আছে কান ভাঙ্গাচ্ছে দিনে রাতে,
ছোট বৌ—তুমি কেন বাধছ, ওতে ওদের হচ্ছে তাই হোক না।
ভাই—কেন, দাদা, বৌদির নামে কিনলে জমি গোপনে,
দাদা—একথা তো সবাই জানে বড় বৌয়ের টাকায় কেনা।
বড় বৌ—বাবার টাকায় কিনলাম জমি তার কেন ভাগ দিব আমি,
ছোট বৌ—চুলচিরে ভাগ করবো আমি বাবার বললেও ছাড়বো না।
ভাই—তোমার বিয়েই টাকা নিল, বাবা আজ লাটসাহেব হ'ল,
দাদা—যা বলবে তা আমায় বল নইলে ভাল হবে না।

বড় বৌ—তুমি ছুটকির ফুঁসে পড়ে বলছ কথা গায়ের জোরে,
ছোট বৌ—তুমি ফুঁস দিচ্ছ ভাসুরে শরিক ফাঁকির মন্ত্রণা।
ভাই—মোড়লিতেও জুয়াচুরি বলতে তো বাবুগিরি,
দাদা—তোর কাজটি তো বেজায় ভারি মাঠে গিয়েও ঘুম ভাঙেনা।
বড় বৌ—দিনরাত খাটি ঝিয়ের মত, আমার কিসের গরজ এত,
ছোট বৌ—শুধু ধান ভানতে নাড়ার মজবুত পাড় দিতে ভিড় না।
ভাই—খরচা করে পড়লে তুমি, সে সব টাকা পাব আমি,
দাদা—তোর জন্ম দিলাম আমি দুশো টাকা জরিমানা।
বড় বৌ—রেঁধে তোমায় দিলাম খেতে, রাঁধার খরচা হবে দিতে,
ছোট বৌ—তোমরা খেলে দুজনাতে আছে একজনের পাওনা।
বড় বৌ—একা খাটলাম তোমার বিয়েই তার মজুরীও নিব ধরিয়ে,
ছোট বৌ—তোমার বাপ-মা গেল খেয়ে, তখন তো ওর কেউ ছিল না।
ভাই—মগরী আইন আমার কাছে, ভাগ নিব এই মুগুর ভেঁজে,
দাদা—কথা শোন, ভাই, আমার কাছে ভাগ বাদে যোগ কর না।

এইবার যোগের কথা বলি শোন, যোগে মিলে অমূল্য রতন।
যোগ বলে হয়ে বলীয়ান, লাভ করা যায় যে ভগবান,
যে যোগ করে মুনি ঋষিবর।
যোগ করে বিয়োগ জয় করে, বলে জানাই প্রকাশ করে,
দেবাদিদেব ভোলা মহেশ্বর।
সহযোগে বলী যারা, সব কাজই জয় করে তারা,
পরিচিত হয় না কোন দিন।
এই সহযোগ নাই যাদের, অন্যেরা কি আর পারে তাদের,
যারা যোগ রাখিছে চিরদিন।
যোগেতে হয় সংসার গঠন, যোগ ছাড়িলে দেহের পতন,
যোগে যোগ ক্রমে বৃদ্ধি হয়।
তাই যোগ থেকে ভাগ করলে পরে, ক্রমে যাবে নিম্নস্তরে,
একথাটি মিথ্যা কভু নয়।
তাই যোগ কর ভাই, যোগ কর।
ভাগ হলেই বিয়োগ, তারপর যোগ কর ভাই, যোগ কর।

ভাই—মুখের কথায় হয় নাকো যোগ, কর্ম করা চাই।
কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি, তারা হয় যোগের বাদী,
আগে তাদের দমন করা চাই।
যোগ করিতে ইচ্ছা যদি, হতে হবে সত্যবাদী,
নিরবধি সৎপথেতে চল।
তবে ভোগ করবে যোগের ফল, নতুবা সব হবে বিকল—
ভাব কথা আসল কি নকল, এযোগ যোগে যাগে চলবে না,
যোগফলকে সমান রেখো না, যোগে যাগে চলবে না।
বড় বৌ—এসো, বোন, আমরা দুজনে, যোগ করে নিই প্রাণেপ্রাণে।
ছোট বৌ—এ যোগ থাকে যেন জন্মে জন্মে, ভাগ যেন আর করো না।
—মুর্শিদাবাদ

রয়াণী গান

পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ জিলায় মনসা-মঙ্গলের পালাগানকে রয়াণী গান বলে। রয়ানী শব্দটিব উৎপত্তি লইয়া মতবিরোধ আছে। কেহ মনে করেন, রাত্রিতে এই গান গাওয়া হয় বলিয়া রজনী শব্দ হইতে ইহার রয়াণী নামের উৎপত্তি হইয়াছে, আবার কাহারও কাহারও মতে রয়াণী যাত্রা শ্রেণীর গান বলিয়া যাত্রার অর্থ যখন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে রওয়ানা হওয়া, সেই সূত্রে ইহার নাম রয়াণী গান হইয়াছে। যাত্রাকে পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষায় রওয়ানা বলে; সুতরাং যাত্রা গান অর্থেই রয়াণী গান শব্দটির উদ্ভব হইয়া থাকিবে।

রয়ানী গান বরিশালের একটি অপরিহার্য পারিবারিক অনুষ্ঠান। পুত্র-কন্যার বিবাহের পুর্বে যে যাহার সঙ্গতি অনুযায়ী এক মাস, সাত দিন, আড়াই দিন কিংবা অন্তত একদিনের জন্য হইলেও রয়াণী গানের অনুষ্ঠান করে। নতুবা বরকন্যার লখীন্দর-বেহুলার পরিণতি লাভ করিতে হয় বলিয়া বিশ্বাস। রয়াণী পূজায় মনসা-মঙ্গলের কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রগুলির বিভিন্ন আকৃতির মৃৎপ্রতিমা নির্মিত হয় এবং তাহাদের যথারীতি পূজা হয়। পূজার সময় রয়াণী গান হয়। রয়াণী গানের ব্যবসায়ী দল থাকে, স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে মিলিয়াই গান করে। গানের বিষয় মনসা-মঙ্গল (মনসা মঙ্গল বা মনসার গান দেখ)।

রাখালী সঙ্গীত

যে প্রেম-সঙ্গীতের নায়ক রাখাল তাহাকে রাখালী গান বলে। শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ লীলা অবলম্বন করিয়া এই গানে অতি সহজেই শ্রীকৃষ্ণের নাম আসিয়া প্রবেশ করে। তবে বাংলার যে অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব অল্প, কেবলমাত্র সেই অঞ্চলেই ইহার মানবিক পরিচয়টি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে।

১

ঠাকুর বাড়ীর কাল তুলসী আগা ঢলমল করে।
প্রাণনাথ চাকরি নিয়ে আমার মরণ।
লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে করিব ধারণ॥
আগচোয়ারা চাকচোয়ারা চাকের বাঁধা ঘাট।
সেখানে কিষ্ট ঠাকুর স্নান করে খেল কদমের গাছ॥
খেলের আলা বেলের ডালা খেলের চিকিমিকি,
শ্যামনগরে পুছতে গেলাম রাধা বিনোদিনী॥
কিষ্ট হে ঠাকুর কিষ্ট ভেকুর কিষ্ট লোকের সখা,
সে কিষ্ট না বুঝিলে লোকে বলে ক্যাশা॥
আর ডাকো না কাল কোকিল শ্রীরাধা রাধা বলে।
তুমি সদাই ডাক রাধা রাধা আর নাম নাই গোকুলে॥—রাজসাহী

২

আমি যে গরুর রাখাল মাঠে মাঠে থাকি।
বাঁশরী বাজায়ে মোরা পালের গরু বাছুর ডাকি॥
তুমি ত যে রাজার কন্যা
আমি ত যে গরুর রাখাল মাঠে থাকি।
বাঁশরী বাজায়ে মোরা গরু বাছুর ডাকি॥
জানতে পারলে আমার মাথা কাটবে তোমার বাপেরে।
পরাণ কাঁদে, রাখাল বন্ধু রে॥ —ঐ

৩

প্রাণসখি রে, ঐ শুন, বাবলা বনের ফাঁকে ফাঁকে
বাঁশরী বাজায় কে।

বাঁশী বাজায় কে রে, সখি,
মাথার বেণী বদল কৈরে তারে এনে দে।
প্রাণ সখি রে, ঐ শুন কদম্ব তলায় বাঁশী বাজায় কে।
ঐ বাঁশীর সুরে মোর প্রাণ কাঁদে॥
তার লাইগা আমার পরাণ পোড়ায় যে।
প্রাণ সখি রে, পরাণ বঁধুরে কাছে এনে দে॥ —ঐ

৪

প্রথম দল— কার বেটা কার নাতি
তুমি ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছ কুতি?
দ্বিতীয় দল—উত্তর দেশে কোসাকুসি দক্ষিণ দেশে পান।
তোমার ভগ্নীক বিয়ে করে ভুলি গেলাম দান।
থাল পা'লাম, ঝারি পা'লাম, আর পা'লাম গাই।
গরু চরাণের রাখাল নিব তোমার দুটি ভাই। —ঐ

রাজকন্যা ও আন্ধা বন্ধুর পালা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'পুর্ববঙ্গ গীতিকা' (৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা)য় এক রাজকন্যা এবং তাহার অন্ধ প্রণয়ীর কাহিনী গীতিকার আকারে বর্ণিত হইয়াছে (পৃ. ১৮৫—২০৭)। ইহার সূচনা এই প্রকার—

ভিক্ষা দাও গো, নগরবাসী, তোমরা সকলে।
খাড়া হইল আন্ধা বন্ধু, রাজার তুল দুয়ারে॥
ভোর গগনে থইয়া মেঘ রে সিন্দুর তার গায়।
রাজপন্থে কোন বা জনে বাঁশীটি বাজায়॥
দূর গাঙ্গের কূলে খাড়াইয়া আছিল ভালা লিলুয়া বয়ার।
শুন্যা সে বাঁশীর গান লাগিল চমৎকার॥

রাজা তিলক বসন্তের পালা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, 'পুর্ববঙ্গ গীতিকা' (৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা)য় 'রাজা তিলক বসন্ত' নামে একটি গীতিকা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা

পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চল হইতে সংগৃহীত। ইহাতে রাজা তিলক বসন্তের উপর এক অতিথির অভিশাপ এবং পরে তাহা হইতে মুক্তির বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমাংশ এই প্রকার—

১

ওরে ও দূরের নদী উজান বইয়া যা।
উজান বইয়া যারে নদী ভাট্যাল বইয়া যা॥
সেই না নদীর পাড়ে আছিল রাজা ভারী মহাজন।
তিলক বসন্ত নাম রূপে গুণে অনুপম॥
তার কথা শুন দিয়া মন রে, ওরে নদী, উজান বইয়া যা॥

রাজা রঘুর পালাগান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' (৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা)য় রাজা রঘুর পালা নামে একটি পালাগান সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাতে মৈমনসিংহ জিলার উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত গারো পাহাড়ের নিম্নে সুসঙ্গ নামক স্থানের রাজা রঘুর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে (পৃ. ৭৩—৮৯)। কাহিনীর প্রথমাংশ এই—

১

শুত্যা আছিল ধার্মিক রাজা রে, আরে রাজা, বার বাংলার ঘরে।
রাণীর লাগিল রাজা রে, আরে রাজা, উফর ফাফর করে॥
কই গেলা গো কমলা রাণী, এ গো রাণী, ফালাইয়া আমারে।
আন্ধুয়া তুকি বাইয়া মরি গো, এ গো রাণী, বিচরাইয়া তোমারে॥

—মৈমনসিং

ইহাতে সুসঙ্গের রাজা ও তাঁহার মহিষীর মৃত্যুর পর তাহাদের শিশুপুত্রকে কি ভাবে জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান ঈশা খাঁ হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তারপর তাহার গারো প্রজারা এক রাত্রিতে তাহাকে সেখান হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

রাণীহাটি, রেণেটি

বাংলা কীর্তন গানের বিশিষ্ট একটি ঢং-এর নাম রাণীহাটি বা রেণেটি। প্রাচীন সপ্তগ্রামের অন্তর্গত রাণীহাটি নামে একটি পরগণা ছিল, সেখান হইতেই

কীর্তন গানের এই রীতিটি উদ্ভূত হইয়া সর্বত্র প্রচার লাভ করে বলিয়া ইহার নাম রাণীহাটি বা রেণেটি বলিয়া মনে করা হয়। বর্তমানে বর্ধমান জিলায় রেণেটি নামক একটি গ্রাম আছে। তাহার নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী বিপ্রদাস ঘোষ এই ধারাটির প্রচলন করিয়াছিলেন বলিয়া ধারণা।

১

তোরা দেখ্‌সে আসি ব্রজবাসী ব্রজাঙ্গনা,
এসেছে ঠিক যেন সেই কেলেসোনা।
রাধা রসে পোরা এমন পোরা আর দেখ্‌বি না ;
তেমনি গোরার আঁখির ভুরু, তেমনি রামরম্ভা উরু,
তেম্নি ওর মনচোরা কটি সরু,
যেমন ব্রজে ছিল নন্দ-নন্দন, তেম্নি যত অঙ্গগঠন, কাঁচা সোনা
করে ধ্বনি রা রা রা, যুগল চক্ষে শতধারা,
ধা বলে অধর হ'য়ে পড়ে ধরা,
মুখে হারাই! হারাই! ধ্বনি, কি ধন হারায়ে ধনীর এ যন্ত্রণা।

রামপ্রসাদী গান

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন রচিত শাক্তপদাবলী যে সুরে গাওয়া হয়, তাহাকে রামপ্রসাদী সুর বলে, তাহাকে রামপ্রসাদী গান বা মালসী গানও বলে (পূর্বে মালসী গান দেখ)। আগমনী-বিজয়ার বিষয়-বস্তু লইয়া তিনি যে গান রচনা করিয়াছেন, তাহাকে আগমনী-বিজয়া গানও বলে। তবে রামপ্রসাদী গান বলিতে রামপ্রসাদ (দ্বিজ বা বৈদ্য) রচিত শাক্তপদাবলী মাত্রই বুঝায় (পরে শাক্তপদাবলী দেখ)। তবে রামপ্রসাদের আদর্শ অনুসরণ করিয়া অন্যান্য পল্লী কবিও যে সকল গান রচনা করিয়াছেন, তাহাদিগকেও রামপ্রসাদী গানই বলে। নিম্নে এই শ্রেণীর দুইটি গান উদ্ধৃত হইল।

১

মা আমার সাজাইলে রাখাল, ঘাড়ে গামছা হাতে লাঠি মা,
চরাই আমি ছয় ধেনুর পাল, মা, আমায় সাজাইলে রাখাল,
গেদে গেদে ভুসি দিলাম, মা, তাতে দিলাম ছয় ঘড়া জল,

তবু বেড়া ভেঙ্গে খেতে যায়, মাগো, মড়লদের পোয়াল,
মা, আমায় সাজাইলে রাখাল। —মুর্শিদাবাদ

২

আমি কেবল প্রেমভিখারী।
চাই না সুকেশা সুন্দরী নারী॥
চাই না মুক্তি, চাই না ভুক্তি, চাই না অট্টালিকা পুরী।
চাই না গুরু বাবুগিরি, চাই না তুচ্ছ জমিদারী॥
হব না ভুপ, চাই না স্বরূপ, চাই না সুন্দরী কুমারী।
যদি সে ধন দেহ যায় সন্দেহ যাতে উদাসিনী কৌমারী॥
চাই না পুণ্য, চাই না স্বর্ণ, খাইব অন্ন ভিক্ষা করি।
চাই না তীর্থ ভ্রমণ যশোকীর্তন, অক্ষয় জীবন চাই না হরি॥
ব্রহ্মত্ব ইন্দ্রত্ব চাই না, শিবত্ব পদ তুচ্ছ করি।
দেহ সদানন্দের আনন্দের ধন, মহানন্দের চরণতরী॥ —ঐ

রামায়ণ গান

রামায়ণের বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়া পাঁচালীর সুরে যে সুদীর্ঘ আখ্যায়িকা-মূলক গান গাওয়া হয়, তাহাকে রামায়ণ গান বলে। রামায়ণ গানকে শ্রীরাম-পাঁচালীও বলে। আনুষ্ঠানিক ভাবে আসরে একটি ঘট স্থাপন করিয়া একজন মূল গায়েন চামর মন্দিরা হাতে লইয়া এবং পায়ে নূপুর পরিয়া দোহারের সহায়তায় সামান্য অঙ্গভঙ্গি করিয়া মঙ্গল গানের সাধারণ রীতি অনুযায়ী রামায়ণ গান গাওয়া হইয়া থাকে। সাধারণত বাড়ীতে শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠানে কিংবা দুর্গোৎসবের সময় রামায়ণ গান হয়। কোন কোন সময় বিভিন্ন পালায় বিভক্ত এই গান এক মাসেও শেষ করা হয়। একটু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

ধুয়া— তোমরা দুই ভাই নবীন ধনুকধারী রে,
লব রে তোদের মা কে?

পয়ার— রাম—রাম বলে বল, লব দু'ভাই,
তোমাদের পিতামাতার নাম বটে কি?

লব— অকালেতে মা মরেছে বাপে নাহি জানি,
আমার বাপের নাম জানেন বাল্মীকি মুনি।

আমার বাপের সৃষ্টি আমার জন্মের সমান,
আমার বাপের গায়ের লোম যত দেবগণ।
যোগী জপে যোগে যারে ঋষি জপে মনে,
আমার বাপের নাম জপে এ চৌদ্দ ভুবনে।
আমার বাপের নাম নিলে যত পাপ হরে,
পাপী হয়ে তত পাপ করিতে না পারে।
তোমার পাপে পিতা পিতামহ যতজন ছিল,
আমার বাপের নাম করি পরম ধামে গেল।
তারা সবে মুক্তি পাইল আমার বাপের গুণে,
অশ্বমেধ যজ্ঞ কর কি কারণে।

রাম— হেন বাপের বেটা যদি বটে দুইজন,
রাজ্য অট্টালিকা বিনা কেন কানন ভ্রমণ।
তৈল কেন গায়ে নাই উড়িতেছে খড়ি,
অন্ন বিনা গাত্র মাংস হয়ে গ্যাছে দড়ি।

লব— তুমি কেন বনে গিয়াছিলে হয়ে রাজার বেটা,
স্বর্ণ মুকুট খুলে রাখি আবার ধরিলে জটা।
তব পিতা পিতামহের কিবা নাম,
শুনে তাহাদের কথা কহিলেন রাম।
মোর পিতা পিতামহ জানিলা কেমনে,
লব বলে বাহান্ন পুরুষ জানি রাজাগণে।
অজ নামে রাজা ছিল বড় বলবান,
অজ বলিতে হয় তোমার পিতামহের নাম।
বড় বলবান রাজা জান নামের ফলে,
অজ শব্দে সর্বকালে ছাগলেরে বলে।
দশরথ তার নাম কহিলেন রাম।
লব বলে কোন দশরথ হন তিনি।
লোক মুখে বহু দশরথের কথা শুনি॥
রাম বলে এক বই দশরথ নাই।
কেহ বলে বহু রাম মোরা শুনিতে পাই॥

এক দশরথের মোরা জানি আত্মমূল।
ভৃগুরামের শরা সম বহে মাথায় চুল ॥
অন্ধ পুত্র সিন্ধু যেই বিনাশিল শরে।
আর দশরথ তার বুদ্ধি হল নাশ।
স্ত্রীর বাক্যে পুত্র বধূ দিল বনবাস ॥
আর দশরথের বুদ্ধি বড়ই পাগল।
পুত্রধনে বনে দিল কথার বড় রস ॥
রাজা হয়ে হয়েছিল সে রমণীর বশ।
রাম বলে, নাহি বল আমার নন্দন।
যমজসম চিহ্নরূপ উভয়ে মিলন ॥
লব বলে, মহারাজ, বিজ্ঞ শিরোমণি।
বড়ই আশ্চর্য কথা তব মুখে শুনি ॥
সূর্য বংশে দশরথ গৌর বরণ।
দুই বর্ণে হইল তার চারিটি নন্দন ॥
পিতৃসম বর্ণ চিহ্ন যদি পুত্র হয়।
তবে বুঝি চারি ভাই এক বাপের হয় ॥
রাম বলে, শিশু হয়ে কটু বল কেনে।
আমি ক্রোধ করিলে কে বাঁচে ত্রিভুবনে ॥
আমার সম জগতে কে আছে বলবান।
শিশুকালে তাড়কার বধেছি পরাণ ॥
লব বলে তাড়কা আইলো বৃদ্ধা জরা।
হুঁচট দিয়া পড়ে সেই প্রাণে হইল সারা ॥
দুর্বল হইল অতি জীবন সংশয়।
তার উপর বাণ ছাড়া কর্তব্য না হয়।
রাম বলে, করিয়াছি পাষাণে মানবী,
লব বলে, হায় হায়, আমি তাই ভাবি ॥
অহল্যা পত্নী যদি পদে তরিয়াছে।
তৃণ আদি গুল্ম লতা তারা কেন আছে।
চৌদ্দ বৎসর দুটী ভাই ভ্রমিল কাননে।

পাদপ পাথর কত ঠেকিল চরণে ॥
তারা যদি মানব হইত মহাশয়।
যত বল তবে সে পতিত মাত্র হয় ॥
এত যদি প্রাণ দিতে পারহ পাষাণে।
লক্ষ্মণ পড়িল রণে না বাঁচালে ক্যানে ॥
রাম বলে, ধনুক ভাঙ্গিলাম সবে জানে।
লব বলে, খুঁতা ধনু জারিল সে ঘুণে।
রাম বলে, বলির বধিনু আমি প্রাণ।
লব বলে, চুরি করে হইল বলবান ॥
রাম বলে, নির্বিঘ্নে বেঁধেছিনু সেতু।
লব বলে, বটে, তাহে নল ছিল হেতু ॥
রাম বলে, নির্বিঘ্নে জয়ী লঙ্কা ধাম।
লব বলে, নাগপাশে বদ্ধ কোন রাম ॥
কোন রামে হয়েছিল বিষ বরিষণ।
শক্তিশেলে অচেতন সে কোন লক্ষ্মণ ॥
মন্ত্রণায় বিভীষণ বলে হনুমান।
ইহারাই ছিল লঙ্কায় তোমার হল নাম ॥
রাম বলে, শিশু তোরা না জান কারণ।
ইচ্ছা নাহি করি উভয়ের সঙ্গে রণ ॥
শিশু বলি মোর মনে দয়া উপজিল।
হাস্য করি দুই ভাই তার উত্তর দিল ॥
কায়মন-প্রাণ রাখি রাখিব চরণে।
রামানন্দে হরিধ্বনি করুন সর্বজনে ॥ —বীরভূম

রামযাত্রা

রামায়ণের কাহিনীকে যাহাতে যাত্রা বা লোকনাট্যের আকারে গীতবাদ্যসহ পরিবেষণ করা হয়, তাহাকে রামযাত্রা বলে (যাত্রাগান দেখ)। তাহাতে বিভিন্ন চরিত্র আসরে অবতীর্ণ হয় এবং তাহাদের মাধ্যমে শিথিল গদ্য সংলাপ এবং সঙ্গীতের মধ্য দিয়া কাহিনী অগ্রসর হইয়া যায়। হনুমানের চরিত্র কৌতুক

রসের সৃষ্টি করে। উনবিংশ শতাব্দীতে যখন মধ্যযুগের ভক্তিভাব জনসাধারণের হৃদয় হইতে বিদূরিত হইয়া গিয়াছিল, তখনই প্রধানত কলিকাতার নাগরিক সমাজকে অবলম্বন করিয়া রামযাত্রার উদ্ভব হইয়াছিল। বর্তমান যুগে ইহাদের জনপ্রিয়তা হ্রাস পাইয়া গিয়াছে।

রূপবতীর পালাগান

'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় রূপবতীর পালাগান নামে একটি গীতিকা (ballad) সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার কাহিনী এই—

রামপুরের রাজার নাম রামচন্দ্র; তাঁহার একটি মাত্র কন্যা রূপবতী। বালিকা কন্যা গৃহে রাখিয়া রাজা কার্যোপলক্ষে মুর্শিদাবাদ নবাব দরবারে গেলেন। বৎসরের পর বৎসর কাটিতে লাগিল, তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন না। দেখিয়া রাণী তাঁহার নিকট একটি পত্র লিখিলেন—কন্যাকে আর অবিবাহিতা রাখা যায় না; দেশে ফিরিয়া তাহার বিবাহের একটা ব্যবস্থা করিবার জন্য পত্রে তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করা হইল। পত্র পাইয়া রাজা দেশে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু তাঁহাকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখা যাইতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিয়া রাণী জানিতে পারিলেন, তাঁহার পত্রখানিই কাল হইয়াছে—নবাব পত্রখানি দেখিতে পাইয়া কন্যাটিকে তাঁহার হস্তেই সমর্পণ করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। শুনিয়া রাজার আহার-নিদ্রা দূর হইয়াছে। রাজা প্রতিজ্ঞা করিলেন, পরদিন ঘুম ভাঙ্গিয়া যাহার মুখ প্রথম দেখিবেন, তাহার হস্তেই কন্যাদান করিবেন, তারপর যাহা হয় হইবে। শুনিয়া রাণী মদন নামক তাঁহাদের এক রূপবান্ যুবক কর্মচারীকে পরদিন রাজার শয়ন-গৃহের দ্বারে উপস্থিত থাকিতে বলিলেন। প্রভাতে তাহার মুখই প্রথম দেখিতে পাইয়া রাজা তাহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তাহাদের ভোগের জন্য একখানি গ্রাম লিখিয়া দিলেন।

এই কাহিনীর একটি পাঠান্তর আছে, তাহাতে ইহার শেষাংশ এইরূপ—নবাবের নির্দেশ মত রাজা তাঁহাকেই নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে কন্যা সম্প্রদান করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। রাণী ইহার পূর্বেই একদিন নিশীথরাত্রে গোপনে মদন নামক তাঁহাদের এক যুবক কর্মচারীর হস্তে কন্যাকে সম্প্রদান করিয়া নৌকাযোগে সেই রাত্রেই দূরদেশে পাঠাইয়া দিলেন। কিছুদিন পর

মদন তাহার মাতাপিতার সংবাদ লইবার জন্য দেশে আসিয়া রূপবতীর পিতার লোকজন কর্তৃক ধৃত হইল, রূপবতীকে অপহরণ করিবার অপরাধে রাজা তাহাকে বলি দিবার আদেশ দিলেন। পরে রূপবতীর সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছে জানিতে পারিয়া তাহাকে ক্ষমা করিলেন এবং কন্যা-জামাতাকে বনবাসের জন্য বিস্তৃত জমিদারী লিখিয়া দিলেন। নবাব দরবার হইতে এই বিষয়ে আর কোনও সংবাদ আসিল না।

ইহার রচনা কবিত্ব-সমৃদ্ধ, একটু নিদর্শন—

আন্ধাইরা নিঝুম রাতি আস্‌মানে জলে তারা।
মদন আসিয়া দুয়ারে হৈল খাড়া॥
লাজেতে গলিয়া পড়ে কন্যার মাথার কেশ।
আস্তে ব্যস্তে টানিয়া কন্যা পরে নিজ বেশ॥
না আসিল পুরোহিত কুল আচরণ।
নিঝুম রাতে করে মায কন্যা সমর্পণ॥

রামলীলা ঝুমুর

পশ্চিম সীমান্ত বাংলা অঞ্চলে প্রচলিত যে ঝুমুর গান রামায়ণ কাহিনী ভিত্তিক রচনা, কিংবা রামচন্দ্র যে ঝুমুব গানের নায়ক, তাহাকে রামলীলা ঝুমুব বলে (পূর্বে ঝুমুর দেখ)।

১

শক্তিশেলে যবে পড়িল লক্ষ্মণ,
কাঁদেন শ্রীরাম রাজীবলোচন,
ভাসেন নয়ননীবে বে,
হায়রে, লক্ষ্মণ কেন রে শয়ন,
মধ্য রণে পারাপারে রে।
ওঠ ওঠ বীর, ধর ধনুক তীর,
দশশিরায় বারে বারে রে।
আজি ফিরে লঙ্কাপতি বিনাশিবে,
রিপুরক্তে কুল-কালিমা ধোয়াবে,
উদ্ধারিবে সীতায় রে॥ —বাঁশপাহাড়ী

লগ্নপত্রের গান

বিবাহের সর্বপ্রথম আচার আনুষ্ঠানিক ভাবে বিবাহের দিন স্থির করা। তাহাকে লগ্ন পত্র করা বা বিবাহের লগ্ন স্থির করা বলে। সেই উপলক্ষে পূর্ববঙ্গে যে গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা লগ্নপত্রের গান।

১

ভাগ্যবতী জামাইর বাপ পণ্ডিত পাঠাইছে,
সোহাগিনী কন্যার বাপের বাড়ী রে,
দেও, কন্যার বাপ, বিবাহের কবুল।
আছে তোমার বেটি রে, আছে তোমার ভাইস্তি রে,
দেও, কন্যার বাপ, বিবাহের কবুল।
এরে শুইন্যা কন্যার বাপ পণ্ডিত ডাকিল রে,
পণ্ডিত ডাক্যা লেখ্যা দিল তার বেটীর বিয়া রে।
বইস্যা আছে জামাইর বাপ দরবার করিয়া,
পত্র পড়িয়া দেখে তার বেটার বিয়া।

—মৈমনসিং

লাগাড়ে গান

বাংলার পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসী সাঁওতাল উপজাতির মধ্যে প্রচলিত এক শ্রেণীর গানের নাম লাগাড়ে গান। ইহা বাংলা এবং সাঁওতালি উভয় ভাষাতেই রচিত হয়। ইহা নৃত্যসম্বলিত গান। এই নৃত্যগীত বিশেষ এক একটি গোষ্ঠীর মধ্যে নিজের গ্রামেই অনুষ্ঠিত হইতে পারে, গ্রামের বাহিরে গিয়া অন্য কোন গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিত ভাবে হইতে পারে না। নাচের ভঙ্গি এবং গানের সুর পাতা নাচের (পূর্বে দেখ) ই মত। নিম্নোদ্ধৃত গান কয়টি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক চরণ কিস্কু নামক একজন সাঁওতালের নিকট হইতে সংগৃহীত।

১

এই বেলা যে এই হইল, আর বেলা যে কিবা হয়,
মনে দেখ ভাবিয়েঁ। হে, দিন দিন সময় চলিল,
পুরুষ বিষ্ণু কিবা আছে আরাধন। —বেলপাহাড়ী

২

খাবার দাবার বেলা হইল, মরিবার দিন হইল,
রাধা জীবা মনে বুঝ হে, এই বেলা করিব রোদন,
রাধা জীবা মনে বুঝ হে, এই বেলা......... । —ঐ

৩

যখন রাণী রাজা ছিল, তখন রাণী শাড়ী শাঁখা
রাজা মরিল রাণী শাঁখা খুলিবে। —ঐ

৪

কাশীপুর মহারাণী মরিল, বাবারে আগুন দিতে কেউ নাই,
হাতে আছে বালা, কানে আছে সোনা,
আগুন দিলে লিবি রে সোনা। —ঐ

৫

জামাই যাচ্ছে আগু আগু, তার পিছু বিটি
কাঁদ না কাঁদ বিটি, ঈশ্বরের দিয়া চিঠি, ভগবানের লিখা
আজই তো গুরুবার, আনিতে যাব শুকুরবার।
কাঁদ না কাঁদ বিটি, ঈশ্বরের..... ...। —ঐ

৬

দুপহর বেলা হইল, শুরু (শহর) বালি তাতা হৈল,
আমি যাব নাই গো, আমি যাব নাই।
ডাল ভাঙ বিটি ছাঁইয়া কর, ছাতা ধর, ধনি, ধীরে চল —ঐ

৭

বাবু গেল পুতুরা গেল, সবাই গেল মরিয়া
একা জীব নিয়ে যাব, প্রাণ গেলে কিবা রাখে ধরিয়া
হে হরি, নিবেদন করি। —ঐ

৮

মা মরিল ঘরে, বাবা মরিল শহরে,
দিনের বেলা আঁধার হল, বাবারে মরণ কখন দেখি নাই। —ঐ

৯

বাড়ী আছে কাপাস ফুটা, সংসারের লোক দেখে
ঘরে আছে মা মরা, কেউ দেখে নাই।
আমি কাঁদি মা প্রাণ বিকল, আমারই কেউ নাই প্রাণ জুড়াতে।—ঐ

১০

বাবা মরিলে দুখ, মা মরিলে জনমে টুওর,
আইস গো, মা জনমের মা, দেখা দে, মা, জনমে। —ঐ

১১

দশ কোশ পথ, বাবা, পাঁচ কোশ অন্তরে,
কোন অভাগিনী বাবা, নয়নে জুড়াই।
যারই অভাগিনী, বাবা, মা বাবা নাই রে,
সেই অভাগিনী, বাবা, নয়নে জুড়াই। —ঐ

১২

ঝিপির ঝিপির জল পড়ে, কুলি কাদা পানে,
বঁধু হে, তুমি না কি, এত রাত কেনে। —ঐ

১৩

কুলি কুলি যাছ, বন্ধু, কুলি পিঁড়া বসনা,
চোর বন্ধা মারিবে, প্রাণের বঁধু রসিকা লো। —ঐ

১৪

কুলি কুলি যাছ, বঁধু, কুলিতে বসিলে বন্ধু,
মাটিতে বস, তামুক খায়ে যা বন্ধু, হুঁকা খায়ে যা,
তামাক খেয়ে যা, বন্ধু, কালি দিও না। —ঐ

১৫

পথে পথে যাতে যাতে, পথে পাইলাম ফুল,
ফুল বড় রসিকা, কানে গুঁজে কুলি কুলি, আইলুম আখড়া। —ঐ

১৬

উপর কুলি আখড়া, নামকুলি আখড়া,
মাঝকুলি আখড়া, রকত্ চন্দন গাছ,
রকত্ চন্দন গাছ তো কাটিব, আকড়া তো মিলান করিব। —ঐ

১৭

কাশীপুর মহারাজ রাজার পাঠায় বসনা,
কলম ধর না কলম বিলম (বিলম্ব) কর না। —ঐ

১৮

বেটা যদি হয় তো, নাম দিব হরিলাল,
বিটি যদি হয় তো, বিয়া দিব পুরুলিয়ায়, শহর বাজারে। —ঐ

১৯

(গ্রাম) শিকর কা লোক বাবা, লম্বা লম্বা ধুতিয়াঁ,
বাছি দে গো বাবা, ছাইলা জোয়ান বাছি দা। —ঐ

২০

রাম কাঁদে ডালে ডালে, লক্ষ্মণ কাঁদে বাঁয়ে ডালে,
সীতা তো কাঁদে কোন কুলে,
সীতা তো কাঁদিছে রাম রাম। —ঐ

২১

নিম্নোদ্ধৃত গানগুলি বাঁশপাহাড়ী ও অন্যান্য স্থান হইতে সংগৃহীত—

কলি যুগ পাড়াও হ না।
মন কে তড়াম কেদা, এটা ডাহার তে।
নিদায় জু তাহার কান, মারি জু তাহি কান,
মামমি কে তাড়াও লেদা, ধরম দাহার তে নাহা যুগ পাল্টাও না।——ঐ

২২

রাম কাঁদে ভাবে ভার, লক্ষ্মণ কাঁদে আগে তার,
সীতা মাইগে কোন কুলে আছে,
সীতা মাইগে আস্তকের বনে গো,
সীতা মাইগে রাবণের অঙ্কে। —বাঁশপাহাড়ী

২৩

কাশীপুর বৈরাগিণী মোটা মালা আনে,
যার গলায় মোটা মালা সাজে গো,
তার নাম গোবিন্দ রাধে ॥ —ঐ

২৪

দাদা গেল শিকারে, কুকুর কাঁদে বিকালে,
দাদারে, কুকুর বিনু শিকার সাজে না। —ঐ

২৫

কাঁসাই নদীর ধারেঁ-রে, হপন্ হপন্ দ্বারে-রে,
বাহাওয়া কান্ থারে থার, এনা পেরা মই,
বাহার শিশির ইং চলা আ, সাঙিন্ রাগে তাহে না,
যাহে বাহে বড়ায়া, উনি বাঁহা সিদ্। —ঐ

অর্থ :—একজন কুটুম একজন মেয়েকে বলিতেছে—কাঁসাই নদীর ধারে ছোট একটা গাছে থরে থরে ফুল ফুটেছে। সে (মেয়েটা) ফুল পাড়তে চায়—কিন্তু ফুলের নাগাল পায় না। (ছেলেটা বলল) যে ফুল পাড়তে জানে, সেই ফুল পাড়তে জানে।

২৬

কলকাতার বাজারে বিটি মরিল,
কেউ না ফেলিতে মানা,
হাতে আছে চুড়বালা, কানে আছে কানপাশা,
ওনাকে হাতাও গে—
এন রাহ ডুগিডি কায়পে। —ঐ

লাঙলচষার গান

ঝাড়গ্রাম মহকুমার বাঁশপাহাড়ী গ্রামের সংগ্রহ-শিবিরে লাঙল চষার গান নামে একটি মাত্র গান সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা কর্মসঙ্গীতের অন্তর্গত। চাষ করিবার সময় এবং অন্যান্য সময়ও এই গান গাওয়া হইতে পারে। কারণ, ব্যবহারিক (functional) সঙ্গীত ব্যতীত আর সকল সঙ্গীতই সকল সময়ই গীত হইতে পারে।

কালী গড়া চাষ হতে, উঠ হে রাঙা মাটি হে গো ধনী,
বাবু ভায়া গামছা গাবায়।
গামছারই চটক দেখি, বিব্যায়ে পার্বতী,
হে গো ধনী ভাল মাটি সঙ্গে চলি যায়।
যা লাগে কড়ি বাতি, কিনে দিয়ো শাঁখা-শাড়ী,
হে গো ধনী পার্বতী, সঙ্গে চলি যায়।
ঋণ করি ধার করি, পরাব শাঁখা-শাড়ী,
হে গো ধনী............ ॥

লাচাড়ী

মধ্যযুগে বাংলার রামায়ণ গান কিংবা মঙ্গলগান গাহিবার একটি বিশেষ সুরের নাম লাচাড়ী। ইহা গান রচনার একটি বিশেষ ভঙ্গি রূপেই ব্যবহৃত হইত। সাধারণত করুণ রসাত্মক ভাবমূলক গীতি মাত্রই লাচাড়ী সুরে গাওয়া হইত এবং বর্ণনাত্মক রচনা পাঁচালীর সুরে গাওয়া হইত। অনেকে মনে করেন, কাহিনীর যে অংশ নাচিয়া নাচিয়া গাওয়া হইত, তাহাই নাচাড়ী বা লাচাড়ী। নাচাড়ী শব্দটিও কেবলমাত্র করুণ রসাত্মক বিষয় বর্ণনাতেই ব্যবহৃত হইত। যাহা নাচিয়া গাওয়া হয়, তাহা স্বভাবতই তালপ্রধান রচনা, তাল প্রধান রচনায় করুণ রস প্রকাশ সম্ভব হয় না। সেইজন্য নাচিয়া গাওয়া হইত বলিয়া ইহাকে লাচাড়ী বলিত, এই কথা স্বীকার করা যায় না। তবে নাচ শব্দটি হইতে লাচ শব্দটির উৎপত্তি হইতে পারে। হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে লাচাড়ী সুরের গানগুলি লিখিত হইত। তবে যতদিন ইহা গানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে, ততদিন ইহারা মাত্রাবৃত্ত ত্রিপদী রূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে। গানের প্রয়োজন দূর হইয়া গেলে ইহারা অক্ষরবৃত্ত ছন্দোরূপ লাভ করিয়া সাধারণভাবে আবৃত্তির কাজে ব্যবহৃত হইত। একটি নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

আহা, প্রভু, প্রাণপতি, কোথা গেলে এত রাতি
একাকিনী ফেলিয়া আমায়।
আজীবনে কোনদিন না করিলে কার্য হেন
এবে কেন হইলে নিদয় ॥

কারে বা করিব রোষ সকলি আমার দোষ
অগ্নি দিলাম আপন কপালে।
কোথা হৈতে আইল নারী সহেলার বেশ ধরি
সে রাক্ষসী প্রভুরে নাশিল॥ —বরিশাল

লালন ফকিরের গান

বাউল সাধক লালন ফকির (বাউল দেখ) রচিত গানগুলি মুখে মুখে ব্যাপক প্রচার লাভ করিবার ফলে তাহাদের অনুকরণে লালনের ভণিতা যোগ করিয়াও বহু গান রচিত হইয়াছিল। তাহাতে প্রকৃত বাউলের আদর্শ যে সর্বত্র অনুকরণ করা হইয়াছে, তাহা নহে। লালন ফকিরের নিজের রচিত গান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

লীলা-কীর্তন

পদাবলী কীর্তন গান দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত, নাম-কীর্তন ও লীলা-কীর্তন। যাহাতে কেবলমাত্র রাধাকৃষ্ণের নাম গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের প্রেম-লীলার কোন অংশ কাহিনীর আকারে প্রকাশ করা হয় না, তাহাকে নাম-কীর্তন বলে। যেমন, 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে', কিংবা 'রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ মধুসূদন রাম নারায়ণ হরে' ইত্যাদি নাম কীর্তন, কিন্তু যে কীর্তন গানে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলার বিশেষ কোন কোন প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়া থাকে, যেমন মান, নৌকাবিলাস, মাথুর ইত্যাদি ইহাদিগকে লীলা-কীর্তন বলে। লীলা-কীর্তন মহাজন পদ রচয়িতাদিগের বিশুদ্ধ ধারা পরিত্যাগ করিয়া লৌকিক স্তরেই নামিয়া আসিয়াছিল।

লীলার বারমাসী, লীলা ও কঙ্ক

'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় প্রকাশিত 'কঙ্ক ও লীলা' বা 'লীলার বারমাসী' গীতিকাটি বিচিত্র নাটকীয় ঘটনায় সমৃদ্ধ। ইহার কাহিনী এই—ছয়মাস বয়সেই শিশু কঙ্ক মাতৃপিতৃহীন হইল। সংসারে দেখিবার কেহ নাই, অবশেষে এক নিঃসন্তান চণ্ডাল-দম্পতি ব্রাহ্মণ শিশুটিকে লালন-পালন করিতে লাগিল।

তাহার যখন পাঁচ বৎসর বয়স, তখন চণ্ডাল-দম্পতিও পরলোক গমন করিল। কঙ্ক দ্বিতীয় বার নিরাশ্রয় হইয়া পড়িল। এইবার গর্গ নামক এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের গৃহে তাহার আশ্রয় জুটিল। গর্গের এক কন্যা ছিল, নাম লীলা; আট বৎসর বয়সে লীলা মাতৃহারা হইল। গর্গ কঙ্ক ও লীলা উভয়েরই মাতাপিতার স্থান অধিকার করিলেন। লীলা যৌবনে পদার্পণ করিল, কঙ্কের প্রতি তাহার অনুরাগ সে আর গোপন করিয়া রাখিতে পারিল না। ইতিমধ্যে গ্রামে এক পীরের আবির্ভাব হইল, কঙ্ক তাহার নিকট যাতায়াত করিয়া অবশেষে গোপনে তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল, তাহার আদেশে কঙ্ক সত্যপীরের পাঁচালী রচনা করিল। কঙ্কের কবি-খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। চণ্ডালের গৃহে পালিত হইয়াছিল বলিয়া কঙ্ককে বিধিমত প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া গর্গ সমাজে তুলিয়া লইলেন; ইহাতে ব্রাহ্মণ-সমাজ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, কঙ্কের নামে নানা কুৎসা রটনা করিতে লাগিল। এই সূত্রেই গর্গ শুনিতে পাইলেন যে, কঙ্ক মুসলমান পীরের নিকট দীক্ষা লইয়াছে এবং লীলার প্রতি সুগভীর প্রণয়াসক্ত হইয়াছে। শুনিয়া গর্গ ক্রোধান্ধ হইয়া উভয়ের প্রাণবধ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। একদিন কঙ্কের অন্নে তিনি বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিলেন, লীলা তাহা দেখিতে পাইয়া কঙ্ককে তাহার পিতার আশ্রয় হইতে পলাইয়া যাইতে বলিল। কঙ্ক লীলার নিকট হইতে বিদায় লইয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া গেল। দিন যাইতে লাগিল, কঙ্কের বিরহ লীলার ক্রমেই দুঃসহ হইয়া উঠিতে লাগিল। গর্গ নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন, কঙ্ককে অনুসন্ধান করিয়া ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহার দুই জন শিষ্যকে পাঠাইলেন, ছয়মাস কাল অনুসন্ধান করিয়া তাঁহারা ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিল। দুঃখে বেদনায় লীলা শয্যাগ্রহণ করিল, অবশেষে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় লইল। কঙ্ক যখন ফিরিল, তখন শ্মশানে লীলার দেহ ভস্মীভূত হইতেছে। গর্গকে সঙ্গে লইয়া কঙ্ক পুনরায় তীর্থের পথে বাহির হইল।

বিপ্রপুরে ছিল এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
ভিক্ষাবৃত্তি করি করে জীবন যাপন॥
গুণরাজ নাম তার ভার্যা বসুমতী।
পতিব্রতা সেই নারী অতি ভক্তিমতী॥

সারাদিন ভিক্ষা মাগি দুয়ারে দুয়ারে।
সন্ধ্যাকালে ফিরে বিপ্র আপনার ঘরে ॥
এই মত নিতি যাহা করায় অর্জন।
ইতে কোনমতে করে জীবন ধারণ ॥
সংসারেতে ভার্যা ভিন্ন কেহ নাহি ছিল।
কিছুদিন পরে এক পুত্র জনমিল ॥
কেমনে পালিবে পুত্রে না দেখে উপায়।
কেউ নাহি চায় পুত্র কেউ নাহি পায় ॥

লেটো গান

পশ্চিম বাংলার এক শ্রেণীর জনপ্রিয় লোক-সঙ্গীত লেটো গান, ইহাকে লাটু গান, লোট্যার গানও বলে। সংস্কৃত 'নাটক' শব্দ হইতে লেটো কথাটির উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। কারণ, ইহার মধ্যে নাটকীয় ভঙ্গীতে বিষয় পরিবেশন করা হয়। অনেকে মনে করেন, সংস্কৃত নাটকের ইহা আদি রূপ।

লেটো গান অনেকটা তর্যা গানের মতই, দুই দলে বিভক্ত হইয়া এই গান গাওয়া হয়, খানিকটা উত্তর প্রত্যুত্তরের ঢংএ। স্থানীয় জনমনকে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য হাসি, কৌতুক ও উপদেশের ছলে লেটো গান গাওয়া হয়, ইহার অধিকাংশ বিশেষ তত্ত্বমূলক ; কতকটা বাউলের মত প্রচ্ছন্ন যুক্তিসমন্বিত ধর্মীয় ভাবে পরিস্ফুট।

লেটো গান সাধারণত মুসলমান ধর্মপ্রচারক গোষ্ঠীর ধর্মীয় সঙ্গীতরূপেও ব্যবহৃত হইত। বর্ধমান জিলার চুরুলিয়া গ্রাম বহুকাল ধরিয়াই হিন্দু মুসলমানদের মাতৃভুমি। কাজি, মাজি, মুমণ্ডল (শুঁড়ি) ও ভট্টাচার্য সম্প্রদায় ইহার অধিবাসী। এই অঞ্চলের লেটো গানের প্রচারক ছিলেন কাজি সম্প্রদায়, তাঁহারাই লেটো গানের প্রচার করেন উনবিংশ শতকের পঞ্চম দশকে। গ্রাম তখন জনবহুল হইয়া উঠিয়াছে—ইতিমধ্যে এখানে কয়লার খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

এই অঞ্চলে মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উপলক্ষে গাজন গান ব্যাপক প্রচলিত ছিল। ইহাদেরই যৌথ মিলনের ফলশ্রুতি স্বরূপ লেটো গানের উদ্ভব হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। লেটো গানের প্রাথমিক গোষ্ঠীভুক্ত

কবিসম্প্রদায়ের মধ্যে কাজি বদলে করিম, কাজি ফজাল আহম্মদ সিদ্দিকী প্রমুখ কবিরা খুব বেশী শিক্ষিত ছিলেন না। তবু তাঁহারা উর্দু আরবী, পার্সী ভাষাশিক্ষায় ইসলাম ও পারস্যদর্শনের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, লেটো গানে তাহারই প্রভাব পড়িয়াছে। ইঁহারা ছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের পূর্বপুরুষ। বর্তমানে ধর্মতত্ত্বের প্রভাব খাণিকটা ক্ষীণ হইয়া দেহতত্ত্ব-রঙের গান ইত্যাদি আসিয়াছে। ধর্মের কথাতে কতকটা হিন্দু সহজিয়াদের মতের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়।

সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিকে লেটো গানের দল বাহির হইয়া পড়ে। তখন নানা উৎসব-মেলা ইত্যাদি হয় এবং সেইখানে ইহাদের আসর বসে। দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়া কবির লড়াই জাতীয় গানগুলি রাতের বিস্তৃত অবসরেই জমিয়া উঠে।

১

সেদিন কেমন ভাবলি না রে মন,
সেদিন তোর জীবন যাবে রে মন।
আইনের আসামী—আসিবে জমাদার,
কোনদিন এসে তোর করিবে গেলেপ্‌দার।
সেদিন তোর নাই নিস্তার কেমনে হবি পার।
পারেরই ভাবনা ভাবলি না রে মন॥
সে দশা দেখে তোমার এগানা বেগানা,
লেপ বালিশ কেড়ে লয়ে ধূলায় দেবে বিছানা,
কোথা আমিরানা কোথা বালাখানা।
খাট পালং বিছানা পড়ে রবে,
আপ্ত বন্ধু যারা, কেঁদে হবে সারা,
দিবে গোবর ছড়া—দিবে তেড়ে।
'রবে' কার 'রবি' কার বসিবে গলেতে,
শীঘ্রই বাহির করিবে তুলসী তলাতে। —মুর্শিদাবাদ

২

কেমন করে রাজ দরবারে যাবে বল না।
(ও মরি যাই) কেমন করে যাবে বল না॥

জমিদারের আমলা যারা,
হাল খাজানা লেবে তারা,
বাকী তো ফেলবে না তারা,
কড়াতে ক্রান্তি ছাড়বে না ॥
(ও মন) পাঁচ কলেমার পেরেক মার
পঞ্চ কাঠের নৌকা গড়
তবেই, মন, তুই হবি পার ॥ —ঐ

৩

বিদায় দাও গো, মা জননী, জন্মের মত যাই চলে,
যার ছেলে সে নিলে কেড়ে
এখন নয় তো তোমার ছেলে ॥
দশ দিন দশ মাস গর্ভে ধরে
আছিস, মা, তুই রণে মরে,
পেলে পুষে মানুষ করে
যার ছেলে সে কেড়ে নিলে ॥
গাঁ গেরাম সব জুটে পুটে
বানাবে ঘর মাটী কেটে
কাঁচা বাঁশকে কেটে কুটে
মা, করে দিবে জারেজার।
আসবে তখন ও পারের চিঠি
কাঁচা বাঁশের বাঁধবে খাটি
আশে পাশে বেটা বিটি ধরাবে কাঁদন। —ঐ

৪

ওরে, আর কতদিনে ফুটবে, হরি, কণ্ঠের বিহার ফুল।
দাঁত ভাঙ্গিল বয়স গেল ধল হল মাথার চুল ॥
কণ্ঠ বলে, ভাইরে রসিক কণ্ঠ,
বিহা করিস না পাবিরে কষ্ট,
ভজগা মন গিয়ে রাধাকৃষ্ণ, ভবপারের ভাবনা।
ঘোর কলিতে ক'রে বিহে এত লাঞ্ছনা।

কণ্ঠের বিছার পাল্কী সোজা,
আগে পিঠে কাঠের বোঝা, দেখে যা মজা,
বাড়ীতে যেয়ে মাকে বোঝা,
আমার মা কেঁদে হল আকুল ॥ —ঐ

৫

ভবে এসে রইলি বসে বাড়ী ফিরে যাবি না ॥
ভিতরী কামেজ উপরে কোট পায়ে তোমার ইংরাজী 'বোট'
মুখে তুমি লাগিয়ে চুরুট বাড়ীতে নুন ব্যাগরে শাগ সিজে না ॥
হাটু বলে ও দিনকানা হাটের সয়দা তুই চিনলি না,
পুঁজি নাই তোর ষোল আনা কিসে পার হবি বল না ॥ —ঐ

৬

ওহে দানা, করি মানা গৌরব করো না,
ওরে দানা, দানা কর বটে ছুরি মার অমন পেটে,
নইলে তোর ভবের হাটে যাওয়া হবে না ॥
দেখ যত জোলার নারী, বুনছে কত ঢাকাই শাড়ী, আর চার খানা ॥
ম'লে তোমায় ফেলে দিব 'কাফন' দিব না ॥ —ঐ

৭

ওগো সই, বেলা গেল সন্ধ্যা হল ভবের দোকান তোল, সই ॥
রাস্তার সামান কি কি নিলি আর তোমাদের বেলা কই ॥
মনোহরার ঐ দোকানে, রং দেখে ভুলেছ মনে,
রং এর জিনিষ নিছ কিনে মাটী হবে তা দুদিন বই ॥
সোনার গহনা তোমার বেশী দামের জিনিষ ঐ।
কালে কালে নিবি গলে কখনও না হবে ক্ষয় ॥
কখনও পড়িবি দুখে, লোকে টাকা দিবে ডেকে,
দিন যাবে তোর অনায়াসে বসে খাবি চিঁড়ে দই ॥ —ঐ

৮

নবী মেরাজেতে দোস্তের সাথে চললেন মোলাকাতে ॥
দেখে বেহেস্তের বাজার খুসী হলেন পয়গম্বর।
দোজখ দেখে লাগিল কান্দিতে ॥

শোন গো জলিল, জোববার নির্বোধ ওম্মত আমার,
দোজখ জ্বালা পারবে না সহিতে ॥
তবে নূর নবীজী পয়গম্বর বোর্‌রাকে হয়ে সোওয়ার
এক নজরে উঠলো আসমানেতে ॥
সরবতের পিয়ালা হাতে সত্তর হাজার হুরপরী,
দাঁড়ায়ে সারি সারি নূরের বাতি জলতেছে হাতে ॥
তবে নবীজী ভবে এলো মোলাকাত সাঙ্গ হ'লো
মিলন হলো এবার দোস্তের সাথে ॥
ওস্তাদ কয় চমৎকারী, আমতলায় আমার বাড়ী,
চিরদিন স্মরণ করি তাতে ॥ —ঐ

৯

ভব নদী তরাবি যদি কিস্তী কর তৈয়ার,
একিন মনে আনো ইমান কলমা কর সার ॥
ভব নদীর তুফান ভারী, শুনে ভয়ে কেঁপে মরি,
সাঁতারে পার হতে নারি অকূল পাথার ॥
ইমানের কিস্তি বান্ধ, ভাই, চারিটী কলেমা তক্তায়,
১৩০ শেষ মার ভাই, লৌকার মাঝার ॥
তোরা ঈমান ছেড়ে নদী পার হবি সাঁতারে,
ডুবে যাবি ঘোর পাথালে বেইমানে বদকার ॥
কেটে ঈমান গাছের গোড়া, পাতায় পানি ঢালে এরা,
আজাজিলের দশা তোরা দেখরে দুরাচার ॥
যত সব নামিজের বেটা কপালে লিয়াছে ঘটা
শুক্রবার ও আঁচল আঁটা মন শিরনী খাবার ॥
ইলিয়াশ ওরে মোমিন, দেশকে আগে করগা একিন
ইমান বিনে হতে কঠিন কেমনে হবি পার ॥

১০

নামাজ বিনা ইমান তোদের যাবে অকারণ,
বেনামাজির বসতখানা দোজখের আগুন ॥

তেল বিনেতে বাতি যেমন, নামাজ ছাড়া ইমান তেমন,
নামাজ ও ইমানের প্রথম হাদিসের বচন ॥
যে ছাড়িল রোজা নামাজ, ইমান তাদের গেলো মুজে
দেখরে আপন মনে বুঝে ॥
ইমান ও নামাজের গোড়া, মাথা তাহার কলমা পড়া,
পুছে দেখ গ্যা ওরে ভেড়া আলেমের কারুণ ॥
ইমান হল নামাজ ছাড়া, কোন হাদিসে দেখলি তোরা,
কথা বলিস না দলিল ছাড়া সরার সদন ॥
ইলিয়াশ কয় কাতরেতে, চল মোমিন নামাজেতে
ভুলো না ওদের কথাতে যত মোমিনগণ ॥ —ঐ

১১

কাটা গাছে জল ঢালিলে মেওয়া ফলে না,
কেটে ইমান গাছের গোড়া পাতায় পাতায় জল ঢালে এরা।
মিছা কলমা নামাজ পড়া সরা জানে না।
নামাজেতে সেজদা দিতে মন যায় এদের হাতী কিনতে
হাঁটু পেড়ে আনমনেতে করে ভাবনা।
লব পড়ায় আর উঠে বসে এলো-মেলো মাথা ঘুসে
রুকু যায় আর মুচকি হেসে খোদা দিলে না।
একিন ইমান করে খাঁটী ঘটায় মনের ময়লা মাটী
গোর আজাবে পাবে মুক্তি নেলে পাও না।
মুনকির পুছিবে হিসাব বেইমানে দেহ জওয়াব
কেবা তেরা ছিল রব মাবুদ কোন জনা।
ইমান না থাকিলে পরে জওয়াবেতে যাবে হেরে
কোন বাবা তোর রাখবে ঘেরে কোরার যাতনা।
মন দিয়ে দুনিয়ার করে মাথা ঠোকে নামাজ পড়ে
সে নমাজ তোর আঁধার গোরে পানহা দিবে না। —ঐ

১২

ভবের গতিক নাইরে ভালো, সৎ পথে চলো।
পঞ্চ মাণিক ৩০ মতি গলাতে তুলো ॥

নবীর সরিয়ত ধরা		পঞ্চ অক্ত নামাজ পড়া
তবেই পাবে ভেস্ত, ধরো মোমিন সকলে ॥
নামাজ রোজা না পড়িলে		জিন্দেগী যাবে বিফলে
নামাজ বিনে পরকালে হবে মুস্কিল ॥
জম জম নামাজ ছেড়ে		কি দুর্গতি হ'ল গোরে
দোবারা বেঁচে সংসারে নামাজ পড়িল ॥
কেরাউন হামান কমিনা		পড়িলে সে পঞ্চ গেনা
হাদিশ খুলে দেখ মোমিন কি দশা হল ॥
দেখ এই নামাজের বলে		পার হইবে সরু পুলে
ইলিয়াশ কয় মায়াজালে ভবে না ভুলে ॥	—ঐ

১৩

কেন দানাকে নিন্দা কর অকারণ।
দানা না খাইলে তোদের জীবন্তে হত মরণ ॥
যখন দানা বিনেতে		প্রাণে মরবি তোরা ক্ষুধাতে
কাপাস পড়ে পরনেতে কি গুণ আসিবে তখন ॥
খেয়ে যে দানার তরে		সংসারে বেড়ায় ফুটানী করে
সেই দানাকে নিন্দা করে পেঁদির বেটা কয়েকজন ॥
মোমিন লোক মৌলে পরে		দানা খায়রাত করে ফকিরে
নেকি পেয়ে দানার জোরে বেহেস্ত যাবে সে জন ॥
১২৪০ সালে দানা হয়নি		দক্ষিণ অঞ্চলে
দানা না পেয়ে সেকালে কত জনা হল খুন ॥
কহে হীন ইলিয়াশ		তখনও ভবেতে ছিল কাপাস
এত লোক খেয়েছে হুতাশ করেছিল কবা শুন ॥	—ঐ

১৪

কাপাসেরও যতন কর ও ভাই মোমিনা,
কাপাস তোমার সঙ্গের সাথী ভেবে দেখলি না ॥
শাড়ী ধুতি চাদর বানায়, কত আদর করে আমায়,
বালিশ তোষক হই বিছানা গেরদা চৌকোনা ॥

মোমিন লোকও মৌলে পড়ে, কাপাসেরও দরকার করে,
আমার মান্য এ সংসারে ভেবে দেখ না ॥
কাপাস তোমার সঙ্গের সাথী, কাপাস বিনে নাই রে গতি,
ইলিয়াশের এই মিনতি কাপাস ছেড়ো না ॥ —ঐ

১৫

দানাহারা দিন-কাণারা বাঁচবি কি করে।
অনাহারে মরবি দেখিস দানা বেগারে ॥
হায়, কত জন দানার লেগে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগে,
কষ্ট পায় সে বিনা রোগে দানার খাতেরে ॥
কেন্দে সে বলে বাণী দানা দাও গো, মা জননী,
বেঁচে থাক তোর গুণমণি খয়রাতের জোরে ॥
কাপাস তো থাকে পরণে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় না কেনে ?
কাপাস থাকতে কি জন্যেতে ক্ষুধাতে মরে ॥
কাপাসে করিয়ে রুজি মরদ তোরা হয়েছি বুঝি,
কাপাসের দুধ খানি বুঝি থেকে আঁতুরে ॥
দানার দিকে হাত বাড়িয়ে ঠোকনা দিব তোদের পায়ে
কেড়ে নিব দানার আলে দু'কানে ধরে ॥
নিন্দা কর না এ সভাতে লজ্জা কি লাগে না খেতে
কাপাসের বিচি দিব খেতে তোমারে ॥
নবীজীর পদতলে হীন ইলিয়াশ বলে
দানা ধনকে দাওগা গণে বাঁচবি সংসারে ॥ —ঐ

১৬

তাহার লাগি ভাবি, হে বন্ধু, বসে গভীর রাতে,
একলা আছি ঘরে জোটে নাই মোর সাথে।
সারা জীবন ব্যথায় ভরা, তবু প্রিয় দেয় না ধরা,
মরি আমি ঐ দুখে গো নিদ্রা নাই আঁখিতে বসে গভীর রাতে।
—মুর্শিদাবাদ

১৭

ঐ যে নিশি হোল ভোর ডাকছে কোকিল চালে বসে ঐ।
ডালে বসে ডাকছে কোকিল নাথ এল কই ॥
আর বেশী জোরে দিস না ঝাড়া যামিনী ফুল যাবে ঝরা
যামিনী তোর চক্ষের মণি আঁচল পেতে রই।
পরের সোনা দিস না কানে, কেড়ে নেবে হেঁচকা টানে,
কেড়ে নেবে হেঁচকা টানে জান না হে, সই। —ঐ

১৮

আমার নাম রসিক মাতাল জানেন সকলে,
পেট ভরে মদ খাই শুঁড়ির কান মলে।
দু'চার পয়সা পেলে ফেরি, চলে যাই শুঁড়ির বাড়ি,
ঘরেতে না চড়ুক হাঁড়ি মরুক মাগ ছেলে।
ওরে ওরে ও ভাই শুঁড়ি, শুননা রে তোর পায়ে ধরি,
ধারে মাল আজ দে এক হাঁড়ি নইলে জীবন যাবে অকালে। —ঐ

১৯

তুমি এস না ফিরে যাও ও কালো সোনা।
রাজকুমারী মান করেছে তোমার আসিতে মানা ॥
জানি না কার কুঞ্জে ছিলে প্রভাতে জাগাতে এলে।
সারা নিশি কুঞ্জ দ্বারে সয়েছো তো গঞ্জনা ॥ —ঐ

২০

বল দেখি সই, শ্যামের বাঁশীই ধরে কত গুণ।
বাঁশী যে শুনেছে, সেই মজেছে তার কুলে ধরেছে ঘুণ ॥
বাঁশীর স্বরে তুষারাকারে দ্রব হয় পাষাণ।
কদম্ব হয় বিকশিত যমুনা বহে উজান, যমুনা বহে উজান,
বাঁশীর স্বরে পুলক ভরে ভ্রমর করে গুণ্ গুণ্ ॥
বাঁশীর স্বরে পশুপাখীর হরে সবার মন।
গাছের পত্র করে নৃত্য ভুলিয়া আপন, ভুলিয়া আপন।
মৃদুমন্দ বহে পবন শীতল হয় দীপ্ত আগুন।
আমারও গিয়াছে সখী জীবন যৌবন ধন ॥

রাধা রাধা বলে বাঁশী বাজে অনুক্ষণ, বাজে অনুক্ষণ।
বাজুক তাহে নাই মানা, (বাঁশী) না না শুনিলে পায় বেদনা,
(আমার) কাছে থাকলে গুরুজনা লাজে হয় মুখটী চুণ। —বীরভূম

২১

ও হতভাগা কপাল আমার ভাই,
শিশু রেখে মারা গেলেন মা, দেখতে পেলাম না।
জন্মদিনে বাবা মলেন দেখতে পেলাম না।
রাণীগঞ্জে ও গেলাম আমি চাকরী করিতে,
ছজন মিলে করলে চুরি আমায় কাঁদাতে।
শেষে পুরলে আমার তড়িঘড়ি কয়েদখানাতে
ও হতভাগা কপাল আমার ভাই।
যে করেছে লালন পালন মা,
তাকে আমি দেখতে পেলাম না। —ঐ

২২

সে ত ভাসায় ফুল জলে, আমার ভাসে কুল গো।
ঐ পাহাড়ে বাজে বাঁশি, সেকি আমার মনের ভুল গো॥
বারে বারে করি মানা, উড়ে যাবার নাইরে ডানা,
তুমি বুঝ না হে মোর বেদনা, পরাণ আমার আকুল গো॥ —বীরভূম

২৩

হায় টাকা, হায় টাকা, হায় টাকা রে,
তুমি বিনে দুনিয়াটা সব ফাঁকা রে।
তুমি উড়াতে শিখাছ মোরে
চড়িতে শিখাছ রে··· ··
তুমি বিনে দুনিয়াটা সব ফাঁকা রে।
তুমি কুলের বধূর মন ভুলাতে ওস্তাদ হে,
তুমি পকেটে থাকিলে পরে
তুমি সরম ভরম সব ঢাক রে॥ —ঐ

২৪

হরি কে জানে তোমার লীলা
তুমি ত্যজে গয়া কাশী, হ'লে শ্মশানবাসী,
মন কর উদাসী জপ হরিমালা।
শুন শ্রোতাগণ করি নিবেদন
রাণীগ্রামে আজ পড়েছি যখন।
হরি কে জানে তোমার লীলা
তুমি ত্যজে গয়াকাশী হ'লে শ্মশানবাসী
মন কর উদাসী জপ হরিমালা॥ —ঐ

২৫

আলিমামন মন শুদ্ধতে বাঁধরে ইমান,
পাঁচটি সূতো লয়ে হাতে, তিরিশটি পাক দিও তাতে,
জল দিলে ভিজবে না গো, রৌদ্রে দিলে শুকাবে না।
কবে হ'বে তৈয়ার বাড়ী, কাঁচা বাঁশের বাঁধবেন গাড়ী,
লয়ে যাবে তাড়াতাড়ি ঢেকে ঐ চাঁদ বদন॥
মা কাঁদেন মোর বাছা বাছা, ভগ্নী কাঁদে ভাই আমার,
পরের বিটী নারী কাঁদে গো, কি গতি হ'ল আমার॥ —বীরভূম

উপরে উদ্ধৃত সব কয়টি গানই যে লেটো গান বা লাটু গান কিংবা লেট্যা গান এমন মনে হয় না, তবে সবগুলিই এই নামেই সংগৃহীত হইয়াছে।

শ

শব্দ গান

প্রধানতঃ মুর্শিদাবাদ জিলা হইতে সংগৃহীত এক শ্রেণীর তত্ত্বমূলক গানের নাম শব্দগান। কেন ইহার এই নাম তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

১

বেশ বেশ আলখা মজার ছবি গড়লেন দীননাথ ছুতার।
স্বর্গ মর্ত পাতাল আদি রেখেছেন ছবির মাঝার॥
ছবির মধ্যে সাত সমুদ্র অষ্ট খণ্ড চার বাজার।
সেই বাজারে বিরাজ করে কোন কারীগর নিরন্তর॥
ছবির মধ্যে নুরনবিজী ইমাম হোসেন রোশনদার।
আছে হজরত আলী আর ফতেমা, করছেন গো তুজনেই বিচার॥
ছবির মধ্যে 'আগুনপানি' ধুমথালে উঠিছে জল।
বিনা মেঘে জল বরিষণ জোয়ার বয় সচরাচর॥
ভুগোল বলে পাঁচ মজাহাব রেখেছেন ছবির মাঝার।
উহার চার মজাহাব জাহের আছে এক মজাহাব শুনরে, মন আমার॥

—মুর্শিদাবাদ

২

আমি কার হিল্লায় দাঁড়াব বলো, ভূতের বেগার খাটা হলো।
এলি তো মাতা জন্মের দাতা এ জগতের পালন কর্তা,
আমার পূর্ব জন্ম ছিল কোথা, হেথায় আমায় কে আনিল॥
বেটাবেটি স্ত্রীপরিবার, দম ফুরালে সব হবে পর,
আমার দম ফুরালে সব অন্ধকার, আমি কার তার ঠিকানা না হলো।
সঙ্গে আছে মন পাগলা, ভুলে না সে ঝুল্না তালা,
মালিককে করিয়া ধুলা ভবের হাটে হরিলুট দিল॥
ভুগোল বলে, হায় কি করি, ঝকমারি তুনিয়াদারী,
আমি কারে শুধাই কারে ধরি, আমার স্বায়ী বাড়ী কোথায় বলো॥ —ঐ

৩

আমি পেটের দায়ে খুন হয়ে মলাম।
পেট হয়েছে চিন্তা গারদ, পেট হলো জকো কালাম॥
কতজন ভদ্রলোকে লেখাপড়া শিখে,
কেবল সে পেটের দায়ে করে চাকুরী কাম।
এক চোখ দু চোখ করতে করতে, দিবানিশি নাই বিরাম॥
হায়রে, এই পেটের আশে, পড়িয়া রিপুর বশে,
মাতিয়া রঙ্গরসে সুখে ভুলিলাম॥
পেটে পেটে হয় উৎপত্তি, পেট নিয়ে থাকবো কতি,
পেট নিয়ে নিন্দা ভীতি সংসারে,
হয়ে কামে মত্ত অবিরত মহামুনি হারালাম।
পেটে পেটে আসা যাওয়া, পেটেতে জন্ম নিলাম॥
নামাজের সময় হলে, আল্লাহো আকবর বলে
বুকেতে তকবির বেঁধে মুখে খোদার নাম।
আমার মন নয়ন রয় পেটের চিন্তায়,
চিনলাম না মনজিল মোকাম॥
কাপ্তান কয়, কি করিলাম, পেটের চিন্তায় দিন ফুরালাম।
গুরু চিন্তা করবো কখন সময় না পেলে,
আমার মুনসিব চাঁদের চরণ সাধন জন্মাবধি না পারলাম॥ —ঐ

৪

এমন চাষা বুদ্ধি নাশা তুই,
কেন চিনলিনারে আপন ভূঁই।
তোর এই মানব দেহ পাকা ধানে,
লেগেছে চটা বাবুই॥ এমন···
তুই ভাল করে করলি কিষানী,
মানব দেহ চৌদ্দ পোয়া লাল জমিখানি,
তাতে জন্মেছিলো ভক্তি ফসল
খেয়ে গেল সব হিংসা-চড়ুই॥ এমন····

চেতন বেড়া উপড়ে পড়েছে,
আলগা পেয়ে সে সব ফসল খেয়ে গিয়েছে।
এখন গোঁফ ফুলায়ে বসে আছো, ও মন,
তোর মাচা ভরা বিন্ন পুই॥ এমন······
মসিনা মটর কুটে ভাতুড়ে,
কেন ভালো করে ভুঁইয়ের আলে বাঁধলি না কুঁড়ে।
এখন চিন্তা জ্বরে মরবি পুড়ে, ও মন,
পেটেতে হবে পিলুই॥ এমন······
তোর ফসল গেল, ঘটলো বিষম দায়,
ঠেকৃবি যেদিন দেখবি সেদিন নিকাশের সময়,
কাপ্তান বলে আমি কুবীর পদে মনকে থুঁই॥ এমন··· —ঐ

৫

নবীজীর তরীক ঠিক কর সবে,
নবীর তরীক ছাড়া হবে যারা মুনাফেক হয়ে যাবে॥
শুন বলি, নবীর তরীক কারে কয়,
জানিবে ঠিক পড়লে পরে শুধু নামাজ রোজা নয়।
আদায় করলে রোজা নামাজ, তার তরীকের হবে না কাজ,
নবীকে কয় খোদা বেনওয়াজ দেখ কোরাণ কিতাবে॥
খোদা আপন মনে খোস্‌দিলেতে জিব্রাইলকে তিন জিনিষ দেয়,
জিব্রাইল লয়ে মক্কায় গিয়ে নবীর হাতে দিয়ে কয়,
আছে জহর আতর, মধু নাজেল হল তোমার উপর।
বিচার করে দেলের ভিতর বুঝিয়া তাই খাইবে॥
ইয়ারগণকে ডেকে নবী আতর মধু দেয়,
আত্মসুখের জন্ম নবী জহর শিশি নিজে খায়,
জহরের আতশ লাগিল নাফরি প্রাণ পুড়ে গেল,
কাম ক্রোধ দূর হইল ঐ জহর খাবে সবে॥
শরিয়ত আর মারফত ফাঁকে রাখিবে,
প্রকৃতিকে সঙ্গে লয়ে প্রকৃত হয়ে রবে।

অধীন বাহার ভেবে বলে, হিংসা, নিন্দা দূর করিবে,
তবে তরীক ঠিক হইবে নবীজীর ওম্মত হবে ॥ —ঐ

৬

কার এমন বিপদ হল দুনিয়ায়,
কোন শহরে কার রমণী ভেসে যায় দরিয়ায় ॥
সে রমণী গর্ভ ছিল ভাসতে ভাসতে সন্তান হল দরিয়ায়,
মরি, হায়, আহা হা ...
ভাসতে ছিল তক্তা পরে, তক্তাতে সু বাতাস ধরে,
যায় তক্তা ধীরে ধীরে ঝোড়ায় তক্তা বেঁধে যায় ॥
সে রমণী মারা গেল, ছেলের ভাগে হায়, কি হল,
বলিতে বুক ফেটে যায়, আহা মরি হায় আহা······
কে করে তার লিগাবানী, কে তার আহার জোগায়,
মরি, হায়, আহা······
এক বাঘিনীর বাচ্ছা মরে দুগ্ধতে প্রাণ ছটফট্ যায়,
প্রাণের পিপাসায় তখন দরিয়ায় পানি খেতে যায়।
ছেলের মুখে দুধ পড়িল, বাঘিনীর জানে আরাম হল,
মুখে করে তুলে আপন বাসা চলে যায় ॥
রবিয়ল চাঁদের এই রচনা গোকুলের পুরাও বাসনা,
এ কথা কেউ মিথ্যা জেনো না হদিসে তা শুনা যায় ॥ —ঐ

৭

ধর গা চেতন মুরশিদ, ঘুমাস নারে মন,
তুই ঘুমের ঘোরে পড়বি ফেরে সকল হবে অকারণ ॥
কথা ধর নেকী কর, এ দুনিয়ার পরেতে,
মরে গেলে পস্তাবে খালি হাতে গোরেতে।
মরি হায়, আহা হা······
গোর হতে উঠাবে আমল নামা হাতে দিবে,
তখন বিচার হবে রীতিমত কি জবাব দিবি।
এক সূর্যের বারো মুখ ল্যাজভর আসিবে,
এই দুনিয়া পুড়ে তামার বরণ হইবে।

মরি হায়, আহা হা… ..
কথার মত কথা লও সে কথাতে পাবি মজা,
সাজা দিবে অতিশয়। মরি হায়, আহা……
তাইতে বলি, ও ক্ষেপার মন, দিনে রাতে হও পাঁচ বার চেতন,
তখন বিচারে পাবি অমূল্য ধন হাসরের দিনে তখন।
নফছি নফছি ফুকারিবে, হায়, নছিবে কি বা হবে,
নবীগণ কইছেন ভেবে মুসাহক লাজে কয় এখন। —ঐ

৮

এস হরি বস আমার হৃদয়াসনে,
অমি ধোয়াব তোমার চরণ নয়ন-সিঞ্চনে।
আমার দেহভাণ্ডে যত আছে ধন,
দিব তোমায় করি এই নিবেদন।
আমি চাইনে জগতে পৃথক্ বলিতে আপন বলিতে জীবনে,
পিতৃভক্তি কুশণ্ডি করি প্রেম-চন্দনে সঞ্চিত করি,
মুখে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে দিব অঞ্জলি তোমার চরণে॥ —যশোহর

৯

এসো হে গৌর চন্দ্র নিত্যানন্দ দয়া করে।
অধমে ডাকিছে, প্রভু, এসো হে আসরে॥
এসো হে গৌর গদাধর গৌর গলার হার।
গৌর আমার পরণের সাড়ী দেখ্‌তে চমৎকার॥
ও সে হাল মাকৃড়ি সখের চুরি দোল কা দোল কানের দোল॥ —ঐ

১০

কেন এলো না জামাই ব্যাটা মিথ্যা চাল কুটা।
আমি ঐ পাড়াতে দেখে এলাম গো বড় পিঠার লেগেছে ঘটা।
রাঁধতাম পাঁচখানা তরকারি, তাতে দিতাম ফুলবড়ি,
আঁধসা আর কলাভাজা পটল চড়চড়ি।
মাছের ঝোলে দিতাম আমি গো কস্তি পেড়ে পুঁই ডাঁটা ;
আমি বড় দুখিনী, এলো না যাদুমণি,
কন্যা দিয়ে পুত্র পাব শাস্ত্রেতে শুনি।

এলে লাল বরাতের পিরাণ দিতাম গো,
একটা দিতাম মাথায় কম্‌ফেটার ॥ —ঐ

১১

পতিত অতিথ সেবায়, ভবে চাঁদ গৌর হয়েছে কানাই।
জাতিভেদ নাই ভেদাভেদ, মজেছে ছল্লাতলায় ॥
অতিথের প্রেমমাধুরী নীলমণি রাই কিশোরী, ভবপাথারে সাঁতরায়।
তরাতে পতিত পাবন, স্বর্গ মর্ত গোবর্ধন, কীর্তি খেলে দয়াময় ॥
কাউকে রেখেছেন সুখে, কাউকে রেখেছেন তুঃখে, কাউকে করেন
নিরাশ্রয়।
কাউকে রাখে ভুখা ফাঁকা, কাউকে সে দেয় না দেখা, অধরা নলিতে কয় ॥
ভবে এই কলিযুগে, সুখী দেখে তুঃখী শোকে, হায়, বলে কৃষ্ণরাধায়।
সুখী তুঃখী বাসেনা, কৃষ্ণ প্রেমে মজেনা, সে জনা কি মানুষ হয় ?
অতিথির মাতাপিতা, নারায়ণ জগৎকর্তা প্রেমআত্মা করুণাময়।
তুখ তুঃখী শাস্তি দিতে ব্রহ্মা বিষ্ণু বৈরাগীতে, শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ হয় ॥
সব জীবের ভব জালা, তরাতে ঐ শ্যামকালা, ধরে লীলা জগৎময়।
অন্বেষণ কে করে তা, করে গেছে কর্ণদাতা, অতিথ সেবায় কৃষ্ণ পায় ॥
মানবের মন ছলিতে, নারায়ণ এ জগতে, নানা মূর্তিতে বেড়ায়,
দেখরে মন সেবলে, অতিথে কৃষ্ণ ফলে, লভ্য হবে দয়াময় ॥
মন তুই ভুমধ্য সাগর, নীচে শিকড় গহ্বর, ভাণ্ড ফণী দেখ তায়।
ইচ্ছা ভোগ যতই দিবে, সব পাতালে পড়িবে, ছক্কা দান তো ফাক্কা যায়,
গোলাপ চাঁদ গোপাল ধরে, ভাসে ভব পাথারে, উজান ঢেউয়ে কৃষ্ণ রয়।
জয় রাধা রয় ভাটুতে, দেখরে মন মৃণালেতে, তে ধারায় তরঙ্গ বয় ॥—ঐ

১২

কে তোমার দম সুমারে, ঠিক দিয়ে মন দেখ দেখি।
আসে যায় করুণাময়, সব জীবে সমীরণ পাখি ॥
চলো চলো ত্রিবেণীতে, তরঙ্গ বয় তিন ধারাতে।
দেখতে পাবে স্বচক্ষেতে, যুগল কৃষ্ণ রাধা লক্ষ্মী ॥
মুখে বল, আমার আমি, কেউ কারো নয় স্বার্থ স্বামী,
সর্বস্ব অপরের তুমি, যখন উড়ে যাবে পাখি ॥

লক্ষ জন্ম করলে ভ্রমণ, সে সময় বা ছিলে কেমন ॥
পেয়ে এখন মানব জনম্, সে দিন ভুলে গিয়েছ কি ॥
ধন যৌবন তো নিশির স্বপন, ভৌতি লীলা ভিল্লকি মতন,
যখন তুমি পাবে চেতন, তখন তোমার সকল ফাঁকি ॥
ধন সম্পত্তি ভব আশা, কোন ঘড়ি কি হবে দশা,
যতই হবে ততই আশা, রাজ্যের রাজা হইবে কি ॥
অতিথি বেশ নারায়ণ ধরে, যাচাঞা করে মালদ্বারে,
ফিরে চায়না যে জন তারে, সে জনা বঞ্চিল নরকী ॥
কে কদিন থাকবে ভবে, হঠাৎ যমদূতে ধরিবে,
মালধন তো সব পড়ে রবে, পরিণাম হবে ঠকঠকি ॥
শাস্ত্র বেদে মধু পুরা, ভ্রমদক্ষ অলি যারা,
মধুপুষ্পে রত তারা, পুরছে আপন আপন চাকী ॥
সুযোগে সুদিন বয়ে যায়, মালধনে কি পরিত্রাণ পায়,
মজলি না মন অতিথ সেবায়, বেদশাস্ত্রে তা জান না কি ॥
যদি আশা স্বর্গবাসী, নারায়ণ অতিথি সন্ন্যাসী,
তার সেবায় যে প্রেম প্রেয়সী, স্বর্গের রাজ্যে তার অভাব কি ॥
গোলাপ চাঁদ গোপালে বলে, দমঘড়ি মৃণালে চলে,
হঠাৎ ঘড়ি বন্ধ হলে, লড়বে না তখন ধুকধুকী ॥ —ঐ

১৩

চড়ে ইংরেজের গাড়ীতে তোর প্রয়োজন।
শোনরে অবোধ মন, শ্রীগুরুর পাদপদ্ম গাড়ীর আগে।
তুচ্ছ কলের গাড়ী কোথায় লাগে, শীঘ্র চড় অনুরাগে।
যাবে নিত্য বৃন্দাবন ॥
গাড়ীর প্রথম ক্লাসে হরিনাম দুই অক্ষর, যদি ইচ্ছা করে,
চড় গাড়ী চাইনে টাকা মাশুল কড়ি,
আগুন পানি নাইকো দড়ি গাড়ীতে।
অমনি গাড়ী চলে হাওয়াতে।
গাড়ী গোড়েছে অনল কাল, জলে স্থলে অমনি চলে,
চৌদিকেতে আপনি চলে, লাইন নাই তার নিরূপণ।

গাড়ীর দ্বিতীয় ক্লাসের কথা বলি শোন,
রেখে শিক্ষাগুরুর পদে মতি, গ্রহণ কর কাম গায়িত্রী,
মনে প্রাণে ঐক্য করে সাধনা।
আছে গাড়ীর ভিতর চার রং পোড়া
প্যাসেঞ্জার তার পান যে ধরা,
পীতাম্বর তার সঙ্গে পরা, গাড়ী চালায় সর্বক্ষণ!
গাড়ীর তৃতীয় ক্লাসে প্রকৃতি আশ্রয়,
গাড়ীর মুখ রয়েছে তালা আঁটা, চড়তে লাগে বিষম নেটা,
সিক ঝোলান নিক্তির কাঁটা তার ভিতর,
হাসেন ঘড়ি আনতেছে গাড়ির খবর।
ইঞ্জিন পাতা হচ্ছে সেই মহাজন, নানা দ্বারে বয় যে পবন।
এই গাড়ির কল জানে যে জন হাতে তার চৌদ্দ ভুবন।
গাড়ীর চতুর্থ ক্লাসে মঞ্জুরি আশ্রয়, রাধাকৃষ্ণ যুগল সেবা
মনে প্রাণে রাত্রি দিবা এই গাড়ির কল জেনে কর চলাচল।
আবার মোক্ষ গাড়ি চালাই দেখ সেই একজন।
আমার গোঁসাই গুরুচাঁদে বলে, চৌদ্দ ভুবন একটি কলে,
দুই চাকাতে গাড়ী চলে চালায় বসে মন-পবন॥ —ঐ

১৪

মন ময়্‌না কেমন ভিয়েনদার জান্‌বোরে এবার।
হরিভক্তি রসে ভিয়েন করা, যুক্তি কর মালোদ্ধার॥
তোর দেহ খুলিতে, সাধন-চিনি দে তাতে,
ওরে মনোযোগের অনযাগের হাতা নে হাতে।
কর নিরবধি শ্রবণাদি নাড়া চাড়া বারম্বার।
বৈরাগ্য অনলে, রিপু কেমন॥
উদয় রবি হয় না সে দেশে, কারণ বারি তুফান ভারি, মৃত্তিকা ভাসে।
সেথা খোড়ায় চলে পাথর ঝোলে, শূন্যে করে আকর্ষণ।
বসনেতে বহ্নি বাঁধা রয়, হস্ত হীনে ঘোর সংগ্রামে যুদ্ধ করে জয়।
কাঙাল গোপাল শুনে মনে প্রাণে গোবিন্দের ধরগে চরণ। —ঐ

১৫

আহা মরি, নীচে পদ্ম উদয় জগৎময়।
আসমানে রয় চাঁদ চকরা তাদের কেমন করে যুগল হয়॥
নীচে পদ্ম দিবসে মুদিত আসমানেতে চন্দ্র উদয় তখন বিকশিত।
এদের দুয়েতে এক যুগল আত্মা রে, চন্দ্র লক্ষ যোজন ছাড়া রয়॥
পদ্ম কান্ত শান্ত দান্ত যে, সে মালীর সঙ্গে পরম রঙ্গে ভাব করেছে।
সে মালী কেমনে সাজিয়ে ডালি রে, মালী বসে আছে দরজায়।
গুরু চন্দ্র শিষ্য পদ্ম যে তারে তারে তার মিশায়ে গেঁথে রেখেছে,
খ্যাপা মদন বলে, তেমনি হলে রে, তবে যুগল মিলন দেখা যায়। —ঐ

১৬

আছে পূর্ণিমায় চাঁদ মেঘে ঢাকা।
মেঘ না কাটলে চাঁদের পাবি না দেখা রে, পাবি না দেখা।
যখন মেঘ তোর কেটে যাবে, তখন চাঁদের উদয় হবে।
জ্ঞানচন্দ্রে দেখতে পাবে চাঁদে চাদে মাখা চোখা।
মেঘের কোলে চাঁদ রয়েছে, চাদের কোলে বিদ্যুৎমালা।
মেঘ কেটে চাঁদ উদয় করা সেটা কিন্তু লেখা জোখা।
মদন বলে অন্ধকারে বন্ধ হয়ে রইলাম একা,
যার হয়েছে গুরুর কৃপা সেই পেয়েছে চাঁদের দেখা। —ঐ

১৭

সোলা ডুবে পাথর ভাসে, হরিনামের নিশানা,
নাগের সঙ্গে নেউলের পিরীত স্বরীত হোলে যায় জানা।
অষ্টমীতে একাদশী, বিধবা রইল বসি,
পূর্ণ শশী উদয় আসি নিত্য করে ছলনা।
খাইলে যে গর্ভ হয়, না খাইলে পাপের উদয়,
কৃপা করি, হে দয়াময়, আমাকে তাই বল না,
জননী উদরে পতি, সতী হলো গর্ভবতী,
সে সতীর নাইকো গতি, উপপতি করে না।
পতি যায় সদা বিদেশে, নিত্যই রমণ করে গো সে,
সে সতী সত্যই প্রসবে পতির হলো ঘোষণা।

ছয় আঙুল মাথা, সে মলে গোর দিবে কোথা,
বল দেখি এসব কথা ওহে মহাজন।
সে ছেলের যে নাইকো মরণ, মলে হবে করণ কারণ,
রতিলালের এই নিবেদন যুগল বাসনা। —মুর্শিদাবাদ

১৮

আমার মন-মাঝি, শ্রীগুরু কাণ্ডারী তরীতে বসাও,
দেখি আত্মা নদীর বিষম পাথার পাছে এ তরী ডুবাও।
সেই ত্রিপর্ণের খালে বিষম তরঙ্গে জলে
মরবি ডুবে খাবি খেয়ে, বাঁচবি রে তুই কার বলে।
তাই বলছি তোরে বারম্বারে চেতন গুরু সঙ্গে নাও।
তরীর বিচিত্র গঠন বোঝাই আছে রত্ন ধন,
খুব হুঁসিয়ারে, প্রেম নগরে সহজে যাওরে মন।
সেথা গেলে পরে, পটুবে দরে, ওজন সূক্ষ্ম উচিত তাও।
যারা বেচে মন ধনে রত্ন মাণিক কি চেনে,
তাদের সঙ্গে সওদাগরি পটবে কেমনে।
তাদের পুঁজি নাস্তি বোঝাই কিস্তি, ফোরাতে কি জানে, ভাই।
আছে মণি বাঁধাঘাট দ্বারে মুকুন্দ কপাট,
চার চন্দ্রে সহরে ফেরে মাঝখানে সে লাট।
গেলে দেখতে পাবে সুফল হবে, যদি সব জ্বালা মেটাও।
গোবিন ভাবছে বসিয়ে, সঙ্গের সঙ্গী না পেয়ে
সঙ্গী পেলে এতদিনে পৌছিতাম গিয়ে।
এসব কারবারিদের কারবারি দেখে, যেতে ইচ্ছা নাই কোথাও। —ঐ

১৯

বাঁজা নারীর ছেলে ম'ল করি কি উপায়।
মরা ছেলের কান্না শুনে মোল্লাজী পালায়॥
দাইমা মেরে ফয়তা সারে, নাপিত মেরে শুদ্ধ করে,
মোল্লা ডেকে ছেলের কল্লা কেটে ওগো জানাজা পড়ায়॥
ছেলে মরা তিন দিন হলো, ছেলের বাবা জন্ম নিল,
জন্ম নিয়ে কি ফল তাহার পায়॥

তোরা কে যাবি আয় মড়ার সাথে,
মড়া দেখে মড়াতে হাসে,
অধীন কোরবান্ ভেবে বলে মড়ায় মড়া খায় ॥ —ঐ

২০

আমি বেড়াই রে পাগলের বেশে।
আমি কুলকিনারা পাব কিসে ॥
সমুদ্রে তিনটি জেলে, মাছ মারে সে খেপলা ফেলে,
মাছ মারে সে ট্যাংরা বেলে, ও তার মাছ মারা কৃপা দোষে ॥
সমুদ্রে নাইকো তড়া, ভেবে পায় না আগাগোড়া,
আলোকলতার গোড়া ছাড়া রে ও তুমি বনে থাক কিসের রাসে ॥
একবার গঙ্গা একবার যমুনা, নিগূঢ় তত্ত্ব তাও পেলাম না,
ইহার কোন ধার নোনা, কোন ধার সোনা গো,
ইহার কোন ধারে জীব রসে ভাসে ॥
সমুদ্রে জোয়ার এলে, উজান কি তাই ভাটোয় চলে,
ও নবীন ভুগোল ভেবে বলে গো ইহার কেডা মান দিবে বলে ॥ —ঐ

২১

লা এ লাহা ইল্লাহর গাছে ফুটেছে এক ফুল,
ফুলের ছটায় জগৎ লুটায় নামেতে রসুল ॥
সে ফুল জগতের মুল, ও সে চাঁদ সমতুল,
আসমানেতে তার গোড়ারে ভাই, পাতালে তার মুল।
তার রূপে জগৎ কাঁপে চৌদ্দ ভুবন হয় আকুল ॥
চারি রঙ্গে গাছটি উঠেছে, পাঁচটি শাখা তার আছে,
পাঁচটি শাখায় পাঁচ রঙ্গের, ভাই, ফুল ফুটেছে।
কত দেবতা হল পাগল পীরওলি খোদার মকবুল ॥
সেই গাছের তিনটি মুল, আল্লাহ্ নবী মহম্মদ রসুল,
ফুলের মুলে বসে থাকে মালেক মওলা দিচ্ছে সদায় ঝুল
সে যে লহু মাফুজের গাছ ইল্লাহর বোঁটায় ইল্লাহর ফুল।

ভেবে নইমুদ্দিন কয়, যে দিন ফুল ফোটে, ভাই,
তুই ফুলেতে ঐক্য হয়ে ময়ূর নেচে যাই,
সে ফুল কেউ পায়, কেও না পায়, আল্লা করে যমুনার ফুল ॥ —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে বাউল লালন ফকিরের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গানটি তাহারই রচিত কি না, এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

২২

বল, কি করে নামাজ আদায় হয়।
গুরু, সত্য করে বল আমায় ॥
একশো তিরিশ ফরজ মশলা
তার ভিতরে বিষম ঘোলা
কোন ফরজটা পাব আল্লা ?
আমি যারে শুধাই সেই নারে কয় ॥
সাত জনাতে জামাত হল,
একজনা তার ইমাম ছিল,
দু'কারাত তার নামাজ হল,
বাকী এক রাকাতে এমাম মারা যায় ॥
মুক্তাদিগণ ভাবছে বসে, বাকী পড়বে নাকি মাটি দিবে,
কোন ফরজটা আগে হবে,
দরবেশ লালন ভেবে তাই নারে কয় ॥ —ঐ

২৩

শেষের দিনে সেজন বিনে কে তোর আপন হবে রে ॥
যে মাথাতে কাটছো তুমি বাঁকা আলবোট টেরি।
সে মাথা তোর শ্মশান ঘাটে যাবে গড়াগড়ি রে ॥
যে গায়েতে মাখছ তুমি আতর গোলাপ সাবান রে।
সেই গায়ে তোর জ্বেলে দিবে বন্ধুলোকে আগুন রে ॥
যে মুখে খাচ্ছ তুমি চিনি মণ্ডা মাখন রে।
সেই মুখে তোর তুলে দেবে বন্ধুলোকে আগুন রে ॥
ভাই কাটে ঝাড়ের বাঁশ বন্ধুকাটে দড়িরে,
চার জনাতে কাঁধে করে বলে হরি হরি রে ॥

মা কাঁদে, বাবা রে বাছা, ভগ্নি কাঁদে, ভাই।
পরের বেটি ঘরে কাঁদে আমার কেহ নাই রে॥ —মুর্শিদাবাদ

২৪

এস হে, গৌরচন্দ্র, নিত্যানন্দ সঙ্গে করি।
মনের আনন্দে দুই বাহু তুলে সংকীর্তনে নৃত্য করি॥
ভুবনমোহন গৌরা মনোহরের মনোহরা।
রাধার প্রেমে হয়ে বিভোরা ধূলায় দিচ্ছে গড়াগড়ি।
যে ডাকেরে গৌর বলে, ভয় কিগো তার ভবের কূলে।
চাঁদ গৌরকে চক্ষে হেরে মানব জনম সফল করি।
নন্দের চাঁদ নদে ছেড়ে এসে ভক্তের হৃদ-মন্দিরে॥
দ্বিজ ভূষণে বলে, অন্তিম কালে পাই যেন রাঙ্গাচরণ তরী॥ —ঐ

২৫

মন বাঁধা রয়েছে আমার রইলো কেবল গামছাতে।
এইবার ঘরে সুতো তাঁতীদের ঐ তাঁতে যাবো।
ভাল ভাল গামছা হবো রব নারীর বুকেতে।
এইবার মরে মাটি হবো, কুমোরদের ঐ চাকে যাব।
ভাল ভাল কলসী হবো রব নারীর কাঁখেতে।
এইবার মরে সোনা হব, স্বর্ণকারের ঘরে যাব,
ভাল ভাল হার হব রব নারীর গলেতে। —ঐ

২৬

গৌর, তোমায় ভজে হলাম নাচের ভিখারী।
নামাবলী কমণ্ডলু বহাতে আর না পারি॥
গৌরাঙ্গ নাম যে জন লয়, তার দুঃখ সর্বদায়,
ঘরবাড়ী ছাড়া যে দিয়ে গাছতলায় বসায়॥
গৌরাঙ্গ নবীন বয়সে কাঙ্গালের বেশে,
মাথামাথি কিসের তরে আর কাঁচা রসে।
এস গৌরহরি, তোমার না দেখলে মরি,
জীবন যৌবন যা কিছু ধন সবই তোমারি॥ —ঐ

২৭

যারে জগতে করে সাধন—হিন্দু কি যবন।
আমি কোরাণে পুরাণে শুনিতে পাইনি কোথাও নিদর্শন ॥
মুসলমানে একিন দিলে খোদার নামে আজান দিলে,
খুসী হালে তাই করে শ্রবণ,
হিন্দুর পূজা বড় মজা, নৈবেদ্য পুষ্প চন্দন ॥
কোনভাবে সে কখন ফিরে, জনমেতে দেখি নাই তারে।
তিনিই কালী তিনিই কৃষ্ণ রে তিনিই মাণিক মুক্তারন ॥
এক মাটি এক আগুন পানি, এক হাওয়া দিবারজনী।
ও চাঁদ কুবীর বলে যাদুবিন্দু বলে রে ধর গা গুরুর চরণে ॥ —ঐ

২৮

আর কতদিন থাকব বসে তোমার আশাতে।
কতটুকু ছাড়াছাড়ি তোমাতে আর আমাতে ॥
তুমিই তো দূরে থাকো, আমি তত পাই হে দুঃখ।
তুমি যত ভালবাস, পারি না ভালবাসিতে ॥
রাধাশ্যাম কয় মনে মনে, প্রাণ সঁপেছে রসিক জেনে।
ঠেলো না রাঙ্গা চরণে ঠেলো না চোর আসিতে ॥ —ঐ

২৯

এমন দুর্লভ মানব জনম পেয়ে,
হরি না ভজিলাম, আশায় মজিলাম,
যা কিছু বলে এলাম গেলাম ভুলিয়ে ॥
ময়দা বাজারে সয়দা হবে কি, ছয় জনা গাঁট কাটা জুটে খেলছে ফাঁকি।
সেই অবধি পড়লাম ফাঁকি, আঁখির গঞ্জের রাজা গেলরে বয়ে ॥
নবদ্বীপ ধাম হতে যে পুঁজি এনেছিলাম,
দেবগ্রামের তোলা দিতে আসলে হারালাম।
আছে বিক্রমপুরের হাট কি দিয়ে করিব আর,
সেই হতে দুর্দশায় নিল ফিরিয়ে।
ঢাকা হইতে যেদিন হইল আসা,
বলেছিলাম ভজব হরি, করগো খোলসা ॥

রংপুরের রং তামাসা, তা দেখে হল নিশা।
সেই অবধি দুর্দশায় নিল ঘিরিয়ে ॥ —ঐ

৩০

তোমার তার কে বসে করতেছ হে মাল গুজারী ;
ও চাঁদ গৌর হরি।
আমার সঙ্গে ছিল ছয়জন প্রেমের মহাজন,
তারাই করলো জুয়াচুরি ॥
সময়ে নাই বর্ষা বিন্দু, অসময়ে বর্ষা ভারি,
জমির ছয় দিকে ছটা ঘাস ছিটেছে, কেমন ক'রে আবাদ করি।
মহাজনের দেনা ধারি, দেনার জ্বালায় প্রাণ বাঁচে না,
আমি হিসাব করে দেখছি বসে, কোনদিন করবে শমন জারী ॥
গোঁসাই প্রেমানন্দ বলে, কোন ধারেতে রাখবেন দাঁড়ি।
মন বলেছেন, দয়া করে যেদিকে যাবেন গৌরহরি ॥ —ঐ

নিম্নের গানটিতেও লালন ফকিরের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। সে কোন প্রকার তত্ত্ব-সঙ্গীতে লালনের ভণিতা ব্যবহার করিবার রীতি তাঁহার ব্যাপক জনপ্রিয়তাই নির্দেশ করে।

৩১

গুরু, দোয়ায় তোমার মনকে আমার নাওগো সুপথে।
তুমি দয়া না করিলে গুরু তরব কি মতে ॥
তুমি যারে হওগো সদয়, সে তোমার সাধনে পায়।
দেহের বিবাদীরা তফাতে যায়, তোমার কৃপাতে ॥
যন্ত্র যন্ত্রী যেমন বাজাও, তেমনি বাজে তেমন,
তেমনি করে আমারি মন গেল তোমার হাতে ॥
জগাই মাধাই দস্যি ছিল, নামের গুণে তরে গেল।
লালন খ্যাপা পড়ে রইল তোমার আশাতে ॥ —ঐ

৩২

সখাসখী, তোরাই যা, আমি আর যাব না পাপ-ঘরে।
বারে বারে কৃষ্ণনিন্দা সহি বল গো কি করে ॥

ননদিনী বাক্য রসি, পাঁজর কেটে হিয়ায় বসি।
ডুবলো আমার প্রেম-কলসী, শ্যামকলঙ্ক সাগরে ॥
ননদিনী, বল বল, যার রাধা তারির হলো।
ক্ষ্যাপা বলে, হায়, কি হলো, এসে ভব সংসারে ॥ —ঐ

৩৩

আমায় দে গো মোহনচূড়া বেঁধে।
আমি কেন কেঁদে মরি, কৃষ্ণরূপ ধরি দাঁড়াব চরণ ছেঁদে ॥
এমনি করে একদিন মথুরাতে যাব, হয়ে কৃষ্ণ রাধিকারে সাজাব,
ও দুঃখ জানিনা জানিনা জানাব জানাব কত জ্বালা শ্যাম-বিচ্ছেদে ॥
এমনি করে একদিন লুকাব গোপনে,
ভুলেও শ্যামকে দেখা না দিব শয়নে স্বপনে,
বেলা অবসানে মদনমোহনে, আনিব মান-শরে বেঁধে ॥
মান ধরে যেদিন ঘটিবে প্রমাদ, বসনে ঢাকিয়ে রাখিব বদন চাঁদ।
নীলকণ্ঠ বলে, মেগে নিব অপরাধ, ধরিয়া যুগল পদে ॥ —ঐ

৩৪

ধনী, নত ভাবে বিচ্ছেদ কেনে।
হেঁট করে মাথা, কওনা কেনে কথা, বদন ঢাকলে, ধনী, নীল বসনে ॥
বল বল, ধনী, বিচ্ছেদের কারণ, কিসের জন্যে শ্যাম ধরেছিল চরণ,
ও কাল আসবে বলে কালা এলো সকালবেলা, সেই অপরাধে ধরি চরণে ॥
অধিক ভাবে ধনী অধিক বিচ্ছেদ হয়,
কথা সত্য বটে কথা মিথ্যা নয়।
পরের সঙ্গে সুখ চিরদিন না রয়, আপ্ত বিচ্ছেদ হলে থাকবে মনে ॥
বলো বলো, ধনী, বিচ্ছেদের ফাঁসী,
করে লয়ে বাঁশী চলেন কালো শশী।
কাঁদিতে কাঁদিতে মথুরাতে আসি, নিধন করলো সেই কংসধনে ॥ —ঐ

৩৫

হরি, দুঃখ দাও যে জনারে।
ও যার অদৃষ্টে নাই সুখ, বিধাতা বিমুখ, সুখ নাই তার ত্রিসংসারে।

অগ্রে যার ঘরে প্রবেশ করে ব্যাধি, আগে মরে তার পুত্র পৌত্রাদি,
কন্যা কি জামাতা দৌহিত্র থাকে যদি, পোষ্য পুত্র নিলে মরে ॥
বাণিজ্যের আশে গেলাম পরদেশে,
খাঁটী রূপো সোনা কিনলাম মেজে ঘষে।
কপালক্রমে হলো তামা দস্তা সিসে হিরে বিকায় জিরের দরে ॥
যার যখন কপালে ধরলো হে আগুন,
জলে করলে ঘর, তাতেও লাগে আগুন,
পুড়ে কোঠাবাড়ী, ছুটে টালি চুণ, লোহার তীরে ঘুণ ধরে ॥
ক্ষেত্রে না হয় শস্য, বৃক্ষে না হয় ফল,
দুগ্ধবতী গাভী দুগ্ধহীন সকল,
সরোবর নদী শুকায়ে যায় জল, জল বিনে মৎস্য মরে ॥
কোথা থেকে পাপ ঋণ জুটে,
ঋণের দায়ে বিকায় বাড়ী বাস্তুভিটে,
নীলকণ্ঠ তখন বেড়ায় ছুটে ছুটে খেটে খুটে তখন পেট না ভরে ॥

—মুর্শিদাবাদ

৩৬

আমি নেমেছি অগাধ জলে কাতলা মারিতে।
কাতলা অতি মাতলা হয় ভারি,
ঘর বুলতে খালে ঢুকে।
আ মরি মরি, ও তোর কানখার ভিতর, হানলি আমারে।
তোকে লাথিয়ে তুলবো ডাঙ্গাতে নেমেছি অগাধ জলে।
কাতলা মারিতে ওগো বঠির চোটে, কাটি বসিয়ে,
তোর প্যাটাঙ্গাটা বার করিয়ে পেটটিকে চিরি।
ও তোর প্যাটাঙ্গাটা বার করিয়ে হায়গো মরি।
তোকে বোম ফুটাবো লাথিতে ॥

—ঐ

৩৭

ওই ওরে ঘর করেছি প্রথম চৌদ্দ ভুবন জোড়া,
আড়ের দিকে বানিয়েছি ঘর, আড়ের দিকে বানিয়েছি ঘর।
আড়ে সাড়ে তিন কড়ারে।

ওরে সকলে ধর বাগাইয়াছে, এরা চামর থ্যাড়ে ঘর ছেড়েছে,
কোন বাড়োই ছাঁচ কেটেছে,
নাইকো ছররা বররা, ও ঘরের গোড়া আঁটা,
দিয়াল ফাটা শুধু চামের আড়া।
ঐ দেহের মধ্যে সপ্ত সাগর, ইহার কোন কিনারায়
গহীর জলের, লোটাছে মরছে মাগোর,
দিইয়া ফিচা লড়া, ঐ হে কুবীর বলে,
কি সাধনে পাইহে চরণ থোড়া,
ঐ যে ঘর করেছি প্রথম চৌদ্দ ভুবন জোড়া॥ —ঐ

৩৮

ওগো আজব শহর নহর, বানাইল কোন জন।
সেই শহরে খোলা তালা সেই শহর কেউ দেখলে না।
কোমন দিয়ে চোর সাজায়ে।
সেই শহরে দেয় হানা, চোরে নিলে রত্ন ধন,
কেউ ছিল না সচেতন।
ওরে, কোমন দিয়ে নিয়ে গেল,
সেই শহরের বস্তু ধন।
আমার মন, আজব শহর বানাইল কোন জন॥
আর সেই শহরের আতায় নদী কোন বিধাতা ধায় রে,
আর কোন বিধাতা সাঁতার দিতে হাবু ডুবু যায় রে।
ও পাহাড়ে তীরপিনি, ওগো মাহাজ গয়রিণী,
তলায় পড়ে খায় থাপি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন জনে,
আজব শহর বানাইল কোন জন।
সেই শহরে রথ চালাইছে, দুই জনা তার সারথি,
ওগো দুইজনা তার সহকারী, দুই ধারে জ্বালাই বাতি,
আসা যাওয়া হচ্ছে পথে, ভজন কঠিন হয় না তাথে,
ঐ আপনি যেয়ে তাহার হাতে আপনা আপনি দেয় মরণ, দেয় মরণ,
আজব শহর বানাইল কোনজন॥ —ঐ

৩৯

মন আমার, দেহের নদী, যতই বাঁধি।
বাঁধলে বাঁধা ঠিক মানে না॥
নদীর বহস্ত ছিল, লা ফলিত,
ওগো, ঝড় বাতাসের ভয় ছিল না।
সেই নদী শুকায়ে গেছে,
ও খ্যাপার মনরে আমার।
তলায় পড়েছে তবু নদীর স্রোত মরে না।
মুনি মহান্তর বলে, নদীর কুলে ভাই রে,
বসত করা আর হল না।
সেই নদীর পাওড়া ভেঙ্গে।
ও খ্যাপার মনরে আমার,
সেই নদীর পাওড়া ভেঙ্গে
যাচ্ছে চলে, মুর জাঁই কুমীরের থানা।
সেই নদী শুকায়ে গেছে, তলায় পড়েছে
তবু ও নদীর স্রোত মরে না॥ —ঐ

৪০

এক গাছের ঐ চল্লিশ ডালো,
দশ ডালো তার গায়ের হ'ল।
কেনই বা গায়ের হ'ল, হাদীশ কোরান খুলে বল।
খোদার কুদরত হতে, প্রেমের গাছ হয়েছে দেখ।
সেই গাছেরো পাকে পাকে,
উড়ছে বুলবুল তার ঝাঁকে ঝাঁকে।
খোদার কুদরত হতে প্রেমের গাছ হয়েছে দেখ,
জমিরুল্লা আর খবিরুল্লা, প্রেম করেছেন খলিলুল্লা
সেই প্রেমেতে মধুমাখা।
কোন ফুলে তার মধু মাথা, কোন ফুলে তার মধু মাথা।
খোদার কুদরত হতে প্রেমের গাছ হয়েছে দেখ।
সেই গাছের ঐ পাতে পাতে, নাম লেখা তার খতে॥ —ঐ

৪১

ওরে, কেমন করে তুই কবরেতে থাকবি রে, মন, একেলা।
কব্বর যদি করবি আলো নমাজ পড় পঞ্চ বেলা,
তবেই পাবি নূরের আলো হাসরের বেলা।
মদন সা ফকিরে রে বলে, নামাজ রোজা করলে পরে,
আখেরেতে যাবি তরে নিদানের বেলা।
রে মন, থাকবি একেলা।

ওরে মন, তোর বাপ দাদা যা,

করছে তাই কর, দিয়া দিয়াসালাই সিগারেট বিড়ি,
অপব্যয় তোর পয়সা কড়ি, ছিলুমেতে তামাক পুরি,
চকমকিতে সায়ো, তোর বাপ দাদা, যা করেছেন তাই কর।
মোটা কাপড়, মোটা ভাত, কাজ কি তোমার বিলাসিতে,
চরখায় কোরে সূতা কেটে নিজে কাপড় বুনে পর।

৪২

মেহেরাজের কথা বাজে ফজরে,
কোন পায়গম্বর খোদায় দেদার, যায় আসে বাহুভরে,
তবে এক লক্ষ নয় হাজারের রাস্তা, যেতে হবে, সাঁই, দেদার,
নিশিরাতে গেলেন বেগে, কথা হল নব্বুই হাজার,
পৌষট্টি বৎসরের রাস্তা, গেলেন এলেন কইলেন কথা।
গরম ছিল বিছান কাঁথা, শিকল লড়ে তুয়ারে।
তবে নাপিত শুনে, ভাবে মনে, মিছা কথা সমুদয়,
নবীজীকে ইনকার কোরে, রাস্তা বেয়ে চলে যায়।
সেই সময় এক মেছোর মেয়ে,
মৎস্য নিয়ে যেতেছিল, তার কাছে মৎস্য নিল,
মূল্য দিয়ে তাহারে, মেহেরাজের ……ফজরে
তবে মৎস লয়ে, আলয়ে গিয়ে দিল আপন বিবিকে।
কুটো তুমি চল্লাম আমি, যমুনায় চান করিতে।
তেলের বাটী গামছা হাতে চল্ল নাপিত চান্ করিতে।

নাপতান লাগল মাছ কুটিতে,
দেখিল তাই নজরে, মেহেরাজের····· ফজরে।
আর তবে তেলের বাটী ডাঙ্গায় রেখে নামল নাপিত জলেতে,
ডুব দিয়ে নারী হল, রূপসী হয় দেখিতে,
সেই সময় এক যুবক এলো, সওদাগরের নৌকায় ছিল,
নৌকাতে তাহারে নিল, চলিল দেশান্তরে।
তবে ঘুরিতে ফিরিতে তাদের বার বৎসর গুজরাইল,
সেই নাপিত ল্যাপতানি সেজে তিনটি গর্ভ ধরিল।
ব্যাপার কোরে ঘুরে এলো, সেই ঘাটে উপস্থিত হল।
তেলের বাটী ডাঙ্গায় ছিল, দেখিল তাই নজরে।
তবে তেলের বাটী ডাঙ্গায় দেখে, কাঁদে নাপিত বারে বার,
হাতে ধরি মিনতি করি, আমিতো যাবো না আর।
পায়ের ঠুরী মেরাছিল, অমনি গিয়ে জলে পড়িল,
নারীর কায়া বদলে গেল, পুরুষ হয় পলক ভরে,
ডাঙ্গায় উঠে কাপড় চিপে, তেলের বাটী লয় হাতে,
ভয়েতে মোর অঙ্গ কাঁপে, কেমনে যাব বাড়ীতে।
নাপিত তখন বাড়ী গেল, নাপতানি সেই মাছ কুটছিলো,
তখনি খেয়াল হল, কি বলিলাম পায়গম্বরে।
তবে নাপিত বলে, ও লাপতানি, কুটা কেন হল না মাছ,
তুমি যেমন গেলা, তেমনি এলা, ভারি তোমার কথার ছাঁট।
সেই ঘড়ি খেয়াল এল, নবীর পায়ের উপর পড়ল।
তরী খিঁচে মুরীদ হল, হাবোল কয় খোস অন্তরে॥ —মুর্শিদাবাদ

৪৩

মন, তুই যদি আজ ফকির হবি রে,
প্রেমের ধন খরিদ কর নিজ মেয়ে হইয়া রে।
মুনোরে নদীর এপার ছিলি উপার গেলি,
আবার কেন সাঁতার লইলি রে।
এই নদীর ও নোনা পাণি, পুরুষ খেয়ে বলেরে,
মন, তুই যদি আজ ফকির হবিরে।

প্রেমের ধন খরিদ কর নিজ মেয়ে হইয়া রে।
মনোরে, মেয়ে হোচ্ছে তরুলতা,
এক স্মৃতিতে আছে গাঁথা, সেই অশান্তিকে শান্তি করে,
প্রেম ফলটি খোইয়ারে ; মন, তুই যদি আজ ফকির হবিরে,
প্রেমের ধন খরিদ কর নিজ মেয়ে হইয়া রে।
(মনোরে) মেয়ের হাতে তিনটি ফুল, দেখে পাষাণ হয় আকুল,
মেয়ে সদাই খেলে চক বাজারে, প্রেমের পুঁথুল হইয়ারে।
মন, তুই যদি আজ ফকির হবিরে ॥ —ঐ

৪৪

তোরা, আয়, কে যাবিরে নিতাই গোরার হাঁসপাতালে নদীয়াপুরে,
নিতাইবাবু সিভিল সার্জন অদ্বৈত গোঁসাই আছে কপাউণ্ডার।
পথ্য বলে দিচ্ছেন বাবু, হরি নাম দুগ্ধ সাবু,
সাবুর সঙ্গে পাতি নেবু ভব সংসারে ॥
তোরা, আয়, কে যাবিরে নিতাই গোরার হাঁসপাতালে ॥ —ঐ

৪৫

শব্দ গানের প্রতিটি ছন্দ, প্রতিটি বাক্য মানুষের চলার পথে সতর্কতার অভয়বাণী। আপাতদৃষ্টিতে গানগুলিকে নিতান্ত হাল্‌কা মনে হয় ; কিন্তু মানব-জীবনের নানা বাধা-বিঘ্ন, অন্যায় কার্যকলাপের বিরুদ্ধে উপদেশ ও ভাল মন্দের সমালোচনার মূল সুরটি এই গানের প্রতিটি ছন্দে প্রবাহিত।

ওরে মন-জেলে, কেন মরছ মিছে জাল ফেলে।
নাড়া চাড়া গুগলি ঝাড়া এই ছিল মোর কপালে ॥
মাছ ধরতে বাসনা জাল ফেলতে শিখলি না ;
জল দেখে জাল জড়িয়ে পড়ে ছড়িয়ে পড়ে না।
তুমি কিনা রাতে মারছ খেওয়া, মাছ রইল অগাধ জলে।
সে জালের চৌষটী ঘাই, তার একটি ভাল নাই,
ভজন সাধন পুর্ণকারী একটি দেখতে পাই ;
হরিনামের জীর্ণ সূতো ছিঁড়ে যায় গো টান দিলে ॥ —ঐ

৪৬

আজ আমার কাদা মাখা সার হ'লো।
মাছ ধরব বলে এলাম জলে ভক্তির জাল ছিঁড়ে গেল ॥
পঞ্চভূত লাগলো পিছে, মাছ ধরার পাঁচ বেঁধেছে,
ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে গেছে উপায় কি তাই বলো ॥
কপাল গুণে পেয়েছি কতককগুলো ॥
কুসঙ্গ সঙ্গে নিলাম, কি ক্ষণে মাছ ধরতে এলাম,
খ্যাপা খালুই হারালাম, হায়, কি আমার হলো,
আমি বিল ছেঁচে পাই চাঁদা পুঁটি বক চিলে লুটে নিল ॥

৪৭

গৌরলীলার বাজারে অবাক যাই হেরে।
সুঁচের ছিদ্র মজার কথা, ভাই, পার করে গজবরে ॥
একটা সজনে গাছেতে, জোড়া আম ধরে আছে,
আমের ভিতর জামের চারা, ভাই, জাম ধরে তাতে।
তার ভিতর এক মায়া নদী, হেম নদীতে প্রেম বাড়ে ॥
সাপে, নেউলে, ইন্দুরে, বিড়ালে,
এক ঘরেতে বাস করে, ভাই, একই মিলে।
তা দেখে এক মরা হাঁসে মুখে, হা গোবিন্দ, রব করে ॥ —ঐ

৪৮

অতি যত্ন করে রাখলাম চুল গো গোছে পেলাম না।
গোছে যদি পেলাম চুল গো বাঁধতে সময় পেলাম না ॥
চুলের জন্য দিলাম টাকা, তবুও চুল হলো না বাঁকা,
গালি দিবে কাকা ;
কাকা ক্ষমা দিতে পারে কাকী দিবে গঞ্জনা ॥
কোল্‌কাতার ঐ আমলা মেথি আনাইব রাতারাতি,
বাঁধবো গো ঝুঁটি,
খোঁপা তুলে বাঁধলাম ঝুঁটি শ্যাম কালাচাঁদ এলো না ॥ —ঐ

৪৯

মাটিকে খাঁটি জানরে, মন, কেন ভাব অকারণ।
এই মাটিকে খাঁটি জান্‌লে মাটি হয় অঙ্গের ভূষণ॥
ছিলে বাবার মস্তকে এলে মায়ের উদরেতে,
আর কবর আছে, বাছা, তোর ঐ মাটির ভিতরে।
এই মাটিতে কাশী গয়া এই মাটিতে বৃন্দাবন॥
আছে মক্কা মদিনা তার পিছনে থানা,
দমের ঘরে হাওয়ার নিবাস, তাও কি জাননা।
মলম চাঁদ ফকিরে বলে মাটীর কর গা অন্বেষণ॥ —ঐ

৫০

বাজল বাঁশী, চল, নাগরী, রেল দেখে আসি।
রেলের ধারে বাড়ী গো যাদের, তারা পড়েছে ফেরে,
ছেলেপিলে সব সামাল রেখো, ভাই, যাবে যে মরে।
বিধি কি লিখেছে কার কপালে তাই ভাবি দিবানিশি॥
গাড়ী তৈয়ার করলে কে, দেশে ইংরেজ এসেছে,
তারে তারে যোগ লাগায়ে, ভাই, গাড়ী চালাচ্ছে।
গাড়ী সকল রাস্তা ঢিমে চলে পাগ্‌লা কহে দমবেশী। —ঐ

৫১

বলব না, ভাই, সাধন ভজন, ভয় করে মনে,
বললে বুঝে রসে মজে, এমন মানুষ পাবে না কোনখানে।
ব্রজের সমপদ রাধারাণী, যার প্রেমে গোবিন্দ প্রেমী,
রাণী তাকেই বলে রজকিনী জগতের রসিকগণে॥
কিছু কই সাধকের সন্ধান অনুভবা নন্দ যিনি স্বয়ং ভগবান॥
তারি কন্যা কন্যার কন্যা কবিরাজের বর্ণনা॥
ভজন কথা বলছি এবার শুন মন দিয়ে,
কণার রানী কৃষ্ণের উদয় ভাঙ্গা অন্তরে
সর্বমোহন শ্রীকৃষ্ণ কোন কৃষ্ণ ধাতুর অর্থ সেইখানে॥
দ্বিজ হরেকৃষ্ণ কয়, কর রাধা পদাশ্রয়

হয়ে ধরা করিনি, সে কথা মিথ্যা নয়,
হলো রাধার দয়া তবেই বাস হবে বৃন্দাবনে ॥ —ঐ

৫২

ওরে অবোধ মন, বিবাহের কারণ
অকারণ কেন হতেছ উতল ॥
তোমার বিয়ে হবে, যবে বৈদ্য আসবে যাবে,
নাড়ী ধরে দেখবে রোজ দুবেলা ॥
পাড়া প্রতিবেশী বরযাত্রী যাইবে,
বাড়ী এসে তারা নিম মাত্র খাইবে
শৃগাল কুকুরের বাসর জাগাবে,
খ্যাঁকা খেঁকী হবে তাদের শোলোক বলা ॥ —ঐ

৫৩

ভয় করো না, ভোলা মন, থাকবে মনের সুখে।
চিন্তা জ্বর ছেড়েছে যখন ঘিরবেনা বিকার তোকে ॥
হয়েছে ঋতুর সমতা, সে-যে খুব সুখের কথা,
'টনিক' খেয়ে সবে চলে শক্তিহীনতা ॥
শরীরে শক্তি পেলে যাবে চলে বৃন্দাবন অভিমুখে,
বলে দিই ঔষধের দোকান
বাজারের মাথায় দোকান
অন্নপূর্ণা ফার্মেসী সেই দোকান, দোকান খানির নাম,
দোকান যাবে যখন চাইবে তখন রসবিন্দু টনিকে ॥ —ঐ

৫৪

গোবিন্দ আনন্দ মনে।
বিরাজিত একমনে ॥
কালুর রামে বৃষভানু সুতা
তমালে বেড়ান কমলতা ক্ষণপ্রভা নবঘনে ॥
আহা, মরি মরি, কি রূপ-মাধুরী তুলনা নাহি ভুবনে।
কিশোর-কিশোরীর মিলন দেখে
শুক সারিগণে করিছে সুখে প্রেমরাগ আলাপনে ॥ —ঐ

৫৫

একবার এস, গৌর গুণমণি।
আমি মনের সাধে পূজব রাঙা চরণ দুখানি ॥
এস নিত্যানন্দ সনে, গদাধরে নিয়ে বামে,
সম্মুখে, অদ্বৈত প্রভু, দাঁড়াও হে আপনি।
শ্রীরামাদি ভক্তবৃন্দ হইয়ে পরমানন্দ,
আমি পড়ি গিয়ে চরণ তলে লোটায়ে ধরণী ॥
আসিয়া অবনীতলে কত পাপী তরাইলে,
দীন বিষ্ণু বলে, থাকবো পড়ে একাকী হে আমি ॥ —ঐ

৫৬

গুরু গো, কি হবে উপায়,
তোমার ভক্তে যদি ব্রজনাথে ব্রজে যেতে হয়,
বাস করেছি মায়াপুরে আছে বাঁকা নদীর কাঁটা ঘিরে,
কেমন করে যদি উপরে ভাবছি বসে তাই ॥ —ঐ

৫৭

বলব না, ভাই, মনের কথা থাকুক মোর মনে।
মনের কথা বলে লোকে, পাগল সাজি কেনে ॥
কি মজা তার ভবের বাজার, নায়ক যাহার মন,
সেই বাজারে বাজার কর কেমন ভুলের ভুলে ॥ —ঐ

৫৮

মিছে তুই করলি সাধন, ও ভোলা মন।
পিছন ফিরে দেখলি না ॥
কাঁদিস তুই যাদের তরে, তারা আর চায়না তোরে,
পড়লি তুই বিষম ফেরে, ও তোর আপন ভাল দেখলি না ॥ —ঐ

৫৯

জয় রাধা রাধা রাধা বলে কে বাঁশীতে করে গান।
বাঁশীর সুরে রইতে নারী গেল কুলমান ॥

থাকি আমি গৃহকাজে, সদাই বাঁশী বাজে,
চল মন দেখি আসি, ললিতা ত্রিভঙ্গ কতই করে রঙ্গ,
কুলবতীর কুলে থাকে না পরাণ ॥

৬০

গৌর প্রেমানন্দে হরি বলরে বদন ভরে।
ওরে যেমন কলি তেমনি নাম ভাই কালের ভয়ে যাবে দূরে ॥
চৌরাশী জনম ভ্রমণ করিয়ে, সাধের মানব জনম পেয়ে,
কি বলে এলি জঠরে কর রে সমরণ ॥
তখন বলেছিলে ভজব হরি, আমি থাকব না তোমায় ভুলে ॥ —ঐ

৬১

প্রেম প্রেম সবাই বলে, প্রেম কাহাকে বলে, ভাই।
শুধাইব প্রেমের কথা, যদি কোথাও প্রেমিক পাই ॥
কেউ বলে প্রেম অতি সরল,
কেউ বলে প্রেম মাখা গরল,
কেউ বলে তুষের অনল, ধিক ধিক জ্বলে হিয়ায় ॥
কেউ বলে প্রেম পরশমণি,
কেউ বলে প্রেম দুখের খনি,
প্রেম কাউকে করে পাগলিনী
কারো প্রেমে দুকূল যায় ॥ —ঐ

৬২

করি কি, ওগো বৃন্দে, বল চলাচল আমরা রাই ॥
না নিলে ভূমণ্ডলে, কার কাছে কি যাব বল।
আসতে আসতে নিশি হল, ভোর হল তোদের কাছে,
চোর পুরুষের কত জ্বালা, রাখনা খবর
আমি জগতের মন জোগাই ; বৃন্দে, তাইতেঁ পেলাম প্রতিফল।
রাধা রাধা বলে সর্বদাই, আমি বাঁশরী বাজাই,
খেতে শুতে দিনে রাতে রাধার গুণ গাই ॥ —ঐ

৬৩

কি চিন্তা কর, ধনি, হরি হরি কর ধ্বনি,
চল, হেরি গো, হরি হরি, যে বিপদ আমার,
চিন্তিলে চিন্তা হরে, চিন্তা তাদের বিপদ হরে
সজনি, চিন্তা জ্বরে ঔষধ শ্যাম চিন্তামণি ॥ —ঐ

৬৪

ও সাঁই, কুদরতের ধনি কুদরত কামিনী,
আপন কুদরত তুমি বুঝ আপনি ॥
তোমার রূপের মহিমা কে করিবে সীমা।
তুমি নূরের দীপ জ্বালাও দিবা রজনী ॥
তোমার কুদরত দেখি বড় রসিক নাই তার জোড়া।
কেও মেলেনা তরা কেও মেলেনা শুনি ॥
এমন ক্ষুদ্র জনাকে তারে দিল কে রূপের ঝিকিমিকি,
খেলে পিছনে। —ঐ

মায়া গঙ্গা যমুনা সরস্বতী।
মাসে মাসে জোয়ার আসে ত্রিপীণি সংহতি ॥
যেদি নদী হয় উতলা তিন মায়ের খেলা,
একজন কালী একজন কৃষ্ণমালী
মাতা সেইদিন ধরাতে ধরলে হায় গৌরাঙ্গ মুরতি।
মায়ের গুণ কেবা জানতে পারে কিঞ্চিৎ জানে মহেশ্বর।
শিরে পশুপতি রাধারাণী শমন শয্যা সামর্থী তিন রীতি ॥
রসিক মেয়ে গোপন থাকে, ঘরে বসে জগত দেখে,
সতী হয়ে ধর্ম রাখে লয়ে উপপতি।
তার সাক্ষী দেখ গোপের মেয়ে গোকুলে বসতি ॥
এবার মরে মেয়ে হব, প্রেম সাগরে ঝাঁপ দিব,
মহাদেব সঙ্গে জেনে নিব প্রেমের রীতিনীতি। —মুর্শিদাবাদ

নিম্নোদ্ধৃত গানটির আর একটি পাঠ পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে—

৬৬

মেহেরাজের কথা বাজে ফজরে ॥
পঁয়ত্রিশ হাজার বৎসরের রাস্তা গেলাম এলাম হল কথা।
গরম ছিল বিছানা কাঁথা শিকল নড়ে দুয়ারে ॥
এক নাপিত শুনে ভাবছে মনে মিথ্যা কথা সমুদয়,
নবিজিকে ইনকার করে রাস্তা বেয়ে চলে যায়।
সেই সময় এক জেলের মেয়ে মৎস লয়ে যাচ্ছে চলে।
একটি মৎস্য নিল কিনে মূল্য দিয়ে তাহারে ॥
মৎস্য লয়ে আলয় গিয়ে দেয় নাপতানির হাতে।
তুমি মৎস্য কুট, যাচ্ছি আমি যমুনায় স্নান করিতে।
তেলের বাটি গামছা হাতে নাপিত গেল স্নান করিতে।
ডুব দিল নারী হল রূপসী হয় দেখিতে।
সেই সময় এক যুবক এল, সওদাগরি কাজে ছিল,
জাহাজেতে তুলে নিয়ে যায় সে দেশান্তরে ॥
ঘুরিতে ফিরিতে তাহার বার বৎসর গুজরাল।
সেই নাপিত নাপতানি হয়ে তিনটি গর্ভ ধরিল।
ফিরতি পথে সেই ঘাটেতে তেলের বাটি ডাঙ্গায় দেখে কাঁদে
নাপিত বারেবার,
পায়ে ধরি বিনয় করি আমি ত যাব না আর।
সেই সময় সওদাগর ক্রোধে জলিয়া উঠিল।
পৃষ্ঠ দৃষ্ট করে কিল গদাগদ মারিল।
পায়ের লাথি যেই মারিল অমনি জলে পড়েছিল।
নারীর কায়া পলট হল, পুরুষ হয় পলক ভরে ॥
গামছা চিপে ডাঙ্গায় উঠে, ভয়েতে তার অঙ্গ কাঁপে,
কেমনে যায় বাড়ীতে।
বাটি গিয়ে দেখছে সেথায় নাপতানি সেই মাছ কুটিছে।
নাপতানিকে বলে হেঁকে কুটা কেন হয়নি মাছ।
যেমন গেলে তেমন এলে ভারি তোমার কথার ছাঁট।

সেই সময়ে খেয়াল হইল, গিয়ে নবির পায়ের উপর পড়ল,

তরিদ খিঁচে মুরিদ হল, আলেপ খোম হয় অন্তরে ॥ —মুর্শিদাবাদ

পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ খোদার নির্দেশে মেরাজ শরীফ গমন করিয়াছিলেন। খোদার দরবারে খোদার সহিত ৯০ হাজার কথা সমাপনান্তে তিনি পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসেন। হজরত মোহাম্মদ ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে তিনি যে দরজাটি ভেজিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, তাহার কড়াটি তখনও নড়িতেছে। এই ঘটনা শুনিয়া এক নাপিত বিশ্বাস করিতে পারে নাই এবং হজরত মোহাম্মদকে অপমান করিয়াছিল। খোদার শাস্তি স্বরূপ নাপিত তাহার জীবনের আলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে হজরত মোহাম্মদের ঘটনা যে সত্য ছিল, তাহা অনুধাবন ও বিশ্বাস করিতে সমর্থ হয়। ইহাই গানটির মূল বিষয় বস্তু।

৬৭

আমার মন যাবিরে ভ্রমণে, কৃষ্ণ-অনুরাগের বাগানে।

সেথা যাবি প্রাণ জুড়াবি আনন্দ সমীরণে ॥

সেই বাগানে দুজন মালী, একজন উড়ে একজন বাঙালী।

সে যে নাড়ে চাড়ে সেচে পানি গাছ বাড়ে সুযতনে ॥

তার মধ্যে জলে সাঁতার খেলে হংস আর হংসী।

ইহার কোটী জন্মে পিপাসা যায় বিন্দুমাত্র জলপানে ॥

সেই বাগানে চৌদিকে বেড়া, আছে শূন্য পর খাড়া,

নেহাজ করে দেখ দেখি মন, তার মেলে না গোড়া।

শিব ব্রহ্মা রয়েছে খাড়া বাগান প্রবেশ করবার সন্ধানে ॥

ভেবে কুবির চাঁদ কয়, বাগান কিবা শোভাময়,

সেই বাগানে গেলে পাপীর অঙ্গ শীতল হয়,

যদি যেতে চাও, মন, সেই বাগানে;

ভাব রাখ মালীর সনে ॥ —ঐ

৬৮

ও আমার প্রাণ-বন্ধুরে, তোরা ধর গো ধর।

এখনও তো জেনে, রাধে, তাওতো জান না,

আমরা তোমার আছি সহায় কিসের ভাবনা ॥

যা গো যা তোরা যা সত্বরে,
এখনও তো যায়নি বন্ধু আছে পথও মাঝারে।
খাঁচা আমি গড়েছিলাম পাখীরও তরে,
সাধের খাঁচা শূন্য করে পাখী গেল যে উড়ে॥
স্বদেশ ছাড়িয়া বন্ধু গেল বিদেশে।
ও শ্রীহরি গেল অমূল্যেরে পাগল করিয়ে॥ —মুর্শিদাবাদ

৬৯

ওরে ও মন কাণ্ডারী, এই দেহতরী,
তুমি ভবসিন্ধু দিবা পাড়ি হয়ে খুব হুঁশিয়ারী।
ভবসিন্ধুর মাঝখান তোমার আছে তরীখান।
উঠবে যখন সে ঘোর তুফান খাওয়াবে চোবান।
থেক তুমি খুবই সাবধান, ঢেউ বুঝে বেও তরী।
তরীর বলি বিবরণ কি ভাবে করেছে গঠন,
২০৬ খানা তক্তা একই করেছে যোজন,
তাতে জোলুই পেরেক মনের মতন মেরেছে শক্ত করি।
তরী করেছে তৈয়ারী তার যাই বলিহারী,
ভাঙ্গিলে মেরামত করার নাইকো মিস্ত্রী।
ধন্য তাহার কারিগরী, ধন্য সে জন মিস্ত্রী।
আছে ৯ জন চড়নদার, তাদের বুদ্ধি চমৎকার,
একজনা রয় মালিক সেজে, দুজন সহায় তার।
এদের উপর নৌকার সব ভার, বাকী ছয় জন হয় দাঁড়ী,
ছয় জন টানে ছয় দিকে দাঁড় ফেলে, একে একে
সুযোগ পেলে তারা ছয় জন ডুবায় নৌকাকে।
মালিক যদি ঠিক না থাকে, মেরে দিবে এ তরী।
বোঝাই আছে রত্নধন, শুন ও মালিক সুজন,
মালের উপর রাখবে নজর সদা সর্বক্ষণ।
বজায় রেখে তোমার মূলধন করিবে মাল বিক্রি।
তরী চালাবে পালে, তুমি বসে থেকে হালে,
দাঁড়ী ছয় জন আটক রাখ সংযম-শৃঙ্খলে।

পড়লে ওদের মোহজালে ঘটাবে বিপদভারী।
তুলে হরিনামের পাল, তুমি বাগিয়ে ধর হাল,
তবে পাবে কুলের নাগাল হবে না বানচাল।
থাক তুমি হয়ে সামাল, টান রাখ ভক্তির দড়ী।
তরী বাইছে ভাড়াতে, লাভালাভ হচ্ছে যা,
তাতে এক জন হিসাব রাখছে বসে লিখে খাতাতে,
ও তা ভাগ করবে দাঁড়ী পাল্লাতে সে যে পাকা মহুরী।
ও দীন সুশীল কুমার কয়, দেহতরী বাওয়া দায়,
ভবনদীর মাঝে পড়ে হাবু ডুবু খায়।
কখন তলিয়ে যায় এই ভাবনায় আছি দিবাশর্বরী॥
গুরুর চরণ বাখানি, সাঙ্গ হয় সঙ্গীতখানি।
সভাজনে চাঁদ বদনে দেন হরির ধ্বনি।
সবে ধরুন এই তরণী, তরিবেন ভবপাড়ি॥ —ঐ

৭০

বুঝ্তে নারি কারিকুরি গাছ আছে তার গোড়াটি নাই।
ডাল কত তার শত শত, কত রঙ ধরে পাতায়॥
পাতার কথা বোলবো কি, ভাই, পাতায় বোঁটায় মিলন তার নাই।
পাতায় পাতায় ফাঁক পেলে খায়, পাতা আছে কালিখানায়॥
ব্যোমকেশ বলে শোন ছন্দি, গাছের গোড়ায় ফিকির ফন্দি,
না জেনে মন জানে বন্দী, কাঁদি বসে সেই গাছতলায়॥ —ঐ

৭১

ধর্ম মাছ ধরবো বলে, নামলাম জলে ভক্তিজাল ছিঁড়ে গেল॥
মাছ ধরায় ফের ঘটেছে, ছ'টা ভুল লাগলো পিছে;
ভয়ে প্রাণ শুকায়ে গেছে আর কিবা হবে বল॥
আমি প'লাম পাকে দারুণ পাকে আমার বলবুদ্ধি চুলোয় গেল।
কি ক্ষণে বিল গাবালাম, কুসঙ্গে জাল নামালাম,
ক্ষমায় খালুই হারালাম, আর কিবা হবে বলো।
আমি হিংসা, নিন্দা, গুগ্‌লি ঘুনী সে মাছ পেয়েছি কতকগুলো॥

এ ধর্ম সত্যবিলে, সুরসিক বাগ্‌দী জেলে,
শুধু রাগ-সিক্‌টি জালে আনন্দে মাছ ধরলে ভাল।
আমি বিলগুণে পাই চাঁদা, পুঁটী ; সে মাছ, বকচিলে লুটে খেল॥
গোঁসাই কুবেরে ভাষে, হতো তোর গদীতে বসে
কহে আজ বিন্দুদাসে একবার হরির নাম নিলে না, ওরে বোকা। —ঐ

শারদোৎসবের গান

শরৎকালীন দুর্গোৎসব উপলক্ষে প্রধানত গ্রামে গ্রামে প্রথমত আগমনী, তারপর বিজয়া গান শুনিতে পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত গানটি গ্রাম্য কবির রচিত বিজয়া গান।

(ওগো) বিদায় দাও জননী আমারে।
আমারে লইতে ডুলী লেগেছে দ্বারে॥
(মাতা) বলো না, বলো না, উমা, ও কথা বলো না।
জীবন থাকিতে বিদায় দিতে তো পারবো না॥
(ঐ) তোমারে এনেছি, গৌরী, সম্বৎসরও পরে।
তোমারে বিদায় দিয়া থাকি কি প্রকারে॥
(উমা) বলো না বলো না—ও কথা, বলো না বলো না ও কথা,
আমারে দিয়ে ব্যথা।
বলো না মোরে ওমা জননী॥ —মুর্শিদাবাদ

২

আশার স্বপন কি, মা, সফল হবে না, মোর পুজা কি নেবে না।
তোমার আশে নয়ন ভাসে, চরণে কি স্থান দেবে না॥
মন মন্দিরে তোমা লাগিয়ে, নানা ফুল রাখি সাজায়ে,
কি দোষ পেয়ে দেখো না চেয়ে অবোধে কি ক্ষমা দেবে না॥
কাকুতি মিনতি ধরি দুটি পায়, নিরাশা করে না আশায়,
মন্দিরও মাঝে মোহন সাজে, এসে তুমি দাঁড়াও, মা॥ —ঐ

শিবের গান

১

শিবের গান অত্যন্ত প্রাচীন। শিব সম্পর্কিত নানা লৌকিক কাহিনী ইহাদের মধ্যে গীত হয়।

বম্ বম্ বম্ ভোলা, ভোলার নামটি জপ্‌লে পরে যাবে ভবজ্বালা,
ভোলা গাল বাজায় আর বাজায় বগল, সকল লোকে বলে পাগল,
তার কণ্ঠের ভিতর হলাহল গলায় হাড়ের মালা।
ভোলার জটার ভিতর মন্দাকিনী, কুলু কুলু করছে ধ্বনি,
শিরোপরে ভুজঙ্গিনী করিতেছে খেলা।
ওরে, জ্ঞান নাই তিনকড়ি তুই বুঝবি কি তার লীলা,
কাশীতে রাজ-রাজেশ্বর বামে গিরিবালা। —বাঁকুড়া

২

ওগো ও মেনকা, মাথায় দে গো ঘোমটা,
কত কালের হবে বুড়া, কেউ না জানে তাহার গোড়া,
যার অনুচর কপাল পুড়া, জপ্‌ল তারি নামটা।
চুল পেক্যেছে দাঁত ভেঙ্গেছে, তবু বিয়ের সাধ না গেছে,
মাথায় জটা ত্রিশূল হাতে ঠিক ভিখারীর ঢংটা।
ওযে ভস্ম মাখে সর্বাঙ্গেতে চেপ্যে বেড়ায় বলদেতে দেখ্‌লো,
মাথায় জটা ত্রিশূল হাতে ঠিক ভিখারীর ঢংটা।
ও তোর জামাই-এর কপালে আগুন, নিপুণটা সব গাঁজায় আগুন,
কিন্তু শিবের স্বভাব করুণ সাধাসিধা মনটা।
মোটা সোটা জামাই যেমন, রূপের গিরিবালাও তেমন,
আ মরি, সেজেছে যেমন হাতীর গলায় ঘণ্টা।
এবার সিদ্ধি ঘুঁটে যাবে গৌরীর দমটা ॥ —তিলুড়ী (বাঁকুড়া)

৩

আদি অনাদি চিরজনম ভবসাগর তারণ নাদ বিন্দু শিব মহাগুরু,
রাম নাম জপ সদা পঞ্চাননে কোটি কল্প বিগত অধিষ্ঠানে,
নন্দন কানন পরিহরি প্রথমাধীশ্বর শ্মশানচারী
প্রণমামি শিব শ্রীচরণে।

কুললাজ মান ভয় সব ত্যেজে শ্রীচরণ রজে যেন মন মজে,
রহে মত্ত ধরা নামে রতিমতি প্রণমামি শিবং শিব দীনগতি ॥ —ঐ

৪

এই সময় একবার ভাবরে, মন, ভোলা।
সিদ্ধের ঝোলা মাপের মালা, সে ধন সঙ্গে রবেরে তোলা,
এ সময় একবার ভাবরে মন, ভোলা।
ভোলার দয়া চাও যদি, মন, সার কররে গাছের তলা।
সর্ব তীর্থময়ী গঙ্গা ভোলার আছে রে তোলা।
জন্মিলে মরণ আছে, তাইতে আর নাইরে বেলা।

শিলারির গান

পূর্ব বাংলার এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী ওঝা ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র বলিয়া ধানক্ষেত কিংবা বাড়ীঘরকে শিলাপাত হইতে রক্ষা করিয়া থাকে বলিয়া মনে করা হয়। তাহাদিগকে শিলারি বা হিরালি বলে। তাহাদের গান সাধারণত মন্ত্রের মত, আবৃত্তিকালে কিছু কিছু শুনিতে পাওয়া যায়, কিছু কিছু শুনিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের গীতিগত কিংবা সাহিত্যগত কোন গুণ নাই। তবে যত্যা হিরালির আত্মদান বিষয়ক একটি পালাগান পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত আছে, তাহাকেও হিরালির গান বলে। ক্ষুদ্র পালাগানটিতে কি ভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যত্যা হিরালি নিজের উপর সমগ্র শিলা আকর্ষণ করিয়া লইয়া নিজের জীবনের বিনিময়ে কৃষকের পাকা বোরো ধানকে রক্ষা করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে (বাংলার লোক-সাহিত্য, ১ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ৬৬০-৬৪ দ্রষ্টব্য)। তাহার কিছু অংশ এই প্রকার—

বারই বৈশাখের বেলা হৈল তিন পহর।
সাজিল বিষম দেওয়া মাথার উপর ॥
হাইড়া কুণায় গুড়্ গুড়্ ডাকে মাডি মিত্তিকা লড়ে।
আসমান হৈয়াছে কালা হিল নাকি পড়ে ॥
গুড় গুড় গুড় হিলের গৈড় পশুপক্ষী কান্দে।
আন্ধার হৈল দেশ কেউর না পরাণ বান্ধে ॥

হাওরে চাহিয়া দেখ্যা মাথাত দিয়া হাত।
সকলের এক চিন্তা কি করে বরাত॥ —মৈমনসিংহ

শীতলা পূজার গান

যশোহর জিলার রাজঘাট অঞ্চল হইতে সংগৃহীত শীতলা পূজার গান সম্পর্কে স্বর্গত গুরু সদয় দত্ত (প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৪০ সনে) লিখিয়াছেন, 'যেদিন শীতলার পূজা হবে, তার তিন বা পাঁচ কিংবা সাত দিন আগে থেকে যে গৃহস্থ মানত করেছেন, তিনি অধিবাসের আয়োজন করেন। পাড়ার বয়স্কা মেয়েদের এই উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করা হয়। মানতকারিণী সে দিন উপবাসে থাকেন। মেয়েরা সমবেত হলে উলুধ্বনি সহকারে সকলে ঘাটে যান। মানতকারিণী কুলার উপর একটি পিতলের ঘট রেখে ঘট ও কুলা মাথায় করে জলে ডুব দেন। ঐ জল ভরা ঘট ও কুলা ঘাট থেকে মাথায় করে এনে ঘরের মধ্যে ঘটস্থাপনা করেন। তারপর সমবেত মেয়েরা সেই ঘরের মধ্যে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করেন। জাগরণের সময় সমষ্টি-গীত হয়ে থাকে। প্রথমে হয় বন্দনা গান—'

প্রথমে বন্দিলাম আমি শ্রীগুরুর চরণ
—আমার মানেক ও ধন, আম্মার, আসরে কর রে আগমন।
তারপরে বন্দিলাম আমি শ্রীহরির চরণ—'ইত্যাদি। —যশোহর

শীতালং শাহের গান

সূফী সাধক শীতালং শাহ শ্রীহট্ট জিলার অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার বহু গান সেই অঞ্চলের লোকের মুখে মুখে আজিও প্রচলিত আছে। তিনি বহু মারফতি বা ভক্তিমূলক এবং মুর্শিদ্যা বা গুরুবাদী গানের রচয়িতা। ব্যক্তি-বিশেষের রচনা হইলেও ইহারা বহুল প্রচারের জন্য লৌকিক স্তরে নামিয়া আসিয়াছে। ইহারা বর্তমানে লোক-সঙ্গীতেরই অন্তর্ভুক্ত।

১

দেখ তোর স্বয়ামী পদে দিয়া মন, নারীগণ;
দেখ তোর স্বয়ামী পদে দিয়া মন॥
ভাগ্যমতী সেই নারী তারার চরকায় বসতি,
ও তারা অতি ভাগ্যমতী, হায় হায়।

ওরে চরকার সনে তাল কাটিয়া
নাল কাটিও অনুক্ষণ, নারীগণ ॥
নারীর সঙ্গতি গীত চরকা আর সুয়ামী।
ও তারা ভজে দিবাযামী, হায় হায়।
ওরে চরকার তালে হা হু জপি,
পাইয়া বসে সুয়ামীর মন নারীগণ ॥
শীতালং ফকিরে কয় সুতা বড় ধন,
সুতায় গাঁথা যায় রতন, হায় হায়!
ওরে চরকা হৈতে মন ছাড়াইলে
সুতা কাটে টনাটন, নারীগণ ॥
দেখ তোর সুয়ামী পদে দিয়া মন ॥ —শ্রীহট্ট

শীতলা মঙ্গল গান

বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম শীতলা। তাঁহার মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া যে আখ্যায়িকা-গীতি রচিত হইয়াছে, তাহাই শীতলা মঙ্গল গান নামে পরিচিত। মেদিনীপুর অঞ্চলের কয়েকজন কবি শীতলার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া লিখিত ভাবে কয়েকটি পাঁচালী রচনা করিয়াছেন, তাহা শীতলা মঙ্গল গান নামে পরিচিত। তাহাতে শীতলার উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হইয়াছে—

১

করিল পুত্রেষ্টি যজ্ঞ নহুষ বাজন।
কত মুনি ঋষি আইল কে করে গণন ॥
নির্বিঘ্নে করিয়া যজ্ঞ দিলেক আহুতি।
হইলেক পুর্ণ যজ্ঞ শাস্ত মতি ॥
যজ্ঞপূর্ণে নিভাইল যজ্ঞের অনল।
তাহে জনমিল এক কন্যা সমুজ্জ্বল ॥
মস্তকে ধরিয়া কুলা বাহির হইলা।
দেখি প্রজাপতি তারে যত্নে সুধাইলা ॥
কে তুমি সুন্দরী কন্যা কাহার গৃহিণী।
কি হেতু অগ্নিতে ছিলা কহ সে কাহিনী ॥

দেবী কন, অগ্নিকুণ্ডে মম জন্ম হইল।
কোথা যাই কি করিব পরাণ বিকল ॥
শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা কহিলা বচন।
যজ্ঞ শীতলের কালে তোমার জনম ॥
সেহেতু শীতলা নাম তোমার হইল।
মম বাক্যে যাহ তুমি শীঘ্র ভূমণ্ডল ॥

শীতলা দেবীর কাহিনীটি উড়িষ্যা হইতে বাংলাদেশে আসিয়া প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া জনশ্রুতি প্রচলিত আছে—

২

শীতলার জাগরণ পালা বঙ্গভাষায়।
নাহি ছিল কোন দেশে সুশৃঙ্খলায় ॥
অনেকের ইচ্ছা দেখে মনেতে ভাবিয়া।
উড়িষ্যা হইতে পুঁথি আনি মাঙ্গাইয়া ॥
উড়িষ্যায় লিখেছিল দ্বিজ নিত্যানন্দ।
নানাবিধ কবিতায় করিয়া সুছন্দ ॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে ব্যয় করি অর্থ।
বাঙ্গালা ভাষায় দিলাম করিবারে অর্ঘ্য ॥
শিবনারায়ণ সিংহ উড়িষ্যায় নিপুণ।
গীতছন্দে এই পুঁথি এই করিল রচন ॥

শীলাদেবীর পালাগান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র চতুর্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যায় 'শীলা দেবী' নামে একটি পালাগান মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা ত্রিপুরা জিলা হইতে সংগৃহীত। কাহিনীর নায়ক এক মুণ্ডা জাতীয় লোক। অরণ্যচারী নিরাশ্রয় মুণ্ডা একবার এক বামুন রাজার দেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে সে আশ্রয় পাইল। সে রাজার কতোয়াল নিযুক্ত হইল। রাজার শীলা নামে এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যার জন্য রাজা পাত্র সন্ধান করিতে লাগিলেন। একদিন মুণ্ডা রাজ দরবারে আসিয়া রাজার নিকট রাজ কন্যার পাণি-প্রার্থনা করিল। শুনিয়া রাজা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া গিয়া তাহাকে

কারাগারে বন্দী করিলেন। রাত্রিযোগে কারাগার ভাঙিয়া জঙ্গলী মুণ্ডা জঙ্গলে পলাইয়া গেল। তারপর দলবল সংগ্রহ করিয়া কিছুকাল পর আসিয়া বামুন-রাজার প্রাসাদ আক্রমণ করিল। রাজা পলাইয়া গেলেন। প্রতিবেশী এক রাজার রাজধানীতে গিয়া আশ্রয় লইলেন। সেই রাজ্যের রাজপুত্র শীলার নিকট আত্মনিবেদন করিল। কিন্তু রাজকন্যা শীলা বলিল, আমার পিতা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, মুণ্ডাকে যে বাঁধিয়া আনিতে পারিবে, তাহার নিকটই তিনি আমাকে বিবাহ দিবেন। রাজপুত্র মুণ্ডার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিল। মুণ্ডাকে পরাজিত করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিল। তাহাদের বিবাহের আয়োজন হইল, কিন্তু বিবাহের রাত্রে মুণ্ডা দলবল সহ রাজপুরী আক্রমণ করিল। রাজকুমারকে তীর বিদ্ধ করিয়া বধ করিল। বামুন রাজা এইবার ত্রিপুরারাজের শরণাপন্ন হইলেন। ত্রিপুরারাজ সৈন্য সামন্ত দিয়া তাহাকে সাহায্য করিলেন। মুণ্ডা পরাজিত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

শীলাদেবী পালাগানের প্রথমাংশ এই প্রকার—

বাড়ী নাই ঘর নাই জঙ্গল্যা মুণ্ডা রে ফিরে দেশে দেশে।
দৈবেত আনিল তারর ভালা বামুন রাজার দেশে রে ॥
তুমনা জঙ্গল্যা মুণ্ডারে—
মাও নাই বাপ নাই জঙ্গল্যা মুণ্ডারে ফিরে বাড়ী বাড়ী।
দৈবেত আনিল তারর ভালা বামুন রাজার বাড়ী রে,
দারুণ জঙ্গল্যা মুণ্ডারে।
জঙ্গলেতে জনম মুণ্ডারে, জাতিত জঙ্গলিয়া।
দরবারে খাড়াইল মুণ্ডা ছেলাম ত জানাইয়া রে।

শোক-সঙ্গীত

ইংরেজিতে যাহাকে Funeral song বলে, বাংলায়ও সেই শ্রেণীর গান প্রচলিত আছে, ইহা সাধারণত শ্মশান-যাত্রার সময় গাওয়া হয়—

১

কত সাধের বিয়ে বউ গেল মরে
মরণকালে কিছু বলে গেল না।

বউ-এর মাথা বাঁধা দড়ি যায় গড়াগড়ি
তুলে নিতে মন সরে না।
বউএর হাতে চুড়ি ভেঙ্গে দিত মুড়ি
তাইত' গো মন সরে না। —বেলপাহাড়ী (ঝাড়গ্রাম)

২

সারাদিন কাটিবে সুতা রাইত কাটাইব তালে মালে
বুঝিবে মরণকালে,
মা কান্দে হিতানে বসি বন্ধু পাশাপাশি,
ঘরের রমণী কান্দে যাইয়ম কোনখানে,
বুঝিবে মরণকালে।
আইব শমন লইব টানি হাত মারিব নিজ কপালে,
ও ভাই বুঝিবে মরণকালে ॥ —চট্টগ্রাম

৩

ওরে গোলাপ গাছের ফুল,
ডালপাতা মোর জমিনে নিল দরিয়ার কুল।
ওরে গোলাপ গাছের ফুল।
মক্কাতে গাছের গোড়া মদিনাতে মূল।
ওরে গোলাপ গাছের ফুল,
গাছের আদম সুরুত পাতার নাম রুসুল।
ডালপাতা মোর জমিনে নিল দরিয়ার কুল
ওরে গোলাপ গাছের ফুল ॥ —বেলপাহাড়ী

৪

শ্মশানমাত্র নাম, শ্মশান বড় সুখের স্থান
শ্মশানে সুখ দুঃখ সকলি সমান।
শ্মশানেতে গেলে থাকে না যাতনা
সেইত শ্মশান সাধনের স্থান যে
শ্মশানেতে নাই মান অভিমান, এই যে দেখিছ উচু নীচ ভাব,
শ্মশানেতে গেলে সবে সমভাব।
ব্রাহ্মণ চণ্ডালে সবে সমভাব শ্মশান ধামের এমন গুণ রে।

সেই শ্মশান ভূমি শান্তির আগার,
শ্মশানেতে কবে যাবে মন আমার।
এই ভব-জ্বালা সহ্য হয় না, আর বল শ্মশানেতে কবে করিবে গমন।
আমি কৃষ্ণময় জগৎ দেখি।
কৃষ্ণ মূল শাখা শিখিপুচ্ছ শাখা
কৃষ্ণ রূপে মাখামাখি। —বাঁশপাহাড়ী (ঝাড়গ্রাম)

শোলোক গান

পুরুলিয়া জিলার কুইলাপালের নিকটবর্তী এক গ্রাম হইতে ১৯৬৭ সনে সংগৃহীত এক শ্রেণীর গান শোলোক গান বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। কেন যে ইহাদের এই নাম, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

১

সরু ধুতি পরিতে নারি বাঁধিব মাথার কেশে
এত পীরিতি চমৎকার।
ফুলে ফলে কত ভেঙ্গেছে ডাল
হেদে হে নাগর, ডালিম নাগর, আমাদের পাড়া যাবে,
ডসর ডালিম তুলে দিব ছাদে বসে বসে খাবে।

—লাইলামডি (পুরুলিয়া)

২

কুয়াতে পড়িল ঝারি তুলতে নারি ও কুলবালা,
পীরিতি ভাব জান ত, আসবে দুবেলা।
আসবে যাবে সাবধানে, পাড়ার লোক না জানে,
পাড়ার লোকে দিচ্ছে পাহারা, কেউ না পড়ে ধরা।
আক বাড়ীয়ে গাঁদার গুড়ুর ছোলা বাড়িয়ে কে রে,
দিদির ভাতার গোরাচাঁদ ধরা পড়েছে।
আর মার না আর ধর না পায়ে দিও না বেড়ি,
কাটনা কাটি শোধব আমি চৌকিদারের কড়ি। —ঐ

৩

তালগাছটি এড়িবেড়ি নাম দিয়েছে ঢাকাই শাড়ী,
শিশিরে ভিজল শাড়ী আজ তুমাকে ছাড়াছাড়ি। —ঐ

৪

অগ্‌গে দিব সগ্‌গে দিব সঙ্গে শুব না,
কথা কইব কি ওরে গায়ের গয়না না হলে।
পান খায়েছি বল খেলেছি দাঁত করেছি ছোলা,
বন্ধুর লাগে হার গেঁথেছি কুড়চি ফুলের মালা। —ঐ

৫

ধনে লারচার কর, কন্তে, হাতে পাকা পান,
বুকেরি ডালিম দুটি বামুনকে কর দান।
কি বললে, বামুন ঠাকুর, তোমার কথাই মানে,
বার বছর বিব্যা হল সোয়ামিনে জানি না। —ঐ

৬

তালগাছে লাল গামছা কদমগাছে ঝুড়ি,
ছোট্ট ঠাকুরের ঠমক দেখি, মনে হয়, অমনি ভাতার করি। —ঐ

৭

জলের ভিতর মুড়ন গাছটি ভোমরে বিঁধেছে,
এমন সুন্দর গায়ে বেথ (ব্যথা) দিয়েছে। —ঐ

৮

জোড় পাতটি লড়েচড়ে, দিদির ভাতার গয়না গড়ে,
আমার ভাতার লক্ষীছাড়া, থনে থনে যায় ঢেমনি পাড়া,
ঢেমনি পাড়ায় কি কর, গামছা পেড়ে তামশা কর
তাইতে পাশা ঝনঝন করে। —ঐ

৯

উত্তর দিকে কলাগাছটি পশ্চিমদিকে মোছা,
আমার বঁধু দাঁড়াই আছে সরু ধুতির খোঁছা।
সরু ধুতির খোঁছায় ধরব মানবাজারের শ্যাম। —ঐ

১০

তেরে কেটে কি চাবিকাঠি
লাইলামডির মাইয়া বটি স্থলটি বন্দ,
কাঁচি ডালিমে হাত দিও না, তের টাকা দন্ড। —ঐ

১১

সইদাপুরের ময়দা বঁধু, বাগবাজারের ঘি,
আমি লুচি ছেঁকেছি।
কাগ্‌কে বগ্‌কে দিব তোমায় দেব না,
টাকা লিব কথা কইব সঙ্গে শুব না। —ঐ

১২

ভাতার ভাতার পুই পাতা, ও ভাতার তুই শুস্ কোথা,
আসবে থানেক রাত করে, ডালিম বিছাই যুত করে,
আমার ডালিমে হাত দিও না, তিরিশ টাকা দন্ড।
ডালিম ভেঙ্গে যাবে গো রট করে.
গড়তে লারবে সট করে। —ঐ

১৩

কপাটের টিকটিকিটি না খেলা, সে ত সব মোজার বেলা,
এক বালিশে দু মাথা,
আলো জেলে পান খাও কোথা।
উচ্ছ পাতা তারে গাঁথা তারে বিছানা,
আমি পুস্কারা পাখি আমি কেমনে রাখি। —ঐ

১৪

ও নাগ, মারিস না মরে যাব হে,
বাঁচে থাকলে কোল ভরে শুব হে,
ধাইরাইয়া যাব শ্বশুর ঘরে ইস্তফা দিব হে। —ঐ

১৫

কালো জলে কুঁচলা তলে ডুবলো সনাতন,
কোথা গিছলে সোনার ধন।
আজ সারাদিন কাল সারাদিন পাইনি দরশন॥

জোন্ত জোড়া খুজখুজানি বিরি কলাইর ডাল,
কোথা গিছেলে, বঁধু, কাল।
তোমার ঢেমনে দিচ্ছে গাল, দেখ ঢেমনে গাল,
আমি বুঝাই দিব গাল। —ঐ

১৬

আঠারোটা বেটা রোতে আরো খুঁজো পাটরাণী,
কাশীপুরের রাজা তুমি নামটি তোমার লালমণি। —ঐ

১৭

হায়সলিক (হেসেল) ঘরে টিকটিকি,
হাত বাড়ালে কালা রে, পা নামা যেমন সিকিটি।
আম পেড়ে দে ভালবাসা পা নামা জল খাবার মত,
নদী ধারে আন রতন (বাগান)
আম পাড়বে কালা রে, পা নামা জল খাবার মত। —ঐ

১৮

যা বলছে বলুক লোকে, ঘরের দেওর পরের কি,
সঙ্গে শোবার লজ্জা কি, ঘরের দেওর পরের কি। —ঐ

১৯

কাটাশ পারে বাংলা পান, পুরুষ হয়ে তুমি কর মান,
মান করেছ বেশ করেছ।
তোমার মত মলিন ছোকড়া, মিলায়ে নেব রাস্তাতে। —ঐ

২০

তলি তলাতে তরুলতা, চোখ ঠারাঠারি কিসের,
টাকা দিয়ে পরব শাঁখা, পিরিত রাখিব চিরকাল,
গোল মরিচের ঝোল। —ঐ

২১

তাল তলাতে নাগের বাড়ী, নাগ দিল ঢাকাই শাড়ী,
শিশিরে ভিজিল শাড়ী, আজ নিলাম ছাড়াছাড়ি। —ঐ

২২

ভালবাসায় বলেছিল রেট গড়ায়ে দেব,
তোমার সঙ্গে ভাব নাই রেট কেন লেব। —ঐ

২৩

চাবি গো চাবি, কলকাতায় নাচতে যাবি,
একশ টাকা বেতন পাবি। —ঐ

২৪

খেজুর গাছে কাজল লতা, কিছু কি দিয়া রেখেছ,
হাতে পায়ে জল শুকাই নাই আবার এসেছ। —ঐ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

বাসলী সেবক অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত একখানি প্রাচীন পুথি বাঁকুড়া জিলা হইতে আবিষ্কৃত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর রচনা বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন। ভাষা এবং লিপির প্রাচীনতা হইতেই পণ্ডিত দিগের মধ্যে এই ধরণের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, পদাবলী রচয়িতা দ্বিজ চণ্ডীদাসের তিনি পূর্ববর্তী কবি। সম্ভবত চৈতন্যদেব ইহারই পদ আস্বাদন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার জীবনীকারগণ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা একখানি প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রার পুঁথি। ইহাতে আধুনিকতম কাল পর্যন্ত বাঁকুড়া জিলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত কৃষ্ণযাত্রারই মত তিনটি চরিত্র আছে—শ্রীকৃষ্ণ, রাধা এবং বড়াই। ইহাদের গীতি সংলাপের মধ্য দিয়া কাহিনী অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ইহা লোক-নাট্যের (folk drama) একটি অতি প্রাচীন নিদর্শন। তবে ইহা লিখিত হইয়াছিল, এই পর্যন্তই। লিখিত হওয়া সত্ত্বেও ইহার লৌকিক গুণ যে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল তাহা নহে। তবে ইহার সম্পর্কে একটি কথা আছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে শ্রীরাধার বিরহ পর্যন্ত ঘটনা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। লৌকিক উপাদানই এই বর্ণনায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এ' কথাও সত্য ; তথাপি দেখা যায় যে, ইহার মধ্যে মধ্যে কবি তাঁহার স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক যোগ করিয়াছেন এবং গীত-গোবিন্দের কয়েকটি পদের অনুবাদ ইহার অন্তর্নিবিষ্ট

করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে ইহার লৌকিক গুণ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। তারপর ইহাতে বড়ু চণ্ডীদাসের যে ভণিতা যুক্ত হইয়াছে, তাহাও লোক-সাহিত্যের রীতি বিরুদ্ধ। সুতরাং লোক-সাহিত্য বলিয়া ইহা কতদূর গৃহীত হইবার যোগ্য ?

চৈতন্য পূর্ববর্তী কৃষ্ণপ্রসঙ্গে সমাজের সাধারণ স্তরে ইহার লৌকিক উপাদানই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল এ'কথা সত্য। তবে ইহাও স্বীকার করিতে হয়, জয়দেব তাঁহার গীতিগোবিন্দ কাব্যে লৌকিক উপকরণকে প্রাধান্য দেন নাই। রাধার উল্লেখ তাহাতে থাকিলেও মূলত কাহিনীতে শ্রীমদ্‌ভাগবতেরই ধারা অনুসরণ করা হইয়াছে। গীতি-গোবিন্দ রচনার দুই শতাব্দী ব্যবধানে রচিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে যে লৌকিক উপকরণের এত আধিক্য দেখা গেল, তাহার কারণ কি ? মনে হয়, লৌকিক স্তরে এই দেশের সাধারণ জন-সমাজের মধ্যে যে সকল প্রেম-কাহিনী প্রচলিত ছিল, তাহা নব প্রবর্তিত রাধাকৃষ্ণের প্রেম-প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া একটি কেন্দ্রীয় ঐক্য সূত্রে বিধৃত হইবার ইহাতে সুযোগ লাভ করিয়াছিল। যদি তাহাই হয়, তবে ইহা লোক-সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হইতে কোন বাধা নাই। সংস্কৃত শ্লোকগুলি ইহার লোক-সাহিত্য হইবার পক্ষে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারে নাই ; কারণ, ইহারা কাহিনীর অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে নাই। বিচ্ছিন্ন ভাবেই কাহিনীর মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। লৌকিক কাহিনীকে একটি পৌরাণিক আভিজাত্য দিবার প্রয়াসে ইহাদিগকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, ইহা ব্যতীত ইহাদের আর কোন উদ্দেশ্য নাই।

তারপর ভণিতার কথা বিচার করিলেও দেখা যায়, অনেক সময় রচনায় ভণিতা থাকিলেই তাহা লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতে বিচ্যুত পারে না। কারণ, রচনার মধ্যে ব্যক্তি প্রতিভার কোন সুস্পষ্ট স্বাক্ষর যদি অনুভূত না হয়, তবে ভণিতা থাকিলেই তাহা লোক-সাহিত্য হইবার পক্ষে কোন বাধা হয় না। এখানেও দেখা যায়, প্রচলিত একটি রচনা রীতি এবং ভাব-ধারা অনুসরণ করিয়াই অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস নামক কোন ব্যক্তি পদগুলি লিখিয়াছিলেন ; সমাজের মুখ চাহিয়াই ইহা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহা সামগ্রিক ভাবে সমাজের সাহিত্য রূপে গৃহীত হইয়াছিল। তারপর চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর সমাজে রুচির পরিবর্তন হইয়াছে ; সেইজন্য সমাজ ইহা আর রক্ষা করিতে

পারে নাই; কিছু কিছু শোধন করিয়া পরবর্তী কালেও গ্রহণ করিয়াছে; অধিকাংশ অংশই পরিত্যাগ করিয়াছে। সেইজন্য পুঁথিখানি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে স্থান পায় নাই। কিন্তু লোক-সমাজে যে ইহার ধারা অব্যাহত ছিল, তাহা ইহার বিভিন্ন অংশ যে ভাব সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়। জয়দেবের গীত-গোবিন্দের অনুবাদ কোন কোন স্থানে যে ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে কি ইহার লৌকিক ধর্ম বিনষ্ট হইয়াছে? তাহাও মনে করা যাইতে পারে না। কারণ, জয়দেবের অনুবাদ ইহাতে দুইদিক হইতে আসিতে পারে। প্রথমত প্রচলিত একটি মত এই যে, জয়দেব তাহার 'গীত-গোবিন্দ' দেশীয় ভাষায় প্রথমে রচনা করিয়াছিলেন, পরে লক্ষ্মণসেনের রাজসভার প্রভাব বশত সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রাপ্ত গীতগোবিন্দের দেশীয় ভাষার পদগুলি লোকমুখে প্রচারের ভিতর দিয়া আসিয়াছে। নতুবা ইহাকে একটি বহির্মুখী আভিজাত্য দিবার জন্য গীতগোবিন্দের কয়েকটি শ্লোকের বাংলা অনুবাদ ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। বিশেষত অনুবাদগুলি কাহিনীর ধারায় যে অবিচ্ছেদ্য হইয়া আছে, তাহা স্বীকার করিতে পারা যায় না। মনে হয়, একটি প্রাচীন প্রচলিত কৃষ্ণযাত্রাকে ইহাতে অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস নামক কোন ব্যক্তি লিখিতভাবে কৃষ্ণযাত্রার একটি নূতন রূপ দিয়াছিলেন। ভাগবত বহির্ভূত যে সকল কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা লৌকিক-স্তর হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। তখন লোক মুখে মুখে এই সকল বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত ছিল। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস বিচ্ছিন্ন লৌকিক কাহিনীগুলিকে একসূত্রে গাঁথিয়া দিয়া মালাকারের কাজ করিয়াছেন মাত্র। সুতরাং ইহাকে বাংলার কৃষ্ণযাত্রার প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুঁথিটি নিম্নলিখিতভাবে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত:

জন্ম খণ্ড, তাম্বুল খণ্ড, দান খণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভার খণ্ড, ছত্র খণ্ড, বৃন্দাবন খণ্ড, কালিয়া দমন খণ্ড, যমুনা খণ্ড, হার খণ্ড, বালখণ্ড, বংশীখণ্ড, রাধাবিরহ। ইহাতে একমাত্র জন্মখণ্ড ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতের ঐতিহ্য আর কোথাও গৃহীত হয় নাই। জন্মখণ্ডের মধ্যেও লৌকিক উপাদান প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সুতরাং ইহাতে গীতগোবিন্দের ধারাও অনুসরণ করা হয় নাই। উপরোক্ত খণ্ডগুলির প্রত্যেকটি এক একটি মূলতঃ লৌকিক স্বাধীন প্রেমকাহিনী ছিল, কালক্রমে

নায়ক-নায়িকার স্থলে রাধাকৃষ্ণের নাম গৃহীত হইবার ফলে কাহিনী একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। ইহার ভাষা খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর রাঢ়ের ভাষা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বাংলার লোকগীতির ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন রূপে এখানে তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করা যায়—

১

দধি দুধে পসার সজ্জা আঁ।
নেত বাস ওহাড়ন দিআঁ॥ ল রাধা॥
সব সখিজন মেলি রঙ্গে।
এক চিত্তে বড়ায়ির সঙ্গে॥ ল রাধা॥
নিতি জাএ সর্বাঙ্গ সুন্দরী।
বন পথে মথুরা নগরী। ল রাধা॥ ধ্রু॥
একদিনে মনের উল্লাসে।
সখি সমে রস পরিহাসে॥
আগু গেলি সত্বর গমনে।
বড়ায়িক না করি যতনে॥
বকুল তলাত গোআলী।
বড়ায়ির পন্থ নেহালী॥
বসিলী মাথাতে দিআঁ হাথে।
বড়ায়ি চলিলী আন পথে॥
রাধিকা গুণিআঁ মনে মনে।
বড়াইর বিলম্ব কারণে॥
বন মাঝেঁ পাইল তরাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ —(তাম্বুল খণ্ড)

রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গের লৌকিক ধারা যাহা হইতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র জন্ম হইয়াছে, তাহা যে আজ পর্যন্ত বাংলার লোক-সঙ্গীতে সজীব রহিয়াছে, নিম্নোদ্ধৃত পদগুলি তাহার প্রমাণ।

দধি বিক্রয় ছলে যান শ্যাম-গরবিণী,
কৃষ্ণ-দরশনে যায় সঙ্গেতে গোপিনী।

কমলিনী চলিলেন মথুরার হাটে,
নাবিক হয়েছেন কৃষ্ণ যমুনার ঘাটে।
সঙ্গেতে বড়াই ছিল কাজে বড় পাকা,
নাবিক ও'পার বুঝি ঐ যায় দেখা।
নাবিক বলিয়া ডাক দিল যত সখী,
ত্বরায় আনিল তরী শ্যাম কমল-আঁখি।
কে গো তোমরা কোথা যাবে কাহার রমণী,
পরিচয় দাও মোরে সবিশেষ শুনি।
পরিচয় পেয়ে ছল করেন কমল-আঁখি।
ঢাকা খুল বসন তুল পসরায় কি দেখি।
ললিতা বলেন, ইত বড় মজার কথা,
কড়ি দিয়ে পারে যাব দেখাই কি কাজ।
ললিতা বলেন, ইত বড় মজার কথা,
দধি ছানা না বিচালে কড়ি পাব কোথা।
আসিবার কালে তুমি যত কড়ি চাও,
হাট বেলা বয়ি যায় পার করে দাও।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, ক্ষতি নাইকো সুন্দরী,
কেমনে হব যে পার অতি জীর্ণ তরী।
একে একে পার যদি হইতে পার সবে,
ভাঙ্গা নায়ে পার আমি করে দিব তবে।
স্বীকার করিয়া গোপী চাপিলেন নায়,
পরথম খেয়াতে রাধা বিনোদিনী যায়।
মাঝেতে লাগাইয়া তরী রঙ্গ করেন হরি,
তরঙ্গ হইল বড় সামলাইতে নারী।
গৌর অঙ্গে নীল শাড়ী পরেছ বড়াই,
সাজিল দারুণ মেঘ তাই তো ডরাই।
খুলহ আছে যত অঙ্গের অলঙ্কার,
কাল অঙ্গ ভারে তোমার তরী ডুবে যায়।

ধীরে ধীরে খুলে রাধা অঙ্গের ভূষণ,
হাসিছেন রসিক কৃষ্ণ মুরলীবদন।
নীল শাড়ী খুলে আমি তাই নাহি দায়,
কাল অঙ্গের ভারে তোমার তরী ডুবে যায়।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, মেঘ ধরেছে উত্তরে,
ঐ মেঘের তরে জল হইলেও হৈতে পারে।
এমন সময়ে জল ঝড় বৃষ্টি হৈল,
ছলকে ছলকে জল নৌকায় উঠিল।
অকূল মাঝারে কালা ডুবাইল তরী,
শ্যাম চাঁদ রাই চাঁদ যমুনার মাঝে,
নীল পদ্ম লাল পদ্ম, আ মরি কি সাজে!
জললীলা সাঙ্গ কর ত্রিভঙ্গ কানাই,
মাথাতে ঢালিব দধি এস হে নাগর।
বড়াইয়ের করে রাণী করে সমর্পণ,
এই মতে লীলা করে ব্রজের নন্দন॥

—বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

২

একদিন শ্যাম সঙ্গে মনরঙ্গে রঙিনী রাধে,
হয়ে প্রেমানন্দে মত্ত করির প্রায়
মাধুর্য প্রেম-লহরী খেলায়।
সঙ্গে পূর্ণমাসী ভগবতী নিত্যলীলা
করে যার সহায়।
তখন সঙ্গিনী গণে বলে আমার সব আশা হইল নিরাশ। —ঐ

৩

তখন হয় কেমন রাই অঙ্গে শ্যাম অঙ্গেতে মিলন।
ঐরূপ তাড়িত জড়িত যেন উজ্জ্বল বিদ্যুত বরণ।
হেরে মন হয় উতলা কুচিন্দু কিরণ
ঐরূপে দেখিতে দেখিতে হইল হরিত বরণ।
ও-যে দশভুজা এক নারী বাঁকা ত্রিনয়ন।

তাহার দশ করে অসিধরে সিংহপৃষ্ঠে হয় আরোহণ।
সাজিলেন শ্যাম হৈমবতী সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী বামে গজানন।
তাতে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি পেয়ে রাই করে সাধ্য সাধন।
তখন বৃন্দে কয় একি সাজ সাজলে রসময়—
তুমি অনাদি অনিত্য প্রভু জগৎ বিভু বিশ্বময়।
হায় পুরুষ-প্রকৃতি এমন কেশ কোথায় হয়
জানি এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি শিবশক্তি মিথ্যা নয়।
তুমি অখিল পুরুষোত্তম নাহি এ শ্যাম লয় প্রলয়॥
সত্যযুগে অবতরে বটপত্র করে আশ্রয়—
আবার ত্রেতাযুগে রামরূপেতে করিলে দিগ্‌বিজয়।
যেয়ে জনক রাজার লক্ষ্য বিদ্ধ সীতা সাজে পরিণয়।
আবার দ্বাপরেতে বৃন্দাবনে শ্রীনন্দের তনয়।
একদিন কৃষ্ণকালি বনমালি হয়েছিল আয়ন ভয়
আজ কার ভয়ে প্রাণ কালিয়ে এমন ভাব উদয়।
হৈয়ে শৈলবালা চিকণকালা কোথা ভোলা মৃত্যুঞ্জয়
একি সাজ সাজলে রসময়। —ঐ

৪

হরি হে কি লীলা কৈল্লে চমৎকার—
হৈলে যোগেশ্বরী যোগরূপিনী লীলা নিত্যকারিণী
চম্পকিনী সাক্ষাতে তোমার।
নারায়ণ ভয়ে গুণমণি হৈলে শিব সিমন্তিনী
মহিষমর্দিনী ভীমাকার।
সেদিন এক করে অসি ধৈরে নরমুণ্ড মালা পরে
জীবন ভিক্ষা দিয়েছ রাধার॥
অন্ধকার ভয়ে মনে করি দশ করে অসি ধরি
গৌরী তীর্থে হইলে অধিষ্ঠান।
কোটিকল্প বাঞ্ছা সিদ্ধি তুমি শক্তি ভক্তি হৃদি আজ
কিরোরিকি বর পেলে দান।

যেদিন অনন্ত শয়নে ছিলে কমলিনী পদ সেবিলে
শ্রীমুখে শ্যাম কৈলে অঙ্গীকার।
তুমি জন্মিয়ে দৈবকীর ঘরে মা বলিবে যশোধারে
রাধা হবে প্রেমের ভাণ্ডার।
তাতে ত্রিভুজ মুরলী ধরি রাই বলে বাজায় বাঁশরী
প্রাণ আকুল কইলে গোপিকার।
কইরে নিভৃত সঙ্কেত বনে রসকেলী যে যে স্থানে
মিলাইয়ে রসের প্রেম বাজার।
সে সব কথা ভুলে শ্যামরায় দেখাইলে ভোজবাজী
প্রায় অবলা কি বুঝিবে চাতুরী,
বল সত্য তত্ত্বকথা, প্রাণে আর দিও না ব্যথা,
দেখাও শ্যামরূপের মাধুরী।
তোমায় যে যে ভাবে ডাকে হরি
হায়রে প্রিয় ভক্ত জেনে দেও তারে চরণ তরি। —ঐ

৫

গেল মথুরাতে অক্রুরেরই রথে প্রাণনাথ মোর কহিল আই সবে বলে
আমি জ্বলে মরি তার বিচ্ছেদ অনলে।
আমার ফুরাইল আশাব্রত কত কাল হইল আকুল পাথারে
জন্মের মতন ভাসাইল ॥
আমার শ্যামচাঁদ বিহনে ও প্রাণে মৈলেম, গো সই,
আমার মনের দুঃখ কারে বা কই।
ছিলেন কৃষ্ণ ধনে ধনী কৃষ্ণ প্রেমে কাঙালিনী,
ও সোহাগিনী সই।
এখন হারায়ে সেই গুণমণি আমাতে আর আমি নই
দুঃখ কারে বা কই।
কৃষ্ণপ্রেমে মজে যার মন, বিচ্ছেদে তার কষ্ট কেমন,
ও জানে সেই জন, সই।
দিলাম চরণে তার জীবন যৌবন বিচ্ছেদ বেদন কেমন, সই,
জানি কৃষ্ণ কই। —ঐ

৬

হায়রে তোরে বলবো কি, সখি, আমায় ছেড়ে গেছে কমল আঁখি,
আমার প্রাণ কাঁদে চেয়ে দেখি আছে নীরব হয়ে কোকিল পাখি,
বৃন্দাবনে শোভা আছে আর বাকী আমি কৃষ্ণ বিনে শূন্য দেখি,
যদি না পাই সেই কমল আঁখি তবে কাজ কি এই জীবন রাখি !
এ ব্রজপুরে কেবা প্রেম করে কার বা এমনি হয়।
আমি অভাগিনী কৃষ্ণ কলঙ্কিনী ব্রজাঙ্গনা মোরে কয়।
আগিলা ঘাটেতে আমি স্নান করি পাছিলা ঘাটেতে নয়
আমার অঙ্গের জলে পরশ করি সাঁতার বইয়ে যায়।
আমার কানু বিনে আর কে আছে, আমি দাঁড়াব আর কার কাছে।
প্রাণ যায়, সখি, তোরা দে আমায় বিদায়।
আমি কৃষ্ণ ত্যাগি হলাম ব্রজে এ সাজে কি সাজে গো আমায়,
শুনলেম কৃষ্ণধনের ধনী কৃষ্ণপ্রেমের কাঙালিনী জানে গো ধনী।
আমার খুলে মাথার বেণী সাজায়ে দেও গঙ্গা মৃত্তিকায়,
আমার কাজ কি মিছে অলঙ্কারে সাজিয়ে দেখাবো কারে খুলে দে দ্বারে
যদি বন্ধু আসে ফিরে যতন করে রাখব রাঙা পায়,
আমার বন্ধু গেছে যে পথে আমায় নিয়ে চল সে পথে ধর দুই হাতে।
যদি পদ চিহ্ন পাই দেখিতে রাখব হৃদয় অন্তরে।
আমার মনের দুঃখ কার কাছে জানাব গো বন্ধু বিনে,
আমার মনের দুঃখে দুঃখী জগতে আর কে আছে গো।
আমি ভালোবেসে কার বামে দাঁড়াব, গো সই।
কার গলে বা দিব গো বনফুলে কারে বা সাজাবো
প্রাণে যে মইলেম, গো সই, কৃষ্ণ বিচ্ছেদ দাবানলে।
চিত্রপটে রূপ দেখাইয়ে শঠেরে প্রাণ সঁপেছিলাম,
আসিবে বলে চইলে গেলে ফিরে বন্ধু না আসিল,
শুইলে স্বপন দেখি জাগিলে না দেখি সখি ॥
শুন সখিগণ আমার বচন প্রাণ যাওয়ার সময় হইল,
যমুনার ঘাটে তমালের নিকটে আমারে লইয়া চল।
যমুনার মাটি অঙ্গেতে লেপিয়ে কৃষ্ণনাম লিখিগো তায়।

সর্ব সখি মিলে হরি হরি বলে যখন প্রাণ যায়।
হরিনাম শুধাইও কর্ণমূলে।
না ভাসাইও জলে, না পুড়াইও অনলে বেঁধে রেখো তমালের ডালে।
যখন শিশুকালে ধূলা খেলে আমি প্রাণ সঁপেছি সেই বেলা।
যদি প্রাণনাথ আমার আসবে ফিরে সবে কইলো তারে,
যেন অন্তিমে স্থান দেয় চরণ কমলে। —মুর্শিদাবাদ

৭

নিকুঞ্জবন শূন্য কইরে ত্যাজ্য কইরল অধমেরে কোথা গেল রাধিকা আমার,
দেখা দাও গো, রাইকিশোরী, নইলে আমি প্রাণে মরি, দাবানলে
জ্বলিতেছে জীবন।
নইলে ব্রজ ছেড়ে যাব বিষ খেয়ে প্রাণ ত্যজিব তোমার যদি না পাই দরশন,
রাধা আমার প্রেমের গুরু বাঞ্ছাসিদ্ধি কল্পতরু জগতগুরু বলে সকলে ;
অন্তর্দয় পরমানন্দ নিত্যসুখি চিত্তানন্দ আনন্দ অংশে আহ্লাদিনী বলে।
স্নান করিয়ে করি ধ্যান মূলমন্ত্র শ্রীরাধার নাম তর্পণ করি রাধাকুণ্ডের জলে।
হারাইয়ে চিরনিধি সদায় দিবসরজনী প্রাণ আমার কাঁদে রাধা বলে,
গিয়ে রাধার কুঞ্জজলে, প্রাণ ত্যজিব রাধা বলে,
এই যে, বিধুমুখি, আমায় কর সুখী, আর আমায় দিও না ফাঁকি,
ও দ্বিজকালী কয় পদে রেখো ও বংশীধারী। —ঐ

শ্যামাসঙ্গীত

পশ্চিম বাংলায় রামপ্রসাদ সেন এবং পূর্ববাংলায় দ্বিজ রামপ্রসাদের শ্যামা বিষয়ক পদ অনুসরণ করিয়া পশ্চিম এবং পূর্ব বাংলায় অসংখ্য শ্যামাবিষয়ক পদ রচিত হইয়াছিল। লোক-সঙ্গীতের সাধারণ নিয়মানুযায়ী ইহাদেরও রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। কিন্তু তাহা সত্বেও ইহাদের মধ্যে অনেক সময় সুগভীর ভক্তির স্পর্শ অনুভব করা হায়।

১

সাংখ্য দর্শনে,
সকলই শক্তির উপাসক শক্তি ছাড়া আছে কেরে,
মহাকাল মহাকালীর পদতলে আছে পড়ে।

বৃন্দাবনে নন্দের নন্দন সে ধইরাছে রাধার চরণ,
বল দেখিরে কি আকিঞ্চন অই রমণীর শ্রীচরণে। --মৈমনসিং

২

কালসাপিনীর কোলে ঘুমাও দিবা রজনী।
মাঝ ঘরে করেছে বাসা তারে জান নি।
শিবের মাথায় উদয় কাল, কালের মাথায় নন্দলাল,
কেন সাপের ভয় করে না কারণ জান নি।
সাপের মন্ত্র জানে যারা, সাপিনী নাচায় তারা
পাগল কয় বিষে ধরে না, জাগিলে কুণ্ডলিনী। —ঐ

৩

আদ্যাশক্তি মহামায়া
কে জানে মা তোর মহিমা ওগো মা মাগো,
তোমার চরণে কোটি নমস্কার গো ওগো মা।
অসুর জিনিয়ে মাতা, রক্ষা কইলেন দেবতা,
সংহার করিলে মহিষাসুর গো, ওগো মা।
তুমি গো মা বিশ্বেশ্বরী জগৎ জননী,
তোমার চরণতলে ভোলানাথ গো,
অধম গিরি কাতর প্রাণে ডাকে তোমায় সমাদরে, মাগো,
ওগো অন্তিমকালে চরণে দিও স্থান গো, ওগো মা,
মহিমা কে জানে তোর। —বেলপাহাড়ী (ঝাড়গ্রাম)

৪

শরণ লইলাম জীবণ মরণে চরণে তোমার শ্যামা মা।
একবার দেখা দে গো দীন জননী দিন ফুরায়ে যায়, মা।
আর কিছু ধন চাইনা মা বারেক হেরিতে চাই।
জনমের সাধ মিটাব জননী কোলে যদি এবার যেতে পাই।
বিতর তনয়ে করুণা লেশ কর দুঃখ হারা,
দুঃখেরী শেষ আর কত কৃত করমেরি দোষে
মরণ যাতনা সহিব, মা। —মুর্শিদাবাদ

৫

আর কবে দেখা দিবে, মা, হর মনোরমা।
ফুরাইল, মা, ভবের খেলা আই মা আই এই বেলা।
দিন দিন তনু ক্ষীণ আঁখি দুটো হয় হীন।
এখন না এলি শ্যামা, পরে কি আসবি, মা।
আর কবে দেখা দিবে, মা, হর মনোরমা
খাওয়ায়ে পরায়ে, মা, করেছ বহু যতন, আছ বট,
জানি শ্যামা দেখিনি, মা, তোর রূপ কেমন।
সন্তানের চোখে ঠুলি, তুমি দিলে মা কালী।
কালী ভেবে হলেম কালী, কালী কি করলি শ্যামা
আর কবে দেখা দিবে মা, হর মনোরমা। —ঐ

পরমা বৈষ্ণবী তুমি কালী করুণাময়ী।
তবে কেন ভালবাস ছাগ ও বলি ॥
করুণাময়ী পরমা বৈষ্ণবী তুমি।
রাজার কুমারী হয়ে কেন বেড়াও নেংটা হয়ে,
লোক-লাজে দিয়ে জলাঞ্জলি ॥ —ঐ

৭

মাগো, কেন নেংটা ফের,
বসন ভূষণ নাই, মা, তোমার রাজার মেয়ে গুমর কর।
এই কি গো তোর কুলের ধর্ম পতির উপরে চরণ ধর।
মাগো, কেন নেংটা ফের।
আমরা সবাই মরি লাজে একবার, মা গো, বসন পর।
মাগো, নেংটা ফের। —ঐ

৮

আ মরি কি লাজের কথা মিনসার উপর মাগী।
পদতলে পড়ে আছে অদ্ভুত এক যোগী।

নয়নে না দেখ চেয়ে সব আছে শব হয়ে।
এমনি সর্বনাশী মেয়ে লজ্জা সরম ত্যাগী।
আ মরি, কি লাজের কথা মিনসার উপর মাগী। —ঐ

৯

আমার মন-ভ্রমরা বেড়ায় মেতে কালী নামের কমল ছুঁয়ে
কালী কালী জপ কর মন মনের কালী যাবে ধুয়ে।
কালী আমার নামে কালো, কালী নামে জগত আলো ;
আমার ভক্তি-জবা আপনি ফোটে রাঙা পায়ে পরালে পায়ে ॥
সংসার ভাবনা আমার সঁপেছি ঐ পদে শ্যামার,
যেমন মায়ের কোলে।
শিশু আনন্দে মার কোলে শুয়ে ॥ —মুর্শিদাবাদ

১০

যে দুখে কাটে গো দিন, মা তারা, যে দুখে কাটে গো দিন।
দুখ যায় না, দুগ্‌গে, নানা উপসর্গে পরিবার বর্গে পরিশোধে ঋণ ॥
মনে করি দিব নাটশালাতে তাহা, সর্ব কাণ্ড মুনি সর্ব চণ্ডী মেলা,
হতে চায় না, মা:গো, শালপাতার চালা।
বিষম জ্বালারে জ্বালা জুটল কঠিন।
যে দুখে কাটে গো দিন……॥
মনে করি দিব ঝাড় গেলাসের বাতি,
হতে চায় না, মা, গো প্রদীপে শকতি।
কেরোসিনের তেল নিয়ে আলো জেলে
লাল ধোঁয়ায় মায়ের বদন মলিন ॥ —বাঁশপাহাড়ী (ঝাড়গ্রাম)

১১

মাইয়ার চরণ ভজ সবে ভাই জীবের আর গতি নাই।
জলে মাইয়া, স্থলে মাইয়া, অনলে অনিলে মাইয়া বসুমতী মাইয়া ;
(হা রে) ব্রহ্মাণ্ড উজাড়ি মাইয়া দেখি সর্ব ঠাঁই ॥
মাইয়ার চরণ ভইজে হরে, গঙ্গা রাখলেন জটায় ভরে,
কালী বক্ষোপরে ;
কৃষ্ণ ভজে চরণ ধরে আমায় ত্রাণ কর, গো মাই ॥ —ঢাকা

ষষ্ঠীর পাঁচালী

ষষ্ঠী দেবীর মহাত্ম্য কীর্তন করিয়া কয়েকটি ক্ষুদ্রাকৃতি পাঁচালী রচিত হইয়াছিল, দুই একটি সামান্য বৃহদায়তন লাভ করিয়া অপ্রধান মঙ্গল কাব্যের মধ্যেও স্থান লাভ করিয়াছে। রচনার দিক দিয়া ষষ্ঠীর পাঁচালী যেমন বৈশিষ্ট্যহীন, কাহিনীর দিক দিয়াও তেমনই। বিভিন্ন ষষ্ঠীর মধ্যে অরণ্য ষষ্ঠীর পাঁচালীটিই একটু বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু কাহিনীর গুণে তাহা পায় নাই, বরং বাংলার পারিবারিক জীবনে জামাতার যে একটি বিশেষ স্থান আছে, সেই গুণেই ইহার একটু ব্যাপক প্রচার হইয়াছিল। অরণ্য ষষ্ঠী উপলক্ষেই বাঙ্গালীর গৃহে জামাতার অর্চনা হইয়া থাকে। ইহার রচনা সাধারণ পাঁচালীরই মত—

১

পর্বত প্রমাণ যদি গৃহে ধন রহে।
অপুত্রীর মৃত্যুকালে রাজা সব লভে ॥
কাণা খোঁড়া হইয়া যদি পুত্র থাকে ঘরে।
মৃত্যুকালে অবহেলে পিণ্ড দান করে ॥

ষষ্ঠী ব্রতের গীত

পূর্ব বাংলায় অরণ্য ষষ্ঠী ব্রত উপলক্ষে মেয়েলী গীত শুনিতে পাওয়া যায়। সাধারণত জামাতা এই উপলক্ষে গৃহে আসিলে গীত গাহিয়া তাহার সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। গানের সুর সাধারণ মেয়েলী আনুষ্ঠানিক গানের সুর এবং বিষয় ষষ্ঠীদেবীর মাহাত্ম্য।

ষষ্ঠীমঙ্গল গান

বহু প্রাচীনকাল হইতেই বাংলার সমাজে সূতিকা গৃহে শিশুর জন্মের ষষ্ঠ দিবসে ষষ্ঠীদেবীর পুজা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৃন্দাবন দাস কর্তৃক রচিত 'চৈতন্যভাগবতে' চৈতন্যদেবের জন্মের ষষ্ঠ

দিবসে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠীপূজার বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। বস্তুতঃ ইহার বহু পূর্ব হইতেই ইহা সমাজে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে ইহার বিধান রহিয়াছে। এই বিষয়ে বাংলার প্রতিবেশী কোন কোন আদিম সমাজের সঙ্গে বাংলায় অনুষ্ঠিত আচারসমূহের আশ্চর্য রকম ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়; মনে হয়, ইহাদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক রহিয়াছে।

ষষ্ঠীদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া মধ্যযুগে যে মঙ্গলগান রচিত হইয়াছিল, তাহাকে ষষ্ঠীমঙ্গল গান বলে। ইহার একটি কাহিনী এই প্রকার—

একদিন সুলোচনাকে ষষ্ঠীদেবী জিজ্ঞাসা করেন; কোথায় গেলে তাঁহার পূজা প্রচারিত হইবে। সুলোচনা বলিলেন, দিলীপনগরে জয়সিংহ নামে এক রাজা আছেন, তাঁহার সাত রাণী, কিন্তু পুত্রকন্যা নাই। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশ ধরিয়া তুমি ভিক্ষা করিবার ছলে রাজার কাছে যাও এবং রাজার নিকট পূজা চাহিয়া লও; রাজা অস্বীকৃত হইলে ঘাটের কুলে অপেক্ষা করিও, ছোটরাণী ঘাটে আসিলে তাহাকে পুত্রবর দিও। এইভাবেই রাজবাড়ীতে তোমার পূজা প্রচারিত হইবে। ষষ্ঠীদেবী তাহাই করিলেন। রাজা রাজসভা হইতে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে তিনি ঘাটের কুলে ছোটরাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহেন। ছোটরাণী বলিলেন, 'আমার কোনও ধনের অভাব নাই, আমি তোমার নিকট কি বর চাহিব?' তখন ষষ্ঠীদেবী বলিলেন, 'সকল ধনের শ্রেষ্ঠ ধন পুত্র, তাহাই তোমার নাই,

পর্বত প্রমাণ যদি গৃহে ধন রহে।
অপুত্রীর মৃত্যু কালে রাজা সব লহে ॥
কাণা খোঁড়া হইয়া যদি পুত্র থাকে ঘরে।
মৃত্যুকালে অবহেলে পিণ্ড দান করে ॥'

ছোটরাণীকে ষষ্ঠীদেবী পুত্রবর দিলেন। যথাসময়ে তিনি এক পুত্র প্রসব করিলেন, ইহাতে অন্যান্য রাণীগণ ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার শিশু পুত্রকে জলে ফেলিয়া দিলেন। রাজাকে মিথ্যা করিয়া সংবাদ দেওয়া হইল যে, ছোটরাণী ইট, কাঠ, মুড়া ঝাঁটা প্রসব করিয়াছে। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া ছোটরাণীকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু পাত্রমিত্রের কথায় শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে ঘোড়াশালে বন্দিনী করিয়া রাখিলেন। ষষ্ঠীদেবী ছোটরাণীর সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,

বেঁচে আছে তব পুত্র জলের ভিতরে।
এস বাছা দুগ্ধ দিয়া আসিবে সত্বরে ॥

রাণী ষষ্ঠীদেবীর কথায় আশ্বস্ত হইয়া শিশুকে স্তন্যপান করাইয়া আসিলেন। ষষ্ঠীদেবী ছোটরাণীকে নানা অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়া পুনরায় ঘোড়াশালে পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন। এ সংবাদ শুনিয়া রাজা ছোটরাণীকে ব্যভিচারিণী বলিয়া সন্দেহ করিয়া হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। তারপর রাণীর অনুনয়ে তিনি সরোবরে গিয়া ষষ্ঠীদেবীর সাক্ষাৎ পাইলেন। দেবী তখন সাতটি শিশু হইয়া আবির্ভূত লইলেন।

ডালেতে বসিয়া যেন পক্ষী করে রা।
সেই মত শব্দ করে পাইয়া নিজ মা ॥

শিশুদের দেখিয়া রাজা পরম বিস্মিত হইলেন। ষষ্ঠীদেবী করুণাপরবশ হইয়া তাঁহার অবশিষ্ট ছয়টি রাণীর এক একজনকে এক একটি করিয়া ছয়টি শিশু উপহার দিলেন। সেই হইতেই দিলীপনগরে ষষ্ঠীপূজা প্রচারিত হইল।

সং

সঙের গান

উৎসব উপলক্ষে সঙের শোভাযাত্রা বাহির হইবার প্রথা এই দেশে অত্যন্ত প্রাচীন। ঢাকা জন্মাষ্টমী শোভাযাত্রায় সঙের গান ও নাচ প্রসিদ্ধ ছিল। কলিকাতার জেলে পাড়ার সঙের মুখে নৃত্য-সম্বলিত নানা কৌতুককর গীতি-কাহিনী শোনা যাইত।

১

হুঁকো স্বর্গ, হুঁকো ধর্ম, হুঁকোহি পরমন্ত্রঃ।
সর্ব দেবতা ত্যজিয়া ভজ হুঁকো শ্রীপাদপদ্ম॥
হুঁকো যার নাইরে, ভাই, এই সংসারে।
গলায় দড়ি লেগগে সে গিয়ে ভূত কাঠির ঝাড়ে॥
হুঁকোর লাল রং, কলকে কেন সাদা।
এমন হুঁকো যার নাই সে হ'ল গাধা॥
ধান ধন না থাকলে চাইলে ভিক্ষা মিলে।
হুঁকো ধন না থাকলে কোথাও নাহি মিলে॥
কহিয়ে সাধু মধুর রসের বাণী।
হরে হরে হরে॥ —বীরভূম

২

মজার সার্কাস দেখে যা টিকিট দু' আনা।
হরেক রমক দেখতে পাবি পয়সা লাগবে না॥
ওরে আমার কান্দির আদা, বেরিয়ে এস সোনা গোদা।
সোনা গোদা দেখুন সকলে, থাকেন ইনি মাঠের আলে,
আবার কাঁকড়া পেলে শালা
ব্যাটা কিছুই খায় না।
ওরে আমার কনক চাঁপার ফুল, বেরিয়ে এস গন্ধ গোকুল।
গন্ধ গোকুল দেখুন দেখুন সকলে।
থাকেন ইনি গাছের ডালে।

আবার গুড় পেলে শালা, ব্যাটা কিছুই খায় না।
ওরে আমার আশমানের বাগান, বেড়িয়ে এস বীর হনুমান।
হনুমান দেখুন সকলে, থাকেন ইনি গাছের ডালে।
আবার শশা কুমড়া পেলে পরে আর কিছু খায় না।
ওরে আমার হেলেঞ্চার শাক, বেড়িয়ে এস চিতা বাঘ।
চিতা দেখুন সকলে।
থাকেন ইনি মোর জঙ্গলে।
আবার গরু ভেড়া পেলে পরে ঘাড়টা রাখে না। —ঐ

৩

ও তোরা দেখে যা, দেখে যা, নূতন তাঁতির তাঁত বোনা।
মাকু করে আনাগোনা॥
চার ধারেতে চারটী খুঁটি, আছে তারা আঁটাআঁটি,
তাতে আছে শরের কাঠি চার খানা॥
ও তোরা, দেখে যা, দেখে যা, নূতন তাঁতীর তাঁত বোনা॥ —ঐ

সংকীর্তন

কীর্তন শব্দটি ওরাওঁ আদিবাসীর ভাষায় বিশেষ এক শ্রেণীর নৃত্য-সম্বলিত গীত অর্থে প্রচলিত আছে। প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রে কীর্তন নাম নাই। মনে হয়, কীর্তন কথাটি বিশেষ এক প্রকৃতির গান অর্থে বাংলা দেশেও প্রচলিত ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব জনসাধারণের মধ্যে নিজের ধর্ম প্রচার করিবার জন্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত একটি গীত-রীতিই যে অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা মনে করা নিতান্ত স্বাভাবিক। কালক্রমে ইহাকে আদিবাসীর গীতরীতি হইতে পৃথক্ করিবার জন্য বৈষ্ণব সমাজ ইহার সংকীর্তন নামকরণ করিয়া থাকিবেন। আদিবাসীর কীর্তন কথাটির সংস্কৃত রূপ সংকীর্তন। মহাপ্রভুর সময় হইতেই কীর্তনের পরিবর্তে সংকীর্তন নামটি গৃহীত হইয়াছিল মনে হয়। তথাপি প্রাচীনতর কীর্তন নামটিও পরিত্যক্ত হয় নাই। তবে আদিবাসীর কীর্তন হইতে বৈষ্ণবের সংকীর্তন যে ব্যাপক অনুশীলনের ভিতর দিয়া কালক্রমে রূপান্তরিত হইবে, তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক। নাম কীর্তনকেই

সাধারণত সংকীর্তন বলে। (সংকীর্তনের উৎপত্তির জন্ত নামকীর্তন বা কীর্তন দেখ।) 'চৈতন্ত-ভাগবতে' সংকীর্তনের এই নিদর্শনের উল্লেখ আছে—

শিষ্যগণ বোলেন, কেমন সংকীর্তন।
আপনি শিখায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥
(কেদার রাগ)
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥
দিশা দেখাইয়া প্রভু হাতে তালি দিয়া।
আপনি কীর্তন করে শিষ্যগণ লৈয়া ॥

সত্যপীরের পাঁচালী

বাংলা দেশে লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক যত পাঁচালী প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের পাঁচালীরই সর্বাধিক প্রচার হইয়াছিল। ইহার উদ্ভব যে খুব প্রাচীন, তাহা বলিতে পারা যায় না; কারণ, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী ইহার কোনও পুঁথিই পাওয়া যায় না; কিংবা প্রাচীন এবং মধ্যযুগের সাহিত্যেও সত্যনারায়ণের কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। স্কন্দপুরাণের এক স্থলে সত্যনারায়ণের উল্লেখ আছে সত্য, তবে তাহা যে পরবর্তী প্রক্ষেপ, তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব মনে হয়, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর কোন অলৌকিকতা সিদ্ধ মুসলমান ফকীর বা পীরকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার সমসাময়িক কাল কিংবা তাঁহার তিরোধানের অব্যবহিত পরবর্তী কাল হইতেই এই পাঁচালীগুলি রচিত হইতে আরম্ভ করে। এই পর্যন্ত অনুসন্ধানের ফলে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, ভৈরবচন্দ্র ঘটক নামক একজন কবি রচিত সত্যনারায়ণের পাঁচালীই প্রাচীনতম। অতএব অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনার কাল নির্দেশ করা যাইতে পারে।

মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর ভারত হইতে মুসলমান পীর দরবেশগণ বাংলা দেশে আসিয়া প্রবেশ করিতে আরম্ভ করেন এবং রাষ্ট্রশক্তির সহায়তায় তাঁহারা এ দেশের সমাজের জনসাধারণের মধ্যে মুসলমান ধর্ম প্রচারে মনোযোগী হ'ন। রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যপুষ্ট এই সকল মুসলমান ফকীরদিগের

প্রতি হিন্দু জনসাধারণের দৃষ্টি স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়, কিন্তু তাঁহাদের প্রতি তাঁহাদের যে অবিমিশ্র শ্রদ্ধাভাবই উদয় হয়, এমন কথা বলিতে পারা যায় না—শ্রদ্ধাভাবটি এখানে ছিল গৌণ, যে ভাবটি এখানে মুখ্য হইয়াছিল, তাহা ভয়। আত্মশক্তিতে মানুষ যখন বিশ্বাস হারায়, তখনই দৈব শক্তির উপর তাহার নির্ভর করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। মুসলমান রাজশক্তি কর্তৃক শাসিত বাংলার হিন্দু সমাজ সে দিন আত্মশক্তিতে বিশ্বাস রক্ষা করিবার সকল প্রকার অবলম্বন হইতে বঞ্চিত হইয়া একান্ত দৈব নির্ভরশীল হইয়া উঠিয়াছিল, সাহিত্যের ভিতর দিয়াও বাঙ্গালী সমাজের এই মনোভাবের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল—তাহার ফলেই মধ্যযুগের বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হইয়াছিল। সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের পাঁচালীর মধ্যেও সেইজন্য মঙ্গল কাব্যের অন্তরগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যগুলি খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী হইতেই রচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, চারিশত বৎসর ব্যাপী বাংলার হিন্দু সমাজের উপর ইহা যে সুগভীর প্রভাব স্থাপন করিয়াছিল, তাহারই বহুদূর আর একটি সাময়িক প্রতিক্রিয়া রূপেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে সত্যনারায়ণের পাঁচালীগুলির উদ্ভব হইয়াছিল। চৈতন্য ধর্ম প্রবর্তিত হইবার পর হইতে সমাজে শ্রীকৃষ্ণ বা নারায়ণের উপাসনা বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। দেশের বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণ বা নারায়ণকে তাহাদের আরাধ্য দেবতারূপে গ্রহণ করিয়াছিল; পঞ্চোপাসক হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও নারায়ণের উপাসনা একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করিল। অতএব এই যুগে সত্যপীর সত্যনারায়ণ রূপে হিন্দুর গৃহে পূজা লাভ করিতে লাগিলেন। ইহার বিজাতীয় সকল উপকরণ নারায়ণের নামে শোধিত হইয়া হিন্দুর দেবমন্দিরে ইহা নিঃসঙ্কোচে প্রবেশধিকার লাভ করিল।

বাংলা দেশ প্রাচীন কাল হইতেই ধর্ম সমন্বয়ের দেশ। কৃত্তিবাস বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্রকে দিয়া শাক্তদেবী চণ্ডীর পূজা করাইয়াছেন, বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধিকাকে দিয়া কৃষ্ণকালীর উপাসনা করাইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম সমাজের বহু সঙ্কীর্ণতা ও ছোট বড়র পার্থক্য দূর করিয়া দিয়াছে। মুসলমান ধর্মও রাষ্ট্রীয় শক্তির সহায়তায় যখন দেশের উপর আপনার একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছে, তখন তাহার সম্মুখ হইতে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করিবার পরিবর্তে সে তাহার সম্মুখীন হইয়া মুসলমান

ধর্মের মৌলিক উপাদানগুলিকে নিজের ধর্মের মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত করিয়া লইয়াছে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ধর্মসমন্বয়ের আদর্শ সকল দিক হইতেই পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল এবং তাহারই অবশ্যম্ভাবী ক্রমপরিণতিরূপে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণেশ্বরের মূর্তিমান্ বেদান্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে লাভ করিলাম; বাঙ্গালীর সর্বধর্মসমন্বয়ের সাধনা তাঁহার মধ্যেই চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে। সত্যনারায়ণ উপাসনার মধ্যেও হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের সমন্বয় সাধনের একটি প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রয়াসের মৌলিক উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন, অল্পদিনের মধ্যেই হিন্দু সমাজ তাহা বিস্মৃত হইয়া সত্যনারায়ণের উপাসনাকে নিজস্ব ধর্মচারের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিল। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের গবেষকদিগের মধ্যে ইহার যে তাৎপর্যই অনুভূত হউক না কেন, হিন্দুসমাজের নারায়ণোপাসনার মধ্যেই ইহার পরিণতি আজ সুনির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। সত্যনারায়ণের নামে ভগবানের অহৈতুক করুণা শক্তির উদ্বোধনই আজ এই উপাসনার লক্ষ্য হইয়াছে।

সত্যনারায়ণের পাঁচালী বাংলার জনশ্রুতি মূলক (traditional) সাহিত্যের অন্তর্গত। যে কবিই ইহা বাংলার যে অঞ্চলেই সর্বপ্রথম রচনা করুন না কেন, তাহা আজ বাংলার সর্বত্রই যে কেবল মাত্র প্রচার লাভ করিয়াছে, তাহা নহে, ইহার মৌলিক বৈশিষ্ট্যও সর্বত্রই সমান ভাবে রক্ষা করিয়াছে। সত্যনারায়ণের পাঁচালী সত্যনারায়ণের পূজা উপলক্ষেই পুরোহিত কিংবা তাঁহার সহকারী কর্তৃক আবৃত্তি করা হয়—এই আবৃত্তি পূজাচারেরই (ritual) অন্তর্ভুক্ত। সেই জন্যই মৌলিক কাহিনীতে ইহার কোন পরিবর্তন সাধন সম্ভব হয় নাই। তবে শত শত কবি আড়াই শত বৎসরের অধিককাল যাবৎ এই বিষয় অবলম্বন করিয়া পাঁচালী রচনা করিয়া আসিতেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দুইজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য এবং ভরতচন্দ্র রায়ও এই বিষয়ক পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা সত্বেও এই দুইজন কবির রচনা সমগ্র সমাজের এই বিষয়ক পাঁচালী রচনার ধারা রুদ্ধ করিয়া দিতে পারে নাই; দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন কবি বিভিন্ন সময়ে একই বিষয় অবলম্বন করিয়া পাঁচালী রচনা করিয়াছেন। এই সকল রচনার ভিতর দিয়া একই মনোভাবের অভিব্যক্তি দেখা দিয়াছে। অতএব বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক পরিচয়ে ইহাদের যে স্থানই থাকুক না কেন, বাংলার আঞ্চলিক রস ও আধ্যাত্ম পরিচয়ে যে ইহাদের মূল্য

নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়, তাহা স্বীকার করিতেই হয়। পাঁচালীর কিছু নিদর্শন দেওয়া গেল—

একদিন নারায়ণ কমলা সহিত।
কৌতুকে বৈকুণ্ঠে বসি প্রেমে পুলকিত॥
সরস আবেশে হাসি মৃদু মৃদু স্বরে।
শশীমুখ চুম্বি প্রভু কহেন লক্ষ্মীরে॥
কলিযুগে সত্য সেবা করিব প্রচার।
সেবিলে সবার হবে সুখ পারাবার॥
লক্ষ্মী কন নিবেদন শুন প্রাণেশ্বর।
বাসনা সত্যের তত্ত্ব শুনিতে সত্বর॥
শয়নে স্বপনে কভু না শুনি শ্রবণে।
সত্য কহ সত্য সেবা কেমন বিধানে॥
প্রভু কন মোর নাম সত্য ভগবান।
একান্তে সেবিলে অন্তে দেই দিব্যজ্ঞান॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে বিবিধ বিধানে।
মহর্ষি দেবর্ষি সবে পুজেছে যতনে॥
সেই লীলা কলিকালে প্রকাশিব সব।
সেবিলে সবার হবে সুখের উদ্ভব॥
এতেক প্রকাশি নিজ প্রেয়সী তুষিয়া।
অবিলম্বে গেলা প্রভু বিদায় লইয়া॥
আত্মকীর্তি জানাইতে অতি দ্রুত গতি।
বিপ্ররূপ ধরি মর্ত্যে করিলেন গতি॥
দৈবের নির্বন্ধ কার্য হয় সংঘটন।
পথেতে মিলিল এক ব্রাহ্মণ নন্দন॥
দীন হীন পরিধান মলিন অম্বর।
গাত্রে যজ্ঞসূত্র দোলে ক্ষীণ কলেবর॥
অনাহারে শরীরেতে বিহরিছে হাড়।
বিকৃত আকৃতি কান্তি অতি চমৎকার॥

কাশীপুর বাসী সদানন্দ নাম ধরে।
নিরানন্দ ভাবে দুঃখ-সিন্ধু মাঝে ফিরে॥
অতিকষ্টে যষ্টিপর করিয়া নির্ভর।
আচম্বিতে উপস্থিত প্রভুর গোচর॥
প্রভু কন কেন হেন দেখি বিড়ম্বন।
কোথায় চলেছ তুমি কাহার নন্দন॥
বিপ্র বলে ভিক্ষা তরে ফিরিছি নগরে।
মুষ্টি ভিক্ষা করি নিত্য পালি পরিবারে॥
দুঃখের নাহিক পার কি কব দুর্দশা।
ক্ষুধা হইলে নারীপুত্রে কহে কটুভাষা॥
সর্বদা কলহ হয় নাহি নিবারণ।
কন্যাগণ ছন্ন সদা অন্নের কারণ॥
দুর্ভাগা আমার নাম সর্বদেশ ভরি।
দুরন্ত দৈন্যের দায়ে মৃত্যু চিন্তা করি॥
তথাপি না যায় প্রাণ কি করি উপায়।
পরম পাতকী আমি বিষ্ম পায় পায়॥
শুনিয়া দুঃখের কথা দীন দয়াময়।
অভয় প্রদান করি হইলা সদয়॥
আমার বচন শুন ব্রাহ্মণ কুমার।
সত্য সেবা কর শীঘ্র যেয়ে নিজাগার॥
সর্বদুঃখ ঘুচে হবে সুখ অনুষ্ঠান।
পরকালে নিষ্কণ্টকে বৈকুণ্ঠেতে স্থান॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণ সুত অতি সকাতরে।
বলে প্রভু সত্য সেবা কোন উপহারে॥
প্রভু কন শুন ওহে দ্বিজের নন্দন।
সোয়া পরিমাণে হয় তাঁহার অর্চন॥
আতপের গুঁড়ি আর সুপক্ক কদলি।
কাঁচা দুগ্ধ ইক্ষুরস সুরস সকলি॥

মন বা সেরেতে তার নাহি নিরূপণ।
সাধ্যমতে একচিত্তে করিবে পূজন॥
এত বলি অন্তর্ধান হইলা তথায়।
অবাক হইয়া বিপ্র চতুর্দ্দিকে চায়॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া গেল ভিক্ষার কারণ।
মাগিয়া পাইল দ্বিজ অনেক রতন॥
অন্তরে পরম তুষ্ট হইয়া একান্ত।
গৃহে গিয়া গৃহিণীকে জানায় বৃত্তান্ত॥
শুনি সব সুখোদ্ভব আনন্দ বাড়িল।
বিপ্রনারী নারী সঙ্গে মঙ্গল করিল॥
কুটুম্ব বান্ধব ইষ্ট দ্বিজ অপ্রমিত।
সত্যের মাহাত্ম্য শুনি আসি উপস্থিত॥
সবে মিলি সভা করি মিলিয়া আসনে।
সন্ধ্যাকালে সত্য সেবা করে প্রাণপণে॥ —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত গানটি একদিন পীরের গান—

২

নামা দিয়া গোর বাহারে যায় নানান রঙ্গিয়া।
একদিল চলিয়া যায় সোলেমান গুদুরী গায়,
লোকে বলে বাওলা ফকির॥
একদিল চলিয়া যায়, তাল গাছও দেখিতে পায়,
আশা বনে হাতে তোলে লয়॥
একদিল চলিল পথে, ছ'কুড়ি ছয় বাঘ সাথে,
বাঘের ভয়ে ভাঙ্গিল নগর॥
একদিল চলিয়া যায়, রাঙ্গা চরণ খড়ম পায়,
হাতে আশা বগলে কোরাণ॥ —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত গানটি সত্যপীরের—

৩

আর কাঁদনা সত্যপীরের মা, ধরিয়ে দু'খানি পা,
বাবাকে বুঝায়ে রাখ ঘরে।

কি ও আহা বাবাকে বুঝায়ে রাখ ঘরে —
কাঁদে সত্যপীরের মা মায়ের ধরিয়ে ছু'খানি পা
বাবাকে বুঝায়ে রাখ ঘরে।
আর গগনে দ্বিপ্রহর বেলা, তাতিল পথের ধুলা
কেমনে যাইব বনবাসে ॥ —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত গানটি গাজীপীরের—

৪

প্রথমে ছুটিল ডিঙ্গা নাম ফরমান,
দল শিউলী কেটে ডিঙ্গা করিছে ময়দান।
তারপরে ছুটিল ডিঙ্গা আল্লার আরমান,
ওরে যেই ডিঙ্গাতে বোঝাতে করিলে কেতাব আর কোরাণ
তারপরে ছুটিল ডিঙ্গা নামে এই কালী—
ওরে বুঝতে বুঝতে চলে ডিঙ্গা বৈঠায় না পায় পানি।
তারপর ছুটিল ডিঙ্গা নামে এই মনা।
এরে যার গলায় সত্য নাইরে লক্ষ মন সোনা।
তারপর ছুটে ডিঙ্গা নামেতে সলার।
ওরে আকাশেতে চলে ডিঙ্গা পাতালে গলায়।
তারপরে ছুটে ডিঙ্গা নামেতে হাজারী,
আরে আগে লয়ে দেওয়ান খানা
পিছেতে কাছারী।
তারপরে ছুটে ডিঙ্গা নামে ইলসা পেটী,
মাল ও ধায় বোকায় করে ডিঙ্গা কেটে বনে মাটি।
ও কি হল, হল মোর আল্লাজী জয় জয় বল্যা মাণিক মাঝি
ডিঙ্গা ছেড়ে দিল।
আনন্দেতে সপ্তডিঙ্গা উজানেতে চলিল ॥
ওকি হল ওকি হল মোর আল্লাজী।
তিন দিন ও তিন রাত্রি ডিঙ্গা উজানেতে চলিল ॥
ছিয়ান সওদাগর ডেকে মাণিক মাঝিকে বলিল,
কত দূরও এলোগো, মাঝি, বল সত্য করে,

মাণিক মাঝি বলে ছয় মাস হবে আনুমানিক,
হিমান সওদাগর বলে শুন মাঝি ওরে তুমি,
এই ঘড়িতে সপ্ত ডিঙ্গা লাগাওরে তুমি।
নিশিও প্রভাত হল কোকিলে দিলে রা,
সেরজা হাত সেরজা পতিরা ঝেড়ে তোলেন পা।
সওদাগর বলে শুন ভারি মাঝি, বনে কাষ্ঠ কাটিতে যাও।
শুনিয়া যে ভারি মাঝি দা কুড়োল লয়ে যায়।
মরা বৃক্ষ দিল বলে সকল দেখিল নজরে।
হঠাৎ দেখে সে বৃক্ষ জীবিত হয়ে গেছে,
চল চল তাড়াতাড়ি বৃক্ষের তলায় যাব,
কি গুলি বান্দা আছে নয়নে দেখিব।
দূর থেকে নয়ন যায় সকলে দেখিল,
সেখান থেকে আদায় করে কথা বলিতে লাগিল।
ফকির নাইরে ফিকির নাইরে আছে আল্লার ওলি,
কত অধম তোরে যাবে পেয়ে পথের ধূলি।   —ঐ

৫

সত্যপীর মাণিকপীর রাজ্য অধিকারী,
তানার নামে বীণা লইয়া ফিরি বাড়ী বাড়ী।
গৃহস্থ সকলে দেন চাউল আর কড়ি,
পীরের নামে দিবেন ভিক্ষা স্বর্ণথালা ভরি।
সোয়া সের চাউল দিবেন সোয়া পয়সা কড়ি,
পাঁচগণ্ডা পান দিবেন পঞ্চসুপারি।
সত্যপীর মাণিকপীর তানা দিবেন বর
মাল্যাপীড়া চলে যাবে রোকাম সহর॥   —ঐ

সয়মালার পালা

'সয়মালা' নামে একটি অসমাপ্ত পালাগান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা পূর্ব

মৈমনসিংহ অঞ্চল হইতে সংগৃহীত। ইহার নায়িকার নাম সন্নমালা বা স্বর্ণমালা। কাহিনী যতটুকু পাওয়া যায়, ততটুকু এই—

রাজার একমাত্র কন্যা স্বর্ণমালা, মা বাপের আদরের সীমা নাই। দৈবক আসিয়া জানাইল, কন্যা অলক্ষ্মী, ইহাকে অরণ্যে বিসর্জন দাও। নতুবা তোমার সর্বস্ব যাইবে। রাজা তাহাই করিলেন। সেখান হইতে এক সদাগর বাণিজ্য করিতে যাইবার পথে তাহাকে তুলিয়া লইল। বাড়ীতে ফিরিয়া তাহাকে বিবাহ করিল। কিন্তু সর্পাঘাতে সদাগরপুত্রের মৃত্যু হইল।

কাহিনী এখানে খণ্ডিত। প্রথমাংশ এই প্রকার—

কথায় :—

উজলা মানিক, উজলা মানিক
জন্ম লৈল রাজার ঘরে দিনে দিনে বাড়ে॥
চান সুরুজ তারা মায়ের বুক জোড়া
চান সুরুজ তারা বাপের আঁখির তারা।
ঘরখানি আলা দুয়ারখানি ঝালা,
মায় বাপে রাখে নাম সন্নমালা।

সুরে :—

আর ভাইরে ভাই—
আত্তিশালার আছে ওরে আত্তি ভালা কথা,
ঘোড়া না শালে ঘোড়া।
ডাকে নামে ছিলাইন, ওগো রাজা, ভালা,
পুব দেশ জোড়া না রে—
আরে ভাই, ধামায় মাপ্যা ধন রাজার ভাণ্ডারে ত আছেরে।
বংশে বাত্তি দিতে রাজার এক পুত্র নাহিরে॥

সমসাময়িক গান

সমসাময়িক বিষয়বস্তু লইয়া যে সকল গান রচিত হয়, তাহাদিগকে সমসাময়িক গান কিংবা সমসাময়িক ঘটনামূলক গান বলা যায়। ইহারা কাব্য কিংবা গীতিগুণ বর্জিত।

১

পেপার মিলের আজব কারখানা রে—চন্দ্রঘোনা,
রাঙ্গামাটির এলেকাতে পাকিস্তানের গবরমেন্টে,
পাহাড় কাড়ি কিছু রায় না।
পাকিস্তানের দয়া হইল কারখানা খুলি দিল।
গরীব লোকের অভাব রায় না,
লাখে লাখে লোক আসি, কাজ পাইয়া হইল খুসী ;
স্ত্রীপুত্র আর ভাতে মরে না।
পেপার মিলের কারবার ভারী, রাইঙ্গ জঙ্গেতে ইলেক্‌টারী,
বাঁধ দিয়ে যে নদীর বিছখানায়।
দ্বিজেন্দ্র আর জব্বর মল্লিক, তারা বুঝে গরীবের দুখ।
ডেলি বেতন বাকী রাখে না। —চট্টগ্রাম

২

দেশের খোষখোর, আর ফোষকোর যত আছে, সব জীয়ন্তে মরা।
বেয়ানে ঘুমতুন উডি পরর কামত যাই।
হারাদিন মজুরি করি, দিনর বেতন ন পাইলাম,
আজুয়া দিত্‌ ন পারগুম তোরে,
দশ টেক্যার নোটে নাইরে ভাঙ্গরা।
বাড়ীত যাই ভাত কিদি খাইস্‌ ?
বেয়ানে খাই যে মরিচ ভণ্ডা, বিয়ালে কি খাইয়ম ?
আবার ভাই, চইলের লাই যাতে,
বৌ যে শাড়ীর লাই করগে যে ইসারা।
কাওড়ের দোয়ানে গিই হই গেলাম বেহোশ,
পিছদি আছিল গরাকাটা, আস্তে দিয়ে পোচ।
যখন পিচ মিক্যা ফিরি চাইলাম,
কয় যে চোয়ার মাইরগুম তোরে ইত্যারা।
ঝাপটা মারি, বাড়াই ধরি কি কইলাম ভাই,
পইট্যা থানা গিই, উগ্যান মোওদ্দমা দিলামরে জোটাই। —ঐ

সহজিয়া গান

আদি-মধ্যযুগের বাংলাদেশের একটি ধর্ম্মমতকে সহজিয়া বলিত। ইহার সাধনার নাম সহজিয়া সাধনা। ইহার সাধককে পরকীয়া প্রেমের সাধকও বলিত। সহজিয়া সাধন ভজনের গান সহজিয়া গান। চণ্ডীদাসের নামে এই প্রকার বহু গান আরোপ করা হয়। রামী নাম্নী তাঁহার একজন রজকিনী সাধন সঙ্গিনী ছিলেন বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস তিনি পরকীয়া সাধক ছিলেন।

সহজ সহজ সবাই কহয়ে
সহজ জানিবে কে।
তিমির অন্ধকার যে হইয়াছে পার
সহজ জেনেছে সে॥
চান্দের কাছে অবলা আছে
সেই সে পীরিতি সার।
বিষে অমৃতেতে মিলন একত্রে
কে বুঝিবে মরম তার॥
বাহিরে তাহার একটি দুয়ার
ভিতরে তিনটি আছে।
চতুর হইয়া দুইকে ছাড়িয়া
থাকিবে একের কাছে॥

সহেলার গান

সই পাতানো শুধু বাংলার সমাজ-জীবনে নহে, বাংলার প্রতিবেশী আদিবাসী সমাজেরও একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। এই উপলক্ষে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, সঙ্গীত ইহার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অঙ্গ। নিম্নে কয়েকটি মাত্র এই শ্রেণীর গান উদ্ধৃত হইল। ইহাদিগকে সহেলার গান বলে—

১

লঙ্গ-ফুলের মালা রে বেদিনী সইয়ের গলে।
সীথার সিন্দুর বদল করে, তানা দুইয়ে সইয়ে।

হাতের শঙ্খ বদল করে, তানা তুইয়ে সইয়ে।
আয়না কাকই বদল করে, তানা তুইয়ে সইয়ে॥ —মৈমনসিংহ

২

চলিলা কমলা গো—সহেলা পাতিবারে।
চিড়া-গুড়া নৈল কমলা, ডাইলারে ভরিয়া॥
কলা চিনি নৈল কমলা, ডাইলারে ভরিয়া।
পান গুবারী নৈল কমলা, বাটারে ভরিয়া॥
পুষ্প দূর্বা নৈল কমলা, সাজিরে ভরিয়া। —ঐ

৩

একজন সই অপর সইএর বাড়ীতে রওনা হইবার সময়ে মেয়েরা গান ধরে—

সই সই বলিয়া সই নি আছ ঘরে গো,
বেদিনী, আগো, সই গো।
সইএর বাড়ীত সইএ যাইতে পন্থে হাঁটু পানি গো,
বেদিনী, আগো, সই গো।
সইএর কাছে কইঅ খবর, জাঙ্গাল বাইন্ধ্যা দিত গো,
বেদিনী, আগো, সই গো!
সইএর বাড়ীতে সইএ যাইতে রইদে কষ্ট পাইলাম গো,
বেদিনী, আগো, সই গো!
সইএর কাছে কইঅ খবর,— ছত্র লইয়া আইত গো,
বেদিনী, আগো, সই গো!
খিড়কি দুয়ার, বেতের বান্ধ, সই পলাইল ঘরে গো
বেদিনী, আগো, সই গো!
সইএর কাছে কইঅ খবর, বাইর কইরা দিত গো,
বেদিনী আগো, সই গো! —ত্রিপুরা

৪

যান গৌরী বাপের বাড়ি কোপ করিয়া হরে,
অঙ্গের বসন তার উড়াল ঝড়ে।
তা দেখি ব্রহ্মার বীর্য চলিল সাগরে,
যতনে রাখিল বিধি শঙ্খের ভিতরে

যখন করিল হরি সাগর মন্থন,
সেই তেজে কালকুটি তোমার জনম।
তোরে হুহুঙ্কার সেই আস্তের শিবাই,
মাথা হেঁট ছেড়ে বিষ উপরে বিষ তোরে হরের দোহাই। —ঐ

সাখী গান

সাখী গান সাধারণত তরজার মত। মনসা পুজার ঘটের জল আনিতে যাওয়ার সময় দুইটি দলের মধ্যে এক পক্ষ অপর পক্ষকে প্রশ্ন করে। উত্তর দানে সক্ষম হইলে তবেই অপর দল ঘটের জল লইয়া যাওয়ার অনুমতি পায়।

ইহা ঝাড়গ্রাম মহকুমার সাপের ওঝাদের মধ্যে প্রচলিত ঝাঁপান অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ। গুণী বা ওঝাদিগকে লইয়া ঝাঁপানের শোভাযাত্রা যখন গ্রামের পথ দিয়া অগ্রসর হয়, তখন পথিপার্শ্বস্থিত ওঝার আর একটি দল, মনসা ও সর্পচিকিৎসা-বিষয়ক কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, অন্যদল তাহার জবাব দিয়া পথে অগ্রসর হয়।

১

প্রশ্ন— কোথা হতে এলে, ভাই, কোথায় তোমার থিতি,
কোথায় পাইলে সুন্দর মুরতি,
কেবা তোমার আদি গুরু কেবা তোমার মাতা!

উত্তর— স্বর্গ হতে এলাম ভাই মর্ত্যে আমার থিতি।
পিতার শরীরে আমার হইল উৎপত্তি॥
মাতার শরীরে দুই হস্ত পা।
ব্রহ্মা আমার আদিগুরু গৌরী আমার মা॥
এই সাখীর উত্তর বলে দিলাম আমি।
ঘরে গিয়ে পুরাণ খুলে বিচার কর তুমি॥
লক্ষ্মীকান্ত চরণে আমার অসংখ্য প্রণাম॥
বাজুক বিষম ঢাক চলুক ঝাঁপান॥—বেলপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

২

প্রশ্ন— শুন শুন, গুণিগণ, করি নিবেদন।
অকস্মাৎ এক কথা হইল স্মরণ॥

কেবা যাও তুমি, ভাই, বারি লইয়া।
এক কথা জিজ্ঞাসিব যাও হে বলিয়া॥
পিতা মুখে শুনিয়াছি অপূর্ব কাহিনী।
কি হইতে মনসার এক চক্ষু কাণী॥
ইহার উত্তর যদি না বলিতে পার।
হরি-হর শব্দে তোমরা সাখী গাইতে নার॥

উত্তর— শুন শুন, গুণিজন, করি নিবেদন।
যে সাখী কহিলাম উত্তর করহে শ্রবণ॥
পদ্মপাতে জলপান পদ্মার কুমারী।
অ-যোনি-সম্ভবা তিনি শিবের নন্দিনী॥
একদিন বিশ্বনাথ ভাবিল অন্তরে।
মনসাকে লয়ে যান আদর করে॥
মনসাকে দেখে দেবী কোপ করিলেন।
ত্রিশূল আঘাতে চক্ষু ফোটাইলেন॥
সেই হইতে মনসার বাম চক্ষু কাণী।
সাখীর উত্তর বলে দিলাম আমি।
ঘরে গিয়ে পুরাণ খুলে বিচার কর তুমি॥

৩

একদিন কংস রাজ সভাতে বসিল,
দূত গিয়ে কৃষ্ণচন্দ্রে ধরিয়ে আনিল।
কংস রাজা বলে, কৃষ্ণ, শুন মন দিয়া
কালিদ হইতে আন কমল তুলিয়া।
তাহার উপরে হরি ছাড়েন সিংহনাদ,
সে শুনে কালি নাগে পড়েছে প্রমাদ।
মুখ বিস্তারিয়ে কালি ধাইল সত্বরে
শ্রীনন্দের নন্দন কৃষ্ণকে পুরিল উদরে।
বলরাম বলে, দাদা, বদ্ধ কেন হও?
তোমার সেবক গরুড় তারে স্মরণ কর।

বলরামের বাক্যে কৃষ্ণের হইল চেতন,
গরুড় গরুড় বলি কৃষ্ণ করিলঁ স্মরণ।
কুশল দ্বীপের মধ্যে গরুড়ের আসন টলিল,
আসন টলিতে গরুড় ধেয়ানে জানিল।
ধেয়ানে যে জানিল গরুড় সর্ববিবরণ,
কালিদে কালি নাগ গিলছে নারায়ণ।
এক পক্ষ করে গরুড় কালিদ বান্ধিল,
আর এক পক্ষ করে গরুড় কালিদ ছিচিল।
সাত তাল জল গরুড় করিলে ছেচনি
কর্ণ পাতে শুনে গরুড় নাগের সংশনি।
এক ক্ষুদ্র সাপিনী গিয়ে কালিনাগে কয়,
কোথা হইতে মহাবীর গরুর এলো কালিদয়।
গিলেছিল কৃষ্ণচন্দ্রে উগাড়িয়া দিল,
বিনয় করিয়া কালিনী ধরলো তার পায়।
হর বিষ চাও ফিরে, ভাই, বিষের নাম গাই,
চাইতে চুড়ার পানে আর বিষ নাই। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত সাথী গানটি বিষ ঝাড়ার মন্ত্র; তথাপি ইহাতে একটু কাব্যের স্পর্শ আছে—

৪

চিনি চিনি করে, বিষ, ক্যাহা যাও তুমি।
ফটিক বরণ বিষ পান করি আমি॥
জঙ্গ বিজঙ্গ, ভাই, পলা ছিল বাজী,
বত্রিশ দন্তের খালেন সাপা বিষ করিলাম পান।
ধূলায় তো লিটিপিটি সরু বিষের জ্বালা,
ভবান কাটিয়ে উড়িয়ে পালা।
না চলে মেদিনী কম্পে বিষের তলা ভরা,
নাম নাম বৃষ্টি ঘামুক খবর।
কুথা চণ্ডী, বিষহরি, বাশিবৃক্ষ মূলে
একবার এখানে আসিও।

সন্তানে না দেখিয়া, ভাই, আসে তাই আসে গুরুর সন্ধানে,
আকাশে নাচিছে নাগিনী যত মনসার ভাসানে।
জরৎকারু ছিলেন জানিয়ে মহিম মণ্ডলে,
অন্তাদে বাঁধিয়ে ফেলে সাগরের জলে।
কুজ্ঞান বিজ্ঞান কাটি করে খানি খানি,
ভয়ে সাপাধাপা বলে করে আগুয়ান।
মাতা কুজুবুড়ি ধীরে ধীরে আসে,
বেহুলা কান্দে নিজের চক্ষের জলে ভাসে।
আয় আট আয় হরি বিষহরির ঝি,
গরুড় মনসার দোহাই তোরে সিদ্ধি কামাক্ষ্যার আজ্ঞায়,
শীঘ্র আয় শীঘ্র আয়। —ঐ

৫

প্রশ্ন— কোথা হতে আসে, ভাই, হাতে শিঙ্গা লাঠি,
কোন গুরুকা শিষ্য তুমি কোন গুরুকা লাতি।
উত্তর— দক্ষিণ হতে আসে, ভাই, হাতে শিঙ্গা লাঠি,
শিব হোয়ে কমললোচন কা লাতি। —ঐ

৬

প্রশ্ন— পশ্চিম হতে আস, ভাই, পুবে চলে যাও,
কাহার মন্দিরে তুমি ভিক্ষা করে খাও।
কোথায় তোমার ঘর দরজা কোথায় তোমার বাড়ী,
কিবা তোমার নিজ নাম কিবা তোমার জাতি।
চলিয়া সবার মাঝে রাখছে খেয়াতি।
সাথীর উত্তর যদি না বলিতে পার,
হরি হর শব্দে তোমরা সাথী গাইতে নার।
উত্তর— শুন শুন, গুণিগণ, করি নিবেদন,
যে সাথী কহিনু উত্তর করহে শ্রবণ।
পশ্চিম হতে আসি, ভাই, পুর্বে চলে যাই,
শিবের মন্দিরে আমি ভিক্ষা করে খাই।

এগ্রাম সেগ্রাম বলি গঙ্গাপালে বাসা,
কেবল মাত্র মোর মনসা ভরসা।
নিজ নাম ঘনশ্যাম শুন সর্বজনে,
পিতার নাম রাধানাথ কহিনু এক্ষণে।
শিক্ষাগুরু লক্ষ্মীকান্ত কহিনু এখন,
তাহার চরণ বন্দি সভার ভিতর।
মাহাতো মোর জাতি বলিয়া সবার মাঝে রাখিনু থেয়াতি।
সাথীর উত্তর বলে দিলাম আমি,
ঘরে গিয়ে পুরাণ খুলে বিচার কর তুমি।
মা মনসার চরণে অসংখ্য প্রণাম।
বাজুক বিষম ঢাক চলুক ঝাঁপান ॥ —ঐ

পূর্বেই বলিয়াছি, সাথীগান পূর্বে ঝাঁপান বা সর্পবিদ্যা-বিশারদদিগের বার্ষিক সম্মিলন উপলক্ষেই গীত হইত। গুণী বা ওঝাদিগকে লইয়া তাহাদের শিষ্যগণ যে শোভাযাত্রা করিত, তাহা গ্রামের পথে কিছুদূর অগ্রসর হইলে অন্য এক সম্প্রদায়ের শিষ্য তাহাদিগকে সঙ্গীতের ভিতর দিয়া প্রশ্ন করিত, সঙ্গীতের ভিতর দিয়াই তাহার জবাব দেওয়া হইত। ঝাঁপান উপলক্ষে যে সকল অন্যান্য সঙ্গীত শোনা যায়, তাহা প্রধানত সাহিত্য-গুণবিবর্জিত। উত্তর প্রত্যুত্তর ব্যতীতও সাথীগান কিছু কিছু শোনা যায়—

৭

সীতার সনে রঘুনাথ পঞ্চবটীর বনে,
জানকীর সহিত রাম বসিলেন একাসনে।
খেলিছেন রাম পাশা সারি।
হেনকালে রাইক্ষস মেয়ে এল সেইখানে।
নাম তার সূর্পণখা চাউনি বাঁকা কানে মদন কড়ি,
কঁচি (কুচি) করে পরে আছে কমলা পাড়ের শাড়ি।
দেখায় যেন মেঘের মালা নীল কিনারা,
তায় দিয়েছে কোঁচা লম্ব হয়ে পড়ল মাগীব রাম কদলের মোচা।
মাগীর ঠম ঠমকা আড়ে ঘোমটা আড় নয়নে চায়,
বুকের উপর পীর পয়দা মুক্তা বেড়া তায়।

তিনি যেন তিলোত্তমা সত্যভামা উর্বশী মেনকা,
মেয়ে রূপে নররূপে হলেন স্থূর্পণখা।
এলেন রামের কাছে মধুর ভাষে জোড় করি হাত,
একটি নিবেদন শুনহে, ওহে রঘুনাথ,
আমি তায় অল্পকালে ব্রতছলে ছাড়িয়ে বসতি,
দেশে দেশে খুঁজে পাই না মনের মত পতি।
ইহা যদি মনে লাগে তাহার আগে কি করিতে পারে।
খেলিব রসের খেলা হয়ে একত্রিত,
থাকিব নীলকমলে চাঁপার তলে,
সীতার সনে প্রয়োজন নাই তোমায় আমায় জোড়।
ঐ কথা শুন্যে দৌড়ে গিয়ে ধরল লক্ষ্মণ স্থূর্পণখার জটে।
গোটা দুই পাক দিয়ে ভুমে ফেলে টুটে নাক কান।
নাক ভেষ্টা নাকে শোভা, টুটে গেল কান।
উঠেছে গুপ্তাচুড়ী ভেড়া দৌড়ি যেন উদাম সাড়ী,
জানকী হাসিয়ে বলে, কি হল লো রাঁড়ী,
আহা, কেনে বা আইলাম মান হারাইলাম পঞ্চবটীর বনে। —ঐ

৮

প্রশ্ন— কুথা হোতে এলেন তুমি কুথায় তোমার স্থিতি,
কাহার দুয়ারে তুমি করেছেন বসতি।
কাহার দুয়ারে তুমি বাড়ী করেছ আশা।
কোন কুলে জন্ম তোমার কোন গ্রামে বাসা।
উত্তর— উত্তর থেকে এলাম আমি দক্ষিণে চলে যাই,
শিবের দুয়ারে গিয়ে ভিক্ষা মেগে খাই।
ধর্মের দুয়ারে আমি বাড়ী করেছি বাসা,
শূদ্র কুলে জন্ম আমার নিজ কুলে বাসা।

৯

সাথী শুন সাথী, নাথ, গোকুলের কথা,
পঞ্চ অবতারে কৃষ্ণের জন্ম হলো কোথা।

জন্ম হলো এথা সেথা দৈবকীর ঘরে,
বাসুদেব তুলে নিল গোকুল নগরে।
গোকুল নগরের লোক বলে হরি হরি।
পুষ্প দেখে ঝাঁপ দিলেন মুকুন্দ মুরারি।
বিষজল ছিল, ভাই, অমৃত জল হ'লো।
তা দেখিয়ে গরুড় বীরকে স্মরণ করিল।
দেখ দেখ, গরুড়, বীর দেখ দুটি আঁখি।
এখনি ধরেছি সখা, নাহি মানে সাথী।
এলেন সুপতি ভাই বেলের সে পাতা।
তা দিয়ে পড়াইব কুজ্ঞানের মাথা। —ঐ

১০

পঞ্চবটীর বনে রাম বান্ধি কুড়াখানি।
কাল হইয়ে এলো রামকে সোনার হরিণী।
ঐ মৃগ দেখতে পায় জানকী নন্দিনী।
ঐ মৃগ ধরে দাও হে, রাম রঘুমণি।
ধরিতে নারিব মৃগ, মেরে দিব আমি।
দুর্জয় গাণ্ডীব ধনু লয়ে রাম চলিলেন শিকার।
আগে আগে যায় মৃগ পশ্চাতে শ্রীরাম।
নাচিতে নাচিতে মৃগ গেল দূর বন।
গাছের আড়ে থেকে থেকে মৃগ খেলেন বাণ।
বাণ খেয়ে ডাকে মৃগ, কোথা রে লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বলে কান্দিতে লাগিল।
সেই বাক্য শুনতে পেলেন জনক-নন্দিনী।
সঙ্কটে পড়িয়ে রাম হে ডাকেন লক্ষ্মণ। —ঐ

সাপুড়ের গান

ব্যবসায়ী বেদে এবং বেদিনীরা যে গান গাহিয়া সাপের খেলা দেখায়, তাহাকে সাপুড়ের গান বলা যায়। বাংলা দেশে এই উপলক্ষে সাধারণত মনসা-মঙ্গলের কোন কোন অংশও গীত হয়।

১

ম্যাড় ভাসাও, মা, ভাসাও বলে কাঁদিছে বেহুলা গো,
চম্পানগরে ছিলেন লোহার বাসর ঘরে গো।
ম্যাড় ভাসাও, মা, ভাসাও বলে কাঁদিছে বেহুলা গো,
সুতার সঞ্চার হ'য়ে কালিনাগ বাসরে সামাল গো।
বাসরে সামাই কালিনাগ ভাবে মনে মনে গো,
এমন সোনার লখিন্দর দংশিব কেমনে গো,
ম্যাড় ভাসাও, মা, ভাসাও বলে, কাঁদিছে বেহুলা গো ॥ —ঐ

২

সোনার কাগা রে, মাকে গিয়ে বল,
সোনার বেহুলা তোমার জলে ভেসে গেল।
কলার ম্যাড় কাটিয়ে ভেলা গঙ্গায় ভাসিল,
সাপ বলে সাপিনীরে শুনগো কুলের কথা,
সোনার বেহুলা তোমার জলে ভেসে গেল।
বিষে অঙ্গ জড়জড় সোনার লখিন্দর,
সোনার বেহুলা তোমার জলে ভেসে গেল ॥ —ঐ

৩

কতদিন থাকবি, মা, গঙ্গার জলের উপরে ?
সাপা বলে সাপিনীকে শুনগো কুলের কথা,
কতদিন থাকবি, মা, গঙ্গার জলের উপরে ? —মুর্শিদাবাদ

সাঁওতালি গান

পশ্চিমবাংলার সাঁওতাল জাতি বিভিন্ন উৎসবে যে বাংলা গান গাহিয়া থাকে, তাহার পরিচয় বিভিন্ন নৃত্যগীত উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে দেওয়া হইয়াছে। এখানে সাধারণভাবে আরও কতকগুলি বাংলা গানের উল্লেখ করা হইল।

১

জিলাপী কিনিব বাতাসা কিনিব
কলের জল খাইয়ে রেলে চাপিব।

খড়্গপুর বাড়ীরে, নারাণ, খুকড়া ডাকিল,
হাওড়া যাতে রে, নারাণ, বেলা উঠিল।
চাল চিড়া বাঁধরে, নারাণ, বিদেশে যাব। —বাঁশপাহাড়ী

২

কুথায় তোমার, ভাই, ঘরবাড়ী
কুথায় তোমার, ভাই, শশুরবাড়ী,
টুস কুটুরী হাঁড়িয়া গোদান ঘরবাড়ী
গাড়া ধারে বিয়া শশুরবাড়ী॥ —বেলপাহাড়ী

৩

বেগুণ বাড়ীর ভিতরে।
কে রে বাঁশী বাজায় রে।
আখড় দুব ঘাস সরে না।
আপনার মন সরে না॥ —ঐ

৪

উপর কুলি বাপের ঘর নাম কুলি শশুর ঘর!
জলকে যাবার বেলায় ডাকিও, ঝিঙাফুল, মনে রাখিও। —ঐ

৫

কুলি কুলি কুড়ায় বলে চাপার কলি।
চাপার কলি আতনা সুন্দরী, খোঁপায় আছে কলি। —ঐ

৬

ইন্দুরে কুটুম আইল,
ঘরে নাই কিছু খেতে কি দিব গো,
একটি পান খিলে ষোলটি গুয়া গো হাতে হাতে।
হাতে হাতে ওগো মাধরাইয়া দিব গো,
ইন্দুরে কুটুম আইল। —ঐ

৭

কি হায়, আমার ইকটি বিটি লো
যতনে খোঁপা বাঁধিলো গো,
বাঁ হাতে তেলের বাটি দাইন হাতে আয়না চিরুণী,

হায়, আমার সাধের বিটি গো,
শুভ বলে সিঁদুর ঘষি গো ॥ —ঐ

৮

তুমি, দাদা, বড়রে, হামি, দাদা, ছোটরে,
মাকে জলথি কেন মার ;
মায়ের মত ধন কোথায় পালে রে,
ছাতির উপর তুধ হে পিয়ালে। —সাঁওতাল পরগণা

৯

উপর কুলি আকড়া নেমু কুলি আখড়া।
এত দিন কুথা ছিলি গুরুজন আকাশম বেরিজল। —ঐ

ভাবার্থ—সর্বত্রই নাচগানের উৎসব চলিয়াছে, কিন্তু হে আমার সঙ্গীতজ্ঞ প্রিয় সখী,—আমি বহু দিন ধরিয়া তোমার সহিত নাচগানের আনন্দ হইতে বঞ্চিত আছি। ওগো নিষ্ঠুর, এত দিন তুমি কোথায় ছিলে ?

১০

আমাছে ছেড়িয়ে তুমি গেলি গো বিঁদেবন বিদেশ,
কই ঢোলি গো তুলানের ঘর
কই পেলি গো তুলানের ঘর।
তুমার মন আমার মন একই মন ছিলো গো,
আমাকে ছেড়িয়ে তুমি গেলি গো বিঁদেবন বিদেশ,
কই পেলি গো তুলানের ঘর ॥ —ঐ

সারি গান

সাধারণত এক সঙ্গে সকলে মিলিয়া যে গান গাওয়া হয়, তাহাকেই সারি গান (group song) বলে। এক সঙ্গে নৌকা বাহিবার সময় এই গান গাওয়া হয়। ভাটিয়ালি গানও সারি গানের মত নৌকার মাঝি গাহিয়া থাকে ; কিন্তু যে মাঝি নৌকায় ভাটিয়ালি সুরে গান ধরে, তাহার হাতে কোনও কাজ থাকে না, সে এক হাতে বৈঠা কেবলমাত্র ধরিয়া রাখিয়া নদীর ভাটিতে নৌকা ছাড়িয়া দেয়, ভাটার টানে নৌকা আপনা হইতে ভাসিয়া চলে, মাঝির অঙ্গ সঞ্চালন দ্বারা বৈঠা চালাইতে হয় না। কিন্তু যে মাঝি সারি গান গাহে, তাহার

বৈঠা তাহার আর কয়েকজন সহকর্মীর বৈঠার সঙ্গে তালে তালে জলের মধ্যে পড়ে, তারপর তাহাদের নিজেদের বাহুর শক্তিতে সেই জল ঠেলিয়া তাহারা নৌকা লইয়া অগ্রসর হয়, জল হইতে বৈঠা তুলিয়া আবার জলে ফেলিবার পূর্বে নৌকার বাতায় (edge) একবার করিয়া বৈঠা দিয়া সজোরে আঘাত করে, তাহাতে তাল বা rhythm রক্ষা পায়। সারি গানে এই ভাবে কোন না কোন উপায়ে তাল রক্ষা করিবার আবশ্যক হয়। ভাটিয়ালিতে এই তাল নাই; সুতরাং তাহা রক্ষা করিবারও কোন দায়িত্ব নাই।

নৌকার মাঝিরা বৈঠা বাহিবার কিংবা দাঁড় টানিবার কার্য ব্যতীত তাহাদের সমবেত কণ্ঠে গীত যে কোন সঙ্গীত প্রাচীন কাল হইতেই সারি গান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া আসিতেছে; যেমন খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি বিজয় গুপ্ত লিখিয়াছেন, কুহু কুহু করিয়া কোকিল গায় সারি।

চারিদিকে বেড়িয়া মদন করে ধাড়ি ॥ —মনসা-মঙ্গল

ইহার পূর্বে বাংলা সাহিত্যে এই শব্দটির এই অর্থে ব্যবহৃত হইবার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' এই অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয় নাই। তৎপূর্বে 'বৌদ্ধগান ও দোহা'য় শব্দটি একবার পাওয়া যায় সত্য, যেমন—

আলি কালি সেনি সারি সুনিয়া।

গঅবর সমরস সান্ধি গুণিয়া ॥

অর্থাৎ আলি কালি অর্থাৎ স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ এই দুইটিকে বীণার ছড়ি বা ছড় জানিলাম।

এখানে সারি অর্থ ছড় বলিয়াই মনে হইতেছে। সারি গানের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে গানের সঙ্গে সম্পর্ক এবং একাধিক বিষয়ের উল্লেখ হইতে সারি গানকেও ইহাতে লক্ষ্য করা হইতে পারে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গল রচনাতেই ইহার এই অর্থে সুস্পষ্টভাবে সর্বপ্রথম উল্লেখ দেখা যায়।

মনসা-মঙ্গলের কবি বিপ্রদাস পিপ্‌লাইও লিখিয়াছেন, চাঁদ সদাগর যখন বাণিজ্য যাত্রা করিয়াছেন, তখন—

পুজিল বেতাই চণ্ডী চাঁদ দণ্ডধর।

হরষিতে সারি গায় নায়ের নফর ॥

বিপ্রদাস পিপ্‌লাই খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া কেহ কেহ মনে

করিয়াছেন, যদি তাহাই সত্য হয়, তবে নৌকা বাইচের গান কথার ব্যবহার বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। কিন্তু বিপ্রদাসের এই রচনা আধুনিক।

ক্রমে মধ্যযুগ হইতেই সারিগান মাঝিদের গানরূপেই পরিচিত হইল। যেমন খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর কবি দ্বিজ বংশীদাস লিখিয়াছেন—

চৌদ্দ ডিঙ্গা বাহিয়া যায়,
পাইক সবে সাইর গায়।   —মনসা-মঙ্গল

সমবেত কর্মসঙ্গীত (work song) মাত্রই সারিগান হইলেও কালক্রমে এই শব্দটির অর্থ সঙ্কুচিত (contraction) হইয়া কেবল মাত্র নৌকার দাঁড় কিংবা বৈঠা টানিবার সময় গেয় সমবেত সঙ্গীতকেই সারিগান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। আমরা এখানে ব্যাপক অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করিব।

সারিগানের সঙ্গে নৌকা এবং নদনদী বিল হাওরের সম্পর্ক আছে বলিয়াই পূর্ব এবং নিম্নবঙ্গে ভাটি ও জলাভূমি অঞ্চলের মধ্যে ইহা সীমাবদ্ধ। মধ্যযুগে বাংলার ইতিহাসে যে বারভূইঞার উল্লেখ পাওয়া যায়, তাঁহাদের অধিকাংশই পূর্ব এবং নিম্নবঙ্গে স্বাধীন ভাবে নৌবল রক্ষা করিতেন। যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের যে এক শক্তিশালী নৌবাহিনী ছিল, তাহা ইতিহাস হইতেই জানিতে পারা যায়। এই প্রকার চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র, বিক্রমপুরের চাঁদ এবং কেদার রায়, কিশোরগঞ্জের ঈশা খাঁ মনসদ আলি, সুসঙ্গের রাজা রঘু ইত্যাদি প্রত্যেকরই নৌবহর ছিল। দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের সেনাপতি ইস্‌লাম খাঁ যখন মুঙ্গের হইতে বাংলা সুবার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত করিয়া লইয়া মগ জলদস্যুদিগকে বিধ্বস্ত করিবার কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তখন তিনি এক বিপুল নৌবাহিনী গঠন করিয়া তাহা দ্বারাই নিম্নবঙ্গে অত্যাচার রত মগ জলদস্যুর শক্তি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহাদের নৌবলের প্রধান অঙ্গ ছিল দীর্ঘাকৃতি এক প্রকার ছিপ নৌকা; তাহা দৈর্ঘ্যে অনেক সময় একশত গজ এবং প্রস্থে মাত্র দুই তিন গজ হইত। ইহার দুই ধারে দুই সারি করিয়া পঞ্চাশ হইতে প্রায় একশত সশস্ত্র মাঝি থাকিত, ইহারা বৈঠা দিয়া জল টানিয়া টানিয়া ক্ষিপ্র গতিতে অগ্রসর হইয়া শত্রুদিগের উপর আক্রমণ এবং প্রতি আক্রমণ চালাইত। পূর্ব ও নিম্নবঙ্গের স্বাধীন ভূস্বামিগণ প্রায় প্রত্যেকেই সারা বৎসর ব্যাপিয়াই এই শ্রেণীর ছোট বড় নৌবল রক্ষা করিতেন। যুদ্ধের সময় ব্যতীত উৎসবে পার্বণে এই সকল রণতরী অনেক সময়

একত্র সমবেত হইয়া নদী, হাওর কিংবা বিলের মধ্যে বাইচের (race) প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করিত; প্রধানত তাহা অবলম্বন করিয়াই সারি গান উৎপত্তি ও বিকাশ লাভ করিয়াছে। ক্রমে নৌযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা লুপ্ত হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহা সামাজিক জীবনের নানা উৎসবে পার্বণে এবং সম্পন্ন লোকের সৌখীনতায় ব্যবহৃত হইতে লাগিল। এই ভাবে বাংলার রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাসে তাহার নৌশক্তির উত্থান পতনের সঙ্গে সারি গানের সম্পর্ক জড়িত হইয়া রহিয়াছে।

সারি গানের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহা যে কেবল তালযুক্ত তাহাই নহে, ইহার তাল অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। লোক-সঙ্গীতের মধ্যে তালের একটি প্রধান দোষ এই যে, অনেক সময় ইহা একঘেয়ে হইয়া উঠে; কিন্তু সারি গানের তাল যেমন বিচিত্র, তেমনই সমৃদ্ধ। সারি গানের একমাত্র লক্ষ্য তাল—ভাবও নহে, বিষয়ও নহে। তালই ইহার প্রধান আকর্ষণ। কর্ম-সঙ্গীত মাত্রই ভাব-গভীরতাহীন; যেখানে শারীর ক্রিয়া প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠে, সেখানকার সঙ্গীতের মধ্যে ভাবের দিক দিয়াই হউক, কিংবা রসের দিক দিয়াই হউক, নিবিড়তা দেখা দিতে পারে না; বহির্মুখী শারীর ক্রিয়া দ্বারা অন্তর্মুখী ভাব যেমন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, তেমনই ইহার আশ্রিত রসও বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। সেইজন্য সারি গান রচনার দিক দিয়া যেমন শিথিল বন্ধ, তেমনই ভাবের দিক দিয়াও অত্যন্ত তরল। বাংলাদেশে 'কানু ছাড়া গীত নাই'। সারি গানের সম্পর্কেও এ'কথা সত্য, সারি গানও প্রধানত রাধা-কৃষ্ণের বিষয় অবলম্বন করিয়াই রচিত হইয়া থাকে। ইহাদের প্রেম বিষয়ের মধ্যে যেমন গভীরতা থাকে না, তেমনই কোনও আধ্যাত্মিকতার ভাবও প্রকাশ পায় না। ক্ষিপ্র গতি ও দ্রুত তালই ইহার প্রধান লক্ষ্য থাকে বলিয়া ভাবের দিক দিয়া ইহা নিতান্ত তরলায়িত হইয়া উঠে, ভাটিয়ালির সঙ্গে এইখানেই ইহার পার্থক্য দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটি উল্লেখ করা যায়। ইহার মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ এবং প্রেমের বিষয় উভয়ই আছে সত্য, তথাপি কোন বিষয়ই ইহাতে গভীরতা লাভ করিতে পারে নাই, তাহা লক্ষ্য করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যাইবে।

শুন, ললিতে, কই তোমারে শ্যাম-পীরিতের লাঞ্ছনা।
হায়, পীরিত আমারে ছাইড়ো না॥

পীরিত রতন পীরিত যতন গো, হায় গো, পীরিত গলায় হার।
পীরিত কইরা যে জন মরে সফল জীবন তার॥
এক পীরিতি কইরাছিল গো, হায় গো, রাধের সনে কানু।
কোন যুগে করছিল পীরিত আইজও ঝুরে তনু॥
এক পীরিত কইরাছিল গো, হায় গো, রাধে কইতো পারে।
নন্দের ছাইল্যা ভাইগ্না লইয়া ফিরছিল বনে বনে॥
হায়, পীরিত আমারে ছাইড়ো না॥

ইহাতে পীরিতি বা প্রেমের কথা থাকিলেও, এই প্রেমে গভীরতা নাই, কেবল কৌতুক আছে. আধ্যাত্মিকতা নাই, কেবল ব্যঙ্গ আছে; ইহা চণ্ডীদাসের 'পীরিতি রতন' নহে।

সারি গানের অশ্লীলতার অপবাদ অত্যন্ত প্রাচীন। রেভাঃ মর্টন বাংলা প্রবাদের সে সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে সারি গান সম্পর্কে নিম্নোদ্ধৃত প্রবাদটি গ্রহণ করা হইয়াছিল—

গঙ্গায় সারি গাইলে গঙ্গা হয় না তুষ্ট।
দুষ্টের গুণ গাইলে দুষ্ট হয় না শিষ্ট॥

তিনি সারি গান অর্থে obscene song বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। সারি গানের ভাব নিতান্ত তরল, তবে সর্বদাই অশ্লীল নহে। আর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়—

ও রায়কিশোরী, তোর সনে মোর কথা ছিল কি?
ঐ কাল জলে চান করাব সই,
ও সইরে ডাল ভাঙ্গিয়া বাতাস করি।
তোর সনে মোর কথা ছিল কি?
বেড়াই আমি তোমার লাগে,
অন্নধারী হলাম সখী, তোমার লাগে,
ঘুরছি আমি রাত্রিদিনে করছ কেন চাতুরী?
তোর সনে মোর কথা ছিল কি?

সারি গান নৌকা বাইচের গান বলিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গের মধ্যে যেখান নৌকায় যমুনা পারাপারের বিষয় আছে, তাহা অবলম্বন করিয়াই প্রধানত ইহা রচিত হয়। কৃষ্ণলীলার মধ্যে নৌকাখণ্ড এবং পারখণ্ড বা নৌকাবিলাস একটি

উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ ; তাহারই একটি নিতান্ত লৌকিক রূপ অধিকাংশ সারি গানেরই বিষয় হইয়াছে। যেমন—

আরে ও কানাই, পার করে দে আমারে।
আজিকার মথুরার বিকি দান করিব তোমারে ॥
তুমি ত সুন্দর, কানাই, তোমার ভাঙ্গা না।
কোথায় রাখব দইয়ের পসরা, কোথায় রাখব পা ॥
শুনে কানাই বলে তখন, শুন রসবতী।
ভরা কালে ভরা গাঙ্গে, কেন এলে যুবতী ॥
আগা নায়ে রেখে দই মাঝখানাতে বস।
ফুটিক ফুটিক ফেল জল, লজ্জায় কেন ভাস ॥
সর্ব সখী পার করিতে নেব আনা আনা !
রাধিকারে পার করিতে নেব কানের সোনা ॥

বাইচের নৌকার গতি সকল সময় সমান থাকে না ; ইহা কখনও মন্থর গতিতে চলে, তখন গানের তাল মন্থর হয় ; যখন ইহা দ্রুত গতিতে চলে, তখন ইহার তাল দ্রুত হয়। নৌকার গতি দ্বারা ইহার তাল অনেক সময় নিয়ন্ত্রিত হয়। বিভিন্ন নৌকার সঙ্গে প্রতিযোগিতা যখন একেবারে শেষ সময় অর্থাৎ finishing point-এ আসিয়া পৌঁছায়, তখন তাহাতে আর কোনই গান থাকে না, কেবল প্রবল উত্তেজনামূলক উচ্চ ধ্বনি (yell) শুনিতে পাওয়া যায়। অনেক সময় প্রবল এই উত্তেজনার মুখে তালও সম্পূর্ণ বিসর্জিত হয় ; সুতরাং অন্যান্য গানের যেমন একটি সুনির্দিষ্ট ধারা আছে, ইহার তেমন নাই। বাইচ খেলায় মাঝির মেজাজ ও প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ইহার তাল ও সুর সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে এবং বাইচের উত্তেজনা যখন প্রবলতম হইয়া উঠে, তখন গান সুর এবং তাল সকল কিছুই বিসর্জিত হইয়া কেবল এক উচ্চ কোলাহল ব্যতীত তাহাতে আর কিছুই শ্রুতিগোচর হয় না।

দেশ দেশান্তরের কর্ম-সঙ্গীত (work-song) মাত্রেরই ইহাই বিশিষ্ট রীতি। এই বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য লোক-সঙ্গীত বিশারদ T. C. Brakeley উল্লেখ করিয়াছেন—The rhythmic character of the songs is largely dictated by the nature of the work they accompany. The broad division of rhythm by tasks are clearly shown in

the sea chanteys. If the work requires a heavy blow or pull, particularly when the efforts of a group must be pooled accomplish something beyond the strength of an individual, the works may be sung fairly slowly but in strongly accented rhythm, each stress signalling the moment of effort. অর্থাৎ কর্মের প্রকৃতি অনুযায়ী এই শ্রেণীর সঙ্গীতের তাল নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। সমুদ্রে নৌকার বাইচ খেলিবার সময় যে গান গাওয়া হয়, তাহাদেরই মধ্য দিয়া কর্মসঙ্গীতের তালের বিভিন্ন বিভাগগুলি সুস্পষ্ট ভাবে অনুভব করা যায়। বহু ব্যক্তি বিপুল শক্তিদ্বারা এক সঙ্গে যদি কিছু আঘাত কিংবা আকর্ষণ করে, তখন গানের তাল মন্থর হয়, কর্মের গতি যখন তীব্র ও দ্রুত হয়, তখন তালও সেই পরিমাণে তীব্র ও দ্রুত হয়।

বাইচের নৌকাগুলি যখন গ্রাম হইতে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করে, তখনই ধীর মন্থর গতিতে গান গাহিতে গাহিতে অগ্রসর হইয়া থাকে। প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিয়া যখন কোন বিজয়ী নৌকা ধীর মন্থর গতিতে স্বগ্রামে ফিরিয়া আছে, তখন মৃদুতালের এক প্রকার সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়—

জয় দেগো, রামের মা, তোর গোপাল আইল ঘরে,
ধান্য দূর্বা বরণ কুলা, দে গো, ঐ গলুয়ার কপালে।
নড়িয়া চড়িয়া তোমার গোপাল নে যাও ঘরে ॥
সাত সাগরের পার থিকা যে আনছে বরণ মালা,
দুধের বাটি ক্ষীরের নাড়ু আনো থালা থালা ॥
যেই দেবতার দয়ায় আসে তোমার গোপাল ঘরে।
সেই দেবতা পবন ঠাকুর পেন্নাম যাই তারে ॥

পূর্ব এবং নিম্ন বাংলায় বৎসরের বিশেষ বিশেষ দিনে নৌকা বাইচের জন্য বিশেষ বিশেষ কতকগুলি স্থান বহুকাল যাবৎ নির্দিষ্ট হইয়া আছে, বিশেষ উৎসব উপলক্ষে শত শত বাইচের নৌকা সেখানে আসিয়া সমবেত হয়। বর্ষার জলে চারিদিক প্লাবিত হইয়া সেই সকল স্থান সমুদ্রের মত মনে হয়, ইহাই বাইচ খেলার প্রশস্ত স্থান। সেই উন্মুক্ত জলরাশির উপর, চলন্ত ছিপের মধ্যে বাহুর শক্তি দ্বারা বৈঠা টানিতে টানিতে এক এক ছিপের মধ্য হইতে

পঞ্চাশ হইতে শতাধিক মাঝি এক সঙ্গে তালে তালে সারি গান গাহিয়া থাকে। সুতরাং ঘরের মধ্যে বসিয়া যে পল্লী-সঙ্গীত গীত হয়, তাহার প্রকৃতি ইহা হইতে স্বতন্ত্র হইবে, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক।

হিন্দুর দুইটি প্রধান উৎসব উপলক্ষে গোষ্ঠীগতভাবে পূর্ব ও নিম্নবঙ্গে প্রধানত নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে, তাহা মনসার ভাসান এবং বিজয়া। বিজয়ার ভাসানের সময় অনেক বিল ও হাওরের জল শুকাইয়া যায়; কিন্তু মনসার ভাসানের দিন অর্থাৎ শ্রাবণ সংক্রান্তির পরবর্তী দিন ১লা ভাদ্র তারিখে ভরা বর্ষায় ইহার যে অনুষ্ঠান হয়, তাহাই বৃহত্তম। ইহা ছাড়া বিশেষ কোন উৎসব ব্যতীত এবং অন্যান্য অবকাশ মতও মধ্যে মধ্যে বাইচের প্রতিযোগিতা হয়, তবে তাহা এত ব্যাপক আকার লাভ করিতে পারে না।

পূর্ববাংলার সারিগানের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ প্রাধান্য লাভ করিলেও অন্যান্য সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বন করিয়াও তাহাতে সঙ্গীত রচিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভাবের দিক দিয়া নিতান্ত অগভীর এবং রচনার দিক দিয়া শিথিল বলিয়াই ইহারা কোন স্থায়ী আবেদন সৃষ্টি করিতে পারে না; রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীতই হোক, কিংবা অন্যান্য সমসাময়িক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া রচিত সঙ্গীতই হউক, এক বৎসরের সঙ্গীত পরের বৎসরেই আর শুনিতে পাওয়া যায় না, নূতন বৎসরের জন্য নূতন সঙ্গীত মুখে মুখে রচিত হয়, বৎসরের প্রয়োজন মিটিয়া গেলে বাসি ফুলের মত তাহা সমাজ-মানস হইতে পরিত্যক্ত হয়।

কিন্তু দক্ষিণ বঙ্গ বিশেষত যশোরের সারি গানগুলির একটু বিশেষত্ব আছে। সেখানকার নদনদী বিল খালের জল পূর্ববাংলার বর্ষার জলের মত এত দ্রুত শুকাইয়া যায় না; সেইজন্য বিজয়া দশমীর নৌকা বাইচই সেখানে প্রধানতম নৌকা বাইচের উৎসব। বিজয়ার মধ্য দিয়া যে একটু বাস্তব জীবনের বেদনার স্পর্শ আছে, মনসার ভাসানের মধ্যে তাহা নাই। কারণ, মনসা দেবীর ভাসানের মধ্যে মানবের চোখে অশ্রু দেখা যায় না; কিন্তু বিজয়া দশমীতে আমরা যে প্রতিমা বিসর্জন করি, তাহা দেবী প্রতিমা হইলেও মানব-কন্যা রূপে তাঁহার আগমন বলিয়াই আমরা অনুভব করি। সেইজন্য ইহার ভাসানের সঙ্গে একটু বেদনাবোধের সংমিশ্রণ হইয়াছে। ইহার ভাব পূর্ববাংলার সারি গানের মত এত তরল কিংবা ইহার রচনা এত শিথিলবদ্ধ নহে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—

সোনার কমল ভাসিয়ে জলে আমার মা বুঝি কৈলাসে চলিল।
হাঁস ম'ষ দিয়ে, মাগো, কল্লেম তোর পূজা,
কোথায় ফেলে গেলে এ'সব, ও মা, দশভুজা।
(সোনার কমল)
মাগো, কার বাড়ী গিয়েছিলে, কে করেছে পুজা,
কার জনম করলে সফল হয়ে দশভুজা।
(সোনার কমল)

বাংলার সুপরিচিত কাহিনী নিমাই সন্ন্যাস; ইহার সুরও বেদনারই সুর, বজয়ার বেদনাবোধের সঙ্গে ইহারও সুর এবং ভাবগত একটু সম্পর্ক আছে; সেইজন্য এই অঞ্চলের সারি গানের মধ্যে নিমাই সন্ন্যাসের প্রসঙ্গও শুনিতে পাওয়া যায়—

কেমনে বাঁচিবে তোর মা,
আরে, ও নিমাই, সন্ন্যাসেতে যেও না।
যখনে জন্মিলে, নিমাই, নিম তরুতলে,
আমি বাছিয়া রাখিলাম নাম, নিমাই চাঁদ তোমারে।
সন্ন্যাসী না হইও, নিমাই, বৈরাগী না হইও,
ঘরে বসে কৃষ্ণনাম আমারে শুনাইও।

সারি গান সুস্পষ্ট তালযুক্ত সঙ্গীত বলিয়া অনেক সময় ইহার সঙ্গে অতি সহজে নৃত্যও যুক্ত হইয়া থাকে। তবে যাহারা বৈঠা টানে, তাহাদের দ্বারা নৃত্য সম্ভব হয় না, নৌকার সম্মুখ ভাগের বিস্তৃত গলুইয়ের উপর দাঁড়াইয়া বৈঠার তালে তালে অনেক সময় এক কিংবা একাধিক ব্যক্তি নৃত্য করিয়া থাকে। কিন্তু নৌকা যখন স্বাভাবিক গতিতে চলিতে থাকে, তখনই এই নৃত্য সম্ভব, প্রতিযোগিতার মুখে নৌকা যখন ক্ষিপ্র গতিতে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন তাহা কদাচ সম্ভব নহে। চলন্ত ছিপের উপর এই নৃত্যের মধ্য দিয়া উচ্চ কোন গুণ প্রকাশ পাইতে পারে না।

সারি গানের বাদ্যযন্ত্র ঢোলক এবং কাঁসি; অনেক সময় কাঁসি দেখা যায় না, কেবলমাত্র ঢোলকেই কাজ চলিয়া যায়। কিন্তু বাদ্য কিংবা নৃত্য কিছুই ইহার মুখ্য নহে। বৈঠা দ্বারা ইহাতে যে তাল রক্ষা করা হয়, তাহা বাদ্য এবং নৃত্যের তাল ছাপাইয়া যায়, অন্য বাদ্যের প্রয়োজনীয়তা কেহই অনুভব

করিতে পারে না। এই বিষয়ে একজন বিশিষ্ট পাশ্চাত্য লোক সঙ্গীতবিদ্ বলিয়াছেন—'The only accompaniment to most work-songs is the beat of impliments flails, pestles, axes, and sledge hammers—the tinkle of animal bells, the clack of heddles, the heavy tread of feet or the sharply expelled breath or grunt of the workers as the stroke falls. Yet for some tasks and in some countries instruments have been used to liven the song or pace the work—the bagpipe for harvesting in England, drum and rattle in the Dominion Republic, conchshell trumpet. flute for Greek oarsman, banjo for American plantation works.'

বাংলার লোক-সঙ্গীত একটু একঘেয়ে এবং মেয়েলী ভাবাপন্ন হইলেও, তাহাতে যে কিছু কিছু ব্যতিক্রম আছে, সারি গান তাহার নিদর্শন। সারি গানের মধ্যে কোন কোন সময় পৌরুষ ভাবের একটু স্পর্শ অনুভব করা যায়, তবে এ'কথা সত্য, জারি গান কিংবা অন্যান্য যুদ্ধসঙ্গীতের মত তাহা তত উচ্চ গ্রামে পৌছিতে পারে না; কারণ, রাধা-কৃষ্ণের প্রেম এবং বিজয়ার বেদনার অনুভূতি বিষয়ের দিক দিয়া মুখ্যত ইহার অবলম্বন হইয়াছে; প্রেম এবং বিচ্ছেদের মধ্যে বীররসের স্পর্শ দান করা সম্ভব নহে।

সারি গানেরই একটি নিতান্ত আধুনিক অধঃপতিত রূপ ছাত পেটানোর গান। নদীমাতৃক বাংলাদেশের পূর্ব রূপ আজ আর নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নদনদী হাওর খাল বিলগুলি মজিয়া গিয়াছে, সারি গানের প্রয়োগের ক্ষেত্রও সেই অনুযায়ী সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে। আধুনিক নাগরিক জীবন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে একটি নূতন কর্ম দেখা দিয়াছে। পাকা গৃহনির্মাণে ছাত পিটানো একটি প্রয়োজনীয় সমবেত কর্ম। বিশেষত বৈঠার তালে তালে যেমন মাঝিরা বাইচের নৌকা বাহিয়া থাকে, ছাত পিটানোর সময়ও তেমনই ছাত পিটাইবার সরঞ্জাম বা কর্ণিকটি তালে তালে ফেলিয়া অনুরূপ তাল রাখা হয়। কর্মের এই বহির্মুখী ঐক্য আশ্রয় করিয়াই ছাত পিটানোর মধ্যেও সারি গানের রূপটি গিয়া প্রবেশ করিয়াছে। এখানে উদার জলরাশির সেই উন্মুক্ত বিস্তার নাই, অবরুদ্ধ নাগরিক পরিবেশের কদর্য সঙ্কীর্ণতা আছে, তাহার ফলে ভাবে ও ভাষায় ছাত পেটানোর গানগুলি কদর্য রুচির পরিচায়ক হইয়া উঠিয়াছে।

পুরুষ একটি শ্রমসাধ্য কর্ম সম্পাদন করিবার সঙ্গে সঙ্গে সারি গান গাহিত; কিন্তু যাহারা ছাত পিটায়, তাহাদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক, তাহাদের কর্ম শ্রমসাধ্য নহে, বরং নিতান্ত অলস প্রকৃতির; একজন মাত্র পুরুষ মূল গায়েন, প্রকৃত কর্মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক স্থাপন না করিয়াই বেহালা বাজাইয়া সঙ্গীত পরিচালনা করিয়া থাকে। কিন্তু সারি গানের একজন মূল গায়ক বা পরিচালক থাকিলেও সেখানে সে কর্মী এবং গায়ক, সকলের স্থানই সেখানে সমান। নিষ্ক্রিয় গায়ক সেখানে কেহ নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উভয়ের ক্ষেত্র পৃথক্ হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য যদিও একের অনুকরণে অপরের সৃষ্টি হইয়াছে, তথাপি একের অভাব অন্যের দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে নাই।

কর্ম-সঙ্গীত তাল-প্রধান সঙ্গীত বলিয়া ইহাতে কোন স্থায়ী রসগত আবেদন প্রকাশ পাইতে পারে না। সেইজন্য প্রাচীন সারি গানের সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহা সাময়িক প্রয়োজনে আবেগ ও উত্তেজনার মুহূর্তে রচিত হয়, উত্তেজনা এবং প্রয়োজনীয়তা দূর হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। শ্রম-সঙ্গীত মাত্রেরই ইহা বৈশিষ্ট্য হইলেও সারি গান বা নৌকা বাইচের গানে এই বৈশিষ্ট্য সর্বাধিক পরিমাণে প্রকাশ পাইয়া থাকে। নতুবা ধান ভানার গানও শ্রম-সঙ্গীতেরই অন্তর্গত, ইহা স্ত্রী-সমাজে প্রচলিত বলিয়া ইহার মধ্যে গার্হস্থ্য জীবনের যে সরস চিত্র অনেক সময় প্রকাশ পায়, তাহার ভিতর দিয়া ইহাদের একটি সর্বজনীন আবেদনও সৃষ্টি হয়। ধান ভানার গান সারি গানের মত উত্তেজনার মুহূর্তে সৃষ্ট নহে, বিশেষত প্রায় সমস্ত বৎসর ধরিয়াই ইহাদের ব্যবহার চলে; সেই জন্য ইহাদের পক্ষে অন্তত কিছুকালের জন্য স্থায়িত্ব লাভ করা সম্ভবপর হয়; কিন্তু সারিগান কেবলমাত্র মুহূর্তের প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াই লুপ্ত হইয়া যায়। নারী রক্ষণশীল বলিয়া সে তাহার সৃষ্টিকে যে ভাবে রক্ষা করে, পুরুষ সর্বদাই প্রগতিধর্মী বলিয়া সে তাহার সৃষ্টির উপর কোন গুরুত্ব আরোপ না করিয়া কেবলমাত্র প্রয়োজনীয়তার ক্ষুধা মিটাইয়াই সমুখের দিকে অগ্রসর হয়। সারি গানে নারীর কোন অধিকার নাই, ইহার ক্ষেত্র চিরকালই পুরুষের অধিকারভুক্ত। এমন কি, কোন কোন লোক-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যে দেখা যায়, পুরুষ কালক্রমে নারীর গীতগুলি গ্রহণ করিয়াছে, সারিগান সম্পর্কে তাহাও দেখা যায় না, ইহা পুরুষেরই চির অধিকারভুক্ত; সেইজন্য ইহার বহির্মুখী একটি পরিচয় থাকিলেও অন্তর্মুখী কোনও সম্পদ নাই।

একান্তভাবে বিশেষ একটি কর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলিয়া সারিগান বাংলা দেশের মধ্যেও ব্যাপক প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। এমন অনেক কর্ম আছে, যাহা সমস্ত বাংলা দেশব্যাপীই প্রচলিত, যেমন ধান ভানা; সেই সূত্রে ধান ভানার গানগুলি যেমন এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে প্রসার লাভ করিয়াছে, নৌকা বাইচ পশ্চিম এবং উত্তর বঙ্গে প্রচলিত নাই বলিয়া সারি গান সেই অঞ্চলে প্রসার লাভ করিতে পারে নাই; অথচ সারি গান যে বাংলার আঞ্চলিক সঙ্গীত, তাহাও নহে; কারণ, পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলেই যেমন ইহার প্রচলন আছে, তেমনই নিম্ন বঙ্গ বিশেষত যশোহর এবং খুলনা জিলার নদনদী প্লাবিত অঞ্চলেও ইহার তেমনি প্রচলন রহিয়াছে। অনেক সময় সর্বজনীন আধ্যাত্মিক কিংবা প্রেমমূলক কোন ভাবের বাহন হইলেও লোক-সঙ্গীত এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে প্রসার লাভ করিতে পারে। কিন্তু সারি গানে কোন আধ্যাত্মিক সুর দানা বাঁধিতে পারে নাই, রাধাকৃষ্ণের নাম ইহার মধ্যে থাকিলেও ইহা ভক্তিচন্দনে সুরভিত নহে। সুতরাং স্থায়ী কোন আবেদন সৃষ্টি করিবার যেমন ইহার কোন শক্তি নাই, তেমনি ব্যপক প্রচার লাভেরও ইহাদের সুযোগ হয় নাই; বিশেষত যে কর্মের সঙ্গে ইহা অপরিহার্যভাবে সংশ্লিষ্ট, তাহার ক্ষেত্রও নিতান্ত অপরিসর বলিয়া ব্যাপক প্রচার লাভে ইহার অন্তরায় সৃষ্টি হইয়াছে।

নৌকা বাইচ এবং সারিগানে যে প্রতিযোগিতার ভাবটি আজও প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাতে সারি গানকে মধ্য যুগের যুদ্ধ-সঙ্গীতের অবশেষ বলিয়া মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে। সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়াছেন, প্রতিযোগিতামূলক যে কোন সামাজিক ক্রিয়া প্রাচীন গোষ্ঠি-সংগ্রামের অবশেষ মাত্র। সারিগান সম্বন্ধেও তাহাই মনে হইতে পারে। তবে যুদ্ধ-সঙ্গীতের মধ্যে যে বীররস আমরা স্বাভাবিক ভাবেই আশা করিয়া থাকি, ইহার মধ্যে তাহার কোন অস্তিত্ব নাই। কোন কোন সময় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ এক পক্ষ অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে সারি গান রচনা করিয়া তাহার ভিতর দিয়া কুৎসিৎ আক্রমণ করে। সকল সমাজেই বাহুযুদ্ধ ক্রমে বাগ্‌যুদ্ধে পরিণত হইয়াছে, ইহাতেও তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়; তবে ইহাদের মধ্যে যে বাগ্‌যুদ্ধের অবতারণা হইয়া থাকে, তাহা প্রায়শই কুৎসিৎ গালিগালাজে পর্যবসিত হয় মাত্র, ইহাতে ইতর মনোবৃত্তি প্রকাশ পাইলেও, বীররসের লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে না।

সারি গান কর্মসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইহার সঙ্গে যে কর্মের সংস্রব রহিয়াছে, তাহা সামাজিক কিংবা ব্যক্তিগত জীবনে অপরিহার্য নহে। ইহার কর্ম অবসর মুহূর্তের বিলাসমাত্র; বিশেষত দুইটি প্রধান উৎসবের সঙ্গেও ইহার সম্পর্ক আছে; তাহাদের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের একটি মনসার ভাসান, অপরটি বিজয়া দশমী। সুতরাং নৌকায় বৈঠা বাহিবার কর্মের সঙ্গে ইহাতে উৎসবেরও একটু যোগ রহিয়াছে। সেই দিক হইতে আনুষ্ঠানিক বা festival song-এর সঙ্গেও ইহার সম্পর্ক আছে বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। তারপর কেবলমাত্র বর্ষাকাল ব্যতীত এই সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হইবার উপায় নাই; কারণ, ইহার সঙ্গে জীবনের অবসর এবং বর্ষার জলরাশির বিস্তার উভয়েরই এক সঙ্গে সংযোগ থাকার প্রয়োজন হয়। কিন্তু ধান ভানার গীত কিংবা অন্যান্য কর্মসঙ্গীতের সীমা এত সঙ্কীর্ণ নহে, ইহাদের প্রয়োগ বৎসরের বিশেষ কোন কোন সময়ে ব্যাপক হইলেও, সমগ্র বৎসর ব্যাপিয়াও সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যায় না। সেইজন্য বৎসরের প্রায় সকল সময় কিছু কিছু তাহা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সারি গান নানা কারণে কচিৎ শুনিতে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র ছাত পিটানোর গানে তাহার সুর এখনও সহরের আকাশে বাতাসে আর্তনাদ করিয়া মরিতেছে।

১

শ্যাম রূপ সাজাইয়া দে গো ললিতে,
শ্যাম রূপ সাজাইয়া দে॥
আনিল বেসরের ঝাঁপি খুলিল ঢাকুনি।
দশ নউখে বাছিয়া লইল আবের কাঁকইখানি॥
একেত আবের কাঁকই চন্দনের ফোঁটা।
আঁচুরিয়া মাথার কেশ কল্ল গুটা গুটা॥
আচুরিয়া মাথার কেশ বাঁয় বান্ধিল খোঁপা।
খোঁপার উপুর তুল্যা লইল গন্ধরাজ আর চাঁপা॥
সেই খোঁপা বান্ধিয়া কন্যা খোঁপার পানে চায়।
দিলমন নাইসে খুসী অইলে খুয়াইয়া ফালায়॥
তারপরে বান্ধিল খোঁপা, খোঁপার নাম কেও।
খোঁপার মধ্যে লটকিয়া রয়েছে বিয়াল্লিশ গণ্ডা দেও॥

বিয়াল্লিশ গণ্ডা দেও নারে বিয়াল্লিশ গণ্ডা মাছি।
তবুত কন্যার কেশ না ইলে এক গাছি॥
সেই খোঁপা বান্ধিয়া কন্যা দিলে খুসী হইল।
এক দুই কর্যা সাড়ি পৈরাইতে লাগিল॥
পরথমে পৈরাইল সাড়ি নামে মুক্তামণি।
সাত রাজার ধন লাগ্যাছে সাড়ির গাঁথুনি॥
সেই সাড়ি পৈরাইয়া কন্যা সাড়ির পানে চায়।
দিলমন নাইসে খুসী অইলে দাসীরে পৈরায়॥
চাটগাঁও, সোনারগাঁও, হরিপুর মধুপুর লেখছে থরে থরে।
কত পক্ষীর নাম লেখ্যাছে সাড়ীর কিনারে॥
দইগল খঞ্জন লেখ্যা থইছে যার বুক কালা।
কুসুম পক্ষী লেখ্যা থইছে রাও শুনিতে ভালা॥
কুঁড়া কুঁড়ি লেখ্যা থইছে টুল্লুব্ টুল্লুব করে।
কানি বগা লেখ্যা থইছে গাল ফুলাইয়া মরে।
সাড়ির মধ্যে লেখ্যা থইছে হাঁসা হাঁসীর জোড়া।
সাড়ির মধ্যে লেখ্যা থইছে টাডি টাঙ্গন ঘোড়া॥
সাজিয়া পারিয়া কন্যা মুখে দিল দিল পান।
ঘর্ তনে বাহির অইল পুন্ন্ মাসের চান॥
সাজিয়া পারিয়া কন্যা ঘরের বাইরি অইল।
চান সুরুজ লজ্জা পাইয়া আবরে লুকাইল॥ —ঐ

২

কোন কোন অঞ্চলে নৌকা ছাড়িবার পুর্বে মাঝিরা এই গান গাহিয়া থাকে—

গুরুমান, পথ চেন কেন বেড়াও ঘুরে,
হাট করতে এসেছ, বান্দা, ভবের হাটুরে।
ভবের হাটে এসে, বান্দা, বেচ কেন খাও,
আলিস্যি কর না, বান্দা, আল্লার নাম নাও। —খুলনা

জলের ঘাটের চিত্রগুলি সহজেই জাগিয়া উঠে। পরবর্তী একটি গানে যমুনা-স্নানে আসিয়া শ্রীরাধিকা কি ভাবে নিজের বস্ত্রখণ্ড শ্রীকৃষ্ণের হাতে হারাইয়াছেন, তাহার সরস বর্ণনা পাওয়া যায়।

৬

সকলে—মায় কান্দেরে, নিমাই চান সন্ন্যাসে যায় রে ॥
বয়াতি—শচী মায়ের কান্দনেতে বিক্ষের পত্র ঝরে।
সকলে—নিমাই চান সন্ন্যাসে যায় রে।
বয়াতি—যখন জন্মিলে রে, নিমাই, নিমতরুর মূলে,
হইয়া কেন না মর্‌ছিলে, না লইতাম কোলে ॥
সকলে—নিমাই চান সন্ন্যাসে যায় রে।
বয়াতি—আগে যদি জানতাম রে, নিমাই, যাইবে রে ছাড়িয়া।
এমন অল্পকালে তোরে না করাইতাম বিয়া ॥
সকলে—মায়ের দুর্লভ চান গেল কোথাকারে।
অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া, নিমাই রে, দিয়া গেল কারে ॥ —ঐ

৭

সকলে—ও সই যাবেনি গো যমুনায় জল আনিবার ছলে।
কি রূপ দেখিয়া আইলাম কদম্বের মূলে ॥ ও সই…
বয়াতি—একদিন রাধে স্নানের বেলায় কি না কাম করিল।
দেখ, সোনার কলসী কাঁকে লইয়া যমুনাতে গেল ॥
সকলে—ও সই, কি রূপ দেখিয়া আইলাম কদম্বের মূলে।
বয়াতি—কাহার পিন্ধন লাল নীল কাহার পিন্ধন সাদা,
সুন্দর রাধিকার পিন্ধন কৃষ্ণ নামটি লেখা।
সকলে—ও সই, যাবেনি গো যমুনায় জল আনিবার ছলে।
বয়াতি—জলের ঘাটে গিয়া রাধা কি না কাম করিল,
দেখ, বসনখানি রাইখ্যা পাড়ে জলেতে নামিল ॥
সকলে—ও সই, যাবেনি গো যমুনায় জল আনিবার ছলে।
বয়াতি—সখীগণ সঙ্গে রাধা জলকেলি করে,
কল্‌সী গেল সুতে ভাইস্যা বসন নিল চোরে।

গলা পানিত থাকিয়া রাধা বসনখানি চায়,
কালা বলে এইরূপে কি বসন দেওয়া যায়।
সকলে—ও সই, যমুনায় জল আনিবার ছলে।
বয়াতি—কোমর পানিত থাকিয়া রাধা চাহিল বসন।
শ্যাম বলে, রাধে, তোমার নাই কি সরম ?
সরমে ভরমে কি হইবে—
তখন হাঁটু জলে থাকিয়া রাধা চাইল বসনখানি,
কৃষ্ণ বলে, দেখি তোমায় তীরে আইস, ধনি !
তীরে উঠিয়া রাধা বলে বসন দাও, হে শ্যাম,
কৃষ্ণ বলে আগে রাধে যৌবন কর দান।
সকলে—ও সই, যাবে কি গো যমুনায় জল আনিবার ছলে। —ঐ

৮

যখন নৌকাগুলি ঘরে ফিরিয়া আসে, তখনকার গান—
মায়ের কথা মনে হইল রে লক্ষ্মণ, ভাই,
চল আমরা দেশে যাই।
হেঁহইয়া হো। হেঁহইয়া হো॥ —ঐ

৯

জল ভরিতে যাইস্ না কদমতলা দিয়া।
কানাইয়া পাইতাছে ফান পীরিতির লাগিয়া॥ —ঐ

১০

যা গো, বৃন্দে, মথুরাতে শ্যামকে আনিতে।
একবার আইনে দেখা, দূতী, আমার জীবন থাকিতে।
কাল আসবে বলে বন্ধু আমার গেল এই পথে,
পন্থ চাহিতে অন্ধ হইলাম, সখি, আসার আশাতে। —ঐ

নৌকা লইয়া যাত্রা করিবার গান—

১১

যাত্রা করাইয়া দে শুভরাণী,
কালীদহে যায় কৃষ্ণ বাজাইয়া মুরলী।
হেঁহইয়া হো ! হেঁহইয়া হো !! —ঐ

১২

বিজয়ার দিন যশোহর অঞ্চলে এই প্রকার সারিগান শুনা যায়—

হা রে ও মাঝি, বসে ভাবছ কি।
ধান দূর্বা লয়ে হাতে দাঁড়ায়ে আছে ঝি॥
ভালো দুদে চিনি দিয়ে রামসাগরের ধারে।
তারাদেবী রাণীর মেয়ে দাঁড়ায়ে পথের ধারে॥ —যশোহর

উত্তর বাংলায় নদনদীযুক্ত অঞ্চল হইতেও কয়েকটি সারি গান সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের নাম বিশেষ একটা শুনিতে পাওয়া যায় না—

১৩

হো, ঐ দেখ্ কে যায়রে,
নিশান টাঙাইয়া নাও বাইয়া,
জিজ্ঞাস কইরা ছাথ তারে কোন্ বা দেশী নাইয়া।
বাইছালী খেলাইয়া মধুর স্বরে যায় গান গাইয়া,
নিশান টাঙাইয়া নাও বাইয়া।
ছাড়ছে তরী তাড়াতাড়ি, কোন্ বা ছাশ বলিয়া,
কোন্ ছাশ হইতে কোন্ ছাশে নাও লাগাবে বাইয়ারে,
নিশান টাঙাইয়া নাও বাইয়া।
নিদ্রা নাই বিশ্রাম নাই ভাত পানি না খাইয়া,
বিনা পয়সায় ব্যাগার খাটে কোন বা সে সুখ পাইয়ারে,
নিশান টাঙাইয়া নাও বাইয়া।
দেখিয়া নাওখানি কহে মজিদ্ মিঞা
নাওরে বানিশ দিছে, রং লাগাইছে
চমকিবার লাইগারে,
নিশান টাঙাইয়া নাও বাইয়া। —রাজসাহী

১৪

এই গানটির মধ্যে একটু আধ্যাত্মিক সুর শুনিতে পাওয়া যায়, তবে ইহাতে নৌকা, মাঝি ইত্যাদির চিত্র আছে—

আমার একা যেতে ভয় করে,
চলরে, গুরু, দুজন যাই পারে।
আমার এ দেহ পাষাণের সমান,
গুরু এসে মন্ত্র দিয়ে করল ফুলবাগান।
(চল দু'জন যাই পারে)।
বাগানে ফুল ফুট্যাছে, বাস ছুট্যাছে,
সৌরভ ছুট্যাছে রে,
ও তাতে অধর চাঁদ বিরাজ করে,
চলরে, গুরু, দু'জন যাই পারে।
আগে দেহের স্বভাব ছাড়, বাহির ভিতর সমান কর,
সুজন মাঝির সঙ্গ ধর, নিবেন নৌকায় তুলে।
মায়ার খেলা ছাড়রে মন, বেলা যায় তোর বহিয়া।
চৌষট্টী বচ্ছরের পাড়ি, বেলা আছে দণ্ড চারি,
বেলা শেষে বসবে নবি আসবে ঘাটে বসে আয়,
মায়ার খেলা ছাড়রে, মন, বেলা যায় তোর বহিয়া। —দিনাজপুর

১৫

উজান মুখে চালাও তরী দরিয়ায়,
ওরে ঈশান কোণে ম্যাঘ উঠ্যাছে রে
লাওয়ের বাদাম লিলে তায়!
(হারে) বাউরী বাতাস লাগে আইস্যা
কালাপানীর গায়
লাওয়ের বাদাম লিলে তায়॥
(ওরে) ঢেউয়ের বুকে হালের দড়ি ছিঁড়ল বুঝি হায়,
(ওরে) গুরুর নামে সিন্নী দিব রঙ্গুল পীরের দরগায়। —ঐ

কিন্তু পুর্ববঙ্গে প্রচলিত সারিগানের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের চিত্র ব্যতীত বিশেষ আর কোন চিত্রই নাই—

১৬

যা গো বৃন্দে, মথুরাতে, শ্যামকে আনিতে,
একবার আইনে দেখা, দূতী, আমার জীবন থাকিতে।

কাল আসবে বইলে বন্ধু আমার—ও গো, গেল ঐ পথে,
আমি পন্থ চাইয়া অন্ধ হইলাম, সখি, শ্যামের আশাতে।
আমি কারে বা দেখাব দুঃখ হৃদয় চিরিয়া,
আমার সোনার অঙ্গ মলিন হইল ভাবিয়া চিন্তিয়া।
রাজার ঝিয়ারি আমি থাকি বিপিনে বসিয়া,
শাশুড়ী ননদী ডাকে শ্যাম-কলঙ্কী বলিয়া। —ঐ

১৭

সুবল বল বল বল, ভাই,
কেমন আছে কমলিনী রাই ;
যার কারণে বৃন্দাবনে, রে সুবল,
কান্দিয়া সদা বেড়াই।
ডুবেছিলাম মান-সায়রে
সাধিলাম রাইএর চরণ ধরে,
নয়ন তুলে চাইল নাকো রাই,
আমার যত ময়লা
সব হল বিদূর, রে সুবল—
আমি জন্মের মত বিদায় চাই। —মৈমনসিংহ

গৃহস্বামীর ঘাট হইতে নৌকা যাত্রার কালে পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলে সাধারণত গীত হয়—

১৮

যাত্রা করাইয়া দে, মা, কালীদয়ে যাই গো,
চূড়া বান্ধিয়া দে।
চূড়া বান্ধিয়া দে, ধড়া পরাইয়া দে,
শিঙ্গা রবে বলাই দাদা বলিছে ডাকিয়া,
সকাল কইরা আয় রে, কানাই, ক্ষীর ননী লইয়া। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত গানগুলি সাধারণত যখন কোন প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়, তখনই গাওয়া হইয়া থাকে। নদীতে নৌকার উপর প্রতিমা তোলা হয় এবং একতারা বাজাইয়া দলবদ্ধভাবে এই গান গাওয়া হয়।

১৯

কোথায় আছ, নবীন কাণ্ডারী।
যমুনাতে পার করিতে আন পারের তরী॥
সকালে এসেছি মোরা যত ব্রজনারী।
হাজার ডাকে রা করো না বুকের পাটা ভারী॥
এবার কোথায় আছ নবীন কাণ্ডারী।
ছানা, মাখন বেচব বলে এলাম তাড়াতাড়ি।
বাজার বেলা বয়ে যায়, তাইত ভেবে মরি॥
এবার কোথায় আছ নবীন কাণ্ডারী॥
এবার সামাল সামাল হেলে, দাদা, হাল যেন ঠিক থাকে।
ভাইরে পশ্চিমে উঠেছে ও মেঘ তুফান ঘন ভারি।
এঁটে মেরো হালে থাবা, গেয়ে গানের সারি॥ —মুর্শিদাবাদ

এই গান প্রতিমা বিসর্জনের সময় নৌকায় চড়িয়া একজন দাঁড়ি গাহিয়া যায়, আর কয়েকজন দোহার গানের প্রথম পদ গাহিয়া যায়। তারপর মূল গায়েন একের পর এক অন্তরা গাহিয়া যায়, গায়ক পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অবস্থা বিশ্লেষণ করে, কাহারও গুণগান করে, কাহারও দুর্নাম করে। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে দেব-দেবতার সম্বন্ধে বা ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু লইয়াও এই গান রচিত হয়, তবে এই গান প্রধানত নৌকার দাড়ি মাঝিগণই গায়।

২০

ও ভাই, পুলিন্দাতে বেজেছে ঢোল,
লাগল হট্টগোল, চল্ সজনী, নৌকা বেয়ে কিসের কলরোল॥
মনোহর মণ্ডল ভাবছে বসে টাকা বাড়বে কিসে।
গড়গড়াতে তামাক টেনে খুকুর খুকুর কাশে॥
অন্নদা গুঁই ভাবছে বসে বাঁচা হল দায়,
ডাকাত ভয়ে বন্দুক নিয়ে সদাই জেগে রই।
ও ভাই, পুলিন্দাতে বেজেছে ঢোল কিসের কলরোল॥
ও পাড়ার ওই পেনী বাবু হয়েছে কাবু,
টুপা পানার মধ্যে পড়ে খাচ্ছে হাবু-ডুবু।

ও ভাইরে·········কিসের কলরোল।
শিশু দত্তের বাড়ছে ভুঁড়ি হচ্ছে কোলা ব্যাঙ,
সূর্য দে ব্যাপার দেখে লাফায় তিড়িং তাং।
ও ভাইরে·········কিসের কলরোল।
ধর্মরাজের পূজা দিতে বাঁধলো হট্টগোল,
ঠুনকো মুড়োল ঠাকুর চরণ হয়েছে পাগল ॥
রামনাথপুরের মদনমোহন ক্ষুদ্র মুখে কয়,
আমাদের এই রঙ্গরসে না ধরবেন ভুল, মহাশয় ॥
ও ভাইরে, পুলিন্দাতে বেজেছে ঢোল লাগ্‌ল হট্টগোল।
চল, সজনী, নৌকা বেয়ে কিসের কলরোল। —মুর্শিদাবাদ

রাজসাহী হইতে সংগৃহীত নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে নাটোরের রাণী ভবানীর কন্যা তারাদেবীর নাম শুনিতে পাওয়া যাইতেছে—

২১

ওরে, ও মাঝি! বসে ভাবিস্ কি।
ধানদূর্বা লয়ে হাতে দাঁড়িয়ে আছে ঝি ॥
খাঁটি দুধে চিনি দিয়ে রামসাগরের পারে।
তারা দেবী রাণীর মেয়ে দাঁড়ায়ে পথের ধারে ॥
দশভুজা করে পুজা প্রসাদ লয়ে হাতে।
দশমীর আরতি দিতে দাঁড়ায়ে আছে পথে।
—রাজসাহী (নাটোর)

২২

তুমি ও যে সুন্দর, কানাই, আমি তোমার মামী।
কোন সাহসে বল রে, কানাই, জল ফেলাব আমি ॥
তুমি ও যে সুন্দর, কানাই, না করিলে বিয়ে ॥
পরের রমণী দেখি, কানাই, মর জলে পুড়ে ॥
কোথায় পাব টাকাকড়ি কোথায় পাব মাইয়ে ॥
তোমার মত সুন্দরী পেলে করতেম আমি বিয়ে ॥ —খুলনা

২৩

জল পোরো রাই, বিনোদিনী, জলে দিয়া ঢেউ,
নয়ন মেলে কও কথা ঘাটে নাইকো কেউ।
দেখিয়া যমুনার ঢেউ রে, ও নাগর, প্রাণ কাঁপেরে ডরে,
আজ আমি কব না কথা যা ফিরে তোর ঘরে।
কেমন তোমার মাতাপিতে কেমন তোমার হিয়ে,
বার বছর হয়েছে বয়স না দিয়েছে বিয়ে।
তোমার চায়ে সুন্দর কুমার সেই করেছে বিয়ে।
পরের নারী দেখে কুমার জলে পুড়ে মর।
নিজ ধন ভাঙ্গায়ে কুমার বিয়ে না রে কর॥
কোথায় পাব টাকাকড়ি কোথায় পাব মাইয়ে।
তোমার মত সুন্দরী নারী, কোথায় পাব যাইয়ে॥
আমার মত সুন্দর নারী, কুমার, যদি চাও।
উলুর ছোটা কলসী নিয়ে যমুনায় ভাসাও॥
কোথায় পাব কলসী, নারী, কোথায় পাব দড়ি।
তুমি হও যমুনার জল আমি ডুবে মরি॥ —যশোর

২৪

তুমি ও সুন্দর, কানাই, তোমার ভাঙ্গা নাও।
কোথায় থোব দুধের পসর রে, কানাই, কোথায় থোব পাও
ভাঙ্গা নয় নৌকাখানি, রাধে পসরি সার।
কত হস্তীঘোড়া করলেরে পার, তোর কি এত ভার॥
অর্ধেক গাঙে যায়ে কানাই নৌকায় দিল নাচা,
উড়িল রাধিকার প্রাণ কানাই নাওর ভাঙ্গিল পাছা॥
বাহ বাহ বাহ, কানাই, বাহে ধর কুল।
এ ধন যৌবন দিব, কানাই, গঙ্গায় দিব পুল॥ —ঐ

২৫

পার কর পার কর, কানাই, বেলার দিকে চায়ে।
দধিদুগ্ধ হল নষ্ট, দিবা গেল বয়ে॥

সকল সখি পার করিতে লব আনা আনা।
রাধিকারে পার করিতে নিব কানের সোণা ॥ —খুলনা

২৬

কোন বনে লুকাইলে আইজ তুমি রে, ও শ্যাম বন্ধু রে—
ওরে তরল্যা বাঁশের বাঁশী হাইল্যা পড়ে আগা,
রাইত দুপুরের কালে বাঁশী বলে রাধা রাধা।
বাজাইয়া বুজাইয়া তুইল্যা থুইলাম চালে,
কোন চুরা বাজাইয়া বাঁশী রাইত দুপুরের কালে।
বাঁশীর সুর শুইন্যা আমার পরাণ ত না রয় ঘরে।
ও শ্যাম বন্ধু রে, কোন বনে লুকাইলে আজ তুমি রে

—ফরিদপুর

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পূর্ববঙ্গে এই সকল সঙ্গীতের গায়ক শত করা একশত জনই মুসলমান, কচিৎ এক আধজন নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুও থাকে। সুতরাং গানগুলি মুসলমান কর্তৃক রচিত এবং মুসলমান গায়কের গীত। কিন্তু বিষয়-বস্তু প্রায় সর্বত্র রাধাকৃষ্ণ কিংবা নিমাই সন্ন্যাস।

২৭

পেরভাতে গা তুলিয়া কোথায় গেলিরে নিমা চাঁদ।
মন্দিরার খোপ র'ল খালি, রলো খালি,
সোনার খাট পালং রলো খালি,
পেরভাতে গা তুলিয়া কোথায় গেলিরে নিমাইচাঁদ।
কোহান ত্যা আইল ঠাহুর বইতি দিলাম পিড়া,
জলপান কইরাতি দিলাম শাইল ধানের চিড়া।
কিবা মনতোর দিয়া গেল নিমাইচান্দের কানে,
ছ্যাখোরে পাড়ার লোক ছ্যাখোরে চাইয়া,
নিমাইচাঁদ সন্ন্যাসী চলে, জননীরে ছাইড়া।
আগে যদি জানতাম, নিমাই, যাবেরে ছাইড়া,
না খাইতাম তনের দুকদু না লইতাম কোলে।
ওরে বৈরাগী না হইও, নিমাই, সন্ন্যাসী না হইও,
ওরে নগরে নগরে মাঙ্গিয়া দিবো ঘরে বইসা খাইও। —ঐ

সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বন করিয়াও লঘুপ্রকৃতির বহু সারিগান রচিত হয়, কিন্তু এই শ্রেণীর এক বছরের গান অন্য বছর শুনিতে পাওয়া যায় না।

২৮

সুজন রসিক নৈইয়া, ওজান বাঁকে বাইয়া যাও রে,
সাবধানে চালাও তরী কাণ্ডারী হইয়্যা রে।
ঝুমু ঝুমু বাইদ্য বাজে নিলুয়া বাতাসে—
আমাদের ছাড়িয়া, বন্ধু, রহিয়্যাছ কোন আশে রে।
ওজান বাঁকে যাও রে।
একে তোমার ভাটিয়াল সুরে মন নিল হরিয়ারে।
কুলে এসে লাগাও তরী আমারে যাও লইয়্যা রে।
ওজান বাঁকে বাইয়্যা যাও রে॥ —মুর্শিদাবাদ

২৯

এই লহর দরিয়ার মাঝে বাইয়্যা যাই, ওরে মাঝি, আমার ভাঙ্গা নাও।
ঘরখানি মনা ভাই (তবে) দোর ক্যানে বন্ধু ওরে,
আপনি মরিয়া যাইব্যা তবে ক্যানে পরের লাগি কান্দ।
বাইয়্যা যাই, ওরে মাঝি, আমার ভাঙ্গা নাও॥ —ঐ

৩০

রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে শুনে হাসি পায়।
তোদের সনে পাল্লা দিতে লাজে মরে যায়॥
নাইকো গানের আগা গোড়া, গাধা পিটে হয় কি ঘোড়া
খেয়েছ কি কচু পোড়া ভাবে জানা যায়॥
পশুর গলায় মাণিক দিলে, সাজে না তা কোন কালে,
কানাকে আয়না দেখালে শোভা নাহি পায়॥
বিদ্যা কি পেটে ধরে না কথান পুরাণ আছে জানা।
মাটিতে কি পা পড়ে না গগনচন্দ্র কয়॥ —ঐ

৩১

ও কাইয়ায় ধান খাইল রে, খেদানের মানুষ নাই;
খাওয়ার বেলায় আছে মানুষ কামের বেলায় নাই—
কাইয়ায় ধান খাইল রে॥

ওরে হাত পা থাকিতে তোরা অবশ রইলি,
কাইয়া না খেদাইয়া তোরা খাইবার বসিলি।
কাইয়ায় ধান খাইল রে ॥
ও পাড়াতে পাটা নাই পুতা নাই মরিচ বাটে গালে ;
ওরে তারা খাইল তাড়াতাড়ি আমরা মরি ঝালে
কাইয়ায় ধান খাইল রে ॥ —ঐ

সুন্দরী ছইফার পালাগান

শ্রীহট্ট জিলায় সুন্দরী ছইফা বা ছইফা সুন্দরীর একটি পালাগান প্রচলিত আছে। ইহা 'লোক-সাহিত্য' (ঢাকা) ২য় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। দরিদ্রের স্ত্রী ছইফার উপর তরুণ জমিদার জামালের লুব্ধ দৃষ্টি পড়িল। ছইফা স্বামীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া পলাইয়া গেল। জমিদার তাহা জানিতে পারিয়া ছইফার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল, তবে তাহার কোন সন্ধান পাইল না। কাহিনী এই ভাবে আরম্ভ হইয়াছে,

গরামের মাঝে ছিলা ধনিলা একজন।
ঐ গরামে কেউ না আছিল তাহার মতন ॥
ধনে জনেতে পুরাইরো চম্রিয়ে মিল।
গরাম থাকি ভালা বাড়ী করে ঝিলমিল ॥
বাড়ীর চাইরো ভায় গড় খাই কাটাইয়া।
উচা করি দিছে দেওয়ার ঐ মাটি দিয়া ॥ —শ্রীহট্ট

সূফীগান

মধ্যযুগ হইতেই বাংলাদেশে বহু সুফী সাধকের আগমন হয়। একেশ্বরবাদী ইস্‌লাম ধর্মের প্রচার ইহাদের উদ্দেশ্য হইলেও ইহাদের ধর্মবোধে একটু বিশেষত্ব ছিল। সুফী শব্দের অর্থ 'পবিত্রতা' ; অন্তরে বাহিরে যিনি পবিত্র তিনিই সুফী। যিনি নিজেকে ভগবানের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম বলিয়া অনুভব করেন, নিজের কোন স্বাতন্ত্র্য অনুভব করেন না, ভগবৎ প্রেমে আত্মহারা যিনি তিনিই সুফী। বাউল সাধনার মূল ধারার সঙ্গে সুফী সাধকদিগের তত্ত্বানুভূতির সাদৃশ্য আছে। বাউলদিগের সম্পর্কেও বলা হয়, যাঁহারা বায়ুর মত নিবিড় বা ওতপ্রোতভাবে

ভগবানের সঙ্গে বিলীন হইয়া থাকেন, তাঁহারাই বাউল। সুফীরাও তাহাই। ইহারা ধর্মের বহির্মুখী আচারকে স্বীকার করেন না। সুফীদিগের সাধন-ভজনের কথা যে বাংলা সঙ্গীতের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা মারফতি (পূর্বে দেখ) এবং মুর্শিদ্যা (পূর্বে দেখ) গান নামে পরিচিত। 'মারেফাত' আরবি শব্দ, ইহার অর্থ বিশ্বসত্তা বা ভগবান সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান এবং তাহার সঙ্গে পরিচয় ও মিলন। যাহারা এই পথের প্রদর্শক, তাহাদিগকেই মুর্শিদ বলে। সুফী সাধকেরাই মুর্শিদ, তাহাদের কথাই বাংলা মারফতি এবং মুর্শিদ্যা গানের বিষয়। মুর্শিদ্যা গানের পুর্বে বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে।

সোনাবিবির পালা

শ্রীহট্ট জিলা হইতে সংগৃহীত এবং 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' (৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা)-য় প্রকাশিত একটি অসমাপ্ত পালাগানের নাম সোনাবিবির পালা। কাহিনীটি যতদূর জানা যায়, তাহা এই :—চান্দ সদাগরের পুত্র মাহমুদ, সে বাণিজ্যে যাইবার পথে সোনাবিবিকে দেখিয়া মুগ্ধ হয়, তাহাকে বিবাহ করে। বিবাহ করিয়া বাণিজ্যের কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া যায়, সোনাবিবিকে লইয়া গৃহ সংসারে মত্ত হইয়া যায়। বিষয় কর্ম অবহেলা করিবার ফলে তাহার আর্থিক দুর্দশা দেখা দেয়। অবশেষে বাণিজ্য করিতে রওয়ানা হইয়া পথিমধ্যে মামুদ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পালার কিছু অংশ এই প্রকার—

১

সকল ছাড়িয়া মামুদ গিরেতে বসিল।
সোনার লাগিয়া মামুদ পাগল হইল॥
বাপ আমলের খাট পালঙ্ সাজুয়া বিছানা।
শয়ন করে মামুদ সঙ্গে লইয়া সোনা॥
কি জানি সোনার যদি ঘুম না আইসে।
আবের পাঙ্খা লইয়া মামুদ জুড়ায় বাতাসে॥
ঝিলমিল মশারি টাঙ্গা তবু মনে ভয়।
কি জানি মশার কামুড়ে কন্যার জীবন সংশয়॥ —শ্রীহট্ট

সোনারায়ের পালা গান

উত্তর বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সোনারায়ের পালা নামে একটি কাহিনীমূলক গীত শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাকে সোনাপীরের পালাও বলে। কারণ, ইহার নায়ক সোনারায় একজন পীর। সাধারণত গোয়ালা জাতি এবং গো-মহিষাদির উপর তাহার আধিপত্য দেখা যায়। সোনারায়কে ছলনা করিবার জন্য কি ভাবে যে গোয়ালা জাতি শাস্তি লাভ করিয়াছিল, তাহার বৃত্তান্ত এই পালাগানে বর্ণিত হইয়া থাকে।

১

গোয়াল গোয়াল গোয়াল মাসী, দধি দেও মোরে।
গোষ্ঠের গাভী বাথান গেছে দুগ্ধ নাই মোর ঘরে॥
গোয়াল গোয়াল গোয়াল মাসী, দুগ্ধ দেও আমারে।
চান রায়ের হুকুম হৈছে পুকুর ভরিবারে॥
এক পুকুর ভরিয়া দিছি দধি দুগ্ধ দিয়া।
সোনার রাত্তির শেষে চান জন্মিছে এক ছাওয়ালিয়া॥
আজ যাইত কাইল যাইত দেখ্যা আইও তারে।
বিস্তরে পাইবা ক্ষীর সোনারায়ের পুরে॥ —ঐ

স্বদেশী গান

১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গের পর যে দেশাত্মবোধক আন্দোলন দেখা দিয়াছিল, তাহা অবলম্বন করিয়া যে সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল, তাহা স্বদেশী গান নামে পরিচিত। ইহা প্রায় লোক-সঙ্গীতের পর্যায়ে পৌঁছিয়া গিয়াছিল।

১

মা মা ব'লে ডাক দেখি, ভাই,
ডাক দেখি ভাই, সবেরে।
মা মা ব'লে কাঁদলে ছেলে
মা কি পারে রইতে রে॥
জাগিবে জননী কুল-কুণ্ডলিনী
জাগিবে শক্তি জাগিবে রে,

খুলে যাবে প্রাণ, দিতে পারবি প্রাণ,
দেশের কল্যাণ তরে রে ॥
মায়ের শ্রীচরণ-তরী ভরসা করি
ভাসাও দেহ-তরী রে,
তবে মা হবেন কাণ্ডারী, সুখে দেবে পাড়ি
ভয় কি অকুল-পাথারে ॥
দেখ ভারতবাসীর ঐ এলোকেশীর
মায়ের হাতে অসি কেঁপেছে রে,
দাস মুকুন্দ কয় আর কারে ভয়
জয় জয় ডঙ্কা বাজা রে ॥ —মুকুন্দ দাস

স্তোত্র গান

যে গানের মধ্য দিয়া দেবদেবীর স্তোত্র শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা স্তোত্রগান।

১

প্রণতি পরমেশ্বরে দেব দেবী তদন্তরে, করজোড়ে করি যে মিনতি।
দশ চরণ শিরে ধরি বিনয়ে বন্দনা করি পাপাচারী আমি মূর্খমতি।
নমঃ নমঃ নারায়ণ চতুরানন পঞ্চানন ষড়ানন, গজানন মাতা ভগবতী ॥
নমস্তে মা বাগ্বাদিনী বীণাপাণি শ্বেতবরণী
শ্বেতপদ্মে বিরাজিনী দেবী সরস্বতী ॥
পদ্মে পদ বিভূষিতা ব্রহ্মময়ী মা ব্রহ্মসুতা
অবক্তব্য গুণ সুতা সতী সীমন্তিনী।
আচ্ছাদিতা নীলাম্বরে বিংশতি শশী নমস্করে,
বীণাযন্ত্রে শোভা করে মা সঙ্গীতরূপিণী ॥
মাগো, তব কৃপা বলে, মানব শ্রেষ্ঠ ভূমণ্ডলে
বাক্‌শক্তি আছে বসে বিদ্যাশক্তি পায়।
সকল প্রাণী হতে শ্রেষ্ঠ, মানব অতি উৎকৃষ্ট,
এস মা মহামায়া হেমবরণী হর-জায়া
ভক্তে দিয়ো পদছায়া ধরি ঐ চরণে।

ভবার্ণবের ঐ তরণী পার হতে সে বৈতরণী দিয়ো ঐ চরণে।

তরণী অধীন ভক্তজনে।

গৌরী গজানন মাতা দাক্ষায়ণী দক্ষসুতা

শিবের বনিতা হন আপনি—

এসেছি মা ভবকুল হয়েছি কত ব্যাকুল যেন আকুল

চিন্তাকুল, মা, কুল-কুণ্ডলিনী।

মাগো, তুমি দয়া করিলে, কে আছে মহিমণ্ডলে,

পড়ে আমি ভবকূলে ডাকি, মা, উচ্চৈস্বরে

কহি আমি করুণা করো যেন করুণা চরণ ছাড়া করো না আমারে॥

—মুর্শিদাবাদ

হ

হরিভক্তির গান

সাধারণ ভক্তিমূলক গানের মধ্যে যাহাদের ভিতর দিয়া হরিভক্তি বিশেষ ভাবে প্রচারিত হয়, তাহাদিগকে হরিসংকীর্তন বা হরিভক্তিমূলক গান বলা যায়।

১

এমন শুভদিন হবে না রে আর ;
ভজ হরিপদ অনিবার অন্য আশা পরিহরি,
হরিনাম কর রে সার হরি হরি বল নিরন্তর,
রুচি হলে সকল জ্বালা যাবে রে অন্তর ;
সদানন্দে কাল কাটাবি, পান কর্ব্বে সুধাসার ॥
পেয়ে বহু কষ্টে এ মানব জনম,
মিছা মায়ায় মুগ্ধ হইয়ে না কর্লি সাধন।
কার ভরসায় বসে রলি, কিসে হবি ভব পার ॥
সাধুসঙ্গ কর অনুক্ষণ, অনায়াসে চলে যাবে আনন্দ ভবন।
হা রে চেতনে চৈতন্য পাবি কাল শমনে ভয় কি আর,
বিনয় করে কয় কৃষ্ণহরি,
হরিনামের তরী করে ধর ভবে পাড়ি ;
আছে বিপদভঞ্জন মধুসূদন, ভব পারের কর্ণধার ॥ —ঢাকা (১৩২৪)

২

হরিনামে যার হৃদয় ভরা তার ভরা যায় কিসে মারা ॥
ছিল প্রহ্লাদ হরিভক্ত, হরি নামে সদা মত্ত,
তেমি মত হৈলে চিত্ত, হবে যমের ঘরে কপট মারা ॥
যাবি যদি ভবপারে সদা হরি নাম কররে,
আদর করে নিবে তবে, আছে পারঘাটা কাণ্ডারী খাড়া।
যে জন হরি হরি বলে, সে কি কারে ভয় করে,
দেখ্‌না শিব সকল ছেড়ে সদা দেয় চিতায় পাহাড়া ॥ —ঐ (১৩২৬)

হাতি খেদার গান

দক্ষিণ পূর্ববঙ্গ চট্টগ্রাম, উত্তর পূর্ববঙ্গ জলপাইগুড়ি এবং গোয়ালপাড়া জিলায় খেদায় হাতি ধরিবার সময় এক শ্রেণীর গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে হাতি খেদার গান বলে।

হালকার গান

হালকার গান সম্পর্কে এই বিবরণীটি উল্লেখযোগ্য—'মোমেনশাহী (মৈমনসিংহ)-র কোন কোন অঞ্চলে একজাতীয় ফকিরালী গান প্রচলিত আছে, এইগুলিকে সাধারণতঃ হাল্‌কার গান বলা হয়। চট্টগ্রাম জিলার আকুবদণ্ডী গ্রামনিবাসী চিস্‌তিয়া তরিকার পীর মওলানা আব্দুল কুদ্দুম সাহেবের অগণিত ভক্ত মুরিদ জিক্‌রে জলীর প্রারম্ভে এ সব গান গেয়ে থাকে। গানের তালমান ঠিক রাখার জন্য একটি ঢোলক বাজান হয়। গানের তালে তালে ও জিকিরের জোশে অনেকে দেওয়ানা হয়ে নাচতে শুরু করে। অবশ্য এ নাচ তাদের জিকিরের তালে তালে চলতে থাকে। হালকার মজলিশে অনেক লোক সম্মিলিত ভাবে জিকির করে।' (রওশন ইজদানী, 'মোমেনশাহীর লোক-সাহিত্য, ঢাকা, পৃ. ১৯)

১

গাউছা মোরে দিল না গো মিষ্ট গাছের বেল।
আইজ দিব কাইল দিব বলে বেল ফুরাইয়া গেল॥
যখন বেলে ধর্‌লো কড়া
ডাক্তারবাবু সামনে খাড়া,
পয়সা ছাড়া দেয় না তারা বায়ু রোগের তেল। —মৈমনসিংহ

হাল্‌দা ফাটা গান

চট্টগ্রাম অঞ্চলে 'হাল্‌দা-ফাটা' গান নামে এক শ্রেণীর গানের প্রচলন আছে। ইহার সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক-সঙ্গীত সংগ্রাহক স্বর্গত আশুতোষ চৌধুরী লিখিয়াছেন ('পূর্ববঙ্গ গীতিকা' ৪।২, পৃ. ৫৫৯)

"সাধারণতঃ সমুদ্রোপকূলবর্তী স্থানগুলিতেই 'হোল্‌দা-কাটা' গানের প্রচলন দেখা যায়। এই পালাগায়ক সারেঙ্গ, তানপুরা, খঞ্জরি, কি অন্য প্রকারের

যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে না। প্রকৃতির সাধারণ সুরে ও সমুদ্রের সোঁ সোঁ শব্দ সংযোগে তাহারা যেন গানের তালমান রক্ষা করিয়া থাকে। গায়ক পদ পুরণ করিবার সময় অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক নিয়মে 'রে' শব্দটির দ্বারা সুর যোজনা করিয়া লয়। ইহার কৌশলও অভিনব ও মৌলিক। বঙ্গদেশে সঙ্গীত শাস্ত্রের যদি কোন মৌলিক গবেষণা হয়, তবে হাল্‌দা-কাটা গান হইতে অনেক সুরের উপকরণ সংগৃহীত হইবে। গান করিবার সময় তাল যন্ত্র ছাড়া সুরের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হয় বলিয়া এই পালারচকেরা শব্দবিন্যাস ও ছন্দের প্রতি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া থাকে। অধিকাংশ হাল্‌দা-কাটা গানে উপান্ত্য স্বরের মিল আছে।"

ধুয়া— সাইগরে ডুপালি পরীরে,
হায়! হায়! দুখ্‌খে মরি রে।
কি ভাবে গাহিব ওই দুখ্‌খের বিবরণ।
যে হালে হইল সেই পরীর মরণ॥
কেমনে দুঃখের কথা বয়ান করি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—
ভোজের বাজি দুনিয়া যে কেবল বেড়াজাল।
কাড়াকাড়ি মারামারি আর যত জঞ্জাল॥
মিছা রাজ্য মিছা ধন মিছা টাকাকড়ি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে— —চট্টগ্রাম

হাপু গান

পশ্চিমবঙ্গে হাপুগান নামক একশ্রেণীর লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে। সাধারণত দুইজন লোক একসঙ্গে এই গান গাহিয়া থাকে। একজনের হাতে মন্দিরা বা গোপীযন্ত্র থাকে, আর একজনের হাতে ছোট একখানি লাঠি থাকে। লাঠিধারী লোকটি গান গায় এবং তাহার সঙ্গী লোকটি ধুয়া করে। গাহিবার পদ্ধতিটি একটু অদ্ভুত। এক পদ করিয়া গান গায়, আর মুখে এক প্রকার শব্দ করিয়া নিজের পিঠেই লাঠি দিয়া তাল ভাঁজে। অবিশ্রাম লাঠি চালনার ফলে অনেকের পিঠেই কালশিরা দাগ পড়িয়া যায়। কতকটা নমস্কারের ভঙ্গিতে লাঠিটা দুই হাত দিয়া ধরিয়া থাকে। গানগুলি এই প্রকার,—

একই বিলে চরে পাখী অন্য বিলে ধায়।
চল্যা যাবার কালে পাখীর ফাঁদ্ বাধিল পায়।
ও হায় হায়॥
পাখী না পিথিমি চেনে আসমানে তার বাসা।
কার খোঁজে না বিলের জলে করে যাওয়া আসা।
ধর্‌তে পার্‌লে ছাঁদন বেড়ী দিতাম গো তার পায়॥
ও হায় হায়॥
আল্লা আল্লা বুলো রে, বান্দা, ভাত নাইক ঘরে।
টুপি দিয়া ইমান ঢাক্যা বাগুন চুরি করে॥
তারে ধর্‌ব কেমন ক'রে॥
নিমক হারাম প্যাটের ক্ষুধা নাইরে সরম তার।
দু'দিন বাদে নিভ্‌লে বাতি তামাম অন্ধকার॥
সন্দ কিবা তার॥ —বীরভূম

এই গানের নাম যে কেন হাপুগান হইল, কিংবা হাপু্ শব্দের তাৎপর্যই যে কি, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এই গান বীরভূমে যে খুব ব্যাপক, তাহাও বলিবার উপায় নাই।

হাফ্ আখড়াই

উনবিংশ শতাব্দীতে নাগরিক জীবনকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল গীতরীতি বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে হাফ আখড়াই সর্বাপেক্ষা অর্বাচীন। আখড়াই, দাঁড়া কবি এবং হাফ আখড়াইয়ের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ কিছুই ছিল না। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার 'প্রাচীন কবি সংগ্রহে' দাঁড়া কবি ও আখড়াইর পার্থক্য সম্পর্কে লিখিয়াছেন,—

'দাঁড়া কবির ক্রম এই রকম—

চিতান—পরচিতান—ফুকা—মেলতা—মহড়া—শওয়ারি—খাদ— ফুকা—মেলতা—অন্তরা।

অন্তরা সমাপ্ত হ'লে দ্বিতীয় চিতান। আগের কবি গানের অন্তরা রচনার রীতি পরে থাকে নি। দ্বিতীয় ফুকার পরেই 'গীত সমাপ্য'। হাফ আখড়াই

অবিকল এই রকম, কেবল ফুকার পর ডবল ফুকা। অন্তরা থাকে না।'
(।৶৹—৷৹)।

১

মহড়া— মানের গর্ব করে খর্ব তো করিলে ॥
সওয়ারি— রাগে মান সমাপন করে পণ হারিলে,
রাধে, অতিশয় উচিত নহে, শেষে না রহে,
অতি দানে বলি গেলেন পাতালে ॥
তেহেরণ— মানময়ী, ভাল লোক হাসালে।
চিতেন— কহিলে কথা তুমি রাই, রাই গো, তুলে চন্দ্রানন।
২ চিতেন— তাতে জুড়ালো মানের অনল,
অতঃপর পুরিল মম পণ ॥
ফুকা— করে দক্ষ আগে বিষম পণ পরেতে নারিলেন
রাখিতে পুজিলেন ত্রিলোচন, আজ রাধে গো!
তেমন জ্ঞান গুরু পণ হলো রাই মান নিবারণ।
ডবল ঐ— সেই তো মান ত্যজিলে, শ্রীমুখে কথা কহিলে
নিজ মান, রাই, এখন পুরাতে নারিলে,
ঘুচিল বিষাদ, রাধে, হৃদয় জুড়ালো,
মানের অনল এখন নিভিলো ॥
মেলতা— মানের পর মান রাখিতে নারিলে।

২

চিতান— কটাক্ষে নাশিতে পারে শ্যাম হে, জগতেরি ভার,
পরচিতান— প্রাণে বাঁচাতে পারিলে না বিরজায়,
শাপেতে শ্রীরাধার।
ফুকা— চরণ পরশে শুনেছি হে তোমারি
দীননাথ, অনায়াসে হল হে পাষাণী, মানবী
আমি সার করে শ্রীপদ, হইল এই বিপদ
অবশেষে প্রাণে মলাম, শ্রীহরি।
ডবল ফুকা— কৃষ্ণ দোষ দিব কারে, সকলি কপালে করে
ভব ভয় নয় ঘুচায়, প্রাণ যায়, ভজে তাঁহারে।

মরিতে হে প্রাণে, হরি, কাতরা নহি ত,
মেল্‌তা— কৃষ্ণহারা হলাম বিনা দোষেতে।
মহড়া— রইল মনের দুঃখ এই মনেতে।
যে পদে, বিপদে প্রহ্লাদে, রেখেছে,
তোমার সে পদে প্রাণ সঁপে মনস্তাপে,
মলাম রাধার শাপে এখন প্রাণেতে॥

হাবু গান

লঘু ব্যঙ্গাত্মক এক শ্রেণীর গান হাবু গান নামে পরিচিত। স্বামী চাকুরীতে যাইবে শুনিয়া স্ত্রী যে সব জিনিষ, আনিতে বলিতেছে, তাহা সাধারণতঃ প্রত্যেক বাড়ীতেই শুনিতে পাওয়া যায়, তবে এখানে বায়না একটু মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। ইহাই এখানে হাবু গানের বিষয়।

১

ইচলা, ইল্‌শে, খল্‌সে, পুঁটী,
পুঁয়ে, গচি, বাম, চিংটী, মাগুর শিঙ্গী,
ভাকুর ভোথরে, কাকে বলে কই, চেতল,
শল, শেল, রাং রুই, পেতল কাতল,
ফুলুই, ময়রা, টেপা, চেপা মিরকে—
এরাই সব আজ জালে বন্দী হয়েছে। —ঐ

যেতে সড়ানে ধাক্কা লেগেছে পরাণে,
মালদহের ইষ্টিশনে ফজলি আম আনি কিনে,
মুখে দিলাম খোয়ায়ে চপ্‌ চপা চপ্‌,
ধোবা পিশে তাঁতী মাসী ময়রা ঠাকুর ঝি,
নন্দ ঘোষের বেটীর সঙ্গে কখন হেঁসেছি।
ঐ জ্বালাতে কদম্‌তলার বাসা ছেড়েছি,
খিসাক ঢুম্‌, খিসাক্‌ ঢুম্‌, খিসাক্‌ ঢুম্‌। —ঐ

হাসির গান

কেবলমাত্র হাস্যরস বা কৌতুক সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই কতকগুলি গান রচিত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে হাসির গান বলা যায়।

১

বিড়াল বলে মাছ খাব না, আঁশ ছোঁব না কাশী যাব,
তাই দেখে এক ভোকরা ইঁদুর কপালে দিয়েছে সিঁদুর।
বলে, কাশী গিয়ে ঘোমটা টেনে মেজ বাবুর বৌ হ'ব।
বিড়াল বলে, মাছ খাব না, আঁশ ছোঁব না কাশী যাব।
তাই দেখে এক কোলা ব্যাঙ; লম্বা লম্বা বাড়ায় ঠ্যাং,
বলে, কাশী গিয়ে পৈতা লয়ে আমি ঠাকুর বাবা হ'ব।
বিড়াল বলে মাছ খাব না, আঁশ ছোঁব না কাশী যাব।
তাই দেখে এক কেলে কুকুর, কপালে দিয়েছে চন্দন,
বলে, মথুরা গিয়ে বাঁশী লয়ে আমি কৃষ্ণ ঠাকুর হ'ব।
বিড়াল বলে মাছ খাব না, আঁশ ছোঁব না কাশী যাব।
তাই দেখে এক ল্যাংটা বাঁদর, গলাতে জড়িয়ে চাদর,
বলে, লঙ্কা গিয়ে সীতা হ'য়ে, আমি রাবণ রাজা হ'ব।
বিড়াল বলে মাছ খাব না, আঁশ ছোঁব না কাশী যাব॥ —মুর্শিদাবাদ

২

জান গেল মোর খোসের জ্বলনে,
আমি বাঁচিনা আর পরাণে, খোসের জ্বলনে॥
শুড় শুড় করে খুর খুর করে গো,
চুলকানি উঠে পরাণে,
জান গেল মোর খসের জ্বলনে।
দেখ আড়াই খান তালাই আছে
কি একশো লোকের শোওয়া হয়?
আবার ডাক্তার বাবুর বাড়ী গেলাম গো
আমায় বললে নিম সাবান দে গা ক্যানে।
জান গেল মোর খোসের জ্বলনে॥ —ঐ

৩

আমি বাঁচি প্রাণে কেমনে প্রাণ গেল মোর
খোসের জ্বলনে আমি বাঁচি প্রাণে কেমনে
প্রাণ গেল মোর খোসের জ্বলনে
যখন করে কটকট ধক ধক ও বাবারে আমি বাঁচি প্রাণ কেমনে,
খোস্ হয় কয় রকমের জাত ওরে ডবরা ছোটবড়
ওরে কতকি যুক্ত করে বাড়াল উৎপাত।
একই নাকে শুঁড়ে লাগে, ভাই, আড়াই খানা তালই,
সোজা হয়ে দাঁড়াতে গেলে দেখায় পুঁই মাচাটি।
আমি বাঁচি প্রাণে কেমনে॥ —বাঁশপাহাড়ী

হিজড়ের গান

গৃহে শিশুর জন্ম হইলে নবজাত শিশুকে হিজরার কোলে দিবার রীতি পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত আছে। সেই সময় শিশুকে কোলে লইয়া হিজরারা যে গান গাহিয়া থাকে, তাহা হিজরার গান। বিনিময়ে তাহারা কিছু পারিতোষিক পায়।

১

খোকা দেখালো, ছোট বৌ, খোকা দেখালো।
শাক দিয়ে মাছ ঢাক্‌লে এখন কি হবে বল॥
হাটে যাই বাজারে যাই কিনে আনি শশা।
তোর খাবার বেলা গুপুর গাপুর শোবার বেলা গোসা॥

২

দিদি, কোথায় গেল খোকার বাপ।
হয়ে আছি তলোয়ারের খাপ॥
আমার বাপ দিয়েছে আশা, গড়িয়ে দেব কানের পাশা,
সেই আশা নৈরাশায় একি মনস্তাপ॥ —ঐ

হীরালাল-পদ্মমণি কন্যার পালাগান

চট্টগ্রাম অঞ্চলে হীরালাল ও পদ্মমণি কন্যার পালাগান নামে একটি গীতিকা প্রচলিত আছে ('লোক-সাহিত্য' ঢাকা, ৩য় খণ্ড)। মতিলালের পুত্র হীরালাল,

হীরালালের বন্ধু জয়মন। দুইজনে বিদেশ যাত্রা করিল। পথে রাজকন্যা পদ্মমণির সঙ্গে হীরালালের সাক্ষাৎ হয়, হীরালাল তাহার প্রতি আসক্ত হয়। অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া অবশেষে হীরালাল পদ্মমণিকে লাভ করে। কাহিনীটির প্রথমাংশে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক আছে। পালার একটু অংশ—

নিশি অবসানে দুই জন চিত্তে ক্ষেমা দিয়া,
বাড়ীত্তুন বাহির হৈল আল্লাহকে ভাবিয়া।
দুইজনে দুই ঘোড়া যত্তনে সাজাইয়া,
নিশির অবসানে দুই জন যারগই চলিয়া।
অল্প ধন বহু মুল্যের সঙ্গতি করিয়া, বিদেশে দুইজন যারগই চলিয়া।
ডেনে (ডাইনে) খঞ্জনের জ্যোতিঃ বামে তলোয়ার,
লম্ফ দিয়া ঘোড়ার পিঠত হইল সোয়ার —চট্টগ্রাম

হুদমা গান

উত্তর বাংলায় অনাবৃষ্টির সময় বৃষ্টির কামনায় গ্রাম্য কৃষক রমণীরা একত্র হইয়া অন্ধকার রাত্রে মাঠের মধ্যে গিয়া উলঙ্গ হইয়া আনুষ্ঠানিক ভাব হুদমা দেওর যে পুজা দেয়, তাহাতে নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হয়। তাহার গান হুদমা গান বলিয়া পরিচিত।

১

দেওয়া তুই বরষেক রে, গাও ধুইয়া মুই বাড়ি নাগি যাঁও।
হাড়িয়া কোনেতে যেমন দেওয়া দুর দুরায়
ওই মোতন চেংরি গিলা ফের কেটায়।
আষাঢ় মাস শান মাস দেওয়াত্ না হয় পানি,
তিন দিনকার সরার গায়ত পইছে ছানি!
দেওয়া, তুই বরষেক রে,
গাও ধুইয়া মুই বাড়ি নাগি যাঁও। —জলপাইগুড়ি

২

আষাঢ় শাওন মাসে দেওয়া হইল খরা,
তিন দিনকার আংশাল গোন্দায় সরা সরা। —ঐ

হোলবোল

নদীয়া-যশোহরের কৃষকদিগের মধ্যে প্রচলিত এক শ্রেণীর লোক-সঙ্গীতের নাম হোলবোল।

১

আহা ফাল্গুন মাসের পাঁচুই তারিখ দৈবী গজব হল
মটর মুসুরি ছোলা সরষে সব ফেলায় গেল।
কতই ফেলল ছোলা সরষে ফল ঘটিবাটি
তার চেয়ে অধিক ফেলল ব্রিটিশ রাজার মাটি,
দুইপক্ষ দুই রাজা হয়ে সংসার জ্বলে গেল,
এবার বুঝিল ভাত বেঘোরে কোলের যাদু ম'ল।
মা জননী কেঁদে বলে কী করি উপায়,
গহরমেণ্টের লোক এসে বলে খাল বাঁধিতে চল।
খাল বাঁধিতে না গেলে টাকা দিব নাক।
মাটির ঝুড়ি মাথায় নিয়ে ভিরমি লেগে গেল।
এবার বুঝিল মনে হল আমাদের জান গেল,
পাকিস্থানে কাজ নেই মোদের হিন্দুস্থানে চল,
হিন্দুস্থানে গিয়ে মোরা সবাই শান্তি হব। —নদীয়া

২

আগে জল পিছনা দিয়ে তামুক সেজে দণ্ডপাত হল,
সব বাড়ির সব খবর নেয় সব—
বাড়ির সব আছে কেমন?
বাড়ির সব আছে ভাল আছে মন্দ তাতে নাইকো দায়।
শালা সমুন্দি এসে ওমনি কাছা খুলে নেয়।
তারপর হেসে ওঠে বড় খুশী—
তেল জলপান পায়।
তেল জলপান পেয়ে ওমনি ছ্যান করিতে যায়।
তারপর চিড়ে ভাজা—
চিড়ে ভাজা বড় মজা অল্পে অল্পে অল্পে ধরি,
ডাইনে বাঁয়ে ধরি আর কষে ফাঁকাই মরি।

কেউ তো দেখেনি ভাই ?
আচুককা বাচুককা বসে আছে ওই হালে,
এট্টা ইস্তিরি নোক বইসে আছে দুয়োরের আবডালে,
একখান শাড়ি পরি।
আহা একখান শাড়ি পরি।
শাড়ি পরি বিছানা পেড়ে মিশি দেওয়া দাঁতে,
দাঁতে ছাতা কয় না কথা গায়ে গন্ধ যায়,
আমলা মেথী গুয়াপান, পান সৈরভ খায়।
আমি তো, ভাই, নিজে বুড়ো বাঁচি হুড়ো গলা হড়হড় করে।
হুঁকো থুয়ে কন্ধে টেনে সব শালা তুই বুড়ো বাঁদর। —ঐ

৬

আহা পাঁচ বাড়ির পাঁচ নারী বৈকালেতে জোটে,
কলসী লয়ে আমোদ করে যাচ্ছে জলের ঘাটে।
জলের ঘাটে গিয়ে বলে, শোন লো ঠাকুরঝি,
কালকেকারের ভাসান আমি দুটো শিখেছি,
কি ভাসান শিখেছিলি বল না, ছোট বউ,
ভাসানের কথা শুনে মনে ওঠে ঢেউ।
ঢেউ ওঠে বুক ফাটে আহা মরি মরি,
মরা পতি জ্যান্ত করল বেহুলা সুন্দরী।
কলার মাড়ে চড়ে, ঠাকুরঝি, আমরা যাব চলে,
কলার মাড়ে চড়ে গেলে পতি পাওয়া যাবে।
অল্পবয়সে যেমন লোকটা ফটিঙ টিঙে,
বাজে ঘুনসী কাঁথের বীণায় তোপা রঙের চিঙে। —ঐ

৭

এস, কিষ্ট, বসো কাছে কওগো ফুলের কথা,
অবতার পঞ্চম কিষ্ট জন্ম হইল কোথা।
জন্ম আমার মধুপুরে দৈবকীর ঘরে,
বসুমাতা রেখে গেল নন্দ ঘোষের ঘরে।

নন্দ গেল বাথানেতে যশোদা গেল ঘাটে,
শূন্য ঘর পেয়ে কিষ্ট সগল ননী লোটে।
হাতে ননী হৃদয়ে ননী ধায় গোপালের পিছে,
লম্ফ মেরে উঠল কিষ্ট কদমের ঐ মূলে।
ওখান থেকে নাব রে, কিষ্ট, পেড়ে দেব ফুল।
ওখান থেকে পলে পরে মজাইবি কুল।
লালায়ে ভুলায়ে ও মা কিষ্টকে নাবাল।
গাভী ছাঁদা দড়ি দিয়ে কিষ্টকে ছাঁদিল।
এমন ছাঁদা ছাঁদলে, মাগো, রব না এদেশে,
এদেশে আর রব না, মা, রব মধুপুরে।
পরের মাকে মা বলিয়া ননী চেয়ে খাব।
হাতের অঙ্গুরী বেচে ননীর কড়ি দিব।

হোলী গান

শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা উপলক্ষে যে হোলীগান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে অনেক সময় রাগ-সঙ্গীতের সুর ব্যবহৃত হয়। সেই জন্য কেহ কেহ ইহাকে লোক-সঙ্গীত বলিয়া স্বীকার করিবার পক্ষপাতী নহেন। তবে এ'কথা সত্য, কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা লৌকিক স্তরে নামিয়া আসিয়াছে, অতএব ইহাদিগকে লৌকিক বলিয়া মনে করিবার কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না।

১

খেলাতে হারিয়ে শ্যাম পলাইতে চায়।
চৌ-দিকে ব্রজবধূ, পথ নাহি পায়॥
আবিরে অরুণ আঁখি মেলিতে না পারে।
হারিনু হারিনু শ্যাম বলে বারে বারে॥
কর সঞে মুরলী ভুমিতে পড়ে হাসি।
করতালি দেই সব সখীগণ আসি॥
শিখি পুচ্ছ এলায়ে পড়িল মহীতলে।
অরুণিত বসন ভিজিল শ্রমজলে॥
শ্যামেরে বিভোর দেখি রসবতী রাই।
অরুণ বসন দিয়া ও'মুখ মোছাই॥

সিংহাসনে বসি রাই কোলে নিল শ্যাম।
প্রেম ভরে দুহুঁ অঙ্গে পরিপূর্ণ ঘাম॥
শ্রীরতি মঞ্জরী দোহে চামর ঢুলায়।
শ্রীরূপ মুঞ্জরী দোঁহে তাম্বুল যোগাই॥
শ্রীগুণ মুঞ্জরী দেহ সুবাসিত জলে।
এ রাধামোহন হেরি নয়ন সফল॥ —মুর্শিদাবাদ

২

বৃন্দার রচিত যতেক পরকার।
সখীগণ আনল বহু উপহার॥
রতন থারি পর রাখল তায়।
বারি বারি ভরি দেওল যাই॥
রতন আসন পর বৈঠল কান।
ভোজন করল আপন মন মান॥
আচমন সারি তলপে মুখ বাস।
ভোজন কর ধনি সখীগণ পাশ॥
যো বিন্দু শেষ ভুঞ্জল সখী সাথ।
আচমন করল মৃদুল পদ হাত॥
শ্যাম বামে ধনি বেঠলি যাই।
প্রিয় সহচরী কোই তাম্বুল যোগাই॥
শুতল শেজে আমার রাই ঘনশ্যাম।
চামর বীজন কর দাস বলরাম॥ —ঐ

উদ্ধৃত হোলী গানটির লোক-সঙ্গীত হইবার পক্ষে দুইটি অন্তরায়; প্রথমতঃ ইহার ভাষা ব্রজবুলি, সহজ বাংলা নহে, দ্বিতীয়তঃ ইহাতে বলরাম দাসের ভণিতা ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্য হইতে ইহা সংগৃহীত হইয়াছে, এই পর্যন্তই ইহার লোক-সঙ্গীতের দাবী।

হোসেনের পাঁচালী

কারবালার বৃত্তান্তমূলক মহরমের গানকে হোসেনের পাঁচালীও বলা হয়।

একবার ডাকরে হোসেন মা বলে।
হোসেনের বাপ তোমার দুঃখ দেখে বক্ষের পাষাণ যায় গলে॥

ওঠ, ওঠ, ওরে ও বাপ, সোনার যাদুমণি।
এস কোলে করে দেখি তোমার কাটা মুণ্ডখানি।
ও তোর দুঃখিনী জননীর হৃদয় যায় জলে॥
মদিনায় সুখেতে পালংকেতে ছিলি,
কারবালাতে কেন মরতে এসেছিলি।
ওরেরে আমার দুঃখিনীর ছেলে,
কেন কাফেরের ছলে আজ জীবন হারালে॥
মদিনা শহরে আছিল গোলজার।
এলি কেন, ও বাপ, কারবালা মাঝার।
তোমা বিনে সব হল কেঁদে জারে জার।
এ বাজার মদিনা আঁধার করিলে॥
এই হস্তে যাদের করলি বিতরণ,
তারাই ত এ দস্ত করেছে ছেদন।
খণ্ড খণ্ড করে কেটেছে বদন,
এই লিখন কি ছিল তোর কপালে॥
দশমাস দশ দিন তোরে গর্ভেতে ধরিয়া,
কত শত যাতনা লয়েছি সহিয়া।
ওরে, আমার এত দুঃখের ধন।
কি এমন দোষেতে পলকেতে বিনাশ করিলে॥
ছোট বেলায় তুমি করতে শয়ন।
দোলনা তোমার দোলাতো পবন॥
জিব্রাইল এসে বলতো কখন কখন,
কেন সোনার বরণ ধূলায় লুটালে॥
হুর পরী ফেরেস্তা আদি যত পয়গম্বর,
স্বর্গ হতে এসে করল তোমার গোর।
কাটামুণ্ড জানাজা কবর দিলে॥

—মুর্শিদাবাদ

পরিশিষ্ট

ক। সংযোজন

অনাদি-মঙ্গল

পশ্চিম বাংলার ধর্মঠাকুর বা ধর্মরাজঠাকুর কোন কোন সময় অনাদিদেব বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছেন। সেই সূত্রে মধ্যযুগে তাঁহার মাহাত্ম্যসূচক যে কাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহাকেও অনাদি-মঙ্গল বলিত। ইহাতে লাউসেন ও ইছাই ঘোষের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মৌখিক রচনা প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অনাদি-মঙ্গল বা ধর্মমঙ্গল গানের মধ্যে ইহার লিখিত রূপটি আত্মরক্ষা করিয়াছে।

অষ্টমঙ্গলা

চণ্ডীমঙ্গলগান এক মঙ্গলবারে আরম্ভ হইয়া আর এক মঙ্গলবারে শেষ হইত। সেই জন্য ইহাকে অষ্টমঙ্গলা গানও বলিত। কোন কোন ক্ষেত্রে মঙ্গলগানের শেষ দিবসের শেষ পালার আত্মপরিচয় মূলক অংশকেও অষ্টমঙ্গলা বলিত। একজন মঙ্গলগানের কবি লিখিয়াছেন,

তোমার কৃপায় যদি গ্রন্থ সাঙ্গ হয়।
অষ্টমঙ্গলায় দিব আত্মপরিচয়॥

কেহ কেহ মনে করেন, 'আট দিন ধরিয়া যে গান হইত, তাহার সংক্ষিপ্তসার ও ফলশ্রুতি'র নাম অষ্টমঙ্গলা।' (চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী' ২য় খণ্ড. পৃ. ৮৭৮)

ইউসুফ-জোলেখার পালাগান

পারসী সাহিত্য হইতে কাহিনী গ্রহণ করিয়া বাংলা দেশের নানা লৌকিক আখ্যান মিশ্রিত করিয়া যে সকল লৌকিক প্রণয়াখ্যান মূলক গীতি-কাহিনী মধ্যযুগে রচিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ইউসুখ-জোলেখার কাহিনীই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অনেকে মনে করেন। ইহাতে ইউসুফ এবং জোলেখার প্রণয় বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। মুহম্মদ সগীর নামক একজন কবিই ইহাকে

সর্বপ্রথম একটি লিখিত গীতিরূপ দেন। তাহার পথ অনুসরণ করিয়া অন্যান্ত কবিও অগ্রসর হইয়া আসেন। ইহার রচনার নিদর্শন এই প্রকার—

১

বিবিধ প্রকারে বালা চাহে নিরন্তর।
হানিতে আপনা দিষ্টি ইছুপ অন্তর॥
প্রেমরসে মধুপ্রেম চাহে ভুলাইতে।
ইছুপ রাখিল কন্যা মানস বহিতে॥
জোলেখার দিষ্টি নিত্য ইছুপ উপর।
ইছুপের দিষ্টি ধর্ম পন্থে নিরন্তর॥
রূপ দেখি শান্ত নহে জোলেখার মন।
দেখিলে খণ্ডে না ক্ষুধা না কৈলে ভক্ষণ॥
তৃষ্ণাকুল শান্ত নহে নিরক্ষিয়ে জল।
যদ্যপি না কৈলে পান না খণ্ডে অনল॥

কাহিনীটি সংক্ষেপে এই প্রকার :

রাজা তৈমুসের কন্যা জালিখা। যৌবনে সে পরমা সুন্দরী হইয়া উঠিল। একদিন স্বপ্নে এক সুন্দর পুরুষকে দেখিয়া সে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিল। সেই সুন্দর পুরুষ মিশরের সম্রাট্ আজিজ-মিসর। তৈমুস কন্যাকে তাহার সঙ্গে বিবাহ দিলেন, কিন্তু জালিখা দেখিলেন, ইনি তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ নহেন। তিনি তাঁহার মনের দুঃখ জানাইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। একদিনে দৈববাণী শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন, তিনি তাঁহার প্রণয়াস্পদকে লাভ করিবেন। আজিজ-মিসর তাঁহার নামে মাত্র স্বামী থাকিবেন। কেনান দেশের এয়াকুবের পুত্র ইউসুফ, তিনি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ। ভ্রাতারা ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে হত্যা করিতে চাহিলে তিনি ঈশ্বরের দয়ায় রক্ষা পাইলেন। কিন্তু গৃহ হইতে পলাইয়া গিয়া এক সদাগরের নিকট আশ্রয় লাভ করিলেন। একদিন আজিজ-মিসরের দরবারে তাহাকে উপস্থিত করা হইল। অন্তরাল হইতে জলিখা তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাহাকেই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ বলিয়া চিনিতে পারিলেন। তাহাকে পাইবার জন্য তাহার অদম্য বাসনা জন্মিল। জলিখা আজিজের সম্মতি লইয়াই তাহাকে দাসরূপে কিনিয়া লইলেন। তাহাকে নানাভাবে ভুলাইতে প্রয়াস পাইলেন।

কিন্তু ইউসুফ ধর্মপথ হইতে বিচলিত হইলেন না। অবশেষে জলিখা তাহার নামে অপবাদ দিলেন। রাজা তাহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। ইউসুফ দৈবের সহায়তায় তাহার নিষ্কলঙ্কতা প্রমাণিত করিলেন। জলিখার কলঙ্ক-কথা লোকে জানিতে পারিল। পুনরায় কৌশলে ইউসুফকে কারারুদ্ধ করা হইল। কারাগারে গিয়া জলিখা তাহার নিকট প্রেম নিবেদন করিল। ইউসুফ তাহাকে উপেক্ষা করিলেন। আজিজ-মিসরের ইতিমধ্যে মৃত্যু হইল, নূতন রাজা সিংহাসনে বসিলেন। ইউসুফ একটি ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যা বলিয়া দিবার জন্য রাজা তাহাকে সসম্মানে মুক্ত করিলেন। পুত্রহীন রাজা ক্রমে ইউসুফকেই সিংহাসনে বসাইলেন। তিনি রাজ্যে সুবিচার করিতে লাগিলেন। জলিখা ইতিমধ্যে সর্বস্বান্ত হইয়া ঈশ্বর-সেবায় মন দিয়াছে। করুণা পরবশ হইয়া ইউসুফ জলিখাকে বিবাহ করিলেন। শেষ পর্যন্ত ইউসুফের সঙ্গে ইউসুফের পিতারও মিলন হইল।

উদাসীর গান

চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম সম্প্রদায়েরই একটি শাখার নাম উদাসী সম্প্রদায়। পূর্ববঙ্গেই ইহার সন্ধান পাওয়া যায়। তাহাদের সাধন ভজনের গানগুলি সাধারণত বৈরাগ্যমূলক। ইহাদিগকে উদাসীর গান বলা হয়।

কলহান্তরিতা

বৈষ্ণব পদাবলীর অষ্টপ্রকার নায়িকার অন্যতম নায়িকা কলহান্তরিতা। ইহার লক্ষণ সম্পর্কে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে উল্লেখিত হইয়াছে,

'কলহান্তরিতা মানে ইহারা বিমুখ।
কান্ত বেগ্রতা করে হইয়া সমুখ॥
চরণে লাগিয়া কান্ত পড়ে ভূমিতলে।
কোপ করি নিঠুর কথা অপমান করে॥
বিমুখ হইয়া কান্ত নিজ ঘরে যায়।
পশ্চাৎ তাপ করি বিফল হয়ে তায়॥

কলহান্তরিতা নায়িকা অষ্ট প্রকারের হইয়া থাকে—

'সেই কলহান্তরিতা হয় অষ্ট বিবরণ।
আগ্রহী বিকলা ধীরা অধীরা বচন॥

কোপনাবতী সখ্যক্তিকা সমাদরা আর।
মুগ্ধা লজ্জা জানিবেক ইহার বিস্তার ॥'

পশ্চিম বাংলার ঝুমুর গানে ইহার লৌকিক একটি রূপ কোন কোন সময় ধরা দিয়াছে।

কালিকা-মঙ্গলের গান

সুন্দর এবং বিদ্যার প্রণয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া মধ্যযুগের যে মঙ্গলগান রচিত হইয়াছিল, তাহাতে কালিকাদেবী উপলক্ষ ছিলেন বলিয়া ইহাকে কালিকা-মঙ্গলের গান বলিত। এই বিষয় লইয়া মধ্যযুগে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও বিষয়টি মূলত যে সাধারণের মুখে মুখেই প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

এই লৌকিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রচিত কতকগুলি পদ সে যুগের বাঙ্গালী গীতি-রসিকের মুখে মুখে গীত হইত। ইহারা প্রায় লোক-সঙ্গীতের স্তরে পৌঁছিয়া গিয়াছিল।

ওহে বিনোদ রায়, ধীরে ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে ॥

কেন্দ্রী

বাংলা দেশের পশ্চিম প্রান্তের অধিবাসী সাঁওতাল প্রমুখ আদিবাসীর ব্যবহৃত তারের বাদ্যযন্ত্র। সরু বাঁশ দিয়া বাঁশীর মত সপ্ত ছিদ্র যুক্ত করিয়া ইহা নির্মিত হয়। ইহার নিম্নভাগে ক্ষুদ্র একটি মাটির খোলের উপর চামড়া দিয়া ছাউনি থাকে। উপরের দিক হইতে নীচে চামড়ার ছাউনি পর্যন্ত দুইটি তার দিয়া যুক্ত থাকে। ঘোড়ার লেজ দিয়া নির্মিত ছড় দিয়া একটি তারের উপর বাজান হয়। ডান হাতে ছড় বুলাইবার সঙ্গে সঙ্গে বাম হাতে বাঁশের উপর ছিদ্রগুলির ভিতর দিয়া যে স্বর নিঃসরিত হয়, তাহা নিয়ন্ত্রিত করা হয়। অনেক সময় সরু বাঁশের পরিবর্তে ছাতার বাঁটও ব্যবহার করা হয়।

খঞ্জনী, খুঞ্জুরী

বাংলা লোক-সঙ্গীতের একটি সুপরিচিত আনদ্ধ জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের নাম খঞ্জনী বা খঞ্জরী। কাঠের একটি গোলাকৃতি চাকতির একদিকে চামড়ার

ছাউনি থাকে ; কোন কোন অঞ্চলে কাঠের গোকাকৃতি চাকৃতির মধ্যে মধ্যে ছিদ্র করিয়া তাহাদের ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতলা টিনের গোলাকৃতি চাকৃতি পুরিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে হাত দিয়া চামড়ার ছাউনির উপর আঘাত করিলে তাহাদের মধ্যে সেই ধ্বনির অনুরণন হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে কেবল চামড়ার উপর হাত দিয়া বাজানোরই শব্দ হয়। 'যন্ত্রকোষ' নামক গ্রন্থে উল্লেখিত আছে যে, সর্প চর্ম দ্বারা খঞ্জনীর আচ্ছাদনী দেওয়া হয়। এই যন্ত্র প্রায় পৃথিবীর সর্বত্রই লোক-সঙ্গীত গাহিবার সময় ব্যবহৃত হয়। ইংরেজিতে ইহাকে Tambourine বলে। তবে ইহার আকৃতি বাংলাদেশের খঞ্জনী হইতে বড় হইয়া থাকে।

খমক

বাংলার লোক-সঙ্গীতের আনদ্ধ শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্র। ইহাকে আনন্দলহরীও বলে। ইহা পূর্ববাংলা বিশেষতঃ শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা এবং পূর্বমৈমনসিংহ অঞ্চলে অত্যন্ত জনপ্রিয়। ইহার বর্ণনা সম্পর্কে 'বাংলার সঙ্গীত' (রাজ্যেশ্বর মিত্র, মধ্যযুগ, পৃ. ৫২) গ্রন্থে উল্লেখিত হইয়াছে, 'এ'টি একটি গ্রাম্য যন্ত্র। প্রায় আধ হাত পরিমাণ একটি শূন্যগর্ভ কাঠের খোল, এক গাছি তাঁতের সূত্র এবং চর্মাচ্ছাদিত একটি মাটির বা কাঠের চাকৃতি—এই তিনটিই এর উপকরণ। খোলটির একদিকের মুখ ঠিক মাঝখানে খানিকটা ফাঁক রেখে বাকিটা চামড়ায় ছাওয়া থাকে। তাঁতের তারটি মাঝখান দিয়ে গিয়ে আর এক প্রান্তে মাটির বা কাঠের চাকৃতির সঙ্গে বাঁধা থাকে। এই খোলটি সাধারণত বাঁ হাতে আকর্ষণ করে ডানহাতে একটি তিনকোনা শলাকা দিয়ে বাজান হয়। কাঠের খোলের চারদিকে তবলা বাঁয়ার মতো চামড়ার ছোট্ থাকে।'

গুলে বকাওলীর পালাগান

পারস্য সাহিত্য হইতে যে সকল লৌকিক প্রেমমূলক কাহিনী মধ্যযুগে বাংলাদেশে প্রচার লাভ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে গুলে বকাওলীর গীতি অন্যতম। এই বিষয়টি লইয়া উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা গদ্য এবং নাট্যরচনাও আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। কাহিনীটি এই :

শর্কস্তানের অধিপতি ছিলেন জৈনল মুলক। তাঁহার দুই রাণী। ছোটো রাণী সুয়েসা গর্ভবতী হইলে এক রাজজ্যোতিষী রাজদরবারে আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। রাজা জৈনল জ্যোতিষীকে গর্ভজাত কুমারের ভাগ্যগণনা করিতে বলিলেন। জ্যোতিষী গণনা করিয়া বলিলেন যে, কুমার সর্ববিধগুণসম্পন্ন হইয়াও দুরদৃষ্টের অধিকারী হইবে। রাজা যে মুহূর্তে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিবেন, সেই মুহূর্তে অন্ধ হইয়া যাইবেন। সেই জন্য রাণী সুয়েশা সন্তান প্রসব করিবা-মাত্রই রাজা অন্যত্র প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া রাণী ও নবজাতককে দূরে সরাইয়া রাখিলেন।

বহুদিন চলিয়া গেল। রাজা একদিন বনপথে পরিষদবর্গের সহিত ভ্রমণ করিতেছিলেন। এক অশ্বারোহী যুবক দ্রুতবেগে সেই পথ দিয়া গমন করিতেই রাজা অন্ধ হইয়া গেলেন। বড়রাণীর পুত্রদ্বয় ঋমান ও খোমান ঐ যুবক যে ছোটরাণীর পুত্র তাজল মলুক তাহা রাজাকে জানাইলেন এবং তাহাকে হত্যা করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর বিধান রাজার ভাগ্যে ঘটিল, তবু রাজা আত্মসম্বিৎ হারাইলেন না। তিনি তাজলের রূপগুণ পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়াছিলেন, তাই তিনি পুত্রদ্বয়কে হত্যাকার্যে বাধা দিলেন।

রাণী সুয়েসা ও তাজলের মনেও সুখ নাই। রাজার ভাগ্যে এই দুর্দৈবের নিষ্ঠুর বিধানের কথা শুনিয়া তাঁহারা যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। এদিকে রাজবৈদ্য বিধান দিলেন যে, দুষ্প্রাপ্য বকাওলি ফুলের রস রাজার চোখে প্রয়োগ করিলে রাজা দৃষ্টি পুনরায় ফিরিয়া পাইবেন। বকাওলি ফুলের সন্ধানে কুমারগণ যাত্রা করিলেন। তাজলও মাঝিদের কৌশলে বশ করিয়া সেই নৌকায় আরোহী হইলেন।

রাজপুত্রগণ নৌকাযোগে ফেরদৌসী নগরে উপনীত হইলেন। ফেরদৌসীর রাজকন্যা আয়ারার ছিল পাশাখেলার এক কঠিন পণ। এই পণে যে পরাজিত হইবে সে হইবে কারারুদ্ধ, আর রাজকন্যাকে পরাজিত করিতে পারিলে রাজকন্যা তাঁহাকে বিবাহ করিবেন। অন্যান্য রাজপুত্রগণ রাজকন্যার নিকট পরাভূত হইয়া কারারুদ্ধ হইলেন। তাজল রাজকন্যাকে জয় করিলেন। তারপর তিনি বকাওলি ফুল সংগ্রহ করিবার জন্য পরীরাজ্যে গমন করিলেন। পথিমধ্যে উদ্যানের প্রধানা প্রহরী হামালার কন্যা মহাম্মুদাকে বিবাহ করিয়া হামালার সাহায্যে পুষ্প সংগ্রহ করিলেন; আবার তাজল ফারদৌশীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং আয়রাকে বিবাহ করিলেন। আয়রা অন্যান্য রাজকুমারকে মুক্তি দিলেন। তাজল সুকৌশলে ঐ রাজকুমারদের হাতে রাজসমীপে পুষ্প প্রেরণ করিলেন।

রাজা ভাবিলেন যে রাজপুত্রগণের অসীম চেষ্টায় বুঝি পুষ্প সংগৃহীত হইয়াছে, তাই রাজা দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়া পাইয়া আনন্দ উৎসব করিতে লাগিলেন। এদিকে পরীরাজ্যের রাজকন্যা বকাওলী রাজপুত্র তাজলকে ক্ষণিক দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইলেন। তাজলও বকাওলীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাই তাজল পরীরাজ্য হইতে বিদায় লইলে পরীরাজকন্যা বকাওলী সখী সেমস্থরের সহিত জৈনল মলুকের উৎসব সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাজলের প্রতিষ্ঠিত নূতন রাজ্যে সেই উৎসব সভা বসিয়াছিল। সেখানে আয়রা রাজার কাছে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করিলেন। রাজা তাজলকে বিভিন্ন ঐশ্বর্যে পুরস্কৃত করিলেন। পরীরাজকন্যা সহচরীর সহিত সমস্ত সম্ভান লইয়া অন্তর্হিতা হইলেন। তারপর পরীরাজকন্যা তাজলকে পরীরাজ্যে লইয়া আসিবার জন্য হামালাকে আদেশ করিলেন। তাজলও পরীরাজকন্যা বকাওলীর সহিত মিলিত হইবার জন্য আকুল। পরিশেষে তাজলের সহিত বকাওলীর পরীরাজ্যে এক কৌতুককর পরিবেশের মধ্য দিয়া মিলন হইল। আসামীরূপে তাজল পরীরাজ্যে উপস্থিত হইলে বকাওলী বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া তাঁহার অন্তরলোকে কিছুকাল বন্দী জীবন যাপন করিবার দণ্ডবিধান করিলেন।

ঘরের গান

কেহ কেহ বাংলার লোকসঙ্গীতকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করিয়া থাকেন, ঘরের গান ও বাইরের গান। ইংরেজিতে ইহাদিগকে Outdoor and Indoor Song বলা যাইতে পারে। যে সকল গান মাঠে ঘাটে নদীর বুকে গীত হয়, তাহাদিগকে যেমন বাইরের গান এবং তেমনই যে সকল গান ঘরের ভিতরে প্রধানত পারিবারিক অনুষ্ঠানে গীত হয়, তাহাদিগকে ঘরের গান বলা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, মেয়েলী বিবাহের গান যেমন ঘরের গান, তেমনই ভাটিয়ালী গান, ঝুমুর গান ইত্যাদি বাহিরের গান।

চণ্ডীমঙ্গল গান

লৌকিক চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া মৌখিক যে গীতিকাহিনী মধ্যযুগে প্রচলিত ছিল, তাহাকেই চণ্ডীমঙ্গল গান বলে। ক্রমে ইহা লিখিত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া মঙ্গলকাব্যের রূপ লাভ করে। মধ্যযুগের একজন

শ্রেষ্ঠ কবি এই বিষয়টি লইয়া সে যুগের শ্রেষ্ঠ আখ্যায়িকা-কাব্য রচনা করেন, তাঁহার নাম মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। মুকুন্দরাম সমসাময়িক লোক-সঙ্গীতের অনেক বিষয় তাহার রচনার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাহার রচনা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল।

চণ্ডীমঙ্গল গানের দুইটি কাহিনী—একটিতে কালকেতু ব্যাধের কাহিনী, আর একটি কাহিনীতে ধনপতি সদাগরের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। ইহাদের দুইটিতে যে চণ্ডীদেবী আছেন, তাঁহারা পরস্পর স্বতন্ত্র। একজন পশুকুলের রক্ষয়িত্রী আর একজন 'যোষিতাং ইষ্টদেবতা' অর্থাৎ স্ত্রীজাতির ইষ্টদেবতা; ইহার আর এক নাম মঙ্গলচণ্ডী।

চৌতিশা

প্রত্যেকটি পদের আদ্য অক্ষরে ক্রমান্বয়ে চৌত্রিশটি বর্ণ যোগ করিয়া যে দেবতার স্তবগান রচিত হয়, তাহাকে চৌতিশা বলে। মঙ্গলগানের মধ্যে এই রীতিটি সাধারণত ব্যবহৃত হইত। অক্ষরের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক হইতে মনে হয়, ইহা পুরাপুরি নিরক্ষরের সাহিত্য বা লোক-সাহিত্যের স্তরে কোনদিনই ছিল না। বরং তাহার পরিবর্তে লিখিত সাহিত্য ধারাতেই ইহা প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। পাঁচালী বা বর্ণনামূলক সাহিত্য মাত্র অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত হইত। মুসলমান কবিদিগের বর্ণনায় কোন দেবস্তুতি স্থান না পাইলেও কোন করুণ রসাত্মক বিলাপোক্তিতে ইহার প্রচলন দেখা দিয়াছিল। একজন মুসলমান কবি রচিত যয়নবের চৌতিশায় পাওয়া যায়—

১

কান্দে বিবি জয়নবে যে হাসনের শোকে।
কালিনী সমুদ্রমাঝে ডুবাইল মোকে ॥
কুকিলা কুহরে যেমন বসন্ত সময়।
কিলেশ অক্ষির জল ধারারূপে বয় ॥
ক্ষীণ হইল তনু মোর বিচ্ছেদে তোমার।
ক্ষেমাই রাখিতে চিন্তা না পারিএ আর ॥
খোদাএ করিল মোর এত বিড়ম্বন।
খাইলা দারুণ বিষ আমার কারণ ॥

ইহার প্রথম চারিটি পদের আদ্য অক্ষরে ক এবং পরে খ ব্যবহৃত হইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলে শ্রীমন্তের চৌতিশা এবং কালিকা-মঙ্গলে সুন্দরের চৌতিশা যথাক্রমে চণ্ডী এবং কালীর বর্ণনামূলক স্তব।

ছয়মাসী

নায়িকার বারমাসের পরিবর্তে ছয়মাসের বিরহ-দুঃখ বর্ণনা করিয়া যে গীত রচিত হয়, তাহাকে বারমাসীর পরিবর্তে ছয়মাসী বলে। এইভাবে অষ্টমাসী (পূর্বে দেখ) দশমাসীও বলা হয়। ভোজপুরী ভাষায়ও 'ছৌমাহা' বা ছয়মাসীর প্রচলন আছে।

টনসা যাত্রা

রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করিয়া রচিত পশ্চিম বাংলার এক প্রকার লোক-যাত্রার নাম টন্‌সা যাত্রা। অনেক সময় পাঁচ সাতদিন ধরিয়া রামায়ণের কাহিনী ইহার মধ্য দিয়া গীতসহ অভিনীত হয়। ইহা আদ্যোপান্ত মৌখিক রচনা, তবে বিভিন্ন চরিত্র রামায়ণের কাহিনীর ধারাই অনুসরণ করে।

ডমরু

বাংলাদেশের ডোম জাতি যে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করিত, তাহাকেই ডমরু বলিত বলিয়া মনে হয়। পশ্চিম বাংলার বাদ্যকরের ব্যবসায় একমাত্র ডোম জাতীয় লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাহাদেরই ব্যবহৃত এক বিশেষ শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্রকেই ডমরু বলিত। ইহা চর্মাচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্র। ইহার দুই দিকের তুলনায় মধ্যভাগ সরু। এই সরু অংশটিই মুঠি দিয়া ধরিয়া নাড়িতে থাকিলে চর্মাচ্ছাদিত দুইটি দিকে ইহার দুই কোনে সূতা দিয়া বাঁধা দুইটি গুটি আঘাত করিতে থাকে। মধ্যযুগেও এই বাদ্য যন্ত্রটির ব্যাপক ব্যবহার ছিল।

পালাটিয়া যাত্রা

উত্তর বাংলায় বিভিন্ন লৌকিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া যে একশ্রেণীর পালাগান রচিত হইয়া থাকে, তাহাকে পালাটিয়া গান বলে। লৌকিক প্রণয়াখ্যান ব্যতীতও সাম্প্রতিক কালে ইহাদের মধ্যে পৌরাণিক আখ্যায়িকাও

গৃহীত হইয়া থাকে। আধুনিক কালে যাত্রার প্রভাব বশত ইহা যাত্রাভিনয়েরও রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

ভাদুরার দ্বিরাগমন

পুরুলিয়া জিলা হইতে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয় একটি লোক-নাট্যের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহার নাম ভাদুরার দ্বিরাগমন। ইহা যাত্রার আকারে নাচনী নাচ, ঝুমুর গান ও গণেশ বন্দনাসহ পরিবেশন করা হয়। ভাদুরা এক বোকা জামাইয়ের নাম, তাহার পত্নী উদ্ধারের কাহিনী ইহার কাহিনী।

বৈরাগ্যের গান

যদিও বিভিন্ন বাউল, দেহতত্ত্ব, মুর্শীদ্যা, ভক্তিমূলক গানের মধ্য দিয়া বৈরাগ্যের ভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে, তথাপি এক শ্রেণীর গানকে সাধারণভাবে বৈরাগ্যের গান বলিয়াও উল্লেখ করা যাইতে পারে। সাধারণত ইহারা বার্ধক্যের গান। বিশেষ কোন তত্ত্বকথা ইহাদের মধ্যে থাকে না, বরং তাহার পরিবর্তে সাধারণ ভাবে সংসারের অন্তঃসারশূন্যতা এবং অনাসক্তির কথা ইহাদের মধ্যে প্রকাশ পায়।

১

আর বেলা নাই, ফুটল ঝিঙ্গা ফুল।
অ তোর খস্‌ল দন্ত, পাক্‌ল চুল॥
বেলা গেল সন্ধ্যা হল, আকাশ ভেঙ্গে আস্‌ল ঘুম;
(অ তুই) মহানিদ্রায় চেতন হারা,
জাগ্‌লি না, বাঁধালি গোল॥
বহু শাস্ত্র জেনে শুনে আসলে হয়েছে ভুল;
(অ তুই) খেয়ে দুগ্ধ হয়ে মুগ্ধ, অম্বলে মিশালি ঘোল॥
আপ্‌নে আপ্‌নি আলাপন,
এ আলাপন নিশির তুল্য সমতুল;
ভবে তুমি বা কার, কে বা তোমার,
চিন্‌লি নারে, মন-বাতুল॥

গোঁসাই বলে, মনরে আমার, ছাড়ল নারে মনের গোল ;
জান্‌বি তটে, খেওয়া ঘাটে, পাবি না আর কুলাকুল ॥

—ঢাকা (১৩২৬)

২

ওই ভবে তোর, কে আছে ?
ভেবে দেখ তুই মনের কাছে ।
ভাইয়ে ত আপনা নয় রে, এক বিন্দুর কায়া,
পরের নারী ঘরে আনি, ছাড়লাম ভাইয়ের মায়া (রে) ।
স্ত্রী ত আপনা নয় রে রসের পয়সা খায়,
কটু কথা বল্‌লে পরে রাঁড়ী হইতে চায় (রে) ।
বাড়ীর কাছে বাঁশের ঝাড় (ও) সে ত বন্ধু হয়,
জিতে লাগে ঘরের পালা মর্‌লে সঙ্গে যায় (রে) । —ঐ (১৩২৬)

৩

হারে, মন তুমি কার, কে বা তোমার মন তুই একা একা ।
আইছ একা যাইবা একা, ভবে কারো সঙ্গে নাই দেখা ।
যে সুখে রইয়াছ ভবে, চিরদিন কি এম্নি যাবে,
ভাবের অভাব হবে ;
তখন চোখের জলে বুক ভাসিবে, শেষে পথ যাবে না দেখা ।
আদরের রমণী যিনি, নরকে ডুবাবেন তিনি,
মাইয়া সোহাগিনী ;
তোরে বিনা মায়নায় চাকর পেয়ে কত খাটাইয়াছে, বোকা ।
সহজ মাইন্‌ষের সঙ্গ ধরে, বইসে থাক্‌গে রূপ-নেহারে,
যদি পা'বা তারে ; চণ্ডী বলে কলিকালে—
জীবন আর যাবে না রাখা, মন তুই একা একা ॥ —ঐ (১৩২২)

৪

(আর) কয় দিনের বা বাদ্‌সাগিরি ভেবে বাঁচি না ।
(হা রে) ঘৃণায় তোরে কেউ ছোবে না ॥
মেজ, মাইচা, কোচ ইত্যাদি,
এ সকল বা কোথা রবে তাই আমি ভাবি ।

তোরে জন্মের মত করবে ফকির,
'এস' বলে কেউ ডাকবে না ॥
আতর গোলাপ যত মাখ গায়,
এ সোনার অঙ্গ জোঁকে পোকে কত জানি খায় ;
আরে, এখন কত চাকর নফর,
(আর) সে বেলায় তোর—কেউ রবে না ॥ —ঐ (১৩২২)

৫

আর কতদিন রবি রে, মন, বৈদেশে।
হরি বৈলে মনানন্দে চল রে গউর-দেশে ॥
যে দেশে নাই গউর-গন্ধ,
সে দেশে তোর কি সম্বন্ধ, রলি এই দেশে ;
বিদেশিনীর সঙ্গে প্রেম কইরে,
মিছামিছি মরবি ঘুইরে, হারাবি দিশে।
সে যাবে তার আপন দেশে,
তুই রবি এই দেশে। —ঐ (১৩২২)

৬

মন রে, হরিনামের তরী ভবের ঘাটে লেগেছে।
তরা কে যাবি রে ভবপারে,
আর কি পারের ভয় আছে ॥
দেখে এলি ঘোর অন্ধকার,
ভবনদী করিতে পার, হইয়ে কর্ণধার।
সে যে ব্রজ হইতে নন্দের কুমার নইদেপুরে এসেছে ॥
তরীর মাঝে চৈতন্য চান,
পেতেছে রে পীরিতের ফান, নিশান গাইড়াছে ;
ঐ দেখ হরিদাস দুই বাহু তুলে,
আয়, আয়, বইলে ডাক্‌তেছে ॥
হরি বৈলে নামের নৌকায়,
কে যাবি রে, আয়, তরা আয়, সময় বৈয়ে যায় ;
কত দুঃখী তাপী বিনামূল্যে ভবপার হইতেছে। —ঐ (১৩২২)

৭

নিম্নোদ্ধৃত গানটি উল্টা বাউলের লক্ষণাক্রান্ত—

শোন্, গুরু, সেবকের বোল, ছাড় রে কামিনীর কোল,
তুমি দিনে দিনে ঘাটে ভরা বোরাইলা রে,
—গুরু, মীননাথ রে।
ও গুরু হে, কভু নি দেইখাছ, গুরু,
ইহা নি শুইনাছ রে,
তাল গাছে লাল বাঘের ছাও।
—গুরু, মীননাথ রে।
খঞ্জন পক্ষী হইয়া সে আধার যোগাইল রে,
আধারে ধইরা খাইল ছাও।
—গুরু, মীননাথ রে।
ও গুরু হে, কভু নি দেইখাছ, গুরু,
ইহা নি শুইনাছ রে,
দামড়া ছিঁড়া পাগায় লড় দেয়
—গুরু, মীননাথ রে।
ও গুরু হে, বাঘে মৈষে জুইড়া হাল,
বান্দার কিষাণ, পানির কুমইরে উরা বাছে!
—গুরু, মীননাথ রে।
পানির কুমইর হইয়া সে উরা বাছিল রে,
ইন্দুরে বুইনা গেল ধান।
—গুরু, মীননাথ রে।
ও গুরু হে, উজানি নগরের গুরু,
সে মচ্ছ উজাইল রে,
চরঙ্গীরা পল লইয়া যায়!
—গুরু, মীননাথ রে।
শৈল শৈল বইলা গুরু, সেই না চার দিল রে,
আরে ডাইন্ কাইলায় পল ভাইঙ্গা যায়।
—গুরু, মীননাথ রে।

ও গুরু হে, আটু হইল নড়বড় শরীর হইল কিঙ্কর,
কেশ হইল বাগুরার পাখী !
—গুরু, মীননাথ রে।
ও গুরু হে, অমাবস্যা মঙ্গলবার দ্বিতীয়া পালিও রে,
ডাইন অঙ্গে না ছোয়াইও নারী !
—গুরু, মীননাথ রে।
ও গুরু হে, উপ্তা লাচারীর গীত শোন ওহে পণ্ডিত,
রাজা হইয়া না করলা বিচার !
—গুরু, মীননাথ রে। —ঢাকা (১৩১৯)

৮

জীবনের নাই রে আশা,
কর শ্রীগুরুর চরণ ভরসা।
দেহের গুমান কর মিছে,
নিশ্বাসের কি বিশ্বাস আছে ?
কাল শমনে জাল পেতেছে,
ভাঙ্গবে রে তোর সুখে বাসা।
ভাই, বন্ধু, দারা, সুত
সকল পথের পরিচিত।
যখন প্রাণ তোর হবে হত,
কেউনা রে করবে জিজ্ঞাসা।
আপন আপন বল যারে
কেউত সঙ্গে যাবে না রে।
গুরু ভজন হইল না রে,
কেবল ভবে যাওয়া আসা।
কুমারের হাড়ি দড়ি,
আর অষ্ট কড়া কড়ি,
চাইর জনাতে কান্ধে করি
গাঙ্গের কুলে দিবে বাসা। —ঐ (১৩১৯)

ভেবে দেখলাম ভবনদীর নাইরে পারাপার।
আমি যেই দিকে চাই সেই দিকে দেখি অকূল পাথার।
উন্দুধুন্দু নইরাকারে, সে কথা মনে পইলে ফাঁপর করে,
চিন্তায় জর জরে—না দেখি উপায়। —ঐ (১৩২০)

১০

কাল্‌কা মোরা মনদুঃখে দুঃখী হইয়ে
কান্দা ফেলে মেরেছি সবায়;
কান্দার চোটে মাথা ফেটে
রুধিরে অঙ্গ ভেসে যায়।
নিত্যধামে নিত্য বস্তু রে, মাধা ভাই,
নবদ্বীপে হইয়াছে উদয়॥
সুরধনীর তীরে ধ্বনি ধ্বনি কি মধুর শুনা যায়॥
জন্মাবধি পাপের বোঝা
আমরা দু ভাই লয়েছি মাথায়;
চল দেখি রে, মাধা ভাই রে,
ঢেলে দেই দয়াল নিতাইর পায়;
তাতে যদি না হয় রত,
মন প্রাণ সঁপিয়া দিব জনমের মত,
তুই না গেলে আমি যাব রে, মাধা ভাই,
গৃহে থাক্‌ব কোন্ আশায়॥ —ঢাকা (১৩২২)

১১

মনের দুক্কু মনে রৈল, মনে মনে ভাবছি তাই!
মনে মনে ভাবছি তাই গো, মনে মনে ভাবছি তাই!
মনের দুক্কু মনে রইল!
বন পোড়া যায় সবাই ছাখে, আমার হৃদের আগুন
কেউ না ছাখে,
জলে গেলে দ্বিগুণ জলে—আমি কার ছায়াতে প্রাণ জুড়াই!
মনের দুক্কু মনে রইল মনে মনে ভাবছি তাই!

যখন বাঁধবে যমদূতে তখন আমি কোথায় যাব!
বান্ধন নিব আপন হস্তে, তখন কার দোহাই দিব!
মনের দুঃখু মনে রইল, মনে মনে ভাবছি তাই! —ঐ (১৩২৬)

মর্দল, মুরজ, মৃদঙ্গ

মধ্যযুগে রচিত সঙ্গীত শাস্ত্রে মর্দল, মুরজ এবং মৃদঙ্গকে অভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা কাঠ দিয়া তৈরী হইত বলিয়া সর্বত্রই উল্লেখ পাওয়া যায়। অথচ মৃদঙ্গ শব্দের অর্থই যাহার অঙ্গ মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত। মধ্যযুগের বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায়, মৃদঙ্গও কাঠের নির্মিত হইত। বর্তমানে মৃত্তিকা দ্বারা যাহা নির্মিত হয়, তাহা খোল নামে পরিচিত। তবে মৃদঙ্গও তাহাকে বলা হয়। মধ্যযুগে মর্দল বা মাদল কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত হইত, বর্তমানে তাহাও খোলের মত মৃত্তিকা দ্বারাই নির্মিত হয়। মৃদঙ্গ এবং মর্দল যে মৃত্তিকা দ্বারাও নির্মিত হইত 'ভক্তি-রত্নাকরে' তাহার উল্লেখ আছে—

আনদ্ধ মর্দল শ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গাখ্যা তার।
কাষ্ঠ মৃত্তিকা নির্মিত এ দ্বয় প্রকার॥

মনুচেহের মা'সুমা পরীর গান

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া উনিশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত যে সকল লৌকিক প্রণয়াখ্যান প্রধানত বাংলার মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রচলিত ছিল, মনুচেহের-মা' সুমা পরীর গান তাহাদের অন্যতম। পারসী ভাষা হইতেই ইহা বাংলায় প্রচলিত হইয়াছিল। বাকর আলি নামক একজন কবি ইহার একটি লিখিত রূপ দিয়াছিলেন। ইহা একটি বৈচিত্র্যহীন প্রেম-কাহিনী। মানুষের সঙ্গে পরীর প্রেম বর্ণনা করাই ইহার উদ্দেশ্য। পরীর নাম মা'সুমা এবং প্রেমিক নায়কের নাম মনুচেহের। বাংলাদেশের যোগ শাস্ত্রের কথাও ইহার মধ্যে গিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।

আশক মাশুক মধ্যে আছে এক নিত।
আঁখি ঠারে বাক্য কহে রহে সমাহিত॥
হৃদে চক্ষে মন কথা কহে নিরন্তর।
নিকটের লোক কভু না পায় খবর॥

আপনা জনার বেলা এ যার বিচ্ছেদ।
সহিতে না পারে সেই জানে প্রেমভেদ॥
দেখিতে এয়ার মুখ আঁখির কৌতুক।
না দেখিলে কভু নাহি আঁখি মনসুখ॥
মলকুত নাসুত ঘরে প্রেমের ঠাকুর।
লাহুত তরণী নাই যেবা নাহি ওর॥
লাহুত তরঙ্গ ঢেউ উঠয়ে লহরী।
প্রেমের ঠাকুর দৃষ্টি তরঙ্গ কাণ্ডারী॥
এ হেন প্রেমের সন্ধি যার হৃদে নাই।
মনুষ্য না হয় সেই না মিলে গোঁসাই॥

মধুমালতীর পালাগান

মধুমালতী এবং মনোহরের প্রণয় বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া যে রোমান্টিক গীতিকাহিনী লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল, তাহা মধুমালতীর পালা নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে কয়েকজন মুসলমান কবি এই গীতি কাহিনীটি একটি লিখিত গীতিকার রূপ দেন। ইহার কাহিনীর সঙ্গে বাংলার সুপরিচিত রূপকথা মদনকুমার ও মধুমালার কাহিনীর যোগ অনুভব করা যায়। মুহম্মদ কবীর নামক একজন কবি বলিয়াছেন,

মনোহর মালতীর অকুল পীরিত।
গাহি সকল লোক মন হরষিত॥
এহি সে সুন্দর কিচ্ছা হিন্দিতে আছিল।
দেশি ভাষায় মুঞি পঞ্চালী ভণিল॥

কিন্তু ইহার হিন্দী রূপের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কাহিনীটি বাংলা দেশেই পারস্য সাহিত্যের প্রভাবের ফলে জন্মলাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

লায়লী মজনুর পালাগান

পারস্য গীতি-সাহিত্য অবলম্বনে লায়লী এবং মজনুর লৌকিক প্রেমমূলক আখ্যায়িকা-গীতির নাম লায়লী মজনুর পালা। কাহারও কাহারও মতে খ্রীষ্টীয়

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে লায়লী মজনুর কাহিনী বাংলাদেশে পারস্ত সাহিত্য হইতে মুখে মুখে প্রচারিত হয়। তারপর ইহা বাংলা গীতিকাহিনী আকারে লিখিত হয়। লায়লা এবং মজনুর মানবিক প্রেম-কাহিনীই ইহার বিষয়বস্তু। যে যুগে একদিকে রাধাকৃষ্ণের দিব্যপ্রেম এবং আর একদিকে মঙ্গলকাব্যের শক্তিদেবীর মহিমা হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রচার লাভ করিতেছিল, সেই যুগেই লায়লী এবং মজনুর প্রেমকাহিনী শুনিয়া দেশের সাধারণ লোক তৃপ্তি লাভ করিতেছিল। লায়লীর প্রেমের মধ্যে রাধাপ্রেমের উন্মাদিনীরূপ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

খ। বাংলা লোক-গীতির সুর-বিচার

১

কোন গানের আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সাহিত্যিক বিচার-বিশ্লেষণের সংগে যুক্ত হয়, তার সাঙ্গীতিক গঠন-বৈশিষ্ট্যেরও আলোচনা।

কথা ও সুর

কেন না গানের কথায় কাব্যের প্রকাশ যতটুকুই থাকুক না কেন, সুরসংযোগেই তাহার শিল্প সম্পূর্ণতা লাভ করে। এই কথা জানতেন ব'লে কোন আধুনিক সমালোচক 'গীতাঞ্জলি'র আলোচনা থেকে বিরত হয়েছিলেন।

কথা ও সুরের এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক কেবল সত্যিকারের গানেই সম্ভব, তবে অনেক সময় কোন কোন গানকে যেমন আমরা কবিতার মত আবৃত্তি ক'রে থাকি, তেমনি অনেক কবিতাকেও গানের সুরে গাওয়া হয়। বলা বাহুল্য, এমন অবস্থায় গানের সুর একটা প্রথা বা 'ফর্ম' মাত্র; যেমন, এক সময় প্রথা ছিল, যে-কোন বিষয়কে কাব্যের আকারে বলা।

পল্লীগীতির আলোচনায় আমরা এই দু'টো ব্যাপারই দেখতে পাব; অর্থাৎ সত্যিকারের লিরিক-ধর্মী গান, সুর ছাড়া শুধু কথায় যায় গতি পংগু, যেমন ভাটিয়ালী, বাউল ইত্যাদি; এবং এমন সব গান, তাকে কেবল গান নয়, কবিতা বলতেও অনেকের বাঁধবে, যথা—ভাটের গান। এই শেষোক্ত প্রকারের গানে সুরের প্রয়োগ যে কেবল অপপ্রয়োগ, এমন কথা বললে বেশি বলা হবে; কেন না এই ধরনের ঐতিহাসিক বা অর্ধ-ঐতিহাসিক তথ্যগুলি সুরের মধ্য দিয়ে সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে, নীরস তথ্যবহুল কথা তা' না হ'লে শ্রোতার বিরক্তির কারণ হ'তে পারত। প্রসংগত ব'লে রাখা চলে যে, এই সব গানে সুর যেমন সরল, সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট ছকে ফেলা, তেমনি নেই এর সুরের মধ্যে স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত বলিষ্ঠতা। এই সব প্রায় আবৃত্তিমূলক এবং অনেকটা নকল সুরের সাঙ্গীতিক মূল্য যাই হোক, এই ধরনের ছোটখাট সুরের বাঁধা ধরা নক্সা বা 'প্যাটার্নে'র মধ্যে আমরা বৃহত্তর ও প্রধান প্রধান পল্লীগীতিগুলির ছায়া ও প্রভাব লক্ষ্য করতে পারব।

২

খাঁটি শিল্পসৃষ্টির পেছনে রয়েছে ভাবাবেগের অকৃত্রিমতা, গভীর আত্ম-প্রত্যয়েই যার উদ্ভব। অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত গ্রাম্য লোকদের মনের গঠন সরলই হোক, আর জটিলই হোক, হোক না তাদের জ্ঞানের পরিধি সীমায়িত, এমন একটি ত্রুটিপূর্ণ, শিক্ষিত সহরে ভদ্রলোকের সূক্ষ্ম-বিচারকুশল জ্ঞানাভিমানী মার্জিত বুদ্ধিকে হয়ত তারা ভীতিমিশ্রিত সম্ভ্রমের চোখেই দেখে থাকে; তবুও এ'টুকু বোধ হয় জোর ক'রেই বলা যায় যে, সামান্য ও সংকীর্ণ জ্ঞানকে বিচারবিহীন সরল বিশ্বাসে আত্মসাৎ করা তাদের পক্ষে যত সহজ, শিক্ষিত লোকের পক্ষে তত নয়; বহুমত-কণ্টকিত ক্রমবর্ধমান জ্ঞান-অরণ্যে দিশাহারা হ'য়ে শিক্ষিতদের মধ্যে তাই কেউ হ'য়ে পড়েন সন্দেহবাদী, কেউ বা একরোখা কোন মতবাদের পেছনে বিকারগ্রস্ত হ'য়ে ছুটাছুটি করেন। ফলে স্বদেশ ও স্বজাতির যে বিশিষ্ট ভাবধারা জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে যে বিশিষ্ট চিন্তা ও ধারণা রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত রয়েছে, তাকে স্বীকার ক'রে, ভালবেসে ও বিশ্বাস ক'রে দেশকালের সীমার মধ্যেই যে প্রবল আত্মশক্তির স্ফূরণ ঘটে, বাক্যে কর্মে ব্যবহারে শিল্পে সাহিত্যে সংগীতে যার সুনির্দিষ্ট পরিচয় গাঁথা হয়ে থাকে, শিক্ষিতের ভাগ্যে সেই শক্তিলাভ অনেক সময়েই ঘ'টে উঠে না। যাঁরা সাহিত্য আলোচনা করেন, শতকের সাহিত্যিক ধুরন্ধরদের জীবনে ও তাঁদের শিল্পসৃষ্টিতে তাঁরা এই শক্তির অমোঘ রূপ দেখে চমৎকৃত হয়েছেন, আবার আধুনিক যুগের আত্মভ্রষ্ট স্বজাতিচ্যুত দিগ্‌ভ্রান্ত বাঙ্গালীর দুর্বল অনির্দিষ্ট মনের ক্ষ্যাপামির পরিচয়ও আজ চারিদিকেই দেখা যাচ্ছে। এসব কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, অশিক্ষিত লোকেরা নিজেদের সরল বিশ্বাস ও বুদ্ধিতে বিশিষ্ট সামাজিক রীতিনীতি, ধর্ম ও সংস্কারকে অস্থিমজ্জায় গ্রহণ করেছে ব'লে শিক্ষিতের বিচারে ত্রুটিযুক্ত হ'য়েও এক অতি বিশিষ্ট মানস-চেতনার অধিকারী হয়েছে—এই চেতনার মধ্যেই জাতির একটি অতি নিশ্চিত পরিচয় বিশ্বাসের একনিষ্ঠতায় সুদৃঢ় ও শক্তিমান্ হ'য়ে তাদের সকল প্রকার চিন্তায় ও কর্মে প্রকাশিত হচ্ছে। তাই এই অশিক্ষিত জন-সাধারণের রচিত শিল্পে ও সংগীতে এমন একটি জিনিষ পাওয়া যাচ্ছে, যা' মহৎ না হ'লেও খাঁটি।

পল্লীবাসীর শিল্প-মানস

জাতিগত বৈশিষ্ট্যের এই অকৃত্রিম পরিচয়কে বুঝবার জন্যে এই গ্রাম্য শিল্পি-

রচিত সংগীত-সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করা প্রয়োজন। সাহিত্যের দিক দিয়ে এই বিচার আজ পর্যন্ত মন্দ হয় নি, সংগ্রহও অনেক হয়েছে, তবে সংগীতের দিক দিয়ে এর বিচার বা সংগ্রহ কোনটাই আশানুরূপ হয় নি। রবীন্দ্রনাথ নিজে অনেক লোক-সঙ্গীত সংগ্রহ করেছিলেন, তাঁর রচিত গানেও এই সব বাংলাদেশী লোক-সঙ্গীতের প্রভাব স্পষ্ট। কিন্তু এই সব গানের মধ্যে স্বর-রচনার কৌশল বা নিয়ম-নীতির কোন পরিচয় আছে কি না, এ সম্বন্ধে শিক্ষিত মহলে প্রায় কোন আলোচনাই হয় নি, গানের কথা-অংশটুকু সংগ্রহ ও বিচার ক'রেই তাঁরা সাহিত্যিক কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। অথচ সঙ্গীত সম্বন্ধে যাঁদের কিছুমাত্র অনুসন্ধিৎসা আছে, তাঁরাই হয়ত লক্ষ্য করেছেন, বাংলার পল্লীগীতির মধ্যে কেমন ক'রে যেন মিশে আছে বাংলার আকাশ বাতাস নদী বনপ্রান্তরের সৌন্দর্য, বাঙ্গালীর মনের মর্মকথা। কবি, ঐতিহাসিক ও সাহিত্য-সমালোচকগণ এই বিশিষ্ট বাঙ্গালী মনোভাবের পরিচয় নানাভাবে দেবার চেষ্টা করেছেন; কেবল সঙ্গীতের মধ্য দিয়েও তা' যে কেমন স্পষ্ট ও নিশ্চিত, সেইদিকেই দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন কেউ বোধ করেন নি। শুধু নিরাকার তত্ত্ববিলাস নয়, রসোজ্জ্বল রূপ ছাড়া বাঙ্গালীর মন যে তৃপ্ত হয় না, এর পরিচয় নানাভাবেই অনেকে দেখিয়েছেন। শাক্ত-বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের বিচারেও এর অনেক প্রমাণ মিলবে। কিন্তু একথা আমরা এখনও ভাল ক'রে বিচার ক'রে দেখিনি, কি ভাবে বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-শিল্প কীর্তনের মধ্যে কথা, সুর ও তালের এক অপরূপ মিশ্রণ ঘটেছে, যেখানে প্রত্যেকের মধ্যে বিস্তারের অপূর্ব সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সকলে একসঙ্গে চলাটা কত স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, কেমন ক'রে একদিন বাইরে থেকে আসা রাগসঙ্গীত আপন মাহাত্ম্য বিস্মৃত হয়ে কীর্তনের রসে এমন বেমালুম হারিয়ে গেছে যে, আজ আর তাকে খুঁজে বের করা মুস্কিল। কঠিন রাগসঙ্গীতকে হজম ক'রে স্বীয় বৈশিষ্ট্যকে জাগিয়ে রাখাতে বাঙ্গালীর শিল্পিমনের এই সবল পরিচয়ই পাওয়া যাচ্ছে, এবং যখন দেখি কীর্তনের পেছনেই শক্তিরূপে রয়েছে লোক-সঙ্গীতের ধারা, তখন সাধারণ শিক্ষিত লোক হিসেবে এর বিচার না ক'রে ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কলাবস্তু হিসেবে একে অবহেলার চোখে দেখে আমরা জাতিগত অপরাধ করেছি।

পল্লীসংগীতের সাহিত্যিক পরিচয়ের তুলনায় সাংগীতিক পরিচয়

বাঙ্গালীর শিল্পিমনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য

সেই অপরাধ-স্খালনের কিছুটা চেষ্টা মাত্র এখানে করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এ কাজ একদিনের নয় বা একজনেরও নয়, জনসাধারণের উপেক্ষা ও শৈথিল্যে ও তদুপরি রাজনৈতিক নানা ঘটনা ও সমস্যায় কর্তব্য সম্পাদন ক্রমশঃই দুরূহ হ'য়ে উঠেছে। তবে আমাদের ভরসা এই যে এখনও পল্লী-সঙ্গীতের অপমৃত্যু ঘটেনি। পাশ্চাত্ত্য দেশে লোক-সঙ্গীতের রূপ খুঁজতে গেলে নাকি আজকাল সহরে আসতে হয়। আমাদের তেমন অবস্থা নয়; কেবল ভাগ্যদোষে যা' আমাদের বহু প্রাচীন বঙ্গ, মুসলমান আমলের 'বঙ্গালহ' ও আধুনিক পূর্ব-পাকিস্তান, সেইখানেই মেঘনার বুকে ও সুর্মা উপত্যকায় লোক-সঙ্গীতের একটি অতি বিশিষ্ট রূপ ভাটিয়ালীর জন্মভূমি হওয়ায় সন্ধানী পাঠকের আগ্রহে কিঞ্চিৎ ভাঁটা পড়বার কারণ উপস্থিত হয়েছে।

৩

ভারতবর্ষে শতকরা প্রায় ৯০ জন গ্রামে থাকেন ব'লে দেশের একটা বৃহৎ শক্তি সেখানেই সংহত হ'য়ে আছে; সেই শক্তি একদিকে সমাজ ও অন্যদিকে জনসাধারণের মনোভূমি আশ্রয় ক'রে নানা ভাবে বিকশিত হচ্ছে। এর মূল রয়েছে বহুদিনাগত ধর্ম-সংস্কার, রীতি-নীতি ও নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে। এইজন্যেই বিনা চেষ্টাতেই ভারতবর্ষীয় সভ্যতায় তার ধ্যান-ধারণার চিন্তা-ভাবনার মূল সূত্রগুলি অতি সহজেই সাধারণ লোকের মুখস্থ হ'য়ে গেছে। আর তাই অন্যদিকে না হ'লেও এই জাতির ভাব-জগতের মধ্যে একটি সম্পূর্ণতার আভাস রয়েছে। এর সাক্ষাৎ ফল হোলো জীবনের সর্বদিকে সৃষ্টিমূলক প্রয়াস—সাহিত্যে, সঙ্গীতে, অন্যান্য শিল্পকলায়, জন্মমৃত্যু-বিবাহ ইহকাল ও পরকালের সর্ববিধ চিন্তায়।

ভারতের বিশেষত বাংলার জনসাধারণের জীবনকথায় পল্লী-সংগীত

পল্লীগীতিকে আশ্রয় ক'রে এক বাংলা দেশেই যে বিচিত্র সঙ্গীত ও বিচিত্রতর প্রকারভেদের সৃষ্টি হয়েছে, তার পেছনের রয়েছে এই ধরনের সবল সক্রিয় সমাজ ও জনমন। তাই বাংলার লোক-সঙ্গীত কেবল চাষীর গান নয়, এই গান সমগ্র জনসাধারণের বিভিন্ন কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে, তার উৎসব ব্যসনে অন্নচিন্তায়, ধর্মচিন্তায় সুখে দুঃখের নানা অভিব্যক্তিতে রচিত হয়েছে এই গান। এই বিভিন্ন দিকের সম্মিলিত সমগ্র রূপেই পল্লীজীবনের যথার্থ পরিচয়। বৈচিত্র্যের মধ্যে এই পরম ঐক্যের সন্ধান পেয়ে একদা

একজন বিদেশী সঙ্গীতানুরাগী বিস্মিত হয়েছিলেন। বাংলা দেশের কোন এক গ্রামে নৌকা বেঁধে রেভারেণ্ড্ পপ্লী সাহেব চারদিক থেকে বিভিন্ন প্রকারের সঙ্গীত শুনতে পেলেন—'There was nothing discordant and it all blended together into a pleasing harmony.' বহুকাল ধ'রে একসঙ্গে বাস ক'রে এসেছে বাংলার ধনিদরিদ্র, চাষী ও জমিদার, হিন্দু-মুসলমান। বাইরের বিভেদ যে অন্তরের ঐক্যানুভূতির অন্তরায় হয়নি, তার প্রমাণ এই বিভিন্নমুখী পল্লীগীতির ভিতরকার ঐক্যসূত্রটি। আজও বাইরের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে বাংলার বহির্জীবনে ও অন্তর্জীবনে নানা বিক্ষোভের সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও, এই সূত্রটি ছিন্ন হয়নি ব'লেই মনে হচ্ছে।

আরও একটু কথা আছে। বাংলা দেশে আধুনিক-পূর্ব যুগ পর্যন্ত সহরে ও গ্রামে তফাৎটা তত স্পষ্ট ছিল না; যতটা ছিল ও এখনও আছে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে। দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌর মত বড় বড় সহর এক কোলকাতা ছাড়া বাংলা দেশে ছিল না, আর কোলকাতাও তো সেদিন বৃটিশ আমলের কিছু আগে থেকে সহর হ'বার পথে অগ্রসর হচ্ছিল। হয়ত অনেকটা এই কারণেই বাংলা দেশে শিক্ষিতে অশিক্ষিতে ও বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত লোকদের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গোড়া থেকেই অব্যাহত ছিল। তাই চাষীদের গান কেবল চাষীদের শোনবার জন্যে নয়, আর শিক্ষিতের সঙ্গীত কেবল নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। নানা উৎসবে পূজাপাবণে বাংলার সমস্ত শ্রেণীর জনসাধারণই একযোগে আনন্দ উপভোগ ক'রে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন প্রকারের গীতকে সকলেই সমভাবে তাদের অন্তরের সামগ্রী ক'রে তুলেছে।

বাংলার নাগরিক জীবন ও পল্লীজীবনে প্রভেদ

এর ফলে শিল্পসঙ্গীতের (art music) একটি ধারা যা সমগ্র ভারতীয় বিশিষ্ট সংগীত-চিন্তার সংগে যুক্ত, তা' অতি সহজেই বাংলার সবখানেই সঞ্চারিত হ'য়ে পড়েছে। বাংলা দেশের প্রাণকেন্দ্রে তার আপন পরিচয় যদি যথেষ্ট গভীর না হতো, সমগ্র জাতি যদি তার নিজস্ব সাধনমন্ত্রে দীক্ষিত না থাকতো, তবে এর মধ্যে দিয়েই তার সর্বনাশ ঘট্‌তে পারতো। কিন্তু তা হয়নি। তাই শুদ্ধাচারী প্রবলপরাক্রান্ত রাগসংগীত বাংলার জনসাধারণের সঙ্গে মিশ্‌তে গিয়ে নিজের রাজকীয় পোষাকটি ছেড়ে এসেছেন; বাংলাদেশেও তাঁর চেহারায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য

বহিরাগত সঙ্গীতের উপাদান ও বাংলার পল্লীগীতি

এনে দিয়েছে যা'তে স্পষ্টই বুঝা যায়, এঁকে আর বাংলাদেশের বাইরে দেখতে পাওয়া যাবে না। এমনি ক'রে বাইরের সংস্কৃতিকে আত্মশক্তির মধ্যে শুষে নিয়ে বাংলার শিল্প সমৃদ্ধতর হয়েছে। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে এই আত্মীকরণের ব্যাপার সকলের জানা আছে, সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি, সেইটাই কেবল আমাদের বলবার কথা।

এই সংযোগের ফলে বাংলার লোক-গীতির মধ্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যানুগত হ'য়েও সুরে ও ছন্দের যে বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে, তার সামান্য একটু উদাহরণ দেওয়া যাক। পৃথিবীর যাবতীয় পল্লী-গীতিতে সাধারণতঃ পাঁচ স্বরের খেলাই দেখতে পাওয়া যায়, বিশেষজ্ঞদের এই মত। এই pentatonic scale বা পঞ্চস্বারিক গ্রামের পরিচয় যে বাংলার পল্লী-সঙ্গীতে নেই, তা' নয়; তবে সেগুলো সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায়, বাংলার সীমান্ত প্রদেশে, যথা, সাঁওতালদের গানে,—যাদের সঙ্গে বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক যোগ তত স্পষ্ট নয়, অথবা যারা নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিচয়কে সযত্নে বাইরের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবার চেষ্টা ক'রেছে। এ ছাড়া খাস বাংলার মধ্যেও যেখানে এই পাঁচস্বারিক গ্রামের চিহ্ন আছে, বুঝতে হ'বে সেগুলো গান নামে চ'লে গেলেও আসলে আবৃত্তি-ধর্মী, আর সেইজন্যই সুরকে সেখানে নিতান্তই সরল ও সংক্ষিপ্ত হ'য়ে প্রবেশ করতে হ'য়েছে; যথা, ভাটের গান। এই ধরণের কয়েকটি উদাহরণ বাদ দিলে দেখা যাবে, বাংলাদেশের সাধারণ সঙ্গীতের মধ্যে পাঁচ স্বর নয়, সাতস্বরেরই প্রয়োগ রয়েছে এবং তাদের মধ্যে শিল্পসঙ্গীতসুলভ জটিলতা না থাকলেও, পল্লী-সঙ্গীতের মধ্যে যতটুকু অলংকার তার স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে আঘাত না ক'রেও টিকে থাকতে পারে, তাও রয়েছে। কোনও যুগে এই পল্লী-সঙ্গীতও পাঁচস্বরমূলকই ছিল না, তা' আজ আর বলবার উপায় নেই; আজ কেবল এই কথাই বলব, বাংলার লোক-গীতি অন্যান্য যাবতীয় লোক-সঙ্গীত থেকে আলাদা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, কেবল নিজের বিশিষ্ট রূপভঙ্গীতে নয়, সাত স্বরের বিশেষ ঐশ্বর্য নিয়েও। আর কেবল সুরের দিক দিয়েই নয়, ছন্দের দিক দিয়েও এর মধ্যে নানা বৈচিত্র্যের উদ্ভব হ'য়েছে। এর পেছনে প্রচ্ছন্নভাবে রাগসঙ্গীত বা শিল্পসঙ্গীত সম্বন্ধে কিছুটা চেতনা জাগ্রত রয়েছে ব'লেই সুরে ও তালে এই বৈচিত্র্যের সৃষ্টি সম্ভব হ'য়েছে। অবশ্য মনে রাখতে হবে, এই সমস্ত

পল্লীগীতিতে প্রযোজ্য স্বরের সংখ্যা

সুর ও ছন্দে বৈচিত্র্য

ব্যাপারটিই পল্লী-সঙ্গীতের আপন সত্তার সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে, গান শুনতে শুনতে সহসা এ সব কথা কারও মনে হবে না, যদি না সে আগে থেকে তার বিশ্লেষণী বুদ্ধিটি শানিয়ে নিয়ে তৈরী হ'য়ে থাকে।

সকল দেশের পল্লী-সঙ্গীতের মধ্যেই কতকগুলো সাধারণ লক্ষণ রয়েছে দেশকাল-অনুগত বিশেষ ভঙ্গিমাটি ছাড়াও। ভাষার মত সঙ্গীতও একটা বিশেষ ভাব-কল্পনাকেই প্রকাশ করে, উপযুক্ত পদবিন্যাসেই (musical phrases) তার সম্পূর্ণতা। এই কথার ব্যাখ্যা ক'রে টার্ণার সাহেব বলেছেন—'একটা কথা স্পষ্ট ক'রে ব'লে দিতে চাই যে, সঙ্গীতের মধ্যে ভাষা নয়, সাঙ্গীতিক ভাবকল্পনা বা তার অঙ্গগত পদের সম্পূর্ণতাই প্রয়োজন।' তিনি হয়ত এখানে এই কথাই বলতে চেয়েছেন, পল্লীসঙ্গীতের মধ্যে ভাষার সম্পূর্ণতা নয়, সুরের নক্সাগত সম্পূর্ণতারই প্রয়োজন বেশী ; কেন না, এই বিশেষ নক্সাগুলো বা পদগুলো (musical phrases) সমগ্র গানের মধ্যে বারবার আবৃত্ত হ'তে দেখা যায়। এই দিক দিয়ে অর্থাৎ সুরের দিক দিয়ে পল্লী-সঙ্গীতের মধ্যে একটি অত্যন্ত সরল বাঁধুনী র'য়েছে, অল্প কয়েকটি পদমিশ্রণে তার সুসম্পূর্ণ রূপটি ফুটে উঠে। এই পদান্তর্গত স্বরগুলি সরলভাবে কিংবা জটিলভাবে সজ্জিত থাকতে পারে, যেমন বাংলাদেশের অনেক লোকগীতিতেই তা' দেখিতে পাওয়া যাবে, ছন্দ ও সুর উভয় দিক দিয়েই ; কিন্তু সবগুলো পদ নিয়ে যে সমগ্র গঠনভঙ্গীটি তৈরী হোলো, তা' সরস ও সংক্ষিপ্ত। শিল্পসঙ্গীতের মধ্যে যে ব্যাপ্তি ও জটিলতা সুর ও তালকে আশ্রয় ক'রে আছে, এখানে তার অভাব।

পল্লীগীতির সাধারণ লক্ষণ

পল্লী-সঙ্গীতের আর একটি লক্ষণ হোলো, সে স্বয়ংসম্পূর্ণ,—যে পরিবেশে যেমন ভাবে এই গান গীত হ'য়ে থাকে, সেখানেই তার পূর্ণ রূপটি পুরোপুরি প্রকাশিত হয়,—সেই বিশেষ প্রাকৃতিক আবেষ্টনী, নিজেদের হাতে তৈরী একতারা দোতারা জাতীয় দু' একটি যন্ত্র, এমন কি, গায়কদের বাগ্‌ভঙ্গীর সেই অসাধু উচ্চারণ—এ সব থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে এ'লে পল্লী-সঙ্গীতের অঙ্গহানি হ'তে বাধ্য ; এমন কি, সভ্য জগতের বিচিত্র মধুরধ্বনিবিশিষ্ট যন্ত্র-সংযোগে গীত হ'লেও তার এই অভাবপূরণ আর কিছুতেই হয় না। এই ধরনের একটি ব্যাপারকেই লক্ষ্য ক'রে বোধ হয় পূর্বোক্ত টার্ণার সাহেব লিখেছেন—'এই অজ্ঞাত গ্রাম্য রচয়িতাদের রচনা মূলতঃ 'মেলডি' জাতীয় (melody) হ'লেও

এদের মধ্যে স্বর-সঙ্গতির (harmony) জৌলুস আনতে গিয়ে পরবর্তী সঙ্গীতজ্ঞগণ বারবার ব্যর্থ হ'য়ে কেবল এই কথাই প্রমাণ করেছেন যে, তাদের নিজেদের সাঙ্গীতিক জ্ঞান এই অজ্ঞাত শিল্পীদের কাছে নিতান্তই হীন।' মূলতঃ পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত সম্বন্ধে বলা হ'লেও বাংলার লোক-সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও এর কিছুটা সমর্থন পাওয়া যাবে। নানা প্রতিষ্ঠানের তাগাদায় আজকাল ওস্তাদি বা আধুনিক মনোভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিরা বাংলার কোনও কোনও পল্লী-গীতির সংস্কার বা উন্নতি-বিধানের যে হাস্যকর চেষ্টা করছেন, তার মাধ্যমেই এর প্রমাণ মিলতে পারে।

লোক-সঙ্গীতের আলোচনায় যতই অগ্রসর হব, ততই দেখতে পাব যে, এর সৃষ্টি অশিক্ষিত মস্তিষ্কের খামখেয়ালীতেই নয়, এর মধ্যেও রয়েছে সমস্ত সার্থক শিল্পসম্মত নীতি, নিয়ম ও শৃঙ্খলা, যুক্তি দিয়ে যার বিচার চলে; গ্রাম্য গায়ক জেনে হোক, না জেনে হোক, অত্যন্ত কঠোর ভাবেই তা' পালন ক'রে থাকে। এমনি কি, রাগসঙ্গীতের লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে প্রাচীন শাস্ত্রকার যে সমস্ত নিয়মের উল্লেখ করেছেন এবং আধুনিক রাগসঙ্গীত চর্চায় যা' প্রায়ই উপেক্ষিত হয়, তারই দু' একটাকে কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে এই লোক-সঙ্গীতে অনুসৃত হ'তে দেখে এই কথাই মনে হয়, রাগ-সঙ্গীতের জন্ম-ইতিহাসের পেছনে আছে যে এই লোক-সঙ্গীতই, তা' বোধ হয় মিথ্যা নয়। তাই লোক-সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত লক্ষণগুলো অন্ততঃ রাগ-সঙ্গীতের প্রথমাবস্থায় বর্তমান ছিল, ধ'রে নিতে পারি। পরে অবশ্য ক্রমবিবর্তনের পথে অগ্রসর হ'তে হ'তে সে পুরাণো নিয়মকে বর্জন ক'রে নূতন নিয়ম গ'ড়ে তুলেছে। তবু রাগ-সঙ্গীতের সেই প্রাচীন পদ্ধতিগুলো এখনও কোথাও কোথাও দেখতে পাওয়া যায়। আমরা 'গ্রহ অংশ ন্যাস' নামে শাস্ত্রীয় সূত্রানুযায়ী কোন রাগের যে বিশেষ স্বরে আরম্ভ, বিশেষ স্বরসন্দর্ভে স্থিতি, এমনি আর এক বিশেষ স্বরে বিরতির নির্দেশ পাই, তারই কথা এখানে উল্লেখ করতে পারি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আলোচনা পরে। এখানে কেবল এইটুকু বলতে চাই যে, সঙ্গীতের বৈয়াকরণেরা বোধ হয় লোক-সঙ্গীতের কোন নিয়মনিষ্ঠা থাকতে পারে, এ'কথা বিশ্বাস করেন না; তা না হ'লে, সব সময় কানের কাছে শুনতে পেয়েও কি ক'রে তাঁরা এ সম্বন্ধে একেবারে নির্বিকার আছেন?

লোক-সঙ্গীতের সুনির্দিষ্ট প্রণালী

বাঙ্গালী জীবনের নানাদিকের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে রয়েছে, বাংলার লোক-সঙ্গীত। দৈনন্দিন জীবনের সহস্র খুঁটিনাটি থেকে উচ্চ আধ্যাত্মিক কল্পনা পর্যন্ত সর্বত্র সুর জুগিয়েছে এই লোক-গীতি।

নদীমাতৃক বাংলা দেশ। জলের সংগে তার একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। একদিকে যেমন সে অন্ন যোগায়, অন্যদিকে বন্যায় তার অন্ন ঘুচিয়েও দিয়ে যায়।

ভাটিয়ালীর প্রাচীনতা ও শ্রেষ্ঠত্ব

এই নদীর ধারে ও বুকের উপর বাস ক'রে যে সমস্ত চাষী ও মাঝি, নানা কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে এর সংগে তাদের প্রাণের যোগ স্থাপন ক'রেছে, ভাটিয়ালী তাদেরই আনন্দ-বেদনায় নিবিড় হ'য়ে উঠেছে। ভাটিয়ালী এই আনন্দ-বেদনারই রসরূপ; এর মধ্যে দিয়েই নিরক্ষর চাষী ও মাঝির সুখদুঃখের প্রেমভক্তি-ভালবাসার নানা কথা সরল সৌন্দর্যে ফুটে উঠে। এইসব গানের মধ্যে সাধারণ মানুষের মনের কথাই ব্যক্ত। হ'তে পারে বাউলের তত্ত্বগভীর বাক্যের কাব্যসৌন্দর্য এখানে নেই, তবুও একথা সহজেই বলা চলে যে, তত্ত্বকথার চেয়ে মানুষের সুখদুঃখটা প্রাচীনতর। তত্ত্বকথা বলতে গেলে মনের প্রবীণতার প্রয়োজন হয়; এই কথা মনে রেখে এবং বাংলা দেশের এই বিশেষ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কথা চিন্তা ক'রে আমরা বলতে পারি, ভাটিয়ালীর সৃষ্টি বাউলের অনেক আগেই হ'য়েছে। তাই এখান থেকেই আমাদের আলোচনা সুরু করা যাক্।

আমরা পল্লী-সঙ্গীতকে দুই ভাগে ভাগ করিতে পারি—এক, যে সমস্ত গান

"বাইরে"র গান ও "ঘরে"র গান

ঘরের মধ্যে বা প্রাঙ্গণে অনেকের সংগে একযোগে গাওয়া হয়; আর এক প্রকারের গান, যা' গাওয়া হয় ঘরের বাইরে উন্মুক্ত প্রান্তরে বা শূন্য নদীর বুকে। ভাটিয়ালী এই শেষোক্ত শ্রেণীর গান এবং বোধ হয় সকল প্রকার বাংলা লোকগীতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কেবল তাই নয়, এর অসামান্য প্রভাব নানা গীতের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কাজ করছে, বাউলও বাদ যায় না। এইদিক থেকে ভাটিয়ালীকে বাংলা পল্লীগীতির ভিত্তি-স্বরূপই বলা চলে। আমরা অবশ্য ভাটিয়ালীর সুরের দিক দিয়েই এই কথা বলছি।

প্রথমেই বলে রাখা ভাল, রেকর্ড ও চলচ্চিত্র মারফৎ যে ভাটিয়ালীর সংগে আমাদের পরিচয়, আসলে ভাটিয়ালীর চেহারা সে'রকম নয়। বিভিন্ন যন্ত্র ও

তাল সহযোগে জাঁকজমকের সঙ্গে গীত ভাটিয়ালী শুনেই আমরা অভ্যস্ত; কিন্তু মেঘনার বুকে বা সুর্মা নদীর উপত্যকা ও তৎসংলগ্ন হাওর অঞ্চল যেখানে এই সঙ্গীতের খাস জন্মস্থান, সেখানে এই ভাটিয়ালী শুনতে পাওয়া যাবে না। কারণ, আসল ভাটিয়ালীর সঙ্গে কোন যন্ত্রই বাজে না, তার গতিও স্বচ্ছন্দ অর্থাৎ তাল বা ছন্দোহীন। অদ্ভুত ব্যাপার সন্দেহ নেই, তবু এতে অবাক্ হ'বারও কিছু নেই।

ভাটিয়ালীর খাঁটিরূপ

ভাটিয়ালী গায় একজনে, শোনেও বোধ হয় একজনেই। হাতে কোন কাজ নেই, পাল তু'লে দিয়ে হাল ধ'রেছে নৌকার মাঝি, এই অবসরটুকু ভ'রে তুলবার জন্যে সে গান ধরেচে—'আমি স্বপ্নে দেখি··· ············"; নদীর জলের সঙ্গে, উন্মুক্ত প্রান্তরের সঙ্গে এ'র সুর বাঁধা। উপরে অনন্ত নীলাকাশ স্তব্ধ হয়ে রয়েছে নীচে তার বহুদিনের চেনাশোনা নদী নিতান্তই জানা সুরে একটানা গান গেয়ে চলেছে, চারদিকে দৃষ্টি কোথাও বাধা মানে না,—এই দিগন্ত প্রসারিত শূন্যতার মাঝখানে একলা মাঝি। সে জানে এই প্রশান্ত গম্ভীর বিস্তৃতিকে কোন সুরের মন্ত্রে ভ'রে দেওয়া যায়, কর্মহীন অবসরে নদীর সঙ্গে মুখোমুখী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই কথা তার মনে প'ড়ে যায়। এই নিঃসঙ্গ নির্জনতার মধ্যে মনের দুয়ার আপনিই খুলে যায়। কিন্তু পরকে শোনাবার তাগিদ নেই, তাড়াহুড়ো করবার কোনও প্রয়োজন নেই—তাই তার কণ্ঠ থেকে যে গান বেরোয়, সে গান ছন্দের বন্ধনে সুরকে চঞ্চল ক'রে তুলে না, সুর তার স্বচ্ছন্দগতিতে মাঝির মনের কথার দু'একটিকে মাত্র একেক বারে সঙ্গে নিয়ে লম্বা একটানা পথে ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে দিগন্তে পাড়ি জমায়। এমন পরিবেশে সাধারণ শিক্ষিত লোক হয়ত দার্শনিক হ'য়ে পড়বেন, কিন্তু আমাদের মাঝির চোখ বুজে দর্শন-চিন্তা করার সময় নেই, কোনও একটা পদাংশের মাঝখানে সুরকে ছাড়ান দিয়ে সে হয়ত বড় জোর হুঁকোয় দুটো টান লাগিয়ে নিচ্ছে এবং তারপরে বাকী পদটুকু পূরণ ক'রে দেওয়ার মাঝখানের এই বিবৃতিতে কিছুমাত্র অস্বাভাবিকত্ব ধরা পড়ছে না। বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে ভাটিয়ালীর এই নিবিড় অন্তরঙ্গতা এক পরম বিস্ময়ের ব্যাপার। প্রকৃতির ঠিক মাঝখানে থেকে তার মর্মবাণীর সন্ধান যেন এরা পেয়েছে, তাই এদের কণ্ঠের সুরের আকৃতিকে আকাশ নদী বন ও প্রান্তর যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে আলিঙ্গন ক'রে ধরে। তার নিরাভরণ

ছন্দোবন্ধনহীন কণ্ঠস্বর প্রকৃতি নিজের হাতে পূর্ণ ক'রে তোলে। শুধুমাত্র কণ্ঠস্বরের মধ্যে দিয়ে যে এই অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তাকে সুন্দরতর করবার ক্ষমতা কোন যন্ত্রের নেই।

পূর্বোক্ত অঞ্চলে অনুসন্ধিৎসু শ্রোতা হয়তো এমনি কোন এক মাঝির গান শুনতে পাবেন, নয়তো দেখবেন গরু-মোষগুলোকে চরাতে দিয়ে নিশ্চিন্তে গাছতলায় শু'য়ে আছে কোন রাখাল, তারও চারদিকে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ—সবুজের ঢেউয়ে ঢেউয়ে আকাশ মাটির শেষ সীমান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। হঠাৎ শুনবেন, সেই পূর্বশ্রুত ভাটিয়ালী সুরে আর কোন নতুন গানের কলি। এই রাখাল কোন ছন্দোবদ্ধ কাজে ব্যস্ত নয়, সেই মাঝিও ছিল না; এদের চারদিকে প্রকৃতির মধ্যেও কোনও চঞ্চল ছন্দস্পন্দন অনুভূত হচ্ছে না—তাই ব'লেই যে ভাটিয়ালী ছন্দোহীন এমন মনে হ'তে পারে। আরও মনে হয়, এই প্রকৃতির দুলালেরা যে মুহূর্তে কাজকর্মের ফাঁকে একটু হাঁফ ছেড়ে প্রকৃতি মায়ের কাছটিতে এসে বসে, সেই মুহূর্তেই সে তাদের অন্তরের মধ্যিখানে প্রবেশ ক'রে তাদের কণ্ঠস্বরের বাঁশীটিকে বাজিয়ে তোলে। এই অপরূপ একাকীত্ব, বাইরের প্রকৃতির এই বিশাল বন্ধনহীন বিস্তার, এই মধুর কর্মহীনতা—এই সবই যেন একযোগে এই পরমাশ্চর্য গীতধারাকে সৃজন ক'রেছে।

সুদূর পল্লীঅঞ্চলের ভাটিয়ালীকে তার বিশিষ্ট পরিবেশ থেকে সহরে টেনে এনে সর্বসাধারণের গোচর ক'রে একদিকে যেমন ভাল কাজই করা হচ্ছে, তেমনি একে সহুরে রুচির উপযোগী ক'রে তুল্‌তে গিয়ে এর আসল রূপটিই ঢেকে ফেলা হচ্ছে। এ সম্বন্ধে এখনও সাবধান হওয়া প্রয়োজন। কেন না, এমনি ক'রেই অনুরূপ অবস্থার মধ্যে পড়ে ইউরোপের অধিকাংশ ভাল লোক-সঙ্গীত বর্তমানে এমন ভদ্র অর্থাৎ বিকৃত রূপ নিয়েছে, যে, তাদের আসল রূপ গবেষণার বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। 'হারমোনাই-জেশন' বা স্বর-সঙ্গতির যৌথ কারবারের চাপে প'ড়ে ইউরোপীয় লোক-সংগীতের চেহারা এমন ভাবে পাল্টে গেছে যে, তাকে চেনা তো দুষ্করই, পল্লীঅঞ্চলে আর তাকে খুঁজেও পাওয়া যায় না, বরং পাওয়া যায় কোন সহরবাসীর সংগৃহীত কৌতুহলোদ্দীপক দুর্লভ সামগ্রী রূপে।

সহুরে ভাটিয়ালী

ভাটিয়ালীর এই স্বভাব সম্পূর্ণতা, যন্ত্র ও ছন্দের সাহায্য ব্যতিরেকেই তার রূপের যে এই পূর্ণ প্রকাশ সে সম্বন্ধে আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনামত কারণ নির্দেশ

ক'রে এইবার ভাটিয়ালীর অন্যান্য দু'একটি লক্ষণ সম্বন্ধে কিছু বলার চেষ্টা করা যাক্। ভাটিয়ালীর গঠনভঙ্গীর মধ্যে আর একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, এতে দু'তিনটি শব্দ নিয়ে এক একটি শব্দগুচ্ছ এক একবারে উচ্চারিত হয় এবং দ্বিতীয়তঃ থাকে এই উচ্চারণের পরেই লম্বা একটানা বা আন্দোলনযুক্ত একটি সুরের কাজ। সাধারণতঃ দেখা যাবে, শব্দগুচ্ছের শেষ বর্ণ টি যে স্বরে গিয়ে দাঁড়ায়, সেই স্বরটিই দীর্ঘ হ'য়ে উঠে। এই স্বরের দৈর্ঘ্য কতটুকু হ'বে তার কোন বাঁধাধরা মাপকাঠি নেই, তা' সম্পূর্ণ নির্ভর করে গায়কের নিজস্ব মেজাজ ও রুচিবোধের উপর। স্বরপ্রয়োগের দিক দিয়ে আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়—আরম্ভেই ভাটিয়ালী সাধারণতঃ চড়ার সুরের দিকে চলে যায় এবং তারপরেই ধীরে ধীরে কখনও বা দ্রুতবেগে নেমে আসে খাদের দিকে, সেইখানে ক্রমেই গান যেন বিশ্রাম লাভ করে। এ যেন প্রাণের কোন গভীর কথাকে দিগ্‌দিগন্তে শুনিয়ে দিয়ে আবার নিজের প্রাণের গভীর খাদেই ফিরিয়ে নিয়ে আসা। এ ছাড়া ভাটিয়ালীতে সাতস্বরের প্রয়োগ তো হয়ই, অনেক সময় এর গানের গতি দুই সপ্তক পর্যন্ত ব্যাপ্ত হ'য়ে থাকে। এই ব্যাপারে রাগ-সঙ্গীতের কোন প্রচ্ছন্ন হাত আছে কি না, কিংবা রাগ-সঙ্গীতের কোন গীতরীতির সঙ্গে এর কোথাও সাদৃশ্য আছে কি না, সে সব বিচার একটু পরে করা হবে। 'বাইরের গান' হিসাবে ভাটিয়ালীর এই বর্ণনার পরেই মনে হবে, আর একটি পল্লীগীতির কথা, 'বাইরে'র গান হয়েও যা' ভাটিয়ালীর স্বভাবের একান্তই বিপরীত।

ভাটিয়ালীর গীতরীতি

আমরা সারি গানের কথা বলছি। ভাটিয়ালী ছন্দোহীন মন্থরগতি, সারি গান ঠাসবুনোন ছন্দে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে। দুই প্রকার গানই সেই মাঝিরাই গেয়ে থাকে, কিন্তু তবু দুইয়ে কী ক'রে এই পার্থক্য সম্ভবপর হোলো, তার বিচার করতে গেলে দেখতে পাব যে, এমন ব্যাপার ঘটেছে পরিবেশের তফাতের জন্যেই। ভাটিয়ালী একজনের গান ব'লেই এবং পরিবেশের এই নির্জন উদার বিস্তৃতির জন্যেই সুরের মধ্যে এই নির্লিপ্ত ধ্যান-গভীরতা রয়েছে, ছন্দের ঠোকাঠুকিতে যাকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তোলা হয় না। আর সারিগান বহু জনের সম্মিলিত কণ্ঠসঙ্গীত বলেই এবং বিশেষ ছন্দোবদ্ধ কাজের সঙ্গে সংযুক্ত বলেই এর মধ্যে তাল কেবল অপরিহার্যই নয়, বিচিত্রতায় সমৃদ্ধ। ভাটিয়ালীকে যদি রাগ-সঙ্গীতে ধীর-গম্ভীর আলাপের

সারি বনাম ভাটিয়ালী

চালের সঙ্গে তুলনা করি, তবে সারিগানে রয়েছে যেন দ্রুতগতি গতের চাল।

সারিগানের সময় ও উপলক্ষ্য হচ্ছে বৈঠার সাহায্যে নৌকা চালানো—ছোট পাঁচ সাত হাত লম্বা নৌকা থেকে আরম্ভ ক'রে ষাটজনের উপযোগী ছিপের নৌকা একযোগে তালে তালে যখন দ্রুতগতিতে চালানো হয়, তখনকার গান এই সারিগান, এই action-এর মধ্যে সে গেয়—বিশেষ একই প্রকার কাজের একঘেয়েমিকে দূর ক'রে তাকে সুন্দর গতি দেবার জন্যে, ছন্দ তাই আপনিই এসে পড়ে। ভাটিয়ালীতে এই action-এর ও উদ্দেশ্যের একান্ত অভাব ব'লেই তার মধ্যে শিল্পগত সৌন্দর্য আরও গভীরতর হয়ে উঠেছে। সকলের সংগে মিলে গায়ের জোরে তালে তালে বৈঠা চালানোতে শরীর ও মনে যে ছন্দস্ফূর্তি জাগে, দাঁড় ধ'রে চুপ ক'রে ব'সে থাকায় তার উল্টো ব্যাপার ঘ'টে থাকে। এ ছাড়া সারি কথাটা যদি শ্রেণী অর্থে ধরা যায়, তা' হ'লেও একটা অর্থবোধ হ'তে পারে, কেন না, শ্রেণী থাকলেই শৃঙ্খলা থাকবে, তা নইলে তার গতির মধ্যে সৌন্দর্য জাগে না, আর ছন্দ তো শৃঙ্খলিত তালমাত্রাই।

একসংগে কাজ করার মধ্যে এই ছন্দের আবির্ভাব আমরা নানাভাবেই দেখে থাকি। কোনও একটা ভারী জিনিষ তোলবার বা ঠেলবার সময়, ছাদ পেটাবার সময় এবং এমনি দৈনন্দিন নানা ব্যাপারে সকলই হয়ত দেখেছেন যে, একটা ছন্দে কাজ হচ্ছে এবং সেই ছন্দকে রক্ষা করবার জন্য একটা ছড়ার মতন কি যেন আবৃত্তি করা হচ্ছে। এই ছড়াই বোধ হয় সারি বা তার অনুরূপ গানের প্রাথমিক ভিত্তি। ক্রমোন্নতি হ'তে হ'তে একদিন হয়ত এতে সুর যোজনা করা হয়েছে এবং অর্থহীন ছড়াগুলিও ধীরে ধীরে লোক-সাহিত্যের পর্যায়ে এসে পৌছেছে, কেবল তাই নয়, তার মধ্যে বিশিষ্ট ছন্দের আমদানি ক'রে তাকে সুন্দর তালে পরিণত করা হয়েছে।

সারিগানের প্রয়োগ ক্ষেত্র

শুধু নৌকা চালানোর ব্যাপারেই সারিগান সীমাবদ্ধ নয়। যেখানেই বহু লোক একসঙ্গে একই ধরণের কাজে নিযুক্ত, সেখানেই আমরা এই ধরণের গান শুনতে পাই। ছাদ পেটার গান, ধান কাটার গান ইত্যাদি, নানা নাম থাকলেও, আসলে এ'গুলো সারিজাতীয় গানই। কাজের পার্থক্য অনুসারে কথার বিভিন্নতা

সারি পর্যায়ের অন্যান্য গান

থাকলেও, সুরের রচনা-কৌশল প্রায় সর্বত্রই এক। সুরের দিক দিয়ে এই সমস্ত গান ভাটিয়ালীর কাছে ঋণী। এমন কি, কথার দিক দিয়েও সারিগান অনেকটা ভাটিয়ালীর মতই। কাজেই তফাৎ বেশির ভাগ নির্ভর করছে গাইবার ভংগীর মধ্যে, ছন্দ থাকায় ও না থাকায়।

বাংলার পল্লী-সংগীতে ভাটিয়ালীর প্রভাব যে কত ব্যাপক ও গভীর, তার সুরের নক্সাটাকে একটু হেরফের ক'রে যে কত ভাবে বিভিন্ন লোক-গীতিতে যোগ ক'রে দেওয়া হ'য়েছে, সে সম্বন্ধে আরও কিছু বলবার আগে আমাদের একটি ফেলে আসা আলোচনা আরম্ভ ক'রে দেওয়া যাক্। ভাটিয়ালীর সুরের এই নক্সাটির আরও একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন এবং তার সংগে রাগ-সংগীতের কোন যোগাযোগ রয়েছে কিনা, তাও দেখবার চেষ্টা করা দরকার।

পল্লী-সঙ্গীতে যে নিয়মতন্ত্রের অভাব নেই এবং রাগসঙ্গীতের সঙ্গে তার কিছুটা সম্পর্ক থাকা যে একেবারে বিচিত্র নয়, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে

রাগসংগীতের সঙ্গে সম্পর্ক

একটা ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করেছি। ঝিঁঝিঁট বাংলা দেশে এত জনপ্রিয় রাগ কেন? এমন কি, অনেকের কাছে স্বর্গীয় আখ্যা পেয়ে এসেছে কেন? এর কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, প্রায় সমস্ত পল্লী-সঙ্গীত ও এমন কি, কীর্তনের মধ্যেও এই রাগেরই স্বরগ্রাম বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই রাগ খাম্বাজ ঠাটের অন্তর্গত। আমরা দেখব, এমন অনেক গান আছে, যা'তে মূলতঃ ভীমপলাসী রাগ বা কাফী ঠাটের স্বর লাগলেও কোথাও কোথাও এই খাম্বাজ ঠাটের স্বরও যুক্ত হয়েছে। এইখানে ব'লে রাখা ভাল যে, পূর্বভারতীয় সঙ্গীতে ঝিঁঝিঁটের দুই রূপ স্বীকৃত,—এক, যা খাদের পঞ্চম পর্যন্ত নেমে আসে, এবং অন্যটি যা খাদের ধৈবত পর্যন্ত গিয়েই থেমে যায়। রাগসঙ্গীতে এই শেষোক্ত প্রকার ঝিঁঝিঁটের নাম কঁসৌলী ঝিঁঝিঁট। এই নামটি আমাদের জেনে রাখা দরকার—অধিকাংশ পল্লী-সঙ্গীতের পেছনে রয়েছে এই কঁসৌলী ঝিঁঝিঁট। সাধারণ ঝিঁঝিঁটের বা তথাকথিত পাহাড়ী ঝিঁঝিঁটের স্বররূপ হচ্ছেঃ—স র ম I প ম গ র স ণ় ধ় প় I প় ধ় স র গ ম গ, ধ স I আর পল্লীগীতির ঝিঁঝিঁট বা এই কঁসৌলী ঝিঁঝিঁটের স্বররূপ এই রকমঃ—স র ম I প ম গ র স ণ় ধ় I ধ স স র গ, র গ স I এখানে একথা বললে নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না,—আমাদের মনে হয়, এই শেষোক্ত প্রকার ঝিঁঝিঁটের

মূল রয়েছে এই পল্লী-সঙ্গীতের মধ্যেই। উল্লিখিত স্বররূপের মধ্যে কেবল ভাটিয়ালী নয়, অন্যান্য লোকগীতিরও সাধারণ রূপ প্রত্যক্ষ করছি ব'লেই এই সিদ্ধান্ত করার যৌক্তিকতা অনুভব করছি। অনেক রাগের মূল এই যে পল্লীর সুরের মধ্যেই, সেই কথার প্রমাণও যেন এই প্রসঙ্গে কিছুটা পাচ্ছি।

এদিকে গানের মধ্যে কথার পরিবেশনের নিয়ম আলোচনা করলে দেখা যাবে, শিল্পসঙ্গীতের টপ্‌পা নামক গীতরীতির সঙ্গে এ বিষয়ে ভাটিয়ালীর বেশ মিল রয়েছে। এখানে হিন্দুস্থানী টপ্‌পা নয়, বাংলা টপ্‌পার কথাই বলা হচ্ছে। টপ্‌পা গোড়ায় হিন্দুস্থানী রীতিতে গীত হলেও বাংলা দেশে এসে সে নবরূপ ধারণ করেছে, তার মধ্যে বাংলার নিজস্ব রুচি ও মেজাজের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। হিন্দুস্থানী টপ্‌পায় অত্যন্ত দ্রুত তালের যে তাড়া আছে, বাংলার

বাংলা টপ্‌পা বনাম ভাটিয়ালী

টপ্‌পায় তা নেই—এখানে তালগুলির গতি মন্থর। কেবল তাই নয়, এই সব তালে মোটামুটি ভাবে তালের হিসেব থাকলেও মাত্রা গুণ্‌তির হিসাব নেই, অর্থাৎ সুর মাত্রার সঙ্গে লাফালাফি করে অগ্রসর হয় না—ছন্দ এখানে গা ঢাকা দিয়ে পিছনে সরে আছে। ভাটিয়ালীর মত এর কথাগুলোও এক এক গোছা ক'রে গায়কের মুখে উচ্চারিত হয়, আর তার পরেই কথার হাল থেকে ছাড়ান পেয়ে সুর 'জমজমা' নামক তালের মধ্যে বিশ্রাম লাভ করে। তফাৎ দাঁড়াল এই, ভাটিয়ালীতে একটানা সুরের যা কাজ, টপ্‌পার বেলায় 'জমজমা' তালের কাজও তাই। যদি বলা যায়, বাংলা টপ্‌পায় ভাটিয়ালীর প্রভাব আছে, তা' হলে খুব মিথ্যা বলা হবে না। বাংলার নিজস্ব সঙ্গীত চেতনা সর্বত্র সঞ্চারিত হয়ে রয়েছে ব'লেই টপ্‌পার মধ্যে এই বিশেষ পরিবর্তন ঘটে গেছে বলে মনে করতে পারি। এই টপ্‌পা বাংলার কেবল পল্লী-সঙ্গীত নয়, গত শতকের নানা গীত থেকে আরম্ভ করে এ যুগের রবীন্দ্র-সঙ্গীত পর্যন্ত তায় প্রভাব বিস্তার করেছে।

রাগসঙ্গীত-সুলভ নিয়মতান্ত্রিক আলোচনায় আমরা আরও কিছু দূর অগ্রসর হচ্ছি। রামায়ণ গান বা পুরাণ গান ইত্যাদি প্রায় আবৃত্তিমূলক গানের কথা বাদ দিলে বাউল, ভাটিয়ালী দেহতত্ত্ব প্রভৃতি প্রায় যাবতীয় লোক-

গানের কলি বা 'তুক'

সঙ্গীতে রাগসঙ্গীতের আস্থায়ী ও অন্তরার মত দুটি ভাগ পাই, অবশ্য ধ্রুপদে বা আধুনিক বাংলা গানে যে বাকী দুটো তুক্ সঞ্চারী ও আভোগের পরিচয়ও পাই, পল্লীগীতিতে প্রায় কোথাও

তা' নাই। এই শেষ তুক দুটির প্রয়োগে শিল্পসঙ্গীত জটিলতর ও সমৃদ্ধতর হ'য়ে উঠেছে।

কবি গানে জুড়িরা যে অত্যন্ত চড়া সুরে গান ধরে থাকে, তার মধ্যে আস্থায়ী অন্তরা ভাগ থাকার কথা নয়। তবে 'কবি'র নিজের গানের সঙ্গে তুলনায় এই চড়া সুরের কাজে সমস্ত গানটির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা রয়েছে মনে করতে পারি। পুরাণ গান ইত্যাদিতে পাঠক সাধারণতঃ চার লাইন উচ্চারণ করেন এবং তাদের মধ্যে সুরের তফাৎ বড় একটা থাকে না; কোথাও কোথাও এই চার পঙ্‌ক্তিতে চার রকম সুরই ব্যবহৃত হয়। তাকে আস্থায়ী অন্তরার ভাগে ভাগ করতে পারা যায় না। অন্ততঃ একঘেয়েমি থেকে রক্ষা পাবার জন্যেও এই সুরের তফাৎ দরকার। এই চার পংক্তি গাইবার পরেই সম্মিলিত কণ্ঠে একটু উঁচু সুরে গাওয়া হয় দিশা বা ঘোষা। প্রসংগত বলা চলে, বইয়ের মূল গানের সুরকে এইখানে উন্নততর করার চেষ্টা রয়েছে, পল্লীর গায়কেরা এতে পাল্লা দিয়ে নূতন ও সুন্দর সুর যোজনা করে। এমনি ভাটের গান বা কবিতাতে প্রথম দুই পংক্তির সুরই সর্বত্র গাওয়া হয় বলে আস্থায়ী অন্তরার প্রশ্ন উঠে না, আগেই তা বলা হয়েছে।

দিশা বা ঘোষা

আমরা এতক্ষণ বাউল সম্বন্ধে কিছুই বলিনি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই বাউলের সুরে ও কথার গভীর অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনায় যে কতখানি মুগ্ধ হয়েছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর সংগৃহীত লোক-সঙ্গীতে, তাঁর রচিত গানে। বাউল দেহতত্ত্ব মারফতি, শরিয়তি, হকিয়তি, মাইজভাণ্ডারি ইত্যাদি সবগুলিই প্রায় সম-গোত্রীয় বলেই শুধু একটিরই আলোচনা করা হচ্ছে। হিন্দুস্থানীতে 'বাউরা' মানে পাগল। বাউল মানে পাগল হওয়াও বিচিত্র নয়। গুরুতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব, এইসব তত্ত্বের কথা কাব্যের রূপকে বাউলের মধ্যে পাই। বাউল সংসার বিরাগী যোগী, তার চিন্তাধারা কর্মধারা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে খাপছাড়া অস্বাভাবিক—তাই সে পাগল বৈকি। আর বাউলের কোন সম্প্রদায় নেই, 'বাউল সম্প্রদায়' কথাটা বোধ হয় শব্দের অপপ্রয়োগ। তাই দেখি আত্মতত্ত্ব বা দেহতত্ত্বের আলোচনায়—সাম্প্রদায়িকতা নেই—এখানে সূফী ফকিরের সঙ্গে তাদের মিল রয়েছে, সুতরাং জাতিভেদের কথাও উঠে না।

বাউল

এই সেদিন 'খ্যাপা' নাম নিয়ে যে বাউল গান রচনা করে গেলেন, সেগুলো গাওয়া হয় সাধারণতঃ ফিকির চাঁদ ফকিরের রচিত সুরে। শ্যামা সঙ্গীতে 'রামপ্রসাদী' যেমন বিশেষ এক ধরণের সুর, বাউলের বেলায় 'ফিকির চাঁদি'ও সেই রকম এক বিশিষ্ট সুর। পল্লীগীতিতে শিল্পসঙ্গীতের মতন ধ্রুপদ খেয়াল জাতীয় গীতরীতির নাম নেই, কিন্তু গীতরীতি আছে; 'ফিকির চাঁদি' এই রকম এক গীতরীতি।

এই 'ফিকির চাঁদি'র বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু বলা চলে। আমরা পূর্বে পল্লী-সঙ্গীতে এক ধরণের ঝিঁঝিঁট রাগ ও খাম্বাজ ঠাটের উল্লেখ করেছি। 'ফিকির চাঁদি'র রূপটি একটু আলাদা। কঁসৌলি ঝিঁঝিঁট যা ভাটিয়ালীতে খুব বেশী প্রচলিত তার রূপটি হচ্ছে,—স র ম, প ম গ, ধ স ণ ধ, ধ স—স র গ, র গ স I এর সঙ্গে ফিকির চাঁদির তুলনা করা যাক্ :—II স I স র I গ প — I ধ ন — I ধ স স I ন ধ প I প ম গ I — গ র I র গ ম I গ র স I — — II খুব সূক্ষ্ম বিচার না করেও বলা চলে, এতে বিলাবল পর্যায়ের রাগের প্রভাবই বেশী। এই প্রসঙ্গে একটা বলে রাখছি যে, বিলাবল আমাদের যাবতীয় দেবস্তুতি ও তত্ত্বমূলক সঙ্গীতে সর্বাপেক্ষা উপযোগী সুর। অধিকাংশ সংস্কৃত স্তোত্র বিলাবলের শুদ্ধ স্বর সাহায্যে গাইলে ভাল শোনায়। গাম্ভীর্য রক্ষার পক্ষে এই ধরনের সুরই ভাল। তবে এক কারণে বৈঠকী সঙ্গীত হিসেবে এই গাম্ভীর্য বাউলে রক্ষিত হয় নি। সেটি হচ্ছে বাউলের ছন্দোবাহুল্য, তারও কারণ, বাউল গান গাইবার সময় নাচে। বলা বাহুল্য, এ পাগলের নাচ নয়। সাধারণের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক জীবন যাপন করলেও বাউলের মধ্যে কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা রয়েছে—এ নৃত্য তাই বেপরোয়া মাতামাতি নয়, তাই বাউলের নাচে ছন্দের বৈচিত্র্য আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে তালেও বৈচিত্র্য অর্থাৎ তালফেরতা আছে। এক হিসেবে বাউল গান শুধু কানে শোনবার নয়, চোখে দেখবারও বস্তু। বাউলের একতারা, নৃত্যের ভঙ্গী, ভাবের উচ্ছ্বাস, সবই সামনে থেকে দেখে শুনে তবে বুঝতে হয়; এ সম্পর্কে নন্দলালের আঁকা বাউলের চিত্রটি মনে করা যেতে পারে। এখানে শ্রাব্যের সঙ্গে দৃশ্যসঙ্গীতের প্রত্যক্ষ সমন্বয় ঘটেছে।

এই বাউল গানে একটু আগেই দেখতে পেয়েছি যে বিলাবল অঙ্গীয় রাগের প্রভাব রয়েছে। তা ছাড়া একথা বলাও হয়েছে যে, বাংলার লোক-সঙ্গীতে

ঝিঁঝিঁটের প্রভাবই সবচেয়ে ব্যাপক। বাংলা দেশে বিভাসের এক বিশেষ রূপ চলতি আছে—এটিও বিলাবল অঙ্গের এবং এই সুরেও অনেক পল্লীসঙ্গীত আছে, তবে এই সব পল্লীসঙ্গীতে মাঝে মাঝে একটু কোমল নিখাদ ব্যবহার করার দিকে ঝোঁক রয়েছে, আর তা করলেই কিছুটা ঝিঁঝিঁটের সঙ্গে সম্পর্ক জন্মে যেতে পারে।

বাংলা লোক-সঙ্গীতের আরও কতকগুলো বৈশিষ্ট্য নিয়ে এইখানে আলোচনা করা যাক। কবি জাতীয় গান ছাড়া অধিকাংশ পল্লীগীতির গঠনরীতির মূল ভঙ্গিমাটুকু থাকে পূর্বাঙ্গে, অতএব বিভিন্ন সুরের মধ্যে পার্থক্যের পরিচয় সেখানেই বিশেষভাবে রয়েছে। এদিক দিয়ে এই সঙ্গীতকে আমরা মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করতে পারি :—(১) যে সব সুর 'স র ম প' এমনি করে আরোহণ করে, (২) যেগুলো 'স গ ম প' করে (৩) যেগুলো 'স র গ প' করে ও (৪) যে সব সুর 'স র গ ম প' এমনি ক'রে পঞ্চম পর্যন্ত সোজাসুজি সরলভাবে আরোহণ করে যায়। এই চারটি প্রকারের প্রথমটি দেখা গেছে 'গ' বাদ, ২য়টিতে 'র' বাদ, তৃতীয়ে—'ম' বাদ ও শেষটিতে পূর্বাঙ্গের কোন স্বরই আরোহণে বাদ যাচ্ছে না। এই ব্যাপারটি বিশেষ করে লক্ষ্য করতে বলছি এইজন্যে যে, লোকসঙ্গীতে উপরি উক্ত নিয়মগুলো এমন কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়ে থাকে যা কেবল রাগসঙ্গীতেই দেখা যায়। এই ব্যাপারটির মধ্যে আরও একটু গুরুত্ব রয়েছে এইজন্য যে, রাগ-সঙ্গীতের প্রায় সমস্ত রাগই এই পদ্ধতিতে ভাগ করে দেওয়া যায়, রাগ-সঙ্গীতে যে নিয়মনিষ্ঠা দেখতে পাচ্ছি, তার মূল যে কোনখানে এই সম্বন্ধে একটা সন্দেহ মনে জাগা স্বাভাবিক।

স্বর প্রয়োগগত বিশ্লেষণ

আমরা ইতিপূর্বে 'গ্রহ অংশ ন্যাস' বলে রাগসঙ্গীতের একটি অতি প্রাচীন সূত্রের উল্লেখ করেছিলাম। এই সূত্র অনুসারে কোন রাগের প্রথম সূচনা কোনও একটি বিশেষ স্বরে এবং কতকগুলো বিশেষ স্বর সন্দর্ভে তার রূপ প্রকাশিত হ'তে হ'তে একটি নির্দিষ্ট স্বরে এসে দাঁড়ালে তার পূর্ণ রূপটি প্রকাশিত হয়। আজকাল রাগ বিচারে প্রায় কেউই এই নিয়মটির কথা ভাবেন না; কিন্তু ভাবলে মাঝে মাঝে যে সুফল পাওয়া যায়, সে কথা নিশ্চিত। আমার মনে হচ্ছে, এই সূত্রটি পল্লীসঙ্গীতের ক্ষেত্রে অতি সুন্দরভাবে প্রযোজ্য। এবং তাই ব'লেই আমাদের আগেকার সন্দেহটা কেবলই দৃঢ়কৃত হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক্ :—

স র ম, প ম গ র স ণ ধ ; ধ স, স র গ, র গ স, পল্লী-সঙ্গীতের এই সুরটিতে ষড়জ থেকে গান আরম্ভ না করলেই শিল্পের দিক দিয়ে বিকৃতি ঘটবে। রাগ-সঙ্গীতের শিল্পমুগ্ধ ভক্ত ও বৈয়াকরণেরা এর থেকে এইটুকু শিক্ষা লাভ করতে পারেন যে, তাঁদের নিজেদেরই রাগ সম্বন্ধীয় নিয়মকানুনগুলি কেমন নিষ্ঠার সঙ্গে এই অশিক্ষিত গ্রাম্য সঙ্গীত-রচয়িতারা অনুসরণ ক'রে আসছে, অথচ তাঁরা নিজেরা এ বিষয়ে কতটা পরিমাণে উদাসীন হ'য়ে পড়েছেন !

মালদহ্ অঞ্চলের গম্ভীরা মূলতঃ শিবকেই উপলক্ষ্য ক'রে গীত হ'লেও এই নামটিকে আশ্রয় ক'রে নানা বিষয়ের গানই গাওয়া হ'য়ে থাকে। শিবও সব সময় তাঁর দেবত্বের মহিমা নিয়ে দূরে থাকতে পারেন না, ভক্তেরা তাঁকে টেনে নামিয়ে নিয়ে আসে সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের গণ্ডীর মধ্যে দেশের আর্থিক, সামাজিক দুর্গতির জন্যে তাঁকে দায়ী ক'রে। কথার দিক থেকে গম্ভীরা অনেক বেশী পরিমাণে জীবন্ত। অন্যান্য লোক-সঙ্গীতের মত গম্ভীরার স্বরূপ অত সরল নয়, এর কারণ বোধ হয় শিল্প-সঙ্গীতের প্রভাব। নিত্য নতুন ঘটনা বা অবস্থার উপর নির্ভর ক'রে প্রতি বছরই বহু গম্ভীরা গান রচিত হচ্ছে; নতুন গান রচনার সময়ে স্বভাবতঃই গীত-রচয়িতা বা সুর-রচয়িতারা সমসাময়িক সঙ্গীতের আবহাওয়া থেকে মুক্ত হ'তে পারছেন না। ফলে এর সুরের কাঠামোর পেছনে পাচ্ছি একদিকে শিল্পসঙ্গীত বা অন্যান্য এমন সঙ্গীত যা লোক-সঙ্গীতের পর্যায়ে পড়ে না এবং অন্যদিকে লোকসঙ্গীত—এই উভয়ের একটা যোগসূত্র গম্ভীরায় রয়েছে। এই দিক দিয়ে পল্লীর প্রতিভা আরও অগ্রসর হ'লে ভবিষ্যতে আমরা এক অভিনব সঙ্গীতের রূপ পেতে পারি। অবশ্য মনে রাখতে হবে, এ কাজ সম্ভব হ'তে পারে একমাত্র প্রতিভাবান্ লোক-সঙ্গীত রচয়িতাদের দ্বারাই, শিল্প-সঙ্গীত-স্রষ্টাদের দ্বারা নয়।

গম্ভীরায় সমসাময়িক সঙ্গীতের প্রভাব

এইমাত্র দেখা গেল, গম্ভীরা মূলতঃ শিব-বিষয়ক হ'লেও অন্যান্য নানা বিষয়ও এতে গাওয়া হয়, হাসির গানও বাদ পড়ে না। কি বিষয়-বস্তুতে, কি সুরে পল্লী-সঙ্গীতে বিভিন্ন প্রকারের গানের মধ্যে নানা মিশ্রণ চ'লে এসেছে। কোন একটা গীতরীতি জনপ্রিয় হ'য়ে গেলে অনেক স্থলে ক্ষেত্র ও বিষয়ের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তার প্রয়োগ করা হয়। তাই বিভিন্ন প্রকার গানে অনেক সময় আমরা একই

বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুরের বিনিময়

রকমের সুরের প্রয়োগ লক্ষ্য করতে পারব। রূপকথার মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে অনেক সময় ছোট ছোট গান থাকে, তাদের সুর পুরোপুরি ভাটিয়ালীর সুর। 'বাইরে'র গান হ'য়েও ভাটিয়ালী 'ঘরের গানে'ও তার প্রভাব বিস্তার করেছে। গদ্যে রচিত ছোট ছেলেদের উপযোগী ক'রে টেনে টেনে বলা এই রূপকথায় ছন্দোহীন এই ভাটিয়ালী সুরের প্রয়োগ একদিকে খুবই মানানসই হয়েছে বলতে হবে। 'ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন'—বাউলের একটি বিখ্যাত গান; এই গানের সুর হয়ত শোনা যাবে মৈমনসিংহের ব্রহ্মপুত্রে ঘটিত কোন এক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে রচিত গীতে—

'বাড়ী তার চরপাড়ার চরে।
গোপী শীলের গণা গোষ্ঠী
ব্রহ্মপুত্রে ডুইবে মরে।',

লোক-সঙ্গীত কি সুরের দিক দিয়ে, কি তালের দিক দিয়ে সাধারণতঃ সরলই হ'য়ে থাকে। কতকগুলো বিশেষ ধরণের লোক-সঙ্গীতে অবশ্য এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। কোনও কোনও গীত-রচয়িতার হয়তো একটু জটিল তাল ব্যবহারের দিকে ঝোঁকই থাকে, কীর্তন গায়কদের প্রভাবেও এমন ব্যাপার সম্ভব হ'তে পারে। ফলে দাদরা, কাশ্মীরী, খেমটা, খয়রা ইত্যাদি সোজা তালের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্রই শোনা যায় লোফা, রূপক ও তেওট ইত্যাদি কঠিন তালের গান।

জটিল তাল

বাংলার পল্লী-সঙ্গীতে স্বরপ্রয়োগে একটা জিনিষের অভাব হয়ত অত্যন্ত স্পষ্ট। তার স্বর-রচনায় কমনীয় সৌন্দর্যের অভাব নেই, সুরের ও তালের নানা কারিগরিরও অভাব নেই, কিন্তু নেই কেবল পৌরুষের পরিচয়। এই দিক দিয়ে ঝুমুর জাতীয় সংগীতের রূপ অন্য রকম—সুরের বৈচিত্র্য না থাকলেও এসব গানের গীত-ভংগিমায় বলিষ্ঠতা রয়েছে। এর সঙ্গে পরিচয়ের ফলে বাংলা লোক-সঙ্গীতের এই অভাব কোন দিন দূর হ'তেও পারে। বাংলায় পল্লীগীতিতে সুরের নানা কৌশল থাকলেও, কোনও আয়াসসাধ্য অলঙ্কার বা স্বরভঙ্গি নেই, এটিও লক্ষ্য করবার মত। এই শেষোক্ত লক্ষণটি বাংলা দেশের প্রায় সব রকম আধুনিক ও রবীন্দ্র-সঙ্গীতে দেখতে পাওয়া যায়। জলবায়ুর জন্যেই হোক, আর বাঙ্গালীর মানসিক গঠনভঙ্গীর জন্যেই হোক, এখানকার গানে মাধুর্য ও প্রসাদগুণ একটু

পরুষ ভাবের অভাব

বেশি পরিমাণেই পাওয়া যায়। ঝুমুরের নক্সায় বহু দূরস্থিত দুটি স্বরের মধ্যে মীড়ের সাহায্যে যোগস্থাপনের চেষ্টার বদলে যে হঠাৎ লম্ফ প্রদানের ভাব দেখা যায়, সেটা সাঁওতালি গানেরই যে নকল, সে বিষয়ে সন্দেহের অ কাশ নেই। বাংলার একান্ত নিজস্ব পল্লীগীতির মধ্যে একমাত্র মুসলমানদের জারীগান ইত্যাদি সামান্য কয়েকটি গীতরীতিতে আমরা সুরের খানিকটা উদ্দাম গতি লক্ষ্য করি। এর কারণ মনস্তত্ত্ববিদ্গণ অনুসন্ধান করবেন।

আধুনিক যুগে বাংলা পল্লীসংগীতে যে সব যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, এখানে তাদের কতকগুলি উল্লেখ করছি—

১। তারের যন্ত্র—একতারা, দোতারা, সংগ্রহ, গোপীযন্ত্র, সারিন্দা।

২। শুষির যন্ত্র—মুরলী, আড়-বাঁশী, টিপ্‌রা বাঁশী, শিঙা।

৩। আনদ্ধ যন্ত্র—ঢাক, ঢোল, কাড়া, ঢোলক, খোল, মাদল, খঞ্জনী বা খুঞ্জুরী, আনন্দলহরী বা খমক।

৪। ঘন যন্ত্র—বহু প্রকারের করতাল, খটতাল, মন্দিরা, কাঁসি, কাঁসর, ঘণ্টা।*

* সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক গ্রন্থকারের 'বাংলার লোক-সাহিত্য' ১ম খণ্ডের জন্য লিখিত এবং সেখান হইতে উদ্ধৃত।

✱

গ। স্বরলিপি

১। ভাঙ্গা কাষ্ঠর তরী লইয়া (১১৮ পৃঃ)

II|| সা রা রা গা গা পা পা ধা া া া া পা গা পা ধা
|| ভা ঙ্গা কাষ্ ঠর্ ত রী লই য়া ০ ০ ০ ০ মা জি আই য়া

া া া া পা ধা পা মা গা মা রা গা া া া া
০ ০ ০ ০ আ ই লা ম্ স ন্ সা রে ০ ০ ০ ০

পা পা পা ধা র্সা না ধা পা মগা রা া া সা সা
ও রে নৌ কার্ মই ধ্যে উই ট্যো জ০ ল্ ০ ০ দাঁ ড়ী

রা গা া া মগা রা া া রা গা মগা রা রা সা া া
নাই রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ মা ঝি ০ ০ নাই রে ০ ০

গা পা ধা র্সা র্সা া া া া া া া নধা পমা গরা রা ||II
হা বা ব ন্দা ব ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ল্ ||

II|| পা ধা ধা র্সা র্সা র্রা র্রা র্গা র্গা া া া া া া া
|| মা রা গে ল সা ধর ত রী রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

র্সা র্সা র্রা র্মা র্মা র্মা া া া া া া র্গা রা র্সা পা
গু রু ডু বা ই লি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ও রে আ য়া

ধা া া া পা া া া ধা র্সা র্সা র্রা র্সা া া া ||||IIII
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ও রে আ য়া রে ০ ০ ০ ||||

২। ছেড়ে যাবে কি, মা, উমা (১৬২ পৃঃ)

০ | ১ | + | ৩
II|| া া া মা | দা মদা নর্সা না | র্সা র্সা ণা ণা | দণা দা মা া |
|| ০ ০ ০ ছে | ডে যা ০ বে | কি মা ০ উ | মা ০ ০ ০ |

০ | ১ | + | ৩
া া া জ্ঞা | মা জ্ঞা া সা | ন্া সা জ্ঞা মা | দা মা মা মা |
০ ০ ০ গি | রি পু ০ রী | আঁ ০ ধা ০ | র্ ক রে আমি |

০ | ১ | + | ৩
া া া জ্ঞা | সা ন্া দ্া ন্া | সা জ্ঞা সজ্ঞা মজ্ঞা | া সা সা া |
০ ০ ০ কে | মন্ ক ০ রে | শূ ০ ন্য ০ | ০ ঘ রে ০ |

০ ১ + ৩
। । । সা | জ্ঞা মা দা দা | মা দা র্ণসা ণা | । দা ণা ণা | I]
০ ০ ০ র | ই ব ০ গো | তো রে না ০ | ০ হে রে ০ |

০ ১ + ৩
II| । । । মা | দা না না না | র্সা না দনা র্সা | । না র্সা র্সা |
০ ০ ০ এ | ঘর্ হ ই তে | ও ০ ঘ র্ | ০ যা ই তে |

০ ১ + ৩
। । । না | দা না র্সা র্সা | না না দনা র্সনা | দা দা মা । |
০ ০ ০ নে | চে নে ০ চে | নে ০ চে ০ | ০ নে চে ০ |

০ ১ + ৩
। । । জ্ঞা | মা জ্ঞা । সা | জ্ঞা মা জ্ঞমা দা | । মা দা । |
০ ০ ০ অঞ্ | চল্ ধ ০ রে | বে ০ ড়া ০ | ০ ই তে ০ |

০ ১ + ৩
। । । মা | দা ণা র্সা ণা | দণা র্সা র্সা । | । । । । |
০ ০ ০ থা | ক্ তে কা ছে | কা ০ ছে ০ | ০ ০ ০ ০ |

০ ১ + ৩
। । । মা | র্মা র্মা । র্মা | র্জ্ঞা র্মা র্জ্ঞর্মা র্জ্ঞা | । র্সা র্সা । |
নি | শি তে ০ ঘু | মে ০ তে ০ | ০ থা কি ০ |

০ ১ + ৩
। । । ণা | র্সা ণর্সা ণর্জ্ঞা র্সা | ণা ণা দণা দণা | দা দা মা । |
০ ০ ০ স্ব | প নে ০ মা | তো ০ রে ০ | ০ দে খি ০ |

০ ১ + ৩
। । । সা | জ্ঞা মা দা দা | মা দা মদা নর্সা | । না র্সা । |
০ ০ ০ সে | ধন কি ০ সে | ভু ০ লে ০ | ০ থা কি ০ |

০ ১ + ৩
। । । না | দা না র্সা র্সা | দা । মা । | জ্ঞমা দনা র্সনা দমা |
০ ০ ০ ব | লে যা ০ পা | যা ০ গী ০ | মা ০ ০ ০ |

০ ১
জ্ঞমা দমা জ্ঞমা মা | দা মদা নর্সা না | ইত্যাদি II
রে ০ ০ ছে | ড়ে যা ০ বে |

০	১	+	৩
॥ া া া মা	দা না না না	র্সা না দনা র্সা	া না র্সা র্সা
০ ০ ০ সঁ	পি লা ম্ উ	মা ০ ০ ০	০ তো মা য়

০	১	+	৩
া া া না	দা না র্সা র্সা	না না দনা র্সনা	দা দা মা া
০ ০ ০ ভি	খা রী ০ র্	ক ০ রে ০	০ ০ ০ ০

০	১	+	৩
া া া জ্ঞ	মা জ্ঞা া সা	জ্ঞা মা জ্ঞমা দা	া মা দা া
০ ০ ০ ক্ষু	ধায় শু ০ ধা	ই ০ তে ০	০ মা গো ০

০	১	+	৩
া া া মা	দা পা র্সা পা	দপা র্সা র্সা া	া া া া
০ ০ ০ কে	দি বে ০ গো	তো ০ রে ০	০ ০ ০ ০

০	১	+	৩
া া া র্সা	র্মা র্মা া র্মা	র্জ্ঞা র্মা র্জ্ঞর্মা র্জ্ঞ	া র্সা র্স া
০ ০ ০ তা	ই য ০ খন্	ম ০ নে ০	০ প ড়ে ০

০	১	+	৩
া া া পা	র্সা পর্সা পর্জ্ঞা র্সা	পা পা দপা দপা	দা দা মা া
যে	ক রে ০ মা	য়ে র অ ০ন্	ত রে ০

০	১	+	৩
সা সা া সা	জ্ঞা মা দা দা	মা দা মদা নর্সা	া না র্সা া
আ মি ০ সে	দু খঃ ০ জা	না ০ ব ০	০ কা রে ০

০	১	+	৩
র্সা র্সা া না	দা না র্সা র্সা	দা ০ মা ০	জ্ঞমা দনা র্সনা দমা
তু ই ০ মা	হ লে ০ বুঝ্	বি ০ ০ ০	প ০ ০ ০

০	১	
জ্ঞমা দমা জ্ঞসা ম	দা মদা নর্সা না	॥ ইত্যাদি
রে ০ ০ ছে	ড়ে যা ০ বে	

৩। 'হায়রে সাধের খাঁচা' (১৬৭ পৃঃ)

+	০	+	০
II॥ া া জ্ঞা মা	মা মা মা মা	পণা দা পা া	া া দপা মা
০ ০ হা য়	রে সা ধে র্	খাঁ ০ চা া	০ ০ ০ ০

\+ o + o
া া পা ণা | া ণা ণধা পমা | া া পা ধা | ধা পধা মপা মা |
০ ০ প ড়ে | ০ র বে ০ | ০ ০ সা ধে | র্ খাঁ ০ চা |

\+ o + o
মা া া া | া া মা মা | া া পা ণা | ণা ণা ণা র্সা |
রে ০ ০ ০ | আ মি | ০ ০ ম য় | না ব লে ০ |

\+ o + o
র্সা র্সা র্সা র্সা | র্সা া র্জ্ঞর্রা র্সা | ণা া ণা ণা | ধা পা মা মা |
পু ষ্ লা ম্ | যা ০ রে ০ | ০ ০ সে হ | ল ভু তু ম্ |

\+ o + o
পা দা পা া | া া ণা ধা | পা মা জ্ঞা মা | মা মা মা মা | II
পেঁ ০ চা ০ | ০ ০ রে ০ | ০ ০ হা য় | রে সা ধে র্ |

\+ o +
ণা ণা || া া ণা ণা | র্সা র্জ্ঞা র্রা র্সা | সর্রা পা র্সা র্সা |
শু ন্‌ব || ০ ০ ম য় | না পা খী র্ | কৃ ষ্ ণ ০ |

o + o +
া র্সা র্সা া | া া র্সা র্সা | র্রা র্জ্ঞা র্মা া | র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা া |
০ ক থা ০ | ০ ০ এ ই | জী ব নে ০ | হ ই ল ০ |

o + o +
র্রা র্সা র্জ্ঞর্রা র্সা | ণা া া া | া া ণা ণা | া া ণা র্সা |
না ০ তো ০ | ০ ০ ০ ০ | এ মন | ০ ০ ভু তু |

o + o +
র্সা র্জ্ঞা র্রা র্সা | র্সা র্সা র্সা র্সা | া র্সা র্জ্ঞর্রা র্সা | ণা ণা ণা ধা |
০ম্ পেঁ চা য় | খু ০ রা য় | ০ মা থা ০ | ০ ০ এ ই |

o + o + o
ধা পা মা া | পদা পা পা া | া া ণা ধা | পা মা জ্ঞা মা | মা মা মা মা || II
ছি ল ক ০ | পা ০ লে ০ | ০ ০ রে ০ | ০ ০ হা য় | রে সা ধে র্ ||

\+ o + o
ণা ণ II || া া ণা ণা | র্সা র্জ্ঞা রা র্সা | র্সর্রা ণা র্সা র্সা | া র্সা র্সা া |
আ মার্ || ০ ০ গো লা | য় চার টা ০ | ধা ০ ০ ন্ | ০ ছি ল ০ |

\+ o + o
। । র্সা র্সা । র্মা র্মা র্মা । | র্জ্ঞা । র্জ্ঞা । | র্রা র্সা র্জ্ঞর্রা র্সা |
o o ই ন্ | ছু রে তা o | খে o য়ে o | গে o ল o |

\+ o + o
ণা । । । | । । ণা ণা | । । ণা ণা | র্সা র্জ্ঞা র্রা র্সা |
o o o o | o o এ খন্ | o o পা-ত্ | লে কি হ য় |

\+ o + o
র্সা র্সা র্সা | র্সা । র্জ্ঞর্রা র্সা | ণা ণা ণা ণা | ণা ধা পা মা |
গা o বে র্ | ঢে o কি o | o o ভা ন্ | বি কি ধা ন্ |

\+ o + o
জ্ঞা মা মা । | পা । ণা ধা | পা । । । | । । পধা পা IIII
খা o লি o | মা o চা o | রে o o o | o o o o

৪। এই না কালরূপ আমার লাগিল নয়নে গো

II সা গা গা | গা -া | গা মা I মা -া -পা | পা -া | পা -পা I
এ ই না কা o ল o রূ o প্ আ o মা র্

I পা ধা -া | ণা -া | ণা ধা I পধা মপা ম | গা -া | -া পা I
লা গি o ল o ন o য় o নে গো o o o

I পা মা গা | রা রা | সা সা I রা রসা সা | সা -া | -া -া I
ক ল ং ক o র ই ল o জ লে o o o

I সা সা রা | সা রসা | ন্া ন্া I সজ্ঞা জ্ঞা -রা | রা সা | রসা ন্া I
ভ রা o না o ছু ই ফ রে র্ কা o লে o

I সা -গা গা | গা -া | মা -পা I গমা রগা -া | -া -া | -া গা I
ল ল্ ভ রি o বা র্ যা o o o o o য়

I মা মা -পা | পা -া | ধপা মা I মা -পা মা | পা ধা | ণা -া I
জ লে র ছা o য়া য় কৃ ষ্ ণ রূ প্ গো o

I -া -া -া | ধর্সা ণধা | পা পা I পা ধা -া | র্সণা -া | ধা ণা I
o o o o o যে মুন্ দে খি o বা o রে o

I পা -া ধপা | মা পা | গা -পা I 'কলঙ্ক রইল জলে' গাহিতে হইবে।
পা ০ ই গো ০ ০ ০

II মা পা -পা | না -া | না র্সা I র্সা -া র্সা | র্সা -া | র্র্সা -না I
স ০ ব্ স ০ খী ০ লা ০ ল্ | গো ০ নী ল্

I র্সা -া র্জা | র্র্জা র্রা | র্সর্রা -র্সা I না র্সা -া | -া -া | -া -া I
গ ০ উর্ ব ০ র ণ্ শা ড়ী ০ ০ ০ ০ ০

I মা মা পা | পা -া | ধপা মা I মা পা ণা | ধণা ধা | পধা পা I
শ্রী রা ০ ধা র্ পৈ ০ র নে ০ | শো ০ | ভে ০

I মা -মা পা | পণা ধনা | পধা -পা I মা মা -া | গা মা | গা পা II
কৃ ষ্ ণ নী ০ লা ম্ ব রী ০ গো ০ ০ ০

'কলঙ্ক রইল জলে' গাহিতে হইবে।

সা ন্া II সা গা গা | গা -া | গা মা I মা পা -া | পধা পমা | গা গা I
দা দা জি ০ জ্ঞা সি ০ য়ে ০ দে খ ০ | চা ০ ০ ই

I গা -গা পা | মা -া | মা পা I পপা মগা রা | রা সা | সগ রগ I
কা র্ র ম ০ নী ০ কা ০ ল জ ০ লে ০

I সরা সা -া | -া -া | -া সা | মা I মা পা | পা -া | ধপা মা I
যা ০ ০ ০ ০ ০ য় ধী রে ০ ধী ০ রে ০

I মা পা মা | পা ধা | ণা -া I -া -া -া | ধর্সা ণধা | পা -া I
যা য় গো রা ০ ধে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা ধা -ধা | পা -পা | পণা ধণ I পা ধা -পা | পা -া | -া -া I
হী রা র্ ক ল্ সী ০ কা ০ ঙ্ খে ০ ০ ০

I মা -মা পা | পণা ধা | পা -মা I মা মা গা | গা রা | রগা রগা I
মা ন্ জা চি ০ ক ন্ হেই লে ০ দু ই লে ০

I সা রা সা | -া -া | া- সা II
যা ০ ০ ০ ০ ০ য়

II মা পা -া | না -া | না -া I না -র্সা র্সা | র্সা -া র্র্সা না I
আ গে ০ পা ০ ছে ০ প ন্ চ দা ০ সী ০

I র্সা -া র্গা | র্রা -া | র্সা র্রা I না না না | র্সা -া | র্সগা র্রগা I
ম ০ ধ্যে রা ০ ধা ০ রা ই রূ প ০ গী ০

I র্সর্রা র্সা -া | -া -া | -া -া I মা -মা পা | পণা ধা | পা -মা I
০ ০ চ -ন্ দ্র ব ০ দ ন্

I গা পা -রা | রমা গা | রা সা I রা সা -া | -া -া | -া সা IIII
কে ম ন্ দে ০ খা ০ যা ০ ০ ০ ০ ০ য়

৫। ও গউর্ চাঁদ তোরা দেখ্

সা রা II রা গা -া া | -া-গা গপা মপা I গমা গা-া-া | -া গা পা পা I
ও ০ গ উ০০ ০ র্ চাঁ ০ ০ ০০০ ০ দ্ তো রা

I পা ধা -া -া | ধা র্সা ণধা -পা I -া পা পা গা | ধা পা ধপা মা I
দে ০ ০ ০ ০ ০ ০ খ্ ০ আ ই সে গো ০ চাঁ ০

I গা -পা পা মা | গা গা রা সা I রা গা গা মগা | রা গরা সা রা II
০ দ্ ন দে ০ উ দ য় হ ই য়া ০ ছে ০ 'ও০' গউর্...

II -া -া মা পা | -পা না না -ধা I না -পা -র্সা র্সা | র্সা -া র্সা র্রা I
০ ০ চাঁ দে র্ মা লা ০ চাঁ ০ দ্ গাঁ থ ০ নি ০

I র্সনা -া না -া | -া র্সা র্গা -া I র্রা র্গা র্সর্রা র্সা | -া -া না না I
০ ০ কে ০ ০ গাঁই থা ০ দি ল ০ ০ ০ ০ স জ

I না র্সা র্সা -া | -া -া -া -া | -া -া মা পা | -পা না না ধা I
নী ০ লো ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ এ ম ন্ রূপ্ আ র্

I না -া র্সা -র্সা | র্সা -া রা র্সা I না -া না না | -া র্সগা র্রা র্গা I
জ ০ ন ম্ ত ০ রে ০ ০ ০ দে খি ০ না ০ ই

I র্সর্রা র্সা -া -া | -া -া না -মা I না র্সা র্সা -া | র্সা -া -র্সা র্সা I
গো ০ ০ ০ ০ ০ তা র হা ০ তে ০ চাঁ- দ্ ক

I না র্সা না পা | -া না না -না I -া -া না র্সা | না ধা পা -া I
পা ০ লে ০ ০ ০ চাঁ দ্ ০ ০ চাঁ দে ০ চাঁ দে ০

I পা ধা ধা ণধা | পা -া মা পা I গমা গা -া -া | রা গর সা রা II
আ ০ ল য় কই ০ রা ০ ছে ০ ০ ০ ০ ০ 'ও ০' গউর্…

II -া -া মা পা | -পা না না -ধা | না -র্সা র্সা -র্সা | র্সা -া র্গা র্রা I
০ ০ লে গে -া ছে এ ক্ চাঁ ০ দে র্ বা ০ জা ০

I র্সনা -া না না | -া র্সা র্গা -া I র্রা র্গা র্সর্রা র্সা | -া -া না না I
০ র্ তা কি ০ জা ন ০ না ০ ০ কি ০ p ও তার্

I -া -া মা পা | পা মা -া নধা I না র্সা র্সা -া | র্সা -া র্সর্গা র্রর্সা I
০ ০ পা ০ দ প ০ দ্মে কো ০ টি ০ | চাঁ ০ ০ ০

I না -না না না | র্সা র্সা র্গা -া | র্রর্গা র্সর্রা র্সা -া | -া -া নানা I
০ দ্ ক রে ০ সা ধ ০ না ০ ০ ০ ০ ০ ওগো

I না র্সা র্সা -া | র্সা -া র্সর্রা -র্সা I না পা পা না | -া না না -না I
ব্র ০ হ্মা ০ র ০ বা ন্ ছি ০ ত ০ ০ যে চাঁ দ্

I -া -া না র্সা | না ধা পা -া I পা ধা ধা ণধা | পা -া পা মা I
০ ০ চাঁ দে ০ চাঁ দে ০ মি ০ শা ০ গি ০ য়া ০

I গমা গা -া -া | -া -া সা রা IIII
ছে ০ ০ ০ ০ ০ 'ও' ০

গউর্…

৬। একদিন দেইখাছি যারে

II পা -পা মা পা | গমা -গা রা সা I সা -া সা া | সা া রসা ণ্া I
এ ক্ দি ০ ০ ন্ দে ই খা ০ ছি ০ যা ০ রে ০

I -া -া সা গা | া- মা পা -পা I ধা পা ধা পা | মা মপা গা পা I
০ ০ তা রে ০ ভো ল ন্ না ০ যা য় গো ০ ০ ০

I -া -া সা সা | রা সা ণ্া -া I সা জ্ঞা -া -জ্ঞা | রা জ্ঞরা সা রসা I
০ ০ স বা ই ব লে ০ মে ০ ০ ঘ্ মে ০ ০ ০

I ন্া -ন্া সা -গা | -গা মা পা পা I মপা মা গা -া | -া -া -া -া I
০ ঘ্ মে ০ ঘ্ ন য় গো আ ০ ভা ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া মা -পা | পা পা পা মা I পা ণা ণা -া | ধা ণধা পা ধপা I

০ ০ তো ম্ রা নি দে ই খা ০ ছ ০ স ০ ০ ০

I মা -মা মা পা | -পা ণা ধা পা I পা ধপা মা পমা | গা মা গা পা I

০ ই মে ঘে র্ আ ডে ০ জ ০ বা ০ গো ০ ০ ০

I পা -পা মা পা | গমা -গা রা সা I সা -া সা -া | -া সা সা -া II

এ ক্ দি ০ ০ ন্ দে ই খা ০ ছি ০ ০ যা রে ০

II -া -া পা র্সা | -া র্সা র্সা ণা I র্সা র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া | র্রা র্জ্ঞর্রা র্সা র্রর্সা I

০ ০ চ র ০ ণে নূ ০ পু ০ র ০ বা ০ ০ ০

I ণা ণা ণা র্সা | ণা র্সর্জ্ঞা র্রা -র্জ্ঞা I র্সর্রা র্সা র্সা -া | -া -া র্সা র্সা I

জে ০ হা তে ০ মো হ ন্ বাঁ ০ শি ০ ০ ০ অ তার্

I -া -া ণা র্সা | -া র্সা র্জ্ঞা র্রা I র্সা -া ণা র্সণা | ধা ণধা পা ধপা I

০ ০ গ লে ০ শো ভে ০ ব ০ ন ০ মা ০ লা ০

I মা -া মা পা | -া ণা ধা ণা I ণধা পা পা -া | -া -া পা মা I

০ ০ মু খে ০ মৃ দু ০ হা ০ সি ০ ০ ০ গো ০

I -া -া রা মা | -া মা মা পা I পা -া পা -পা | পা -া ধপা মা I

০ ০ চু ড়া ০ য়ে ম ০ য়ূ ০ রে র্ পা ০ খা ০

I পা ণা ণা -া | ধা ণধা পা ধপা I মপা মা মা -া | -া মা পা গা I

ক ০ রে ০ ঝি ০ কি ০ মি ০ কি ০ ০ তা রে ০

I -া -া -া গা | পা মা -া পা I গপা মগা রা সা | রা সা ণ্া -া I

০ ০ ০ ম নে ব ০ লে প্রা ০ ণ ০ ০ স ই ০

I ণ্া -সা সা মা | -জ্ঞা রা সা সা I রা রসা সা -া | গা মা পা -া I

এ ক্ বা ০ র্ দে ০ খে আ ০ সি ০ গো ০ ০ ০

I পা -পা মা পা | গমা -গা রা সা I সা -া সা -া | -া সা সা -া II

এ ক্ দি ০ ০ ন্ দে ই খা ০ ছি ০ ০ যা রে ০

II -া -া সা সা | রা সা সণ্া -া I সা জ্ঞা জ্ঞা -া | রা জ্ঞরা সা রসা I

০ ০ পী রি ০ তি পী ০ রি ০ তি ০ য ০ ০ ০

I -না -না না গা | গা মা পা -পা I মপা গমা গা -গা | গা -া গা পা I
ত ন্ পী রি তি গ লা র্ হা ০ ০ র্ গো ০ এ মন্

I -া -া মা -পা | পা -া ধপা মা I পা ণা ণা -ণা | ধা ণধা পা মা I
০ ০ পী ০ রি ০ তি ০ যে ০ জ ন্ ক ০ রে ০
-া -া মা পা | পা ণা ধা -পা I পা ধপা মা পমা | গা মা গা পা I
০ ০ স ফ ল্ জ ন ম্ তা ০ ০ র্ গো ০ ০ ০
পা -পা মা পা | গমা -গা রা সা I সা -া সা -া | -া সা সা া- II
এ ক দি ০ ০ ন্ দে ই খা ০ ছি ০ ০ যা রে ০

পা পা II মা -মা পা র্সা | -র্সা র্সা র্সা ণা I র্সা র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া | র্রা জ্ঞরা র্সা র্রর্সা I
আ মা ০ র্ ন য় ন্ নি ল ০ কা ০ ল ০ রূ ০ পে ০

I ণা -া ণা র্সা | -ণা র্সর্জ্ঞা র্রা র্জ্ঞা I র্সর্রা র্সা র্সা -া | ণা ধা পা মা I
০ ০ ম ন ০ নি ল ০ বাঁ ০ শি ০ গো ০ যা রে

I মা -া পা -া | ণা -া ধা -া I পা ধপা মা পমা | গা মগা রা গরা I
শু ০ ই ০ লে ০ স্ব ০ প ০ নে ০ দে ০ খি ০

I সা ণ্া ণ্া সা | ম জ্ঞা রা জ্ঞা I সরা সা সা -া | গা মা পা -া
০ ০ জা গি ০ য়া না ০ দে ০ খি ০ গো ০ ০ ০

I পা -পা মা পা | গমা -গা রা সা I সা -া সা -া | -া সা সজ্ঞা রজ্ঞা I
এ ক্ দি ০ ০ ন্ দে ই খা ০ ছি ০ ০ যা রে ০

I সরা সা -া -া | -া -া -া -া IIII
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

৭। এ পার বইসা বাজাও বাঁশী

II গা গা পা পা পা া ধা র্সা র্সা র্সা র্রা র্গা র্গা র্গা I
এ পা র্ বই সা ০ বা জা ও ০ বাঁ শি ০ ০
র্রর্গা র্মা র্গা রা র্রা র্গা র্রর্গা র্সর্রা সা সা সা সা না না I
০ ০ ০ ০ এ পার বই সা শু ০ নি ০ হায় রে
না না র্সা র্রা র্সা ণা ধা পা পা পা ধা ধা ধা ণা I
আ মি ত অ ব লা না রী সাঁ তার্ না হি ০ ০

পা ধা ধা পা মগা ঝা ঝা গা ঝগা সঝা সা সা সা সা III
জা নি ০ ০ রে ০ এ পার্ বই সা গু ০ নি ০

II সা সা ধ্‌া সা ঝা মগা ঝা ঝা পা পা ধা ণধা পা পা I
বাঁ শি বা জান্ জা ন না ০ অ স ম য়ে ০ ০
পা মা গা ঝা । সা সা সা ঝা গা ঝগা মগা ঝগা মগা I
বা জাও বাঁ শি ০ কা লা ০ মন্ তো ০ ০ ০ ০
ঝা সা সা সা II
মা নে না ০

II গা পা পা পা ধা ণা ধা পা গা পা ধা র্সা না র্সা I
য খন্ আ মি বই সারে থা কি গু রু জ নার মা ঝে
সেই না ঝা ড়ের বাঁ শিরে তো মার্ লা গুর্ য দি পা ই
র্সা র্সা র্সা র্ঝা র্মা র্গা র্ঝা র্সা ণা ধা পধা ণধা পা মা পা ধা I
ও রে, নাম ধ রি য়া বা জে রে বাঁ শি ০ ০ শুই না ম
ও রে, ঝা ড়ে মূ লে উ পা ড়ি য়া ০ ০ ০ সা য় রে
ণা পা ধা ধা র্সণা ধপ মা পা ণা ধা পা পা পা পা I
রি লা জে ০ ০ ০ শুই না ম রি লা ০ জে ০
ভা সা ই রে ০ ০ সা য়া রে ০ ভা সা ই ০

II পা পা গা পা পা ধা ণা ধা পা গা পা ধা র্সা র্সা I
ও রে রন্ ধন্ শা লা তে বই সা য খন্ আ মি ০
না র্সা র্সা র্সা র্সা র্ঝা র্ঝা র্ঝা র্স' র্সা ণা ধা ধনা র্সণা I
রান্ ধি ০ ওরে ভি জা কা ষ্ঠ চু লায় রে দি য়া ০
ধা পা মা পা ধা ণা পা ধা র্সা ণা ধা পা পা পা I
০ ০ ধুঁ য়ার্ ছ লে কাঁ ন্দি রে ০ ০ ০ ০
মা পা পণা ধনা পধা পা পা পা II
ধুঁ য়ার্ ছ লে কাঁন্দি ০ ০

'বাঁশি বাজান জান না……মন তো মানে না' ইহা গাহিতে হইবে।*

*

* স্বরলিপিগুলি শ্রীমন্মথলাল দাস কর্তৃক এই গ্রন্থের জন্য রচিত

ঘ। বঙ্গীয় লোক-নৃত্যকোষ

আচার নৃত্য

যে সকল গোষ্ঠী এবং একক নৃত্য সামাজিক আচারানুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত, তাহাদিগকে ইংরেজিতে ritual dance এবং বাংলায় আচার-নৃত্য বলা হয়। গাজন অনুষ্ঠানের মধ্যে ভক্ত্যা বা গাজনে সন্ন্যাসিগণ অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অংশ পালন করিবার সময় যে আনুষ্ঠানিকভাবে নৃত্য করিয়া থাকে, তাহা ইহার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। ধর্মঠাকুরের গাজনে ধর্মঠাকুরকে মন্দির হইতে আনুষ্ঠানিকভাবে বাহির করিয়া আনিবার সময়, তাঁহাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান করাইবার সময়, তাহাকে গ্রাম প্রদক্ষিণ করাইবার সময় ভক্ত্যাগণ সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিয়া থাকে, তাহাই আচার নৃত্যের অন্তর্ভুক্ত। মেয়েলী ব্রত নৃত্যও আচার নৃত্য। পূর্ববাংলার সূর্যব্রত এবং যশোরের শীতলাব্রতে মেয়েরা কুলা মাথায় লইয়া চক্রাকারে নৃত্য করিয়া থাকে, তাহা আচার-নৃত্য। আচার-নৃত্য আচারের সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত, বিশেষ আচার লুপ্ত হইয়া গেলে তাহার সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত নৃত্যও লুপ্ত হইয়া যায়।

আদিবাসীর নৃত্য

বাংলার পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল ব্যাপিয়া বিভিন্ন উপজাতি এখনও কোন কোন ক্ষেত্রে সংহত সমাজ-জীবন যাপন করে, এখনও তাহাদের মধ্যে তাহাদের নিজস্ব নৃত্য-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। তাহাই বাংলার আদিবাসীর নৃত্য। উত্তর বাংলায় দুই একটি উপজাতি এখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে বাস করে, তাহাদের নানা সামাজিক অনুষ্ঠানেও নৃত্যগীত অপরিহার্য। তাহাও আদিবাসী নৃত্যের অন্তর্ভুক্ত। আদিবাসী নৃত্যের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহারা প্রধানত গোষ্ঠীনৃত্য, কোন কোন ক্ষেত্রে স্ত্রী ও পুরুষের মিলিত নৃত্য, কোন কোন ক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষের স্বতন্ত্র নৃত্যও হইয়া থাকে। আদিবাসীর মধ্যে নৃত্য এখনও জাতীয় জীবনের অন্তর্নিবিষ্ট (integrated), লোক-সমাজের তাহা নহে। বিবিধ সামাজিক এবং পারিবারিক উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষেই আদিবাসীর নৃত্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবের

পরিচয়েই নৃত্যেরও পরিচয় হয়, যেমন করম নাচ, পাতা নাচ, দাঁড়শালি নাচ, কাঠি নাচ ইত্যাদি। ইহাদের প্রত্যেকটির বিবরণ যথাস্থানে দেওয়া হইয়াছে।

বাংলা দেশে সাঁওতাল, ওরাওঁ ব্যতীত আর কোন আদিবাসীর সংহত সমাজ জীবন আর প্রায় নাই। মেদিনীপুর জেলার লোধা এবং শবর জাতিও হিন্দু প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হইবার ফলে তাহাদের সংহত সমাজ-জীবন ব্যাহত হইয়াছে। আদিবাসী নৃত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহাদের গোষ্ঠী যত ক্ষুদ্রই হউক, নৃত্যের অনুষ্ঠান তাহাদের নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, অন্য কোন গোষ্ঠী কিংবা সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিত ভাবে তাহারা নৃত্য করে না। তাহার ফলে, তাহাদের নৃত্য অন্য কোন জাতির মধ্যে সহজে প্রসার লাভ করিতে পারে না। গোষ্ঠীর জনসংখ্যা হ্রাস পাইলে নৃত্যও লুপ্ত হইয়া যায়।

ইঁদপরবের নাচ

ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে পশ্চিম বাংলার সীমান্ত অঞ্চলে যে ইঁদ-পরবের অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে প্রচলিত নৃত্যই ইঁদপরবের নাচ। ইঁদ পুজা আদিম সমাজের বৃক্ষ পুজারই একটি রূপ, হিন্দু প্রভাবের ফলে ইহাকে এখন ইন্দ্রধ্বজ পুজা বলিয়া মনে করা হয়।

একটি বিরাট শালগাছের খুঁটি পুতিয়া তাহাকে ঘিরিয়াই সববেত নৃত্যগীত চলে। ইহা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, স্থানীয় ভূস্বামিগণ এই অনুষ্ঠান পালন করেন এবং বিভিন্ন জাতির লোকই ইহাতে যোগদান করিয়া নৃত্য এবং গীতে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহার সঙ্গে ছাতা পরবের নাচের (পরে দেখ) সম্পর্ক আছে। উভয়ই মুলত অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।

ওঝার নাচ

ইংরেজিতে যাহাকে Magic Dance বলে, বাংলায় তাহাকে ওঝার নাচ বলিয়া উল্লেখ করা যায়। কোন ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া সাধন করিবার উদ্দেশ্যে গ্রামের অলৌকিক শক্তির অধিকারী কিংবা অধিকারিণী বলিয়া যাহার উপর বিশ্বাস আছে, তাহার একক নৃত্যকে ওঝার নাচ বলা যায়। এই নৃত্য

উপলক্ষে ওঝার উপর কোন দেবতা কিংবা উপদেবতার 'ভর' (trance) হয়। নৃত্যকারীর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায় বলিয়া বিশ্বাস। 'অজ্ঞান' অবস্থায় ওঝা যে নৃত্য প্রকাশ করে, তাহা কোন তান-লয় যুক্ত স্বাভাবিক নৃত্যানুষ্ঠান নহে। ইহার উদ্দেশ্য অলৌকিক বলিয়া সাধারণ লোক বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সেই নৃত্য দর্শন করে, কোন সৌন্দর্যবোধের প্রেরণায় তাহা করে না। বাংলা দেশে হিরালীর নাচ এবং হিজরার নাচকে এই শ্রেণীর নাচ বলিয়া গণ্য করা যায়। ছোটনাগপুর এবং উড়িষ্যার উপজাতি অঞ্চলে এই নাচের বহুল প্রচলন আছে। বাংলা দেশে ইহার প্রভাব ক্রমে লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। হিরালী বা শিলারি এক প্রকার গ্রাম্য ওঝা। পূর্ব বাংলার পল্লী অঞ্চলে ইহাদের ব্যবসায় প্রচলিত আছে। তাহারা ঐন্দ্রজালিক নৃত্য এবং মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা মেঘের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে বলিয়া বিশ্বাস। মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা নৃত্য করিয়া থাকে। হাতে সর্বদাই একটি শিঙ্গা ও একটি ত্রিশূল লইয়া বেড়ায়। তাহাদের শিলাবৃষ্টি নিরোধ করিবার বিশেষ ক্ষমতা আছে বলিয়া মনে করা হয়।

হিজরার নৃত্য বাংলা দেশের প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত আছে, তবে বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। পূর্ব বাংলায় ইহার ঐন্দ্রজালিক প্রকৃতি এখনও অক্ষুণ্ন আছে, পশ্চিম বাংলায় হিজরার নৃত্য আছে বটে, তবে ঐন্দ্রজালিক চরিত্রটি তাহা হইতে অনেকখানি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পশ্চিম বাংলায় নবজাত শিশুর আয়ু এবং স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশ্যে শিশুকে হিজরার কোলে দেওয়া হয়, হিজরা শিশুকে কোলে লইয়া নৃত্য করে। ইহার মধ্যে ঐন্দ্রজালিক উদ্দেশ্য আছে, তবে নৃত্যের প্রণালীর মধ্যে ঐন্দ্রজালিক রূপ নাই।

একক নৃত্য

উচ্চতর সমাজের কিংবা প্রাচীন পদ্ধতির (classical) নৃত্যের মধ্যে একক নৃত্যের যে পরিমাণ সন্ধান পাওয়া যায়, লোক-নৃত্যের মধ্যে তাহা সেই পরিমাণে পাওয়া যায় না। যে সমাজে নারী পণ্যের সামগ্রী, সেই সমাজেই নারীর একক নৃত্যের প্রাধান্য। কিন্তু লোক-সমাজে নারী পুরুষের কেবলমাত্র বিলাস কিংবা পণ্যের সামগ্রী নহে, সেখানে তাহার একটি বিশেষ সামাজিক অধিকার আছে, সেখানে পুরুষের সঙ্গে সে সমান অধিকার ভোগ

করিয়া থাকে, তাহার ব্যক্তিজীবন সামগ্রিক সমাজ-জীবনের অন্তর্নিবিষ্ট। এক কথায় বলিতে গেলে, লোক-সংস্কৃতির সকল উপকরণই যেমন সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি, লোক-নৃত্যও সামগ্রিক অনুষ্ঠান। তবে ওঝা কিংবা প্রাচীন পদ্ধতির পুরোহিত শ্রেণীর লোকের ঐন্দ্রজালিক নৃত্যানুষ্ঠান (magical dance)-কে যদি স্বতন্ত্র ঐন্দ্রজালিক নৃত্য বলিয়া গণ্য না করিয়া লোক-নৃত্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা যায়, তবে তাহাই একমাত্র একক লোক-নৃত্যের নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

তবে বাংলা দেশের কোন কোন অঞ্চলে বালিকাবেশী বালকের যে একক নৃত্যানুষ্ঠান এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নারীর একক নৃত্যানুষ্ঠানের একটি আধুনিক রূপ বলিয়াই মনে হয়। এই সম্পর্কে পূর্ব বাংলার ঘাটু নৃত্যের কথাই সর্বাগ্রে মনে হয়। বর্তমানে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের প্রভাব বশত নারীর পরিবর্তে নারীবেশী পুরুষ এই নৃত্যানুষ্ঠান করিলেও এই নৃত্যের বহির্মুখী রূপ ও প্রয়োগ পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা পূর্বে নারীরই নৃত্য ছিল, এখন সামাজিক কারণে নারী প্রকাশ্য নৃত্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া নারীবেশে পুরুষই এই নৃত্য সম্পন্ন করিতেছে। ইহা মূলত যে একক নৃত্যই ছিল, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। ইহা একক নৃত্য হওয়া সত্ত্বেও লোক-নৃত্য। এই প্রকার একক নৃত্যের নিদর্শন বাংলা দেশে আরও কিছু কিছু পাওয়া যায়। ('বাংলার লোক-সাহিত্য', ৩য় খণ্ড, পৃ ১৩০ -১৩৪ দ্রষ্টব্য)।

করম নাচ

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার আদিবাসী এবং অর্ধআদিবাসীর মধ্যে প্রচলিত একটি শস্যোৎসবের নাম করম পরব। ভাদ্রমাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে এই পরবের অনুষ্ঠান হয়। নৃত্য এবং সঙ্গীত এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ। ইহা স্ত্রীপুরুষের মিলিত নৃত্য, প্রধানত ইহা কুমারী নৃত্য, তবে সধবারাও এই নৃত্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। করম একটি বৃক্ষের নাম। কদম গাছের মত ইহা দেখিতে এবং কদম ফুলের মতই ইহাতে বর্ষাকালে ফুল ফোটে, তবে ফুলের আকৃতি সাধারণ কদম ফুল হইতে ইহা আকারে কিছু ছোট। করম গাছেরই একটি শাখা আঙ্গিনায় প্রোথিত করিয়া ইহাকে ঘিরিয়াই নৃত্যগীত চলিতে

থাকে। করম গাছকে পাহাড়ী কদমগাছ বলা যায়, ইহা কদম গাছ পূজারই একটি আঞ্চলিক রূপ। এই নৃত্যের মধ্যে বিশেষত্ব আছে।

কাঠি নৃত্য

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার একটি জনপ্রিয় লোক-নৃত্যের নাম কাঠি নৃত্য। সাধারণত দুর্গোৎসবের সময় সামন্তরাজদিগের পৃষ্ঠপোষকতায় এই নৃত্যের ব্যাপক অনুশীলন হইত। বর্তমানেও দুর্গোৎসবের সময়ই এই নৃত্যের আধিক্য দেখা যায়। ইহা যুদ্ধনৃত্যের একটি অবশেষ বলিয়া মনে হয়। পূর্বে লাঠি লইয়া নৃত্য হইত, এখন তাহার পরিবর্তে কাঠি লাঠির স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা গোষ্ঠীনৃত্যের একটি সুন্দর নিদর্শন। দুই হাতে দুইটি কাঠি লইয়া একটি বৃত্ত রচনা করা হয়, নৃত্যকালে পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাঠিতে আঘাত করিয়া করিয়া বৃত্তাকারে নৃত্য চলিতে থাকে। ইহাতে কাঠি দিয়া সতর্কভাবে আত্ম-রক্ষার প্রয়োজন হয়। আত্মরক্ষা করিতে না পারিলে কাঠির আঘাত গায়ে লাগে। ইহা গুজরাটের রাসনৃত্যের অনুরূপ। তবে গুজরাটের রাস নৃত্য স্ত্রী পুরুষের মিলিত নৃত্য, বাংলার কাঠি নাচ বর্তমানে পুরুষেরই নৃত্য। তবে কোন কোন অঞ্চলে পুরুষ নারীবেশে সাজিয়া এই নৃত্যের অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে দেখা যায়। নারীর বেশ গোপিকার বেশ। নৃত্যের পটভূমিকায় সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়। সঙ্গীতে এখন রাধাকৃষ্ণ-প্রসঙ্গের উল্লেখ থাকে।

কাচ নৃত্য

পাত্র পাত্রীর বেশ ধারণ করিয়া নৃত্য করিবার নাম কাচনৃত্য। চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে শ্রীচৈতন্য এই নৃত্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া 'চৈতন্য ভাগবতে' উল্লেখিত আছে।

'সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া।
বলিলেন প্রভু, কাচ সজ্জ কর গিয়া॥
শঙ্খ কাঁচুলী পাটশাড়ী অলঙ্কার।
যোগ্য যোগ্য করি সজ্জ কর সবাকার॥
গদাধর কাচিবেন রুক্মিণীর কাচ।
ব্রহ্মানন্দ তার বুড়ী সখী সুপ্রভাত॥

নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার।
কোতোয়াল হরিদাস জাগাইতে ভার॥
শ্রীবাস নারদ কাচ, স্নাতক শ্রীরাম।
দিয়ড়িয়া হাড়ি মুই বোলয়ে শ্রীমান্॥
অদ্বৈত বোলয়ে কে করিবে পাত্র কাচ?
প্রভু বলে, পাত্র সিংহাসনে গোপীনাথ॥
সত্বরে চলহ বুদ্ধিমন্তখান তুমি।
কাচ সজ্জ কর গিয়া নাচিবাঙ আমি॥'—মধ্যলীলা

অন্যের সাজ সজ্জা গ্রহণ করিয়া নৃত্য করিবার নাম কাচ নৃত্য। যে নৃত্যে কোন সাজ সজ্জা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয় না, তাহা সাধারণভাবে নাচ মাত্র।

কার্ত্তিক পূজার নাচ

উত্তর বাংলা বিশেষত কুচবিহার জিলায় কার্তিক পূজা উপলক্ষে এক শ্রেণীর নৃত্যগীত ব্যবসায়ী সারারাত্রি জাগিয়া নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, ইহাদিগকে গিদালী বলে। ঢাকের বাদ্যের তালে তালে এই নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়। ইহারা ব্যবসায়ী নর্তক, বিভিন্ন অনুষ্ঠানেই ইহারা নৃত্য দেখাইয়া থাকে। কার্তিক পূজা উপলক্ষে যে নৃত্য হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সময়োচিত গানও শুনিতে পাওয়া যায়। গানের জন্য 'বাংলার লোক-সাহিত্য' ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৯-৬০ দ্রষ্টব্য।

কালী কাচ

কালীর রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার অসুরের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে যে নৃত্য প্রদর্শিত হয়, তাহা পূর্ববঙ্গে বিশেষত ঢাকায় কালী কাচ নামে পরিচিত। ঢাকার কালীকাচ বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাহাতে নৃত্যপর কালী মৃত্তিকার উপর শায়িত শিবের বুকের উপরে তলোয়ার দ্বারা একটি কলাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিতে দেখা যাইত। চৈত্র সংক্রান্তির সময় এই নৃত্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কালীর সঙ্গে অসুরের যুদ্ধ নৃত্যের ভিতর দিয়া প্রধানত প্রকাশ করা হইয়া থাকে।

কালী নাচ

ঢাকার কালী কাচ ব্যতীতও বাংলার প্রায় সর্বত্রই কালী নাচ প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে মালদহের গম্ভীরা উৎসব উপলক্ষে কালী নাচ উল্লেখ-যোগ্য। ইহাতে কালীর মুখোস পরা হয়, কালীকাচে মুখোস পরা হয় না, মুখে কালো রঙ মাখিয়া কালীর সাজ হয়। মালদহের গম্ভীরায় কালীর কাষ্ঠ নির্মিত মুখোস পরিয়া হাতে তরবারী লইয়া ধীর লয়ে কালী নৃত্য করে। নৃত্যকারী বালকের উপর কালীর 'ভর' হয় বলিয়া বিশ্বাস।

খেমটা নাচ

অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল নৃত্য উত্তর ভারত অঞ্চল হইতে বাংলা দেশে প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে খেমটা বা বাইজী নাচ অন্যতম। বিহারের ব্যবসায়িনী নর্তকীদিগের মধ্যে ইহার একটি লৌকিক রূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহাই বিহারের সীমান্তবর্তী অঞ্চল হইতে পশ্চিম বাংলার পুরুলিয়া বাঁকুড়া মেদিনীপুর জিলার ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিয়াছে। ইহা ব্যবসায়িনী নর্তকী সম্প্রদায়ের নাচ এবং কেবল মাত্র তাহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। খেমটি নাচের সঙ্গীতে রাধাকৃষ্ণের বিষয় পরিবেশন করা হয়, খেমটিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রীরাধার বেশ ধারণ করিয়া নৃত্য করিয়া সঙ্গীতের ভাবটি প্রকাশ করে। পশ্চিম বাংলায় খেমটি নর্তকীরা যে গান গাহিয়া থাকে, তাহাকে ঝুমুর গান বলে।

গরু নাচ

কার্তিকী অমাবস্যা তিথিতে পশ্চিম বাংলার কৃষক এবং গৃহস্থদিগের মধ্যে যে গো-পূজার অনুষ্ঠান হয়, তাহার একটি অঙ্গের নাম গরু নাচ। গরুগুলিকে সেদিন স্নান করাইয়া তেল সিঁদুর মাখান হয়, যত্ন করিয়া তাহাদিগকে আহার করাইয়া এক একটিকে এক একটি খুটিতে বাঁধা হয়। তারপর ইহাদিগকে লাঠি দিয়া খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া বিব্রত করিয়া তুলা হয়। চারিদিক ঘিরিয়া পানোন্মত্ত পুরুষের দল মাদলের তালে তালে নৃত্য করে। গরুকেও সঙ্গে সঙ্গে 'নাচানো' তাহাদের উদ্দেশ্য; কিন্তু গরু ভয় পাইয়া ছুটিয়া পলাইয়া

যাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। ইহাই ইহার 'নাচ' বলিয়া মনে করা হয়। (বাংলার লোক-সাহিত্য, ৩য় খণ্ড পৃ. ২৪১ দ্রষ্টব্য)

গম্ভীরা নাচ

গম্ভীরা মালদহের জাতীয় উৎসব; গীতি এবং নৃত্য এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ। ইহা মালদহের কৃষকেরই উৎসব, কৃষিকর্মের বাৎসরিক সাফল্য ও ব্যর্থতার পর্যালোচনাই এখনও ইহার মূল বিষয়। লৌকিক উৎসব মাত্রেরই নৃত্য একটি প্রধান অঙ্গ, সেই সূত্রে ইহাতেও নৃত্যের একটি বিশেষ স্থান রহিয়াছে। গম্ভীরা নৃত্যে দেবদেবীর মুখোস ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য 'বাংলার লোক-সাহিত্য' ৩য় খণ্ড পৃ ৭৫৯-৭৬২ দ্রষ্টব্য।

গাজন নৃত্য

চৈত্রসংক্রান্তির সময় বাংলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঢাকের বাদ্যে মুখরিত হইয়া উঠে; এই সময় বাঙ্গালীর জাতীয় নৃত্যোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে বলিয়া অনুভব করা যায়। এই সময়ই পুরুলিয়ার ছো-নাচ, বীরভূম, বাঁকুড়ার ভক্ত্যানাচ, হুগলি-চব্বিশ পরগণার গাজন নাচ, মালদহের গম্ভীরা নাচ, দক্ষিণ বাংলার নীলের নাচ, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের বোলান ও আলকাপ, ঢাকার কালী কাচ, পুর্ব বাংলার অন্যান্য স্থানের ঢাকপাট ইত্যাদি বহুবিধ লোক-নৃত্যেরই অনুষ্ঠান হয়। ইহার একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, উপরে যে সকল নৃত্যের উল্লেখ করিলাম, তাহাদের প্রত্যেকটিই পুরুষের নৃত্য, চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে যে নৃত্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহাতে নারীর কোন স্থান নাই। ইহাতে পুরুষই নারীর বেশ ধারণ করিয়া থাকে; ইহার আরও একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহা সর্বত্রই একক নৃত্য নহে, ইহাতে সমবেত নৃত্য বা সারী নৃত্যও আছে, শিবগৌরীর যুগ্মনৃত্যও দেখা যায়। এই নৃত্যে যে নারীর অংশ আছে, তাহা সত্য; কিন্তু ব্রতনৃত্য কিংবা কোন কোন কৃষি নৃত্যের মত ইহাতে নারী স্বয়ং অংশ গ্রহণ করে না। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য 'বাংলার লোক-সাহিত্য' ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৫৪-৭৫৯ দ্রষ্টব্য।

গিদালীর নাচ

উত্তর বাংলা বিশেষত কুচবিহার জিলায় এক শ্রেণীর নৃত্যগীত ব্যবসায়ীকে গিদালী বলে। সম্ভবত গীতওয়ালী কথাটিই উচ্চারণে এই প্রকার ব্যবহৃত হয়। নানা পুজা পার্বণে নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান করাই তাহাদের ব্যবসায়। কুচবিহারের কার্তিক পুজা বা 'কাতিপুজা' উপলক্ষে তাহারা সারা রাত্র ধরিয়া নৃত্যগীত করিয়া থাকে, সেই উপলক্ষে সময়োপযোগী সঙ্গীত তাহাদের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়।

গোপিনী নৃত্য, গোপিনী খেলা

পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু নারীদিগের মধ্যে এক শ্রেণীর নৃত্য প্রচলিত আছে, তাহা গোপিনী খেলা বা গোপিনী নৃত্য বলিয়া পরিচিত। কয়েকটি মধ্য বয়স্কা নারী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া হাতে মন্দিরা বাজাইয়া গান করিতে করিতে নৃত্যভঙ্গিতে একবার পিছনের দিকে পিছাইয়া যায়, একবার সম্মুখের দিকে আগাইয়া আসে। হয়ত পূর্বে এই নৃত্যে পদক্ষেপের কোন বিশেষত্ব ছিল, এখন আর তাহার কিছু নাই। ইহা এখন বৈচিত্র্যহীন। নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত চলিতে থাকে। সঙ্গীতের বিষয় রাধাকৃষ্ণের প্রেম। পুরুষের এই নৃত্যে কোন অংশ নাই।

ঘাটু নৃত্য

পূর্ব মৈমনসিংহ, উত্তর ত্রিপুরা এবং পশ্চিম শ্রীহট্ট অঞ্চলে প্রচলিত বালিকা বেশী বালকের একক নৃত্যের নাম ঘাটু নৃত্য। প্রধানত নৌকার উপর নদীর ঘাটে ঘাটে এই নৃত্যের অনুষ্ঠান হয় বলিয়া ইহাকে ঘাটু গান বলে। মনে হয়, পূর্বে বালকের স্থান বালিকাই গ্রহণ করিত, বর্তমানে এই অঞ্চলে মুসলমান ধর্ম প্রবর্তনের জন্য বালিকার প্রকাশ্য নৃত্য লুপ্ত হইয়াছে, তাহার ফলে বালিকার স্থান বালকই অধিকার করিয়াছে। ঘাটুর দল যখন সমবেতভাবে সঙ্গীতের মধ্য দিয়া শ্রীরাধার অন্তর্বেদনা ব্যক্ত করিতে থাকে, তখন ঘাটু বালক তাহার নীরব নৃত্যের ভিতর দিয়া তাহার ভাব ব্যক্ত করে। কোন মুদ্রা ব্যবহার না করিলেও হস্ত দ্বারা ভাব প্রকাশের ভঙ্গিমাটি সুন্দর। ইহার বিস্তৃত আলোচনার জন্য 'বাংলার লোক-সাহিত্য' ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩৫১-৫৯ দ্রষ্টব্য।

ঘোড়া নাচ

পশুপক্ষীর কৌতুককর নৃত্যের মধ্যে এক শ্রেণীর নৃত্যের নাম ঘোড়া নাচ। এক ব্যক্তি কৃত্রিম ঘোড়ার উপর 'আরোহণ' করিয়া মঞ্চে আবির্ভূত হয়। কৃত্রিম ঘোড়াটি কখনও একজন ঘোড়ার মুখোস পরা পুরুষের সহায়তায়, কিংবা কাঠের তৈরী ঘোড়ার কেবল মাত্র ঘাড় ও মুখটি দ্বারাই নির্মিত হয়। অশ্বে 'আরূঢ়' ব্যক্তিটি এমন ভাবে তাহার কোমর হইতে পা পর্যন্ত আচ্ছাদিত করিয়া রাখে যে, সে যে আর একজন পুরুষের কাঁধে চড়িয়া ঘোড়ায় চড়িবার অভিনয় করিতেছে, তাহা দর্শকের দৃষ্টিগোচর হয় না। যদি মানুষ্যবাহক এই ক্ষেত্রে না থাকে, তবে একটি কাঠের ঘোড়ার ঘাড় ও মুখ এমন ভাবে নৃত্যকারীর কোমরে আঁটিয়া দিয়া তাহার নিম্নভাগ কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখা হয় যে, সেই ব্যক্তিটি হাঁটিয়া গেলেও বুঝিতে পারা যাইবে যে, সে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছে। সেই অবস্থায় নিজের পায়েই সে নাচিতে থাকিলে মনে হইবে যে, ঘোড়াটিই নাচিতেছে। সে ঘোড়ার পিঠের উপর বসিয়াছে, ঘোড়া নাচের তালে তালে নাচিতেছে। ইহাই ঘোড়ার নাচ।

ছো নাচ, ছৌ নাচ

সমগ্র পুরুলিয়া জিলা, বাঁকুড়া জিলার পশ্চিম সীমান্ত এবং মেদিনীপুর জিলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার পশ্চিম সীমান্তে প্রচলিত এক শ্রেণীর মুখোস নৃত্যের নাম ছো নাচ বা ছৌ নাচ। (ইহার সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনা 'বাংলার লোক-সাহিত্য', ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৯০-২০২ এবং পৃঃ ৭৬৬-৭৭৬ তে দ্রষ্টব্য)। অনেকে এমন মনে করিয়া থাকেন যে, ছো নাচ পুরুলিয়ার সংলগ্ন অঞ্চল বর্তমানে বিহারের অন্তর্গত সরাইকেলাতে 'উদ্ভূত' হইয়াছিল, কিন্তু ইহা সত্য নহে। ছো নাচ বাঙ্গালীর নিজস্ব সাংস্কৃতিক সম্পদ—বিহার এবং উড়িষ্যার সংলগ্ন অঞ্চলে ইহা বিস্তার লাভ করিয়াছে মাত্র। (মুখোস নৃত্য দেখ)

জাওয়া নাচ

পুরুলিয়া জিলার মাহাতো সমাজের গৃহস্থ নারীরা ভাদ্র মাসে যে এক শস্যোৎসব করিয়া থাকেন, তাহার নৃত্যানুষ্ঠানের নাম জাওয়া নাচ। শস্যের জাত কর্মের ইহাতে অনুষ্ঠান হয় বলিয়া জাত শব্দ হইতে জাওয়া শব্দের উৎপত্তি

হইয়া থাকিবে। সাধারণত ভাদ্র মাসে মাহাতো মেয়েরা একটি ডালির মধ্যে কিছু বালি সংগ্রহ করিয়া তাহাতে পঞ্চশস্যের বীজ বপন করে। বীজগুলি যাহাতে সহজে উদ্গত হইতে পারে, সেজন্য তাহাদের উপর প্রত্যহ জল সিঞ্চন করে। তারপর নবোদ্গত শস্যের চারাগুলি ডালা শুদ্ধ মাথায় করিয়া নির্দিষ্ট তিথিতে অন্যান্য প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে মিলিত হইয়া প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ীর আঙ্গিনায় গিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে উঠানের মধ্যে মাথা হইতে ডালাগুলি নামাইয়া রাখিয়া তাহা ঘিরিয়া মেয়েরা বৃত্তাকারে নৃত্য করে। ইহাই জাওয়া নাচ। নাচের ভঙ্গিতে দেহ একবার নোয়াইয়া একবার সোজা করা হয়, এমন ভাবে বার বার নামাওঠা করার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য চলিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে যে গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ভ্রাতার মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়। ইহাই জাওয়া নাচের গান বা জাওয়া গান।

জারি নাচ

পুর্ব বাংলার প্রধানত মৈমনসিংহ জিলার জারি গানের সঙ্গে যে নৃত্য প্রচলিত আছে, তাহাকেই জারি নাচ বলে। জারি গানের গায়কগণ তাহাদের সংখ্যা অনুযায়ী ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ একটি বৃত্ত রচনা করেন। একজন মূল গায়েন বৃত্তের বাহিরে থাকিয়া গীতিসুরে কাহিনী গাহিয়া গাহিয়া যায়, নৃত্যকারিগণ মধ্যে মধ্যে ধুয়া ধরে। নৃত্যের সময় বিশেষত বৃত্তের মধ্যেই একবার এক পা আগাইয়া যাইবার পর আর এক পা পিছাইয়া যায়, এইভাবে ধীর লয়ে বহুক্ষণ ধরিয়া নৃত্য চলিতে থাকে। কোন কোন সময় নৃত্যকারিগণ পায়ে নূপুর পরে, কাঁধের গামছাটা হাতে রুমালের মত করিয়া কখনও এক হাতে কখনও দুই হাতে ধরিয়া দুলাইতে থাকে। যখন বীর-রসের বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়, তখন পাদক্ষেপ সবল এবং দ্রুত হয়, যখন করুণ রসের বর্ণনা চলে, তখন পদক্ষেপ মৃদু এবং ধীর হয়। এই নৃত্যের মধ্য দিয়া কোন কোন সময় যথার্থ পৌরুষের স্পর্শ অনুভব করা যায়।

ঝুমুর

পশ্চিম বাংলার মুণ্ডা এবং দ্রাবিড় ভাষা ভাষী উপজাতীয় দিগের গোষ্ঠীনৃত্যের নাম ঝুমুর। এই উপলক্ষে যে গান গাওয়া হয়, তাহাকেও ঝুমুর গানই বলে।

ঝুমুর নৃত্য নানা প্রকারের হইতে পারে। তবে নারীসমাজে অর্ধবৃত্তাকারে পরস্পরের কটিবেষ্টন করিয়া একবার তিন পা আগাইবার পর আর একবার তিন পা পিছাইয়া যাইবার যে রীতি প্রচলিত আছে, তাহাই ব্যপক ভাবে ঝুমুর বলিয়া পরিচিত। এই নৃত্যে যে সকল পুরুষ মাদল কিংবা বাঁশী বাজায়, তাহাদিগকে 'রসিক' বলে, ইহা ব্যতীত এই নৃত্যে পুরুষের আর কোন কর্তব্য নাই। রসিক এই নৃত্যে অংশ গ্রহণ করে না, কেবল বাদ্যেই অংশ গ্রহণ করে।

টুসু নাচ

পুরুলিয়া জিলায় পৌষ মাস ব্যাপিয়া টুসু পরব নামে যে শস্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে কোন কোন অঞ্চলে গানের সঙ্গে নৃত্যও দেখিতে পাওয়া যায়। নৃত্য পূর্বে অত্যন্ত ব্যাপক ছিল, বর্তমানে ইহার প্রচলন নিতান্ত সীমাবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। মেদিনীপুর জিলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার অন্তর্গত যে বেলপাহাড়ী নামক গ্রাম আছে, তাহার টুসু উৎসব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেখানে পুরুষও টুসু নৃত্যে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে গার্হস্থ্য জীবন ভিত্তিক নানা সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়।

ঢাকী নৃত্য

বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই যাহারা ঢাক বাজায়, তাহারা কখনও সমবেত ভাবে কখনও বা একক ভাবে ঢাক বাজাইয়া ঢাকের তালের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য দেখাইয়া থাকে, তাহাকে ঢাকীনৃত্য বলে। ঢুলীরাও অনুরূপ ভাবে ঢোল বাজাইয়া নৃত্য দেখাইয়া থাকে, তাহাকে ঢুলী নৃত্য বলা যায়। ইহাদের নৃত্য বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে জড়িত, নিজেরাই বাজায় এবং বাজনার তালে তালে নিজেরাই নাচে। ইহা সম্পূর্ণ একক অনুষ্ঠান। তবে কেহ সঙ্গে সঙ্গে কাঁসী বা শানাই বাজাইতে পারে। ঢাকী নৃত্যের প্রারম্ভিক বাদ্যের নাম ঢাকীর ধুমুল।

ঢালী নাচ

পশ্চিম বাংলার যুদ্ধনৃত্যের একটি অবশেষ ঢালী নাচ। ঢাল লইয়া পাইকগণ এই নৃত্য করিয়া থাকে বলিয়া ইহা ঢালী নাচ নামে পরিচিত। যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের যে সৈন্য দল ছিল, তাহাদের মধ্যেও ঢালী নৃত্য

প্রচলিত ছিল। একহাতে ঢাল আর এক হাতে লাঠি লইয়া প্রধানত ডোম পাইকগণ যুদ্ধের মহড়া দিবার সময় যে সমবেত ভাবে লাঠি চালনার কৌশল প্রদর্শন করিত, তাহাই ঢালী নৃত্য বলিয়া পরিচিত। ঢাকের তালে তালে এই নৃত্য হয় বলিয়া ইহার মধ্যে যুদ্ধ নৃত্যের বীরত্বের ভাবটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ইহার মধ্যে স্বভাবতই কোন সঙ্গীত নাই, তবে মধ্যে মধ্যে উচ্চ ফুৎকার (yell) শুনিতে পাওয়া যায়, ইহা বীরত্ব ব্যঞ্জক, কোমল মধুর গীতিসুর-ব্যঞ্জক নহে।

দশাবতার নাচ

চৈত্রসংক্রান্তির গাজন উপলক্ষে কোন কোন স্থানে ভক্ত্যা বা সন্ন্যাসীরা দশাবতারের ভঙ্গিতে নৃত্য করিয়া থাকে, তাহাই দশাবতার নাচ। মৎস্যাবতারের নৃত্যের সময় জলের মধ্যে মৎস্যের চলিবার ভঙ্গি করা হয়, কূর্ম-বরাহ সম্পর্কেও তাহাই করা হয়। তারপর হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি চরিত্রের ভাব প্রকাশ করিয়া পরপর নৃত্য হয়।

দাঁড়শালী নাচ

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার আদিবাসী এবং অর্ধ আদিবাসীদিগের মধ্যে প্রচলিত এক শ্রেণীর কেবলমাত্র পুরুষের নাচ দাঁড়শালী নাচ বা দাঁড়শালী ঝুমুর নাচ বলিয়া পরিচিত। ইহার সঙ্গে সাধারণত কোন উৎসবের সম্পর্ক নাই। যে কোন দিন কর্ম হইতে একটু অবসর পাইলেই গ্রামের আখড়া বা নৃত্যাঙ্গনে এই নৃত্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। পুরুষেরা হাত ধরাধরি করিয়া বৃত্ত রচনা করে এবং সেই ভাবে নৃত্যে যোগদান করে। ঝুমুর গান, মাদল ও বাঁশীর বাদ্যসহযোগে নৃত্য চলিতে থাকে।

ধামালী

প্রধানত শ্রীহট্ট জিলায় প্রচলিত এক শ্রেণীর মেয়েলী নৃত্যের নাম ধামালী। ইহার সঙ্গে যে সঙ্গীত ব্যবহৃত হয়, তাহাও ধামালী বা ধামাইল বলিয়া পরিচিত। ভদ্রগৃহের গৃহস্থ কন্যা ও বধূরা এই নৃত্যে যোগদান করিয়া থাকে। সাধারণত নবান্নের সময়, গৃহে নূতন বধূকে বরণ করিয়া লইবার সময় কিংবা বৌ নাচের সময় (পরে দেখ) এই নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়। দুই হাতে

তালি দিয়া কখনও কখনও ডান পা সামনের দিকে তুলিয়া মাঝে মাঝে দুই হাতে কোমরে ধরিয়া এই নৃত্য হইয়া থাকে। সাধারণ বেশ ভূষাই এই নৃত্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বিশেষ কোন বেশভূষার প্রয়োজন হয় না। পারিবারিক অন্য কোন কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষেও পরিবারের মহিলাদের মধ্যে ইহার আয়োজন হইয়া থাকে। ধামালী শব্দটি পশ্চিমবাংলায় প্রাপ্ত চতুর্দশ শতাব্দীর পুঁথি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' সাধারণ ভাবে রঙ্গরস অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

নাটুয়া নাচ

পুরুলিয়া জিলায় প্রচলিত এক শ্রেণীর বীর-রসাত্মক পুরুষের নৃত্যের নাম নাটুয়া নাচ। পুরুলিয়ার ছো নাচের মত ইহা মুখোস নৃত্য নহে, অথচ ছো নাচের মত ইহাতে বলিষ্ঠ অঙ্গ সঞ্চালন দেখা যায়। ইহা কৌতুক রসাশ্রিত নৃত্য না হইলেও ইহাতে নানা রঙের কাপড়ের টুকরা গায়ে বাঁধিয়া, মুখে রঙ মাখিয়া নৃত্য করা হয়। অথচ বলিষ্ঠ অঙ্গ সঞ্চালন এবং সদর্প পদক্ষেপ দ্বারা ইহার মধ্য হইতে সকল কৌতুককর ভাব দূর হইয়া যায়। ইহা যেমন একক নৃত্যও হইতে পারে, তেমনই গোষ্ঠী বা সারী নৃত্যও হইতে পারে। এই নৃত্যের সঙ্গে বাংলার বিশিষ্ট আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র ধাম্‌সা (ঢাক নহে) বাজিয়া থাকে। ইহা বাংলার যুদ্ধনৃত্যের অবশেষ বলিয়াই মনে হয়। বর্তমানে ইহা বিত্তশালী ব্যক্তিদিগের বিবাহের বরানুগমনে ব্যবহৃত হয়।

পাইক নৃত্য

পশ্চিম বাংলার পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে প্রচলিত বাংলার যুদ্ধনৃত্যের একটি অবশেষ এই পাইক নৃত্য এখনও কোন কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণত সামন্ততন্ত্রের যুগের শারদোৎসবে ইহার আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান হইত। পাইকগণ স্থানীয় ভূস্বামীদিগের পদাতিক সৈন্য স্বরূপ ছিল। অবসর সময়ে তাহারা যুদ্ধের যে মহড়া দিত, তাহাই কালক্রমে নৃত্যে পর্যবসিত হইয়াছে। ইহা লাঠি হস্তে গোষ্ঠীনৃত্য, বলিষ্ঠ অঙ্গ সঞ্চালন ইহার বিশেষত্ব।

পাতা নাচ

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার আদিবাসী সমাজে প্রচলিত স্ত্রী পুরুষের এক মিলিত নৃত্যের নাম পাতা নাচ। ইহার একটি বিশিষ্ট সামাজিক গুরুত্ব আছে। কোন

কোন অঞ্চলে এই নৃত্যের মধ্য দিয়া অবিবাহিত যুবক-যুবতীগণ তাহাদের ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবনের সঙ্গী এবং সঙ্গিনী নির্বাচন করিয়া থাকে। পাতা শব্দের অর্থ বন্ধুত্ব পাতানো, বন্ধুত্ব পাতানোর নাচকে পাতা নাচ বলে। অর্ধ আদিবাসীর মধ্যে ইহা প্রচলিত নাই, কেবলমাত্র যে সকল আদিবাসীর সামাজিক জীবনের সংহতি সুদৃঢ়, তাহাদের মধ্যেই ইহা প্রচলিত।

পুতুল নাচ

পুতুল নাচ প্রকৃত লোক-নৃত্য কি না, এই বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিতে পারেন, বিশেষত বাংলাদেশের প্রধানত পশ্চিম বঙ্গের ভাগীরথীর দুই তীরে যে পুতুল নাচ সাধারণত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে পুতুল থাকিলেও তাহার নৃত্য প্রাধান্য লাভ করে না, বরং পুতুলের অভিনয় প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু ছোটনাগপুরের আদিবাসী অঞ্চলে শীতকালীন মেলাগুলিতে যে এক শ্রেণীর পুতুল নাচ দেখা যায়, তাহাতে যেমন পুতুল আছে, তেমনই তাহাদের নৃত্যও আছে, সেইজন্য পুতুল নাচ বলিতে প্রকৃত তাহাই বুঝায়। বাংলাদেশের পুতুল নাচের মধ্যে নাচ প্রাধান্য লাভ করে না, বরং কতকগুলি পুতুলের সহায়তায় একটি যাত্রার অভিনয় হইয়া থাকে মাত্র। যাত্রার মধ্যে নৃত্যের যতটুকু স্থান, ইহাদের মধ্যেও নৃত্যের ততটুকু স্থান, নৃত্যের তাহার বেশি স্থান নাই। এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য 'বাংলার লোক-সাহিত্য' ৩য় খণ্ড, পৃ ১৭৭-১৮৬ দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন পদ্ধতির নৃত্য

মধ্য যুগে তুর্কী আক্রমণের বিপর্যয়ের সম্মুখে রাষ্ট্রের সহানুভূতি বঞ্চিত হইয়া বাংলার যে সকল চারুকলা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, বাংলার নৃত্যশিল্প যে তাহাদের অন্যতম, বাংলার প্রাচীন সাহিত্য হইতে এখনও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন নৃত্য কিংবা নৃত্যশিল্প বলিতে আমি ইহাকে লোক-নৃত্য (folk dance) হইতে এখানে পৃথক্ বলিয়া মনে করিতেছি। কারণ, দেখা যায়, তুর্কী আক্রমণ বা মুসলমান বিজয়ের পরও বাংলার কোনও কোনও প্রত্যন্ত অঞ্চলে লোক-নৃত্যের ধারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত কতকটা অব্যাহত

থাকিলেও শিল্প-সম্মত নৃত্য বা প্রাচীন বা ক্লাসিক্যাল নৃত্যের ধারা যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহা প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়া যায়।

আজ বাংলা দেশে যে প্রাচীন নৃত্যশিল্পের অভ্যুদয় দেখা যায়, তাহার সঙ্গে বাঙ্গালীর নৃত্যশিল্প-সাধনার নিজস্ব ধারার কোন যোগ নাই, ইহাকে পুনরভ্যুত্থান বা revival বলা যায় না; কারণ, ইহা বাঙ্গালী জাতির বিলুপ্ত একটি শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠা নহে, বরং একদিক হইতে ইহা দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যের অনুকরণ, অন্য দিকে আধুনিক শিল্পবোধ দ্বারা ইহার নব রূপায়ণ। বাংলাদেশে এই বিষয়ে যে একটি নিজস্ব ধারা ছিল, সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া কেহ তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হন নাই। দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলাদেশে ইহার অনুশীলনের অভাবে এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করাও সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। বিশেষত যে সকল ক্ষেত্র হইতে এই সকল বিষয়ের সাধারণত অনুসন্ধান করা হইয়া থাকে, এ দেশে সে সকল ক্ষেত্রের অভাব আছে। সমগ্র ভারতের মন্দিরগুলিকে আশ্রয় করিয়া নৃত্যশিল্পের যেমন আধুনিক কাল পর্যন্তও বিকাশ হইয়া আসিয়াছে এবং সেখানে কেবল মাত্র মন্দিরগুলির মধ্যে অনুসন্ধান করিলেই যেমন সে দেশের নৃত্যশিল্পের একটি সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়, বাংলা দেশে তাহা পাওয়া যায় না; কারণ, বাংলা দেশে অনুরূপ মন্দিরেরই অভাব আছে।

বাংলার মুসলমান শাসনের আমলে মন্দিরগুলিই রাষ্ট্রশক্তির আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল এবং নানা ভাবে কেবলমাত্র যে মন্দিরের ইট-পাথরগুলিই বিধ্বস্ত করা হইয়াছে, তাহা নহে, এদেশে মন্দির সম্পর্কিত কোন সংস্কার কিংবা জনশ্রুতিও গড়িয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। দক্ষিণ ভারতের অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সে দেশে দেবমন্দিরগুলিকে কেন্দ্র করিয়া দেশের সংস্কৃতি নানা ভাবে গড়িয়া উঠিবার নিরুপদ্রব অবকাশ লাভ করিয়াছে। এই সকল মন্দিরের মধ্যে কেবল যে নৃত্য-শিল্পের প্রত্যক্ষ অনুশীলন মাত্রই হইয়াছে, তাহা নহে—যুগে যুগে সে দেশের নৃত্য রাষ্ট্রের সহানুভূতি লাভ করিয়া যে ভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহারও সুবিস্তৃত পরিচয় মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ হইয়া আছে। উড়িষ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মধ্যে যে অগণিত হিন্দুমন্দির অক্ষত ভাবে সহস্রাধিক বৎসর যাবৎ বিরাজ করিতেছে, তাহাতে উৎকীর্ণ মূর্তিগুলির নৃত্যভঙ্গি অনুসরণ করিয়া

গেলেই দক্ষিণ ভারতের নৃত্যশিল্পের ক্রমবিকাশের ধারা সার্থক ভাবে অনুসরণ করা যায়। তারপর দক্ষিণ ভারতীয়ের জীবনে নৃত্যের সংস্কার আধুনিকতম কাল পর্যন্ত যে ভাবে সক্রিয় রহিয়াছে, তাহার মধ্যেও ইহার বহু দূরাগত একটি ঐতিহ্যের ধারা বর্তমান আছে। কিন্তু বাংলা দেশে ইহাদের কিছুই নাই। এখানে সুপ্রাচীন মন্দিরও যেমন নাই। প্রাচীন শিল্প-সম্মত নৃত্যের ধারাও বর্তমান নাই। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি বিষয়ক উপকরণের অনুসন্ধান-কারিগণ এই দুইটি ক্ষেত্র হইতেই ইহার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের শিক্ষা এবং অভ্যাস এই বিষয়ে এমনি অনমনীয় (rigid) হইয়া রহিয়াছে যে, যেখানে এই উপকরণের অভাব দেখিতে পান, সেখানেই এই বস্তুরই অভাব বলিয়া মনে করিয়া সেদিকে আর দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ পান না। প্রত্যেক দেশেরই ঐতিহাসিক উপাদান যে এক হইতে পারে না, এই কথাটি তাহারা বুঝিতে পারেন না। সেই জন্য বিভিন্ন দেশে নূতন নূতন ক্ষেত্র হইতে মানব ইতিহাসের যে সকল বিচিত্র উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে, সেই বিষয়ে আমাদের দেশের পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ সম্পূর্ণ নির্বিকার।

বাংলার ইতিহাস দক্ষিণ ভারত হইতে স্বতন্ত্র। সুদীর্ঘকাল নিরুপদ্রব সমাজ-জীবন ভোগ করা এই দেশের ভাগ্যে ছিল না। সেই জন্য এই দেশে কোন স্থায়ী কীর্তি গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। এই সূত্রেই কোনও ঐতিহ্য এ দেশে দীর্ঘকাল ধরিয়া বিকাশ লাভ করিবার পরিবর্তে তাহা বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। ভাস্কর্য কিংবা স্থপতির নশ্বর কীর্তিতে এ' দেশের ঐতিহ্য ধরা দেয় নাই। কিন্তু সেইজন্য এই দেশে যখন আপাত দৃষ্টিতে সভাভার কোন উপাদানের অভাব দেখা যায়, তখন এই দেশের তাহা একটি বিশেষ ত্রুটি বলিয়া গণ্য করিবার পূর্বে আমাদের অভ্যস্ত ক্ষেত্র ব্যতীতও তাহার সম্বন্ধে অন্যত্র হইতেও অনুসন্ধান করা আবশ্যক হয়। ঐতিহাসিকের উপেক্ষিত সেই প্রকার একটি ক্ষেত্র হইতে প্রাচীন বাংলার নৃত্যশিল্পের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের একটি নূতন পরিচয় প্রকাশ করিতে পারে।

বাংলার প্রাচীন স্থপতি এবং ভাস্কর্য কীর্তিতে প্রাচীন বাংলার নৃত্যশিল্পের উল্লেখযোগ্য কোন নিদর্শন না পাওয়া গেলেও, প্রাচীন সাহিত্যে ইহার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা কোন দিক দিয়াই উপেক্ষা করা যাইতে পারে না।

মঙ্গলকাব্য বাংলার প্রাচীন সাহিত্য ধারার অন্তর্ভুক্ত বাংলার জাতীয় সাহিত্য। ইহার মধ্যে সে কালের বাংলার যে সমাজ চিত্র পাওয়া যায়, তাহা কেবল কবির কল্পিত ভাব-স্বপ্ন মাত্র নহে, ইহার মূলে বাস্তব জীবনের প্রেরণা সক্রিয় ছিল। ইহাদের মধ্যে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে এখনও এখান হইতেই বাংলার অতীত সমাজ-জীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বাংলার ইতিহাসে কতকগুলি নূতন অধ্যায় যোজনা করিতে পারে। মনসা-মঙ্গল ইহাদের মধ্যে নানা দিক দিয়া প্রাচীনতম বলিয়া মনে হয়। বাংলার এক অতি প্রাচীন-জীবনের সংস্কারের উপর ইহার ভিত্তি। ইহার মধ্যে প্রাচীন বাংলার নৃত্যশিল্পের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, ইহা একদিন বাঙ্গালীর জীবনে সাধনার বিষয় ছিল। সে কথাই এখানে উল্লেখ করিতেছে।

এ' কথা সকলেই জানেন, মনসা-মঙ্গলের নায়িকা বেহুলা দেবতাদিগকে নৃত্য প্রদর্শন করাইয়া তাঁহার জীবনের অভীষ্ট পুরণ করিয়াছিলেন। এই কথাটি গভীর তাৎপর্য মুলক। যে সমাজ-জীবন হইতে এই কাহিনী জন্ম লাভ করিয়াছিল এবং যে সমাজ এই কাহিনীকে দীর্ঘকাল যাবৎ পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিয়াছে, সেই সমাজেরই জাতীয় কাব্যের নায়িকা-চরিত্রের সর্ব প্রধান গুণ নৃত্যকুশলতা। ইহা হইতেই নৃত্যশিল্পের প্রতি সমাজের াক মনোভাব ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। মনসা-মঙ্গল কাব্যের মধ্যে এই বিষয়টি যে পূর্বাপর সম্পর্কহীন একটি বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন বিষয়, তাহা নহে। এই কাব্য যাঁহারা গভীর ভাবে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন, প্রাচীন নৃত্যশিল্পকে ইহার মধ্যে পূর্বাপরই একটি বিশেষ স্থান দেওয়া হইয়াছে। মনসা-মঙ্গল কাব্যের প্রথম অংশেই পর পর কয়েকটি শিব-নৃত্যের বর্ণনা আছে। মনসার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন আনন্দের অভিব্যক্তি স্বরূপ শিব একবার নৃত্য করিতেছেন, কবি এই সম্পর্কে লিখিয়াছেন,

পদ্মারে লইয়া কাঁখে নাচে শিব ঘন পাকে,

চক্রাকারে নৃত্য করিবার মধ্য দিয়া প্রাচীন শিবনৃত্যের একটি বিশেষ রীতিরই এখানে বর্ণনা করা হইয়াছে। মনসা-মঙ্গলে শিব-নৃত্যের দ্বিতীয় বর্ণনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ; সেই জন্য তাহা আনুপূর্বিক উদ্ধৃত করিতেছি। মনসা চণ্ডীকে দংশন করিবার ফলে চণ্ডীর মৃত্যু হইয়াছিল, শিবের অনুরোধে মনসা চণ্ডীর দেহে প্রাণ সঞ্চার করিলেন। চণ্ডী যখন চক্ষু মেলিয়া তাকাইলেন, তখন তিনি

পার্বতীকে পাশে লইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ইহার বর্ণনায় চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি বিজয় গুপ্ত লিখিয়াছেন,

জগত মোহন শিবের নাচ।
সঙ্গে নাচে শিবের ভূত পিশাচ ॥
রঙ্গে নেহালী গৌরীর মুখ।
নাচে গঙ্গাধর মনের কৌতুক ॥
হাসিতে খেলিতে চলিতে রঙ্গ।
নন্দী মহাকাল বাজায় মৃদঙ্গ ॥
শিবাই নাচে রে মুখেতে গীত গাহে।
হাতে তালি দিয়া কিঙ্করে গীত গাহে ॥
বিকট দশনে ভ্রূকুটি ভাল সাজে।
ডুম ডুম বলিয়া ডমরু বাজে ॥
মরিয়াছিল চণ্ডিকা জীল আর বার।
ডাকিনী যোগিনী দিল জয়-জোকার ॥
কার্তিক গণপতি দাঁড়াইয়া কাছে।
গৌরীমুখ নেহালিয়া ত্রিলোচন নাচে ॥
দেখিয়া কৌতুক দেব-সমাজে।
পুষ্প বরিষণ করে ধুমধুমি বাজে ॥
ডাহিনীতে গৌরী বামে পদ্মাবতী।
হাসিয়া চলিল দেব পশুপতি ॥

প্রাচীন রীতি (Classical) অনুযায়ী হর-পার্বতী নৃত্যের ইহা একটি সার্থক বর্ণনা—ইহা কেবল মাত্র লোক-নৃত্যের বর্ণনা নহে। বাংলার প্রাচীন কোন মন্দির গাত্রে দক্ষিণ ভারতের অনুযায়ী হরপার্বতীর অনুরূপ নৃত্যভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় না সত্য, তবে হরপার্বতীর মিথুন মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু মিথুন মূর্তিগুলির পরিচয় স্বতন্ত্র, ইহাদের মধ্য দিয়া প্রাচীন নৃত্যের কোন পরিচয় উদ্ধার করা যায় না। উদ্ধৃত বর্ণনাটি হইতে বুঝিতে পারা যায়, বাংলা দেশ হইতে নৃত্যপর শিবের কোনও প্রাচীন মূর্তি আবিষ্কৃত না হইলেও এ দেশেও দাক্ষিণাত্যেরই অনুরূপ শিবকে নৃত্যগুণ-সম্পন্ন দেবতা রূপেই কল্পনা করা হইত। অর্থাৎ নটরাজ শিবের পরিকল্পনাটি বাংলা দেশেও বর্তমান

ছিল বলিয়া মনে হয় এবং দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে এই বিষয়ে বাংলা দেশের কোন বিষয়েই পার্থক্য ছিল না। উত্তর ভারতের পরিবর্তে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে বাংলা দেশের অনেক বিষয়েই যে সাংস্কৃতিক ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়, নৃত্যশিল্পও তাহাদের অন্যতম। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের নৃত্য-সংস্কার অব্যাহতভাবে অগ্রসর হইয়া আসিবার ফলে আধুনিক কাল পর্যন্ত ইহার পরিচয় লোকচক্ষুর সম্মুখ হইতে তিরোহিত হয় নাই; কিন্তু বাংলা দেশে তুর্কী আক্রমণের পর যে সামাজিক বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল, তাহার ফলেই ইহা ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইতে না পারিয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

মনসা-মঙ্গলে চাঁদ সদাগরের পুত্রবধূ ও লখীন্দরের পত্নী বেহুলার শৈশবকালীন শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে বলা হইয়াছে,

মা বাপের বাড়িতে বেহুলা নাচে গায়।

নৃত্য এবং সঙ্গীত এ দেশের নারীদের সাধনার বস্তু ছিল; সেইজন্য এই পথেই বেহুলা তাহার জীবনের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

নৃত্যকালীন তালভঙ্গ সে যুগের সমাজে এক কঠিন পাপ বলিয়া গণ্য হইত। এই পাপে অভিশাপগ্রস্ত হইয়া নৃত্যশিল্পীদিগকে স্বর্গভ্রষ্ট হইতে হইত; তার পর মর্ত্যলোকে দুঃসহ দুঃখভোগ করিয়া সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। কিন্তু নট-নটীদিগের নিজেদের দোষে তাল ভঙ্গ হইত না, কোন চক্রান্তকারী দেবদেবী ষড়যন্ত্র করিয়া তালভঙ্গ করিয়া দিতেন। তাহার ফলেই নট-নটীদিগকে অভিশাপগ্রস্ত হইতে হইত। সুতরাং অটুট নিষ্ঠার সঙ্গে যে ইহার সাধনা করা হইত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। মনসা-মঙ্গল হইতে উষা-অনিরুদ্ধের তালভঙ্গের বর্ণনাটি উদ্ধৃত করিতেছি—

জয় জয় পরে উষা কাচের বসন।
গঙ্গা যমুনা বন্দে মাথে মোহন বাঁশী নিল হাতে
দাঁড়াইল ইন্দ্রের সভায়॥
কোণ্ডর মৃদঙ্গ নিলা উষা মোহন বাঁশী॥
নৃত্য করিতে নামিলা রামা পরম রূপসী॥
তাথিনী তাথিনী তাল নাচে কন্যা সন্নিধান
ধন্য ধন্য বলে ইন্দ্র রায়।

মনসাকে বলে ধোবিনী শোন গো, ব্রাহ্মণি,
কেন নৃত্য দেখ বিষহরী।
মা, বিষ-নঞানে চাও তালখানি ভেঙ্গে দাও
পাউক দেখিবারে ইন্দ্র রায় ॥
মা, বিষ নঞানে চায় তালখানি ভেঙ্গে যায়
দেখিবারে পাইল ইন্দ্র রায় ॥
উষা, হও লো নাটুয়ার জাতি গরবে না চিন মতি
কি দেখিঞা তোর ভঙ্গ তালে।
নাটুয়া, আমার স্থান ছাড়রে, জন্ম লওগা চণ্ডালের ঘরে
এ' বার বছর তরে ॥

মনসার চক্রান্তে উষা-অনিরুদ্ধের তাল ভঙ্গ হইবার দোষে তাহাদের দ্বাদশ বৎসরের জন্য স্বর্গ হইতে নির্বাসনের অভিশাপ হইল। সুতরাং নৃত্যকালীন তালভঙ্গ দোষটি সে যুগে যে কত গুরুতর বলিয়া বিবেচিত হইত, ইহা হইতে তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। যে সমাজ নৃত্যশিল্প নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা করিত, সেই সমাজের নিকটই ইহার কোন প্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি এই প্রকার কঠিন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবার কথা। সেই সংস্কার যে আমাদের মধ্য হইতে আজ একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

বাউল নাচ

বাউল বাংলার নিজস্ব একটি ধর্মসম্প্রদায়, নৃত্য এবং গীত ইহার সাধন-ভজনের অঙ্গ। সেইজন্য এই সম্প্রদায়ের মধ্যে নৃত্যের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বাউল একক নৃত্য। হাতে এক তারা এবং কোমরে বাঁয়া এবং তবলা বাঁধিয়া পশ্চিম বাংলার বাউলেরা নৃত্য করিয়া থাকে। পশ্চিম বাংলার বাউলদিগের মধ্যেই নৃত্যের ব্যাপক প্রচলন আছে। পুর্ব বাংলার বাউলেরা হাতে একতারা লইয়া সাধারণ ভাবে গানের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিলেও তাহাদের নৃত্য বিশেষত্বহীন। কিন্তু পশ্চিম বাংলার বাউলদিগের নৃত্যই বিশেষ প্রাণবন্ত। পুর্ব বাংলার বাউলেরা অনেক সময় নৃত্য ব্যতীতও কেবল একতারা বাজাইয়া ভাটিয়ালী সুরে বাউল গান গাহিয়া থাকে।

নৃত্যের ভিতর দিয়া বাউল তাহার ভগবানের সঙ্গে সাযুজ্যের সুগভীর

আনন্দ ব্যক্ত করিয়া থাকে। সুতরাং তাহার নৃত্য কেবলমাত্র বহির্মুখী বিষয় নহে, বরং অন্তরের সুগভীর অধ্যাত্ম প্রেরণা হইতে জাত। নিজস্ব অধ্যাত্ম উপলব্ধি ব্যতীত এই নৃত্যে বাউল সার্থকতা লাভ করিতে পারে না।

জয়দেব কেন্দুলীতে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের প্রথম দিন এখনও বিরাট বাউল সমাবেশ হয়। সেই উপলক্ষে বাউলের নৃত্যগীত বহু লোককে আকৃষ্ট করে।

বাঘ নাচ

কৌতুককর পশুপক্ষীর আকার ধারণ করিয়া নৃত্যের মধ্যে বাঘের রূপ ধারণ নৃত্যের অন্যতম বিষয়। ইহাকে বাঘ নাচ বলে। বাংলার পল্লী অঞ্চলে এই শ্রেণীর নৃত্য পল্লীবাসীর আনন্দ দান করিত। 'বাংলার লোক-সাহিত্য' ৩য় খণ্ডে 'বাঘ নাচ'-এর একটি বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে (পৃঃ ১৯৩—১৯৯)। ইহা একটি লোক-নাট্যের মত। দুই ব্যক্তি ব্যাঘ্র সাজিয়া তাহাতে একটি লৌকিক কাহিনীর অভিনয় করিয়াছে। ইহার চরিত্রের মধ্যে বেদে বা যে বাঘ শিকার করে ও বাঘ ধরিয়া নাচায়, মোড়ল, ওঝা, চৌকিদার, বেদের স্ত্রী এবং 'ব্যাঘ্র' দ্বয়। ইহাদের কৌতুককর অভিনয়ই বাঘ নাচ বলিয়া পরিচিত।

বৌ নাচ

বাংলার পূর্ব এবং পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে যথাক্রমে শ্রীহট্ট এবং বীরভূম জিলায় এক শ্রেণীর মেয়েলী নৃত্য প্রচলিত আছে, তাহাকে বউনাচ বলা হয়। শ্রীহট্ট জিলার পূর্ব সীমান্ত লগ্ন কাছাড় জিলাতেও বাঙ্গালী সমাজে বউ নাচের প্রচলন আছে। বর্তমানে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য ইহা দ্রুত লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। শ্রীহট্ট এবং কাছাড় জিলায় গ্রামের কোন পরিবারের মধ্যে বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়া যাইবার কিছুদিন পর একদিন গ্রামের মহিলারা নববধূর নৃত্য দেখিবার জন্য তাহার গৃহে নিমন্ত্রিত হইতেন। বধূ মুখে ঘোম্টা টানিয়া দুইখানি হাতে বিচিত্র মুদ্রা ভঙ্গি করিয়া এবং ধীর লয়ে পদক্ষেপ দ্বারা সমবেত নিমন্ত্রিত নারীদিগের সম্মুখে তাহার নৃত্য কৌশল দেখাইয়া থাকে। ইহাই এই অঞ্চলের বউ নাচ।

বাংলাদেশের পশ্চিম প্রান্তবর্তী অঞ্চলের হিন্দু সমাজের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে বউ নাচ আর একটি স্বতন্ত্র রীতিতে প্রচলিত আছে। ইহাদের

উভয়ের মধ্যে যে কোন সম্পর্ক আছে, আপাত দৃষ্টিতে তাহা এখন আর মনে হইতে পারে না। বীরভূম জিলার সুবর্ণ বণিক সমাজে বিবাহের পর একদিন নববধূকে কোলে করিয়া তাহার মাতৃস্থানীয়া কোন নারী নিমন্ত্রিত জন সাধারণের সম্মুখে নৃত্য করিয়া থাকেন। মনে হয়, বাল্য-বিবাহ প্রবর্তিত হইবার পূর্বে যুবতী বধূ নিজেই এই নৃত্যে অংশ গ্রহণ করিত, তারপর রীতিটিকে রক্ষা করিবার জন্য বালিকা-বধূকে ক্রোড়ে করিয়া নৃত্য করিবার প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে। (বউ নাচের বিস্তৃততর বিবরণের জন্য 'বাংলার লোক-সাহিত্য" ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৭—১৯০ দ্রষ্টব্য)

ব্রতনৃত্য

মেয়েলী ব্রত (ritual worship) ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ারই (magic) লৌকিক রূপান্তর মাত্র। ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া আদিম সমাজে প্রধানত একজন ব্যক্তিই অনুষ্ঠান করিত, সে-ই সমাজের পুরোহিত বা ওঝা (exorcist) নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু মেয়েলী ব্রতনৃত্যের মধ্যে গোপনীয়তা (mysticism) কিছুই থাকে না। ইহা প্রকাশ্যে যেমন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তেমনই পরিবারের যে কোন এক বা একাধিক মহিলাই তাহাতে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। ঐন্দ্রজালিক নৃত্য অনেক সময় গোপনে অনুষ্ঠেয় এবং ইহার মধ্য দিয়া একটু রহস্যময়তার ভাব (mysticism) প্রকাশ পায়। ব্রত একটি সামাজিক আচারানুষ্ঠান, সেই সূত্রে ব্রতের সম্পর্কযুক্ত নৃত্যও একটি সামাজিক আচারানুষ্ঠান। যথেচ্ছভাবে ইহার অনুষ্ঠান হয় না, ইহার জন্য যে সময় নিদিষ্ট থাকে, তাহা ব্যতীত ইহার অনুষ্ঠান হইতে পারে না।

বাংলাদেশে প্রচলিত মেয়েলী ব্রতের মধ্যে তিনটি ভাগ প্রধান—প্রথমত কুমারী মেয়েদের ব্রত, তাহাতে বিবাহিতা নারীরা অংশ গ্রহণ করিতে পারে না; তারপর বিবাহিতা নারীগণের ব্রত, তাহাতে কুমারী কিংবা বিধবাগণ অংশ গ্রহণ করিতে পারে না, তৃতীয়ত এমন ব্রত যাহাতে সকল শ্রেণীর নারীই অংশ গ্রহণ করিতে পারে। এই বিভিন্ন প্রকৃতির ব্রতগুলি গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ইহাদের প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গেই কোন না কোন ভাবে নৃত্যের সম্পর্ক একদিন বর্তমান ছিল। মধ্যযুগের সমাজে অধিকাংশ নৃত্যই ধর্ম এবং আচার জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল, বিশেষত স্ত্রীসমাজের কোন নৃত্যই

সামাজিক আচার বহির্ভূত ছিল না। মেয়েলী ব্রতের পুরোহিত মেয়েরা নিজেরাই, পুরুষ পুরোহিতের তাহাতে প্রয়োজন হয় না। নিজেদের মধ্যে মেয়েরা কথা, গীতি এবং নৃত্য দ্বারাই ব্রত উদ্‌যাপন করিত। তাহার কিছু কিছু নিদর্শনের বাংলার প্রান্তিক অঞ্চলে এখনও সন্ধান পাওয়া যায়। কাছাড়ের বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলের ধামাইল ব্রতনাচ, যশোরের শীতলা ব্রতের নাচ এবং বর্ধমান, বীরভূম পুরুলিয়া অঞ্চলের ভাঁজো ও জাওয়া ব্রতের নাচ ইহারই নিদর্শন। এতদ্ব্যতীত কোন কোন ব্রতকথার মধ্যেও দেবতার নৃত্যের কথা আছে। নৃত্য দেবতাদিগের নিকটও একান্ত প্রিয় বলিয়া দেবতাদিগের তুষ্টির নিমিত্তই ব্রতিনীরা নৃত্য প্রদর্শন করিতেন। এই বিষয়ে বাংলাদেশের সর্বত্র প্রচলিত মনসা ব্রতের কাহিনীটি উল্লেখ করিতে পারা যায়। তাহাতে দেখা যায়, মনসা স্বয়ং প্রতিদিন নৃত্য অভ্যাস করিয়া থাকেন এবং তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও সদাগরের ছোট বৌ গোপনে তাঁহার নৃত্য দেখিয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাহাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। সুতরাং যে ব্রতিনীরা মনসার প্রসাদ যাচ্ঞা করিত, তাহারা স্বভাবতই তাঁহার প্রসন্নতার জন্য নৃত্যের অনুষ্ঠান করিত। মনসার সেবিকা বেহুলাও নৃত্যবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন। বর্ধমান জেলার ভাঁজো ব্রতের ছড়ায় মেয়েরা নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে গায়—

ভাঁজো লো কলকলানি, মাটির লো সরা,
ভাঁজোর গলায় দেব আমরা পঞ্চফুলের মালা।
এক কল্‌সী গঙ্গাজল, এক কল্‌সি ঘি,
বছরান্তে একবার, ভাঁজো, নাচবো না তো কি ?

এমন কি, ব্রতিনীরা তাহাদের এই পারমার্থিক বাসনা দেবতাদের নিকট নিবেদন করে—

ষোল ষোল বর্তীর হাতে ষোল সরা দিয়া।
মোরা যাই ইন্দ্রপুরীর নাটুয়া হইয়া॥

তাহারা স্বর্গে গিয়া দেবী হইয়া থাকিতে চাহে না, বরং নর্তকী হইয়া ইন্দ্রসভার চিত্তবিনোদন করিতে চাহে। ঐহিক জীবনে নৃত্যের সংস্কার যদি প্রবল না থাকে, তবে পারলৌকিক কামনার মধ্যে তাহা এই ভাবে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না।

রাজনৈতিক কারণে বাংলার সমাজ-জীবনের বিপর্যয়ের ফলে প্রকাশ্যভাবে নারীর নৃত্য এই সমাজের মধ্য হইতে অনেক ক্ষেত্রেই লুপ্ত হইয়া গেলেও ব্রত বা আচার (ritual) নৃত্য অবলম্বন করিয়াই ইহা শেষ অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছে। কারণ, পল্লীজীবন নিতান্ত রক্ষণশীল এবং নারীর আচার-জীবন তদপেক্ষা রক্ষণশীল। সুতরাং যাহা আচার-জীবনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে, পুরুষ তাহা বহির্মুখী বিপর্যয়ের মধ্যে অনেক সময় পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেও নারী তাহা সহজে বিসর্জন দিতে পারে নাই। সেইজন্য বাংলার প্রাচীন নৃত্য-পদ্ধতির কিছু পরিচয় এখনও নারীর আচার-জীবনের মধ্য হইতে সন্ধান পাওয়া যায়। আচার নৃত্য সহজে পরিবর্তিত হইতে পারে না ; কারণ, যে উদ্দেশ্যে আচার পালন করা হয়, আচারগুলি সম্পূর্ণ পালন না করিলে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না বলিয়াই সমাজে আচারের খুঁটিনাটিগুলি পরিত্যক্ত হইতে বিলম্ব হয়। সেইজন্য যে সকল ব্রতনৃত্য এখনও সমাজে অবশিষ্ট আছে, তাহাদের মধ্যে বাংলার লোক-নৃত্যের প্রাচীন উপকরণগুলিই রক্ষা পাইয়াছে। ইহারা বৈচিত্র্যহীন হইতে পারে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনের কিছু কিছু আদিম উপাদান রক্ষা পাইয়াছে বলিয়া সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাদিগকে অত্যন্ত মুল্যবান্ বলিয়াই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

সূর্যব্রত ভারতের সকল শ্রেণীর নারীসমাজের একটি প্রধান ব্রত। সূর্য উর্বরতাশক্তি (fertility)-র আধার ; কারণ, সূর্যতেজ দ্বারা কৃষিকার্য নিয়ন্ত্রিত হয়। আদিম সমাজ বিশ্বাস করিয়াছে যে, ভুমির উর্বরতা শক্তি যাহা দ্বারা বৃদ্ধি পায়, নারীর উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধির তাহাই সহায়ক ; সূর্যের আশীর্বাদে নারীও সন্তান লাভ করিয়া থাকে এবং সূর্যের অভিশাপেই নারী বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সূর্যকে প্রসন্ন করিতে না পারিলে নারী কদাচ সন্তানের জননী হইতে পারে না। সেইজন্য স্ত্রীসমাজ সূর্যকে নানা ভাবে প্রসন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। মেয়েলী ব্রতগুলি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ লাভ করিলেও ইহাদের মূল লক্ষ্য প্রায় অভিন্ন। সেইজন্য গুজরাটের বহু-প্রচারিত গরবা নৃত্যও যাহা, কাছাড়ের ধামালী-নৃত্যও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নহে ; কারণ, উভয় ক্ষেত্রেই সূর্যকে প্রসন্ন করা উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য পালন করিবার জন্য বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করা হইয়া থাকে মাত্র। কিন্তু এই সকল প্রণালীর মধ্যেও কতকগুলি বিষয়ে ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য বৃত্তাকৃতি এবং

আকাশচারী। সেইজন্য বৃত্তাকারে দাঁড়াইয়া কখনও সূর্যের প্রতীক প্রদীপ কিংবা অন্য কোন বস্তু মস্তকে কিংবা হস্তে ধারণ করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা সাধন করিবার প্রয়োজন হয়। সুতরাং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সূর্যব্রত-নৃত্যের মধ্যে এই সকল বিষয়ে মৌলিক ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। গুজরাটের যে গরবা নৃত্য কেবলমাত্র প্রচারের জন্য সর্ব ভারতীয় পরিচয় লাভ করিয়াছে, তাহার সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সূর্যব্রত-নৃত্যের মৌলিক সম্পর্ক রহিয়াছে, বাংলার সূর্যব্রতের নৃত্যের সঙ্গেও তাহার পার্থক্য কেবলমাত্র বহির্মুখী—অন্তর্মুখী নহে। অর্থাৎ বাংলার মেয়েরা সূর্যব্রতে নৃত্যকালীন গুজরাটী নারীদিগের মত রঙ বেরঙের পোশাক-পরিচ্ছদ ধারণ করে না, পারিবারিক জীবনে প্রত্যহ যে বস্ত্রখানি মাত্র পরিধান করে, তাহা দিয়াই তাহাদের নৃত্যাচার পালন করে; অন্যদিকে গুজরাটী নারীর প্রাত্যহিক জীবনের পোশাকও অত্যন্ত বিচিত্র; তাহার গাঢ় রঙ, ঘাগ্‌রা, জামা ও ওড়নার রঙ্‌-এর বৈচিত্র্য অতি সহজেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু বাঙালী পল্লীনারীর প্রাত্যহিক জীবনে পরিধেয় পোশাক এত বিচিত্র নহে, মাত্র একখানি সাদা শাড়ী তাহার অবলম্বন; সুতরাং তাহা দ্বারা কোন প্রকার দৃশ্যগত আকর্ষণ সৃষ্টি হইতে পারে না। সেইজন্য গরবা-নৃত্যের এত ভারতব্যাপী খ্যাতি এবং বাংলার সূর্যব্রত-নৃত্যের কেহ সন্ধান জানেন না।

বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ, কৃষির সমৃদ্ধি কামনা করিয়াই বাংলার ব্রতের উদ্ভব ও বিকাশ হইয়াছে। কৃষিকার্যের সঙ্গে প্রথম এবং প্রধান সম্পর্কই সূর্যের; সুতরাং সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া যেমন এদেশের ব্রতগুলি পরিকল্পিত হইয়াছে, তেমনই ব্রতনৃত্যগুলিও প্রধানত সূর্যকে কেন্দ্র করিয়াই গঠিত হইয়াছে। এমন কি, আপাতদৃষ্টিতে সূর্যের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই মনে হইলেও, তাহা যে সূর্যব্রতেরই প্রভাবজাত, তাহা অনুমান করা যায়। কারণ, সূর্যব্রতের অনুকরণেই পরবর্তী কালে অন্যান্য দেবতা বিষয়ক ব্রত এবং নৃত্যগুলি পরিকল্পিত হইয়াছে। এই বিষয়ে যশোর জিলার শীতলা-নৃত্যের কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়। শীতলা-নৃত্য বর্তমানে শীতলা পূজা উপলক্ষেই প্রধানত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তথাপি মূলত ইহা সূর্যব্রত উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ব্যাপক একটি নৃত্যাচার ছিল বলিয়া মনে হয়; কারণ, উপরে গরবা নামক যে গুজরাটী সূর্যব্রতের কথা উল্লেখ করিলাম, ইহার সঙ্গে তাহার মৌলিক কোন পার্থক্য নাই। গুজরাটের গরবা-নৃত্যে মেয়েরা

হাঁড়ির মধ্যে একটি জ্বলন্ত প্রদীপ রাখিয়া তাহা মাথায় লইয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়, বাড়ীর ভিতরের আঙ্গিনায় গিয়া মাথা হইতে তাহা নামাইয়া রাখিয়া তাহা ঘিরিয়া নৃত্য করিয়া থাকে। যশোরের শীতলা-নৃত্যে তাহার সামান্য ব্যতিক্রম মাত্র দেখা যায় এবং তাহাও যে বহির্মুখী মাত্র, মৌলিক কোন বিষয়ে নহে, তাহাও বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। কারণ, গুজরাটে মেয়েরা জ্বলন্ত প্রদীপকে একটি হাঁড়ির ভিতরে স্থাপন করিয়া মাথায় ধারণ করে, শীতলা-নৃত্যে তাহার পরিবর্তে একটি কুলার উপর জ্বলন্ত প্রদীপটিকে স্থাপন করিয়া লওয়া হয়। উভয় ক্ষেত্রেই প্রদীপটি ঘিরিয়া বৃত্তাকারে নৃত্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। তবে বাঙ্গালী গ্রাম্য মেয়ের তুলনায় গুজরাটী নারীর পোশাক-পরিচ্ছদের বৈচিত্র্যের জন্য গরবা-নৃত্যটি অধিকতর দর্শনীয় হইয়া উঠে মাত্র।

গুজরাটের সূর্যব্রত-নৃত্য গরবার সঙ্গে বাংলার শীতলা-নৃত্যের সম্পর্ক নির্দেশ করিবার আরও একটি কারণ আছে, বাংলা শীতলাব্রতের নৃত্য যে সূর্যব্রতেরই নৃত্য, তাহা ইহাতে আরও স্পষ্ট হইবে। শীতলা বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইলেও বসন্তরোগ চর্মরোগ; বাংলার চর্মরোগের দেবতা ধর্মঠাকুর, তিনি কুষ্ঠরোগেরও প্রতিষেধক। ধর্মঠাকুর সূর্য-দেবতা। সেইজন্য মনে হয়, শীতলাদেবীর প্রসন্নার্থে যে নৃত্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহা সূর্যব্রত-নৃত্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পূর্ব বাংলার মাঘমণ্ডল ব্রতে সূর্যব্রতের রূপটি আরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। মাঘমণ্ডল ব্রতটি আনুপূর্বিক একটি লোকনাট্যানুষ্ঠান। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'বাংলার ব্রত' নামক গ্রন্থে মাঘমণ্ডল ব্রতানুষ্ঠানটিকে একটি লোক-নাট্যের ভিতর দিয়া উপস্থাপিত করা হইয়াছে। ইহার গীতি কিংবা ছড়ার সংলাপ যে নৃত্যেরও সম্পূর্ণ অনুকূল, তাহাও ইহাতে নির্দেশ করা হইয়াছে। এমন কি, ইহাতে নটনটীর চরিত্র এবং তাহাদের নৃত্যগীতও সংযুক্ত রহিয়াছে। অবনীন্দ্রনাথ সংগৃহীত মাঘমণ্ডল ব্রতের ছড়ায় নটনটীর এই নৃত্যগীতের উল্লেখ করা হইয়াছে—

নট ॥ সোনার বাটী ঝুমুর ঝুমুর মিষ্টি বাটির তৈল।
তাই লইয়া সূর্যঠাকুর নাইতে গেলেন কৈ লো।
নাইয়া ধুইয়া বাটি থুইলেন কৈ লো॥

নটী ॥ বাটি বাটি কুমার আটি সকল পুড়িয়া গেল।
লক্ষ টাকার বাটি আমার হারাইয়া গেল ॥
নট ॥ গেছে গেছে ইহ বাটি আপদ বালাই নিয়া।
আরেক বাটি গড়াম যে চাকা সোনা দিয়া ॥
উভয়ে ॥ সোনার বাটির ঝুমুর ঝুমুর মিষ্টি বাটির তৈল ॥

নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুর করিয়া ছড়া বলিয়া ইহা পরিবেষণ করা হয়। ব্রতিনীরাই একজন নট এবং একজন নটীর অংশে অভিনয় করে এবং সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিয়া থাকে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মাঘমণ্ডল ব্রতের অনুষ্ঠানটি আনুপূর্বিক একটি নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান। যে বয়সের কুমারী মেয়েরা মাঘমণ্ডল সূর্যব্রত করিয়া থাকে, সেই বয়সে নৃত্য সম্পর্ক তাহাদের মধ্যে কোন সঙ্কোচের জন্ম হয় না; সুতরাং সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে তাহারা এই লোক-নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। অনেকে একত্র হইয়া এই ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া থাকে বলিয়া ইহা একক নৃত্য না হইয়া সারি নৃত্যের রূপ লাভ করে। ব্রতনৃত্য মাত্রই সারি নৃত্য, ইহাতে একক নৃত্যের স্থান নাই। কারণ, ব্রত পারিবারিক অনুষ্ঠান, একক অনুষ্ঠান নহে। যৌথ পরিবারভুক্ত সকল কুমারী মেয়েই ইহাতে যোগদান করিয়া থাকে; যাহাদের ব্রত পূর্বেই উদ্‌যাপিত হইয়া গিয়াছে, তাহারাও ব্রতকারিণীদিগকে সাহায্য করিবার সূত্রে নৃত্যে যোগদান করে। কিন্তু ক্রমাগত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবের ফলে কেবল নৃত্যই নহে, তাহার সঙ্গে ব্রতও লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

পশ্চিম বাংলা বিশেষত বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলের ভাদুব্রতের সঙ্গেও নৃত্য যুক্ত আছে। ইহা প্রধানত গীতি-উৎসব, এই গীতির সঙ্গে নৃত্যও পূর্বে সর্বদাই যুক্ত ছিল; কিন্তু কালক্রমে গ্রামাঞ্চলে স্ত্রীশিক্ষার প্রভাববশত উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে নৃত্যাংশ বর্জিত হইয়া কেবলমাত্র সঙ্গীতাংশের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কিন্তু ভাদুব্রত প্রকৃতপক্ষে সূর্যব্রত নহে। ভাদ্র মাসের ভরা বর্ষা প্রকৃতির নামই ভাদু। বাংলার লৌকিক ব্রত-পার্বণের প্রধানত দুইটি লক্ষ্য; প্রথমত যেমন সূর্য, দ্বিতীয়ত তেমনই ধরিত্রী। অধিকাংশ আদিম উৎসবের মধ্যেই সূর্যের সঙ্গে ধরিত্রীর বিবাহের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, বাংলার গাজন উৎসবও তাহাই। ভাদু বর্ষার ভরা প্রকৃতির রূপ,

এই সূত্রেই তিনি ধরিত্রীর প্রতীক্। ধরিত্রীর ব্রতে কুমারী এবং বিবাহিতা নারীরা উভয়েই সমান অংশ গ্রহণ করিতে পারে, স্বামী লাভের জন্য কুমারী মেয়েরা এবং সন্তান লাভের জন্য বিবাহিতা মেয়েরা ভাদুরূপিণী ধরিত্রীর পূজা করিয়া থাকে। তাহারই প্রসন্নতা সম্পাদনের জন্য নৃত্যেরও আবশ্যক হয়।

বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী ভাদুব্রতের নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্যে ছোট-নাগপুর মালভূমির আদিম জাতির নৃত্য সংস্কারের যে প্রভাব অনুভব করা যায়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভাদুব্রতের সমসাময়িক কালে ছোট-নাগপুরের আদিম জাতির মধ্যে নৃত্যগীত মুখর যে বর্ষা-উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে, তাহা 'করম পরব' বলিয়া পরিচিত। ছোটনাগপুর হইতে আরম্ভ করিয়া গুজরাটের ভীলজাতি অধ্যুষিত আদিম সমাজ পর্যন্ত এই বর্ষা-উৎসবে উন্মত্ত হইয়া উঠে। নৃত্য এই উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ। পশ্চিম বাংলার সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসিগণ স্বভাবতই এই উৎসবে সাড়া না দিয়া পারে না। কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রভাব বশত তাহারা ইহার যে একটি হিন্দুরূপ দিয়াছে, তাহাই ভাদুব্রত বলিয়া পরিচিত। তাহা সত্ত্বেও কোন পুরাণ কিংবা স্মৃতিশাস্ত্রে ইহার কোন বিধি লিপিবদ্ধ হয় নাই। যদি তাহা হইত, তবে তাহার ভিতর হইতে বাঙ্গালী কুমারী হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের ভাবটুকু লুপ্ত হইয়া যাইত।

কিন্তু উক্ত অঞ্চলের ভাদুব্রতের অনুষ্ঠানে হিন্দুপ্রভাব স্পষ্টতর হইলেও আদিবাসী অধ্যুষিত ছোটনাগপুরের যতই নিকটবর্তী হওয়া যায়, ততই সেই অঞ্চলের ব্রতানুষ্ঠানে আদিম সমাজের প্রভাব প্রবলতর ভাবে অনুভূত হয়। তাহাতেই ব্রতের সঙ্গে নৃত্যের সম্পর্কটিও স্পষ্টতর হইয়া উঠিবার সুযোগ পায়। এই সম্পর্কে পুরুলিয়া জিলার জাওয়া ব্রত এবং তাহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নৃত্যগীতের কথা উল্লেখ করিতে হয়। ইহাও ভাদুব্রতের মতই ধরিত্রীর ব্রত, তবে ধরিত্রীর রূপটি ইহাতে আরও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবার সুযোগ পায়। ভদ্রগৃহের কুমারী মেয়েরাই এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং ব্রতের সঙ্গে যে নৃত্য-সম্বলিত গীতের অনুষ্ঠান হয়, তাহাতেও তাহারা নিঃসঙ্কোচে অংশ গ্রহণ করে। জীবন্ত বা জীয়াইয়া রাখা অর্থেই জাওয়া শব্দটি ব্যবহৃত হয় বলিয়া মনে হয়। ইহাও বর্ষাকালীন ভাদুব্রতের মত ভাদ্রমাসেরই একটি অনুষ্ঠান। জিতাষ্টমী উপলক্ষে ইহা উদ্‌যাপন করা হইয়া থাকে। ইহার নিম্নলিখিত আচার হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহা শস্যোৎসব, ধরিত্রীর শস্যসম্পদ বৃদ্ধির কামনা

করিয়াই এই উৎসব পালন করা হয়। একটি ডালা বালি দিয়া পূর্ণ করিয়া ইহাতে বিভিন্ন শস্যবীজ বপন করা হয়। তারপর সেই বালিতে প্রতিদিন জল দিয়া শস্যবীজকে অঙ্কুরিত করিতে হয়। সেই ডালি কুমারী মেয়েরা মাথায় লইয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়। অন্তঃপুরে পৌঁছিয়া মাথা হইতে শস্যপূর্ণ ডালিটি নামাইয়া রাখিয়া তাহা ঘিরিয়া সকলে নৃত্য করে ও গীত গায়। এই গীতের মধ্যে কোন মন্ত্রতন্ত্র কিংবা ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার কথা থাকে না; সাধারণ ঘর-সংসারের সুখদুঃখের কথাই শুনিতে পাওয়া যায়। যেমন সম্প্রতি পুরুলিয়া হইতে সংগৃহীত এই জাওয়া গীতের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়—

১

একদিনকার হলুদ বাটা তিন দিনকার বাসি লো।
মা বাপকে বলে দিবি বড় সুখে আছি লো॥

২

বনে ফুটে বনকিয়ারী বনে বনে আলা রে।
বিটিছেলার মিছাই জনম পরের ঘর আলা রে॥

শস্যপূর্ণ ডালাটি ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্যের তালে তালে সঙ্গীত চলিতে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে ঢাক বাজিতে থাকে। এই ভাবে প্রত্যেক বাড়ীর আঙ্গিনায় ডালাটি নামাইয়া নৃত্য ও সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয়।

বর্ধমান জিলার ভাঁজোব্রতের নৃত্যের কথা পূর্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি; তাহাও জাওয়া ব্রতের আর একটি রূপ মাত্র। জাওয়া নৃত্যে ডালা ভরা যে বালির কথা উল্লেখ করিলাম, সেই বালি ভাঁজো-নৃত্যেও প্রয়োজন হয়; আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রামের মেয়েরা যখন একটি পূর্বনির্দিষ্ট স্থান হইতে বালি আনিতে যায়, তখন একদল যুবক তাহাদিগকে সেই বালি লইতে 'বাধা' দেয়। ব্রতিনীরা প্রতিরোধ করে এবং পরস্পর সম্মুখীন সারিবদ্ধ যুবক ও যুবতীদিগের একটি কপট সংগ্রাম (mock fight) চলে। সারি-নৃত্যের মধ্য দিয়া এই যুদ্ধের ভাবটি প্রকাশ পায়। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতও যুক্ত থাকে। সঙ্গীতের বিষয় যুদ্ধ নিঃসম্পর্কিত, নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং গার্হস্থ্য জীবন বিষয়ক—পূর্বোক্ত জাওয়া নৃত্যের সঙ্গীতের সঙ্গে ইহাদের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। যেমন—

১

ভাঁজোর শোলেক বল্‌ব কি, ভাই, জোয়ায় নাক কথা।
কাল গিয়েছে জরের পালা আজ ধরেছে মাথা॥

২

শুষনীর শাক তুলতে গেলাম শাকে ধরেছে পোকা।
থেঁকশেয়ালীর থেঁক শুনে, ভাই, ফেলে এলাম টোকা॥

ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে ব্রতিনীদিগের নৃত্য চলিতে থাকে; এক একবার ঢাকের বাদ্য থামিলে সঙ্গীতের এক একটি কলি শুনিতে পাওয়া যায়।

যে সকল ব্রতের সঙ্গে ছড়া ও গীতির সম্পর্ক আছে, কেবলমাত্র তাহাদের মধ্যেই নৃত্যের সম্পর্ক আছে, তাহা ছাড়া যেখানে ছড়া কিংবা গীত নাই, কেবলমাত্র ব্রতকথা আছে, সেখানে নৃত্যের কোন অবকাশ নাই। সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন, যে সকল ব্রতের সঙ্গে শস্যোৎপাদনের সম্পর্ক আছে, কেবলমাত্র তাহাদের সঙ্গেই নৃত্যের সম্পর্ক আছে; কারণ, নৃত্য উৎপাদিকা শক্তিরই (power of procreation) উদ্বোধক বলিয়া বিবেচিত হয়। বাংলার ব্রতনৃত্যগুলি বিশ্লেষণ করিলেও এ কথাই প্রমাণিত হয়।

ভাদু নাচ

পশ্চিম বাংলায় বিশেষত পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জিলায় ভাদ্র মাসের কুমারী কন্যাদিগের মধ্যে ভাদু নামে যে গীতি-উৎসব প্রচলিত আছে, তাহাতে কোন কোন অঞ্চলে কুমারীদিগের মধ্যে নৃত্যও প্রচলিত আছে, তাহাই ভাদু নাচ। উচ্চতর সমাজে কেবলমাত্র কুমারীদিগের মধ্যেই এই নৃত্য প্রচলিত থাকিলেও সাধারণ নিম্ন সমাজে বিশেষত বাউরীদিগের মধ্যে ইহাতে স্ত্রীপুরুষের মিলিত নৃত্যও দেখা যায়। এই মিলিত নৃত্য অনেকটা খেম্‌টা নৃত্যের অনুকরণেই অনুষ্ঠিত হয়, অঙ্গভঙ্গির মধ্যে অনেক সময় শ্লীলতার মাত্রা অতিক্রম করিয়া যায়। অনেক সময় ব্যবসায়ী নর্তকী বা খেম্‌টিরা তাহাদের 'রসিক' দিগের সঙ্গে এই নৃত্যে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

ভাঁজো নৃত্য

বীরভুম জিলার এক শ্রেণীর কৃষিনৃত্যের নাম ভাঁজো নৃত্য। ইহা ভাদ্র মাসেই প্রধানত অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে একদল যুবক ও একদল যুবতী সারিবদ্ধ ভাবে পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়ায়, তারপর এক একটি দল এক একবার করিয়া সম্মুখের দিকে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া

অন্য দলকে 'আক্রমণ' করে। 'আক্রান্ত' দল নৃত্য করিতে করিতে পশ্চাদপসরণ করে এবং পুনরায় সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া 'আক্রমণকারী' দলকে 'আক্রমণ' করে। ভাঁজোর বালি আনয়ন উপলক্ষে বালির স্তূপ 'অধিকার' লইয়া এই কপট যুদ্ধ (mock fight) অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কপট যুদ্ধই অনেক সময় নৃত্যের রূপ লাভ করে। এখানেও তাহাই হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ভুয়াঙ নাচ

পুরুলিয়া জিলার মাহাতো এবং অন্যান্য উপজাতি ও অর্ধ উপজাতির মধ্যে এক শ্রেণীর নৃত্য প্রচলিত আছে, তাহা ভুয়াঙ্‌ নাচ নামে প্রচলিত। ইহা পুরুষেরই নাচ। ইহা প্রধানত দো-ভাষী (বাংলা ও মুণ্ডাভাষী) সাঁওতাল জাতির মধ্যে প্রচলিত। ইহাকে পুরুলিয়া জিলার আদিবাসীদিগের শিকার নৃত্যও বলা যায়। ইহা সমবেত শিকার-নৃত্য, একক নৃত্য নহে। ইহার ভুয়াঙ নাম হইবার একমাত্র কারণ, হাতে ধনু লইয়া ধনুর ছিলায় গায়ের জোরে এক একবার টান দিয়া 'ভুয়াঙ ভুয়াঙ' শব্দ করিয়া এই নৃত্য করিতে হয়, সেই জন্য ইহার নাম ভুয়াঙ-নৃত্য। ইহা মাঝি নাচ, কিংবা সাঁওতাল নাচের মত সম্প্রদায়গত নাম নহে, সুতরাং ইহা কোন সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে হয় না।

মাছধরা নাচ

মালদহের গম্ভীরা উৎসবে যে মুখোস নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়, তাহাদের মধ্যে একটি বিষয় মাছ ধরার নাচ। পলো বা মাছ ধরিবার সরঞ্জাম লইয়া জলের মধ্য হইতে সতর্কতার সঙ্গে মৎস্য শিকারের মধ্যে লোকনৃত্যশিল্পী একটি তাল খুঁজিয়া পাইয়াছে, মৎস্য ধরা নাচে সেই তালটির রূপ দেওয়া হয়। তবে ইহাতে মুখোসের ব্যবহার হয় না। সেই জন্যই অন্যান্য মুখোস নৃত্যের তুলনায় ইহা অধিকতর জীবন্ত।

মাদার নৃত্য

পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজে প্রচলিত এক শ্রেণীর নৃত্যের নাম মাদার নৃত্য। ইহার সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য।

'বাঙ্গালী মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে দুইটি সরল বাঁশ লইয়া যে নাচ দেখানো হয়, তাহাই পল্লী বাংলায় মাদার নাচ নামে খ্যাত। ঢোল ও কাঁসি সহযোগে

মুসলমান সম্প্রদায়ের দুইজন দুইটি সরল সম্পূর্ণ বাঁশ লইয়া পল্লীতে নৃত্য করিয়া বেড়ায়। কখনও চিবুকের উপর, কখনও কপালের উপর, হাতের তালুর উপর, বুকের উপর, কখনও কখনও এক একটি আঙুলের প্রান্ত সীমার উপর লইয়া, কখনও শুইয়া, কখনও দাঁড়াইয়া 'ব্যালেন্স' রাখিয়া একজন নৃত্য করে। বাঁশ দুইটির শেষ প্রান্তে রঙিন বস্ত্রখণ্ড পতাকার মত জড়াইয়া দেওয়া হয়। শুধু মুসলমান পল্লীতে নহে, হিন্দু পল্লীতেও এই যাদার নাচ দেখান হইয়া থাকে।'

মুখোস নৃত্য

সুর এবং তালের সহযোগে সমগ্র দেহের ভিতর দিয়া বিশেষ একটি ভাবের অভিব্যক্তিই নৃত্য। উচ্চাঙ্গের শিল্পী সমগ্র দেহটির ভিতর দিয়া তাহার উদ্দিষ্ট ভাবটি ফুটাইয়া তুলিয়া থাকেন, এই কার্যে তাহার পদযুগল যেমন সাহায্য করে, দুইখানি হাতও তেমনই সাহায্য করে; তারপর দুইখানি চক্ষু এবং সমগ্র মুখাবয়ব পদ ও হস্ত সঞ্চালনের সঙ্গে সমভাবে সহায়ক হইয়া থাকে। মানবদেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মিলিয়া একটি সামগ্রিক আবেদন সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রত্যেক সমাজেই লোক-নৃত্যের ক্ষেত্রেই মুখোস পরিয়া নৃত্য করিবারও একটি ধারা প্রচলিত আছে। ইহাতে নৃত্যকারীর মুখাবয়ব তাহার পরিহিত বিশেষ একটি মুখোস (mask) দ্বারা আবৃত থাকে এবং এই ভাবেই নৃত্যকার্য চলিয়া থাকে। ইহার একটি প্রধান ত্রুটি এই যে, একটি মাত্র ভঙ্গি বা ভাব মুখোসের আকৃতিতে স্থির (rigid) লইয়া থাকে—নৃত্যকালীন ইহার কোন পরিবর্তন সম্ভব হয় না। কেবলমাত্র হস্ত ও পদ সঞ্চালনের দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা জীবিত মানুষেরই নৃত্য; নতুবা ইহাকে পুতুলের নৃত্য বলিয়া ভ্রম হইতে পারিত। সুতরাং মুখোস নৃত্য উচ্চাঙ্গের শিল্পসম্মত নৃত্যের মধ্যে স্থান পাইতে পারে নাই, এখনও লোক নৃত্যের স্তরেই রহিয়া গিয়াছে।

এ কথা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, লোক-নৃত্যেই হউক, কিংবা উচ্চাঙ্গ নৃত্যেই হউক, মুখোস স্থান পাইবার যোগ্য নহে; কারণ, ইহার দ্বারা নৃত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবন্ত না হইয়া উঠিয়া নিষ্প্রাণ হইয়া উঠে। সেইজন্য মুখোস-নৃত্যের ক্ষেত্রও আজ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষেরও বিভিন্ন অঞ্চলের লোক-নৃত্যের মধ্যে বিশেষত দক্ষিণ ভারতের কথাকলি নৃত্যে একদিন মুখোস ব্যবহারেরই রীতি ছিল, আজ তাহার পরিবর্তে মুখটি বিচিত্র বর্ণে

চিত্রিত করিয়া এবং সুবৃহৎ শিরোভূষণ প্রভৃতি ধারণ করিয়া মুখোসের স্থান পূর্ণ করা হইতেছে। কিন্তু ইহাতেও মুখ যে ভাবে চিত্রিত করা হইয়া থাকে, তাহার ফলে তাহার উপর ভাবের সূক্ষ্ম অভিব্যক্তিগুলি প্রকাশ পাইতে পারে না। সুতরাং মুখোস পরার সঙ্গে ইহার কোন পার্থক্য সৃষ্টি হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষের কেবল আদিবাসী এবং আদিবাসী প্রভাবিত অঞ্চল ব্যতীত অন্য অঞ্চলে মুখোস পরিয়া নৃত্য করিবার রীতি এখন প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। নিম্নশ্রেণীর সমাজে শিক্ষা বিস্তারের ফলে কুসংস্কার দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের মধ্যেও মুখোস নৃত্য আজ আর বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। মুখোস নৃত্য একমাত্র আদিবাসী অঞ্চল ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলে খুব প্রাচীনকাল হইতেই যে প্রচলিত ছিল, তাহা নহে ; কারণ, বুঝিতে পারা যায় যে, মুখোস পরিয়া নৃত্যই হউক, কিংবা পুতুল নাচই হউক, ইহাদের কোনটিই নৃত্যশিল্পের উৎকর্ষের পরিচায়ক নহে, বরং সমাজে লোকনৃত্যের যখন অধঃপতন (decadence) দেখা যায়, তখনই ইহার মধ্যে প্রকৃত নরনারীর নৃত্যের পরিবর্তে মুখোস পরিয়া নরনারীরূপ পুরুষের নৃত্য এবং নিষ্প্রাণ পুতুল নৃত্যের প্রচলন হইয়া থাকে। যেখানে নারীর অভাবে পুরুষকে নৃত্য করিতে হয় এবং নারীর নৃত্য পুরুষ অনুকরণ করিবার সূচনা করে, সেখানেই লোক-নৃত্যে মুখোস ব্যবহৃত হইতে থাকে। যে সমাজে মুখোস নৃত্যের প্রচলন আছে, সেই সমাজে সাধারণত পুরুষের সঙ্গে নারী নৃত্যে যোগদান করে না। সামাজিক কারণে নারীর যখন চিরাচরিত নৃত্য পরিত্যাগ করিতে হয়, অথচ জাতির একটি সুদৃঢ় ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করাও কঠিন বলিয়া বোধ হয়, তখনই পুরুষকে নারীর মুখোস পরিয়া লোক-নৃত্যের ধারাটি সমাজের ভিতর দিয়া অব্যাহত রাখিয়া অগ্রসর হইতে হয়। নতুবা যে লোক-সমাজে স্ত্রীপুরুষের সমান মর্যাদা রক্ষা পায়, সেই সমাজে পুরুষের পার্শ্বে প্রকৃত নারীকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার মুখোস পরিয়া পুরুষকে নৃত্য করিবার প্রয়োজন হয় না।

মুখোস নৃত্য দুই প্রকার—এক প্রকার নৃত্যকে ইংরেজিতে magic dance বলা হয়। ঐন্দ্রিজালিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিবার জন্য ওঝারা অনেক সময় মুখোস ধারণ করিয়া নৃত্য করে ; ইহার উদ্দেশ্য আনন্দ দান নহে ; কোন ঐন্দ্রজালিক পদ্ধতিতে সমাজের মঙ্গল বিধান করা। বাংলা দেশের কোন কোন অঞ্চলে গাজনের সময় সন্ন্যাসী এবং ভক্তেরা এই নৃত্য করিয়া থাকে। দার্জিলিঙের

পার্বত্য অধিবাসীদিগের মধ্যেও ইহার প্রচলন আছে। লোক-নৃত্য বলিতে যাহা বুঝায়, ইহা তাহা নহে। বাংলার লোক-নৃত্যের মধ্যে ব্যাপকভাবে যাহাতে এখন মুখোস ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার নাম ছো-নৃত্য। সং কথাটি হইতে ছো কথাটি আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহা বাংলা দেশের একটি মাত্র অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বর্তমান সময়ে পুরুলিয়া ও তাহার পশ্চিম সীমান্ত সংলগ্ন সেরাইকেলা এবং পূর্ব সীমান্ত লগ্ন ঝাড়গ্রাম মহকুমা অঞ্চলে ইহার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ববর্তী কালে বিস্তৃততর অঞ্চল ব্যাপিয়া ইহার প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়। যদিও বর্তমান কালে স্থানীয় সামন্তরাজের পৃষ্ঠপোষকতায় সেরাইকেলাই এই নৃত্যচর্চার কেন্দ্রভূমি; তথাপি পশ্চিম বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলেও ইহার প্রভাব অনুভূত হয়।

বাংলার পল্লীজীবনে যে সকল লৌকিক (popular) উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহাদের মধে চৈত্র সংক্রান্তির গাজনোৎসব সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। প্রকৃত পক্ষে ইহাকে বাংলার এক জাতীয় উৎসব বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায়। সর্বক্ষেত্রেই বাংলার সামন্ত রাজগণ দুর্গোৎসবের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই নিজেরাই দুর্গোৎসবের আয়োজন করিতেন। কিন্তু গাজনোৎসব বাংলার পল্লীসমাজের লোক-মানস হইতে উদ্ভূত এবং এখনও তাহাই হইয়া থাকে। ছো-নাচ পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের গাজনোৎসবেরই একটি অঙ্গ। পূর্বে অপরিহার্য অঙ্গ ছিল, এখন গাজনের অনুষ্ঠান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া প্রায় একটি স্বাধীন আনন্দানুষ্ঠানে (secular function) পরিণত হইয়াছে। কিন্তু স্বাধীন আনন্দানুষ্ঠানে পরিণত হইলেও ইহা একদিক দিয়া ধর্মকেন্দ্রিক। নৃত্যের ভিতর দিয়া ইহাতে যে বিষয়গুলি অভিনীত হয়, তাহা সর্বদাই হিন্দু পৌরাণিক; নিজের স্বাধীন এবং স্বেচ্ছাচারী কল্পনার ফল নহে; তবে একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বিষয়গুলি একান্ত পুরাণানুসারী নহে, পুরাণ হইতে কতকগুলি সুপরিচিত চরিত্র গ্রহণ করিয়া পুরাণেরই কতকগুলি স্থূল ঘটনা নৃত্যের ভিতর দিয়া অভিনয় করিবার সূত্রে গৃহীত হয়, নূতন নূতন বিবরণও ইহার মধ্যে গৃহীত হয়; কিন্তু পুরাণ বহির্ভূত কোন চরিত্র কিংবা তাহার আচরণ প্রধানত ইহার মধ্যে স্থান পায় না। যে সমাজে এই নৃত্য প্রচলিত আছে, অর্থাৎ যাহারা নৃত্যকারী কিংবা ইহার

দর্শক, তাহারা প্রায় প্রত্যেকেই নিরক্ষর ; সুতরাং পুরাণ সম্পর্কে তাহাদের জ্ঞান পুঁথিগত নহে, বরং লোকশ্রুতিগত ; সেইজন্য সর্বত্রই যে ইহাতে সংস্কৃত পুরাণের নির্ভুল অনুকরণই সম্ভব হয়, তাহা নহে ; কিন্তু তথাপি পৌরাণিক কাহিনীর কোথাও অমর্যাদা প্রকাশ পায় না। পুরাণের প্রধান বিষয় ভক্তি ; কাহিনী যে ভাবেই পরিবেশন করা হোক না কেন, ইহার ভিতর দিয়া ভক্তির ভাবটি বিসর্জিত হয় না। এই গুণেই ছো-নাচ আজও সমাজে আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া আছে, নতুবা ইহা যদি কেবল আনন্দ ও কৌতুকের বিষয় হইত, তাহা হইলে ইহা বহুদিন পুর্বেই লুপ্ত হইয়া যাইত।

ছো-নাচ উপলক্ষে যে মুখোসগুলি পরিয়া নৃত্য করা হয়, তাহা যাহাতে নৃত্যকারী দীর্ঘকাল মুখে রক্ষা করিয়া নৃতকালীন অত্যন্ত ক্ষিপ্র অঙ্গ সঞ্চালন করিতে পারে, তাহার জন্য ইহাদিগকে নিতান্ত হাল্কা করিয়া নির্মিত হয়। বর্তমান কালে কাগজের মণ্ডা ছাঁচে ঢালাই করিয়া ইহারা নির্মিত হয়, তাহার উপর তুলি দিয়া রং করা হয়। ইহারা ওজনে অত্যন্ত হাল্কা এবং দীর্ঘকাল মুখে ধারণ করিয়াও নৃত্যকারী কোন অসুবিধা অনুভব করে না। পুর্বে লাউয়ের শুক্‌না খোলের (gourd) উপর নরনারীর মুখ চিত্রিত করিয়া দিবার রীতি ছিল, কিন্তু কাগজের মণ্ডা ইহা অপেক্ষা হালকা এবং এই কার্যে বিশেষ সহায়ক ; সুতরাং বর্তমানে এই প্রণালীই ছো নাচের মুখোস নির্মাণে সর্বত্র গৃহীত হইয়া থাকে।

এই ভাবে শিব, দুর্গা, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, রাম, লক্ষ্মণ, গুহক চণ্ডাল, পরশুরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, রাধা, সখীগণ ইত্যাদির বিভিন্ন মুখোস নির্মাণ করা হয়। পুরুলিয়া জিলার পশ্চিম ও দক্ষিণাংশে প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ছো-নাচের দল আছে। ইহারা সমগ্র চৈত্র, বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ মাস গ্রামে গ্রামান্তরে নৃত্য দেখাইয়া বেড়ায়। মালদহের গম্ভীরা নৃত্যে কাঠের মুখোস ব্যবহৃত হয়। ইহারা ওজনে অত্যন্ত ভারী। জলপাইগুলি জেলার বিভিন্ন পল্লী অঞ্চলেও কাঠের মুখোস পরিয়া অভিনয় করিবার রীতি প্রচলিত আছে। তাহাতে নানা লৌকিক বিষয়েরও অভিনয় হয় ; তাহা 'মুখা খেইল' নামে পরিচিত। দার্জিলিঙ্‌ জিলার খড়িবাড়ী, নক্সালবাড়ী অঞ্চলে রাভান নৃত্য ও রাজধারী নৃত্য নামে মুখোস নৃত্যের প্রচলন আছে। তাহাতে কোন কোন চরিত্র মুখোস পরিধান করে, অধিকাংশ চরিত্রই করে না। রামায়ণের রাম বনবাসের বৃত্তান্ত

হইতে আরম্ভ করিয়া রাবণবধ কাহিনী দুই রাত্রে এই মুখোস নৃত্যের মধ্য দিয়া অভিনীত হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, লোক-নৃত্যের অধঃপতিত কিংবা বিলীয়মান (decaying) যুগেই মুখোস নৃত্যের উদ্ভব হয়। কারণ, যখন সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে নৃত্যে নারীর অধিকার লুপ্ত হইল, অথচ নৃত্যের প্রেরণা সমাজ হইতে লুপ্ত হইল না এবং নারীর স্থান পুরুষ পূর্ণ করিতে আসিল, তখনই তাহাকে নারীর মুখোস পরিতে হইল। দেহে নারীর আবরণ ও আভরণ ধারণ করা পুরুষ নৃত্যাভিনেতার পক্ষে অসম্ভব এবং অশোভন কিছুই নহে, কিন্তু পুরুষের 'মুখ' লইয়া নারীর অভিনয় করা চলে না, গোঁফ দাড়ি তাহার প্রধান বাধা। সহরে লোক যত সহজে স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় করিবার জন্য গোঁফ দাড়ি বিসর্জন দিতে পারে, গ্রাম্য লোক তাহা তত সহজে পারে না। বিশেষত পুরুষের গোঁফ-দাড়ি গ্রাম্য জীবনের ধর্মীয় আচার পালনের সহায়ক হইয়া থাকে; সেই জন্য নারীর মুখোস পরিয়া পুরুষ তহোর গোঁফ-দাড়ি আচ্ছন্ন করিয়া লইয়া নৃত্যে নারীর অভিনয় করিয়া থাকে। যাত্রাগানে আমরা গোঁফ দাড়ি চাঁচাছোলা অবস্থায় পুরুষকে যেমন স্ত্রীর অভিনয়ে অবতীর্ণ হইতে দেখি, ছো-নাচের স্ত্রী-চরিত্রের পুরুষ অভিনেতা গোঁফ দাড়ি না চাঁচিয়া সেখানে মুখোস পরিধান করে মাত্র। সেইজন্য নারীর লাস্য-নৃত্য ছো-নাচে দেখা যায় না, নারী চরিত্রের নৃত্য হওয়া সত্ত্বেও তাণ্ডবই তাহার মধ্য দিয়া প্রধানত প্রকাশ পায়। সুতরাং পুরুষের নৃত্য দ্বারা ছো-নাচ যতখানি প্রভাবিত হইয়াছে, নারীর নৃত্য দ্বারা ততখানি প্রভাবিত হইতে পারে নাই। অধিকাংশ মুখোস নৃত্যই এই প্রকার।

মেচেনী নাচ

উত্তর বাংলার মেচ সম্প্রদায়ের মেয়েরা বৈশাখ মাসে তিস্তা নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া কল্পিত তিস্তা বুড়ীর পূজা করিয়া থাকে। এই উপলক্ষে তাহারা দল বাঁধিয়া তিস্তাবুড়ীর প্রতীককে একটি ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসনে স্থাপন করিয়া মাথায় করিয়া বাড়ী বাড়ী লইয়া যায়। বাড়ীর আঙ্গিনায় আসনটিকে নামাইয়া রাখিয়া ইহা ঘিরিয়া তাহারা নৃত্যগীত করে। নৃত্যের সময় জল দিয়া মাটি ভিজাইয়া পিছল করিয়া লয়। ইহা সাঙ্কেতিক; মাটি জলে ভিজাইয়া মনে

করা হয়। ইহাতে তিস্তা নদীর অধিষ্ঠান হইয়াছে, তাহার উপর সতর্কভাবে তাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করে। নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে তিস্তানদীর মাহাত্ম্য-সূচক সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়। নৃত্যকালে তিস্তানদীর প্রতীক কাষ্ঠাসনটিকে একটি ছাতা দিয়া আবৃত করিয়া রাখে। রৌদ্র নদীজলকে শুষ্ক করিয়া তাহাকে পীড়িত করে, এই বিশ্বাস হইতেই তাহাকে ছায়া করিয়া রাখা হয়। ইহা উত্তরবঙ্গে মেচেনী নৃত্য বলিয়া পরিচিত।

মেয়েলী নৃত্য

একথা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, নৃত্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীর স্থানই অধিক ; কিন্তু সকল সময় সকল জাতির পক্ষেই একথা সত্য নহে। হিন্দুর উচ্চতর সংস্কারেও নৃত্যের অধিষ্ঠাতা যিনি দেবতা, তিনি নারী নহেন, তিনি পুরুষ। তিনি নটরাজ শিব, তিনিই দক্ষিণ ভারতের সংস্কারে রঙ্গনাথম্। পুরুষের তাণ্ডব নৃত্যের স্থান নারীর লাস্য নৃত্যের নিম্নে নহে। কোন কোন আদিবাসী সমাজের মধ্যে পুরুষই নৃত্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। প্রত্যেক জাতিরই সামাজিক জীবনের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই এই বিষয়ক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। তবে প্রধানত দেখা যায়, মৃগয়াজীবী যুদ্ধ-বিগ্রহশীল যাযাবর জাতির মধ্যে পুরুষই নৃত্যে প্রাধান্য লাভ করে ; কিন্তু কৃষিভিত্তিক সমাজের মধ্যে নৃত্যে নারীরই প্রাধান্য প্রকাশ পায়। আসামের এবং হিমালয় অঞ্চলের ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ বা কিরাত জাতি সমূহের মধ্যে পুরুষই নৃত্যে প্রাধান্য লাভ করে। নাগা, মিশমি, আবর ইত্যাদি জাতির যুদ্ধনৃত্য ইহাদের প্রত্যেকের জাতীয় সংস্কৃতির মধ্যে প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু নাগা জাতিরই অন্যতম যে শাখা মণিপুরী নাম গ্রহণ করিয়া দেশের সমতল অঞ্চলে বসবাস করিয়া কৃষিকার্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষ নারীই নৃত্যে প্রাধান্য লাভ করে। পুর্বোক্ত জাতিদিগের মধ্যে সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে নারী নৃত্যে অংশ গ্রহণ করিলেও তাহাকে সক্রিয় অংশ বলা যায় না ; কিন্তু মণিপুরী জাতির মধ্যে নারীর স্থান এই ক্ষেত্রে কেবলমাত্র যে প্রধান, তাহাই নহে, প্রকৃত পক্ষে নারীই এই বিষয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। মধ্যভারত এবং উড়িষ্যার নৃত্যগীতকুশল গদবা, মুরিয়া ও মারিয়া নামক আদিবাসীর মধ্যেও নারীই নৃত্যে প্রাধান্য লাভ

করিয়া থাকে। ইহারও কারণ, ইহারা সমতল ভূমির অধিবাসী এবং কৃষিজীবী। কিন্তু মধ্য ভারতেরই পার্বত্য অঞ্চলে যে আদিবাসী বাস করিয়া থাকে, তাহারা ভৌগোলিক দিক দিয়া একই অঞ্চলের অধিবাসী হইলেও কেবলমাত্র জীবনাচরণের পার্থক্য হেতু তাহাদের সাংস্কৃতিক জীবনেও পার্থক্য সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছে। একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। উড়িষ্যা প্রদেশের দক্ষিণ সীমান্তবর্তী কোরাপুট জিলার মুচুকুন্দ উপত্যকার সীমান্তবর্তী পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী অর্ধনগ্ন বোণ্ডা জাতির মধ্যে নারী নৃত্যে প্রায় কোন অংশই গ্রহণ করে না, একমাত্র পুরুষের অংশই সেখানে সক্রিয়। কিন্তু সেই পর্বতেরই পাদমূলে অবস্থিত গ্রামগুলিতে গদ্‌বা নামক যে এক জাতি বাস করে, তাহাদের নারী নৃত্যকুশলতার জন্য ভারত-বিখ্যাত। কেবলমাত্র জীবনাচরণের পার্থক্যই ইহাদের সংস্কৃতি বিষয়ে এই পার্থক্যের কারণ। বোণ্ডা জাতি প্রায় চারি হাজার ফুট উচ্চ পর্বত শিখরে বাস করিয়া প্রাত্যহিক জীবনে সুকঠিন সংগ্রামে লিপ্ত; কিন্তু সমতল ভূমির অধিবাসী গদ্‌বা জাতি কৃষিকার্যে লিপ্ত থাকিবার ফলে জীবন-সংগ্রাম অনেক পরিমাণে সহজ করিয়া লইয়াছে। সেই জন্যই সেখানে নারীর জীবনে স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তা যেমন আছে, অবকাশ এবং অবসরও সেই পরিমাণেই রহিয়াছে। বোণ্ডা জাতির নারী-সমাজের তাহা নাই। সামাজিক কিংবা পারিবারিক জীবনের প্রাত্যহিক কর্মে যেখানে পুরুষ প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে, সেখানে নৃত্যেও পুরুষেরই অধিকার এবং যেখানে নারী সেই প্রাধান্য গ্রহণ করিয়া থাকে, সেখানে সেই কার্যেও নারীরই অধিকার। সুতরাং নারীর আকৃতি এবং প্রকৃতি যে নৃত্যের পক্ষে কোথাও অপরিহার্য মনে করা হইয়া থাকে, তাহা নহে। নৃত্য জাতির একটি সংস্কার, জীবনাচরণের সঙ্গে এই সংস্কারের সম্পর্ক। এমন কি, এই সংস্কার যে সর্বদাই রস-সংস্কার, তাহাও নহে; অনেক সময় ইহা ধর্মীয় সংস্কার, ইহার সঙ্গে আদিম ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ারও সম্পর্ক আছে; সুতরাং ইহা সমাজের কেবলমাত্র একটি অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবার কথা নহে।

বাংলা দেশের সমাজ কৃষি-ভিত্তিক; সেই সূত্রেই ইহার মধ্যে নৃত্যে নারীই প্রধান অংশ গ্রহণ করিবে, ইহাই স্বাভাবিক; প্রকৃত পক্ষে ইহার কিছু মাত্র ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায় না। তথাপি বাংলার প্রাচীন সাহিত্যে নৃত্যের যে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ইহার মধ্যে পুরুষেরও যে

একটি প্রধান অংশ আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তাহা লোক-নৃত্যের ক্ষেত্রে নহে, প্রাচীন পদ্ধতির (classical) নৃত্যের ক্ষেত্রেই প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ, মনসা-মঙ্গলে বেহুলার নৃত্যগুণের কথা ব্যাপক-ভাবে উল্লেখিত থাকিলেও শিবনৃত্যের বর্ণনাও রহিয়াছে। 'বৌদ্ধগান ও দোহা'র মধ্যে যেমন ডোম্‌নীর নৃত্য করিবার উল্লেখ আছে, যথা—

একসো পদমা চৌষঠ্‌ঠি পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী ॥

অর্থাৎ এক সেই পদ্ম, তাহার চৌষট্টি পাপড়ি, তাহাতে আরোহণ করিয়া ডোম্বী বা ডোম্‌নী নৃত্য করে, আবার তেমনি বাজিল বা বজ্রাচার্যপাদের নৃত্য করিবারও উল্লেখ দেখা যায়, যেমন—

নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।
বুদ্ধ নাটক বি সমা হোই ॥

অর্থাৎ বাজিল বা বজ্রাচার্যপাদ নৃত্যে করেন, দেবী গীত গাহেন, বুদ্ধ নাটক সমাপ্ত হইল।

নাথ-সাহিত্যের মধ্যেও দেখা যায়, গোরক্ষনাথ মীননাথকে উদ্ধার করিতে আসিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন ; কিন্তু সেখানে তিনি নর্তকীর বেশ ধারণ করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, পুরুষ বেশে নৃত্য করেন নাই।

নাচন্তি যে গোর্খনাথ ঘাগরের রোলে।
কায়া সাধ কায়া সাধ মাদলে হেন বোলে ॥

মঙ্গলকাব্যে যে স্বর্গভ্রষ্ট নায়ক-নায়িকা চরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে একজন স্বর্গের নর্তক, একজন নর্তকী ; সুতরাং পুরুষ ও নারী এখানে সমান অংশ গ্রহণ করিয়াছে। একটু গভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায়, মনসা-মঙ্গল কাব্যের মধ্যে যে সকল প্রাচীন পদ্ধতির শিবনৃত্যের বর্ণনা আছে, তাহাও শিবের একক নৃত্যের বর্ণনা নহে, বরং সর্বত্রই যুগ্ম নৃত্যের বর্ণনা, অর্থাৎ শিব-পার্বতী, শিব-মনসা ইঁহাদের যুগ্ম নৃত্য ; তথাপি ইঁহাদের মধ্যে শিবের অংশই যে প্রধান, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কিন্তু বাংলা দেশের প্রাচীন পদ্ধতির নৃত্য-প্রসঙ্গ বাদ দিলে লোক-সমাজে যে নৃত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে নারীরই যে প্রাধান্য ছিল, তাহা

বুঝিতে পারা যায়। বাংলায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত ব্রতনৃত্যের (ritual dance) মধ্যে নারীরই প্রধান স্থান। ব্রতনৃত্যের মধ্যে কেবলমাত্র গাজনের নৃত্যে পুরুষ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। ঐন্দ্রজালিক (magic) নৃত্যের মধ্যে প্রধানত পুরুষের স্থান; কিন্তু ইহাদের প্রয়োগ বর্তমানে এত হ্রাস পইয়া গিয়াছে যে, তাহা আর উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত যে সকল নৃত্য যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, যেমন বীরভূম জেলার ঢালী, রায়বেঁশে কিংবা পশ্চিম বাংলার সীমান্তবর্তী অন্যান্য অঞ্চলের পাইক নৃত্য, কাঠিনৃত্য ইহাদের প্রত্যেকটিই পুরুষের নৃত্য। একথা নিতান্তই স্বাভাবিক, যুদ্ধনৃত্য মাত্রই পুরুষেরই নৃত্য; কোন ভাবেই ইহাদের মধ্যে নারী অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। আসামের ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ জাতির মধ্যে সামাজিক জীবনের অন্যান্য আচরণে নারী প্রাধান্য লাভ করিলেও যুদ্ধনৃত্যে তাহার প্রবেশাধিকার নাই। এমন কি, নরমুণ্ড-শিকারী (head-hunter) নাগা জাতির মধ্যে নারী জাতিও নরমুণ্ডশিকারে অংশ গ্রহণ করা সত্ত্বেও যুদ্ধনৃত্যে কোনদিক দিয়াই তাহারা অংশ গ্রহণ করে না। পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত রাঢ় অঞ্চলের জাতীয় সাহিত্য ধর্মমঙ্গল কাব্যেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই অঞ্চলের সকল শ্রেণীর নারীই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিত; কিন্তু যুদ্ধ সম্পর্কিত নৃত্য বিষয়ে তাহাদের কিছুমাত্র অধিকার ছিল বলিয়া মনে হয় না। তবে পশ্চিম বাংলার একটি নৃত্যের মধ্যে নারী কোনদিন যুদ্ধনৃত্যে অংশ গ্রহণ করিত বলিয়া ক্ষীণতম একটু আভাস পাওয়া যায়। কারণ, একথা সত্য, যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে পারিলে যুদ্ধনৃত্যে অংশ গ্রহণ করিবার পক্ষে কোন বাধা থাকিতে পারে না। সেইজন্য মনে হইতে পারে যে সম্ভবত রাঢ় অঞ্চলের নারীর একদিন যুদ্ধনৃত্যেও অংশ গ্রহণ করা অসম্ভব ছিল না।

বীরভূম অঞ্চলে প্রচলিত ভাঁজো নৃত্য তাহার একটি নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইতে পারে। অনেক নৃত্য এবং ক্রীড়া (game) যে প্রাচীনতর সমাজ-জীবন হইতে আগত যুদ্ধকার্যের অবশেষ (remnant), তাহা অনেকেই মনে করিয়া থাকেন। ভাঁজো নৃত্যের মধ্যেও তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে একদল যুবক ও একদল যুবতী সারিবদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়ায়, তারপর এক একটি দল এক একবার করিয়া সম্মুখের দিকে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া অন্য দলকে 'আক্রমণ' করে। আক্রান্ত দল নৃত্য করিতে করিতে পশ্চাদপসরণ করে এবং পুনরায় সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া

'আক্রমণকারী' দলকে 'আক্রমণ' করে। তাঁজোর বালি আনয়ন উপলক্ষে বালির স্তূপ অধিকার লইয়া এই কপট যুদ্ধ (mock fight) অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কপট যুদ্ধই অনেক সময় নৃত্যের রূপ লাভ করে, এখানেও তাহাই হয়। এই নৃত্য যদি কোন গোষ্ঠী-সংগ্রাম (community fight)-এরই অবশেষ হইয়া থাকে, তবে একথাও মনে করিতে হইবে যে, প্রাচীনকালে অন্তত রাঢ় অঞ্চলে নারীও যুদ্ধকার্যে যোগদান করিত। পূর্ব বাংলার কৃষিসঙ্গীতে শুনিতে পাওয়া যায় যে, একদিন নারী স্বহস্তে ধনুর্বাণ লইয়া সেই অঞ্চলে শস্যনাশকারী হস্তী ও ব্যাঘ্র শিকারে যোগদান করিত। সুতরাং কৃষিজীবী সমাজে নারী যুদ্ধকার্যে যোগদান করিবে, তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছু নাই। কারণ, কৃষিজীবী সমাজে গৃহের কর্ত্রী নারী ; বিশেষত সেই সমাজ মাতৃতান্ত্রিক (matriarchal) হইয়া থাকে ; সুতরাং পরিবার ও গৃহ-সম্পত্তি রক্ষা করিবার সকল দায়িত্বই নারীর উপর ন্যস্ত থাকে। সেই গৃহ-সম্পত্তির উপর বাহির হইতে যখন কোন আক্রমণ হয়, তখন সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য নারীকেই প্রথম অগ্রসর হইয়া যাইবার প্রয়োজন হয় ; সুতরাং যাযাবর সমাজে নারী যেমন পুরুষ কর্তৃক রক্ষিত হয়, কৃষিজীবী সমাজে নারীরই নারীকে রক্ষা করিবার প্রয়োজন হয়। সেইজন্য যুদ্ধকার্যও তাহার জীবন-সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং যদিও আজ প্রত্যক্ষভাবে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, যাহাতে মনে হইতে পারে যে, বাংলার সমাজেও নারী একদিন যুদ্ধনৃত্যে যোগদান করিত, তথাপি পরোক্ষ প্রমাণ দ্বারা স্বীকৃত হইতে পারে যে, ইহা একেবারে অসম্ভব ছিল না।

বর্তমানে যতদূর দেখিতে পাওয়া যায়, পশ্চিম বাংলার ঢালী, কাঠি, রায়বেঁশে, পাইক প্রভৃতি যুদ্ধনৃত্য ব্যতীত পূর্ব মৈয়মনসিংহ অঞ্চলের জারি নৃত্যে কেবল পুরুষই অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে, ইহাদের মধ্যে নারীর কোন স্থান নাই। কিন্তু পূর্ব ময়মনসিংহের জারিনৃত্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইহা মূলত নারীরই নৃত্য ছিল, কালক্রমে সেই অঞ্চলে মুসলমান ধর্ম বিস্তার লাভ করিবার পর মুসলমান সমাজে নারীর প্রকাশ্য নৃত্যের অধিকার খর্ব হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা পুরুষ কর্তৃকই গৃহীত হইয়াছে। কারণ, জারি-নৃত্যকালীন পুরুষ অনেকটা নারীর মত অভিনয় করিয়া থাকে। যেমন পায়ে নূপুর পরিয়া, কাঁধের গামছাটি হাতে লইয়া আঁচলের মত করিয়া দুলাইতে থাকে।

ইহার কাহিনী কারবালার যুদ্ধের কাহিনী ; কিন্তু যুদ্ধের কাহিনী হইলেও ইহা করুণরস-প্রধান এবং এই করুণরস স্ত্রীচরিত্রসুলভ। সুতরাং সকল দিক হইতেই মনে হইতে পারে যে, এখানে পুরুষ সামাজিক জীবনের আদর্শের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারীর একটি আচরণ গ্রহণ করিয়াছে। বাংলার লোক-নৃত্যের ইতিহাসে এই প্রকার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তুর্কী আক্রমণের পর হইতেই বাংলার বৃহত্তর সামাজিক জীবনে যে বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিয়াছিল, তাহা অনুসরণ করিয়াই বাংলার লোক-নৃত্যের ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন হইয়াছিল। নারীর অধিকার ইহার মধ্যে একদিক দিয়া সঙ্কুচিত হইল, কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষ নারীর অনুকরণ করিতে লাগিল, আবার অন্যদিক দিয়া কোন কোন অঞ্চলে ইহা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল। নৃত্য ও সঙ্গীত মুসলমান ধর্মবিরোধী আচরণ, বিশেষত তুর্কী আক্রমণের ফলে বিপর্যস্ত বাঙ্গালী সমাজের অসহায় অবস্থার মধ্যে নানা কারণেই নারীর নৃত্য আর অধিককাল স্থায়ী হইতে পারিল না। কোন কোন প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা গ্রন্থে দেখা যায়, নৃত্য এক শ্রেণীর নারীর ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছিল এবং ব্যবসায়ী নর্তকী বলিয়া একটি সম্প্রদায়ও গড়িয়া উঠিয়াছিল। নূতন সমাজব্যবস্থার সম্মুখীন হইয়া তাহাদেরও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবার উপক্রম করিল ; সমগ্র সমাজের সহানুভূতিহীন দৃষ্টির মধ্যেও তাহা যতটুকু বাঁচিয়া রহিল, তাহার মধ্য দিয়া তাহা কোন প্রকার শিল্পসম্মত উচ্চতর রূপ লাভ করিতে পারিল না, ক্রমে ক্রমে তাহা বিনাশের পথই প্রশস্ত করিয়া লইল।

যে সকল অঞ্চলে হিন্দু কিংবা মুসলমান ধর্মের প্রভাব কিংবা দীর্ঘকালব্যাপী পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব তেমন সক্রিয় হইতে পারে নাই, কেবলমাত্র সেই সকল অঞ্চলে বাংলার লোক-নৃত্যের প্রাচীনতম পরিচয় কিছু কিছু রক্ষা পাইয়াছে। অথচ হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায় দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই, এমন অঞ্চল বাংলা দেশে খুব অল্পই আছে। উত্তরবঙ্গের ইন্দো-মোঙ্গলয়েড জাতির শাখাভুক্ত কোচ এবং রাজবংশী জাতির কথা এই বিষয়ে উল্লেখ করা যায়। তাহাদের মধ্যেও স্বভাবতই দেখা যায়, নৃত্যে নারী প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, পুরুষের স্থান সেখানে নিতান্ত সঙ্কুচিত।

যুদ্ধ-নৃত্য

এ'কথা আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, বাঙ্গালী এক অসামরিক জাতি, সেইজন্ত ইহার সাংস্কৃতিক জীবনে নৃত্যগীতের যত উপকরণ আছে, যুদ্ধ-বিগ্রহের উপকরণ সেই পরিমাণে বিশেষ কিছু নাই। কিন্তু কোন জাতির আপাত কোন পরিচয় হইতে তাহার মৌলিক পরিচয়ের সন্ধান সকল সময়ই পাওয়া যায় না। ওড়িয়া জাতি যে ভারতবর্ষের মধ্যে এক কালে শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তির অধিকারী ছিল, তাহা বর্তমান উড়িষ্যার অধিবাসীদিগকে দেখিলে কেহই বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু এ'কথা ঐতিহাসিক সত্য। মধ্যযুগে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র উড়িষ্যা প্রদেশই শেষ পর্যন্ত নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ওড়িয়ার সামরিক শক্তির নিকট পাঠান মুঘলের সামরিক শক্তি বারবারই একদিন পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। তারপর ঐতিহাসিকদিগের মতে চৈতন্তদেব তখন উড়িষ্যায় গিয়া বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিলেন এবং তাহার ফলে উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা প্রতাপ রুদ্র বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সিংহাসন ত্যাগ করিলেন, সেইদিন হইতেই উড়িষ্যার সামরিক শক্তির পতন হইতে লাগিল এবং তাহার ফলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই উড়িষ্যার স্বাধীনতা বিলুপ্ত করিয়া পাঠানগণ সে দেশ অধিকার লইল। বৈষ্ণব ধর্ম ও জীবনাদর্শের প্রতি ওড়িয়াদিগের ক্রমাগত আসক্তি বৃদ্ধি পাইবার ফলে ইহার সামরিক শক্তির কোনদিন আর পুনরভ্যুত্থান সম্ভব হইল না।

আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে বৈষ্ণব ধর্ম বিস্তারের ফলে উড়িষ্যার সামরিক শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল, বাংলাদেশ সেই বৈষ্ণব ধর্মের জন্মভূমি। সুতরাং বৈষ্ণব ধর্ম ও আদর্শের প্রভাবের ফলে ইহারও সামরিক শক্তির যে অধঃপতন হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বাঙ্গালীও একদিন এক প্রবল সামরিক শক্তিসম্পন্ন জাতিই ছিল, কিন্তু মধ্যযুগে রাজনৈতিক জীবনে ইহার নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়া যে ভাবে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল, তাহার ফলে ইহার জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল; সেইজন্ত সামরিক জীবনেরও একটি সুদৃঢ় পরিচয় ইহার পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। ইহার বিলুপ্ত সামরিক শক্তির কিছু ইঙ্গিত এই জাতির লোক-সংস্কৃতি হইতে এখনও সন্ধান পাওয়া যায়—বাংলার লোক-নৃত্য এই বিষয়ে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য।

যুদ্ধ-নৃত্য আদিম জাতি মাত্রেরই একটি বিশিষ্ট সামাজিক আচরণ। আদিম সমাজ পূর্বে যখন গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপন করিত, তখন গোষ্ঠী-সংগ্রাম (Community war) ইহার একটি প্রধান আচরণ ছিল। ইহা কেন্দ্র করিয়াই ইহার মৌলিক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবন গড়িয়া উঠিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আসামের আদিম নাগাজাতির কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়। ইহারা নরমুণ্ড শিকারী (head hunter) বলিয়া পরিচিত। ইহাদের মধ্যে প্রচলিত এই আনুষ্ঠানিক নরহত্যার প্রথা দূর করিবার জন্য ইংরেজ সরকার ইহার সকল সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিয়াও ব্যর্থকাম হইয়াছিল। সেইজন্য বরং ইংরেজের সঙ্গে ইহার শত্রুতা সৃষ্টি হইয়াছিল এবং সেই শত্রুতারই সূত্র ধরিয়া আজ ইহারা স্বাধীন ভারতের সরকারের সঙ্গেও প্রথম হইতেই বিবাদের সূত্রপাত করিয়াছে। যাহা লইয়া সভ্য জাতির সঙ্গে ইহাদের শত্রুতা, সেই নরমুণ্ড শিকার (head hunting) ব্যাপারটি কি, তাহা একটু বুঝাইয়া বলি। পার্বত্য নাগাদের এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী এক একটি পাহাড়ের উচ্চ চূড়া অধিকার করিয়া তাহারই চারিপাশের ঢালু জমিতে নিজেদের বাসস্থান নির্মাণ করিয়া বাস করে এবং ঢালু পাহাড়ের গায়েই পাথর গাঁথিয়া চাষের জমি প্রস্তুত করে। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলে প্রকৃতি অত্যন্ত কৃপণা, শত চেষ্টা করিয়াও প্রয়োজন মত শস্যোৎপাদন করিতে পারে না। তাহাদের মধ্যে একটি বিশ্বাস যে-ভাবেই হোক, দৃঢ়মূল হইয়াছে যে, তাহাদের প্রতিবেশী গোষ্ঠী (Communty)-কে অতর্কিতে কোন সময় আক্রমণ করিয়া যদি তাহাদের মধ্য হইতে কয়েকটি নরমুণ্ড স্কন্ধচ্যুত করিয়া লইয়া আসিয়া তাহা ক্ষেতে পুঁতিয়া দিতে পারে, তবে তাহাদের প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইবে। কারণ, তাহাদের বিশ্বাস. মস্তিষ্কের মধ্যেই জীবনীশক্তি থাকে; সদ্যছিন্ন মুণ্ডের মধ্য দিয়া ধরিত্রীর মধ্যে তাহা সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারিলে ধরিত্রী শক্তিশালিনী হইয়া প্রচুর শস্যসম্পদ দান করিতে পারিবে; আহারের অভাব হইবে না। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া ইহারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতিবেশীকে অতর্কিতে আক্রমণ করিবার সুযোগ সন্ধান করিতে থাকে। কখন যে কাহার উপর আক্রমণ হইবে, তাহা পূর্ব হইতে কেহই বলিতে পারে না; সেজন্য সর্বদাই প্রত্যেককে যেমন একদিক দিয়া আক্রমণ করিবার সুযোগ সন্ধান করিতে হয়, তেমনই আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হয়। গ্রামের উচ্চতম অংশে মঞ্চ নির্মাণ করিয়া গ্রামবাসী প্রতিবেশীদিগের

গতিবিধি সর্বদা নিরীক্ষণ করে, আক্রমণের কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলেই পূর্ব হইতে সকলকে সতর্ক করিয়া দেয়। তারপর দুই দলের সম্মুখ সংগ্রামে উভয়েই উভয় পক্ষের ছিন্নমুণ্ড অধিকার করিবার প্রয়াস পায়। নারীও এই সংগ্রামে পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে যোগদান করে। সুতরাং নাগা সমাজকে প্রতি মুহূর্তেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। যখন যুদ্ধ হয় না, তখন যুদ্ধের মহড়া চলে। যুদ্ধের মহড়াই এই জাতির সামাজিক জীবনের একমাত্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলিয়া জাতির নৃত্যগীতে যুদ্ধের সংস্কার অতি সহজেই প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এই প্রকার গোষ্ঠী-জীবনের আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই প্রত্যেক আদিম সমাজেই যুদ্ধ-নৃত্যের প্রথম উদ্ভব হইয়াছিল।

কিন্তু একথাও সত্য যে, সকল আদিম সমাজেই যুদ্ধের প্রয়োজন সমান ছিল না। সর্বদাই পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর তাহা নির্ভর করিত। অর্থাৎ আদিম নাগা জাতির জীবনে গোষ্ঠী-সংগ্রাম যে পর্যায়ে গিয়া পৌছিয়াছিল, সমতল ভূমির অধিবাসী অধিকতর স্বচ্ছন্দ ও সহজ জীবনের অধিকারী আদিবাসীর জীবনে গোষ্ঠী-সংগ্রাম সে পর্যায়ে উঠিতে পারে নাই। ইহা কোন জাতি অপেক্ষা বিশেষ কোন জাতি যে বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বাস করে, তাহার বিশেষত্বের উপরই নির্ভর করে। সেইজন্য পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী নাগা এবং আসামের সমতল ভূমির অধিবাসী মণিপুরী ইহারা উভয়ে মূলত একই জাতির বংশধর হওয়া সত্ত্বেও গোষ্ঠী-সংগ্রাম ইহাদের মধ্যে সমান পর্যায়ে পৌছিতে পারে নাই ; সেই সূত্রে যুদ্ধ-নৃত্যের সংস্কারও ইহাদের উভয়ের মধ্যে সমান নহে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলও যে বিভিন্ন প্রকৃতির আদিবাসীর জীবনের উপকরণ দ্বারা গঠিত হইয়াছে, তাহাতেই ইহার বিভিন্ন অঞ্চলেই যুদ্ধ-নৃত্যেরও যে পরিচয় এখনও সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা অভিন্ন প্রকৃতির হইয়া উঠিতে পারে নাই।

আদিম সমাজের গোষ্ঠী-সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তায় যে যুদ্ধ-নৃত্য একদিন সমাজে রূপলাভ করিয়াছিল, তাহা পরবর্তী জীবনে সামন্ততন্ত্রের যুগে এক সম্পূর্ণ নূতন পরিচয় লাভ করিল। তখন গোষ্ঠীর আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সংগ্রাম হইত না, বরং তাহার পরিবর্তে সামন্তরাজের বেতনভুক্ সৈন্যদের মধ্যে জীবিকার উপায় রূপে যুদ্ধের বৃত্তি গৃহীত হইত। একদিন যে বৃত্তি সামগ্রিক ভাবে সমাজ-জীবনের আত্মরক্ষার জন্য সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাই পরবর্তী কালে

ব্যক্তি-জীবনের জীবিকা উপার্জনের উপায়রূপে পরিগণিত হইয়াছিল। সুতরাং একদিন ইহার মধ্যে যে শক্তির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছিল, পরবর্তী কালে তাহা ইহার মধ্য হইতে দূর হইয়া গেল। আত্মরক্ষার উপায় যখন বিলাসের উপকরণরূপে গণ্য হয়, তখন তাহার মধ্যে যে সেই শক্তি থাকিতে পারে না, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। সেইজন্য আদিম সমাজে যুদ্ধ এবং তাহার সম্পর্কিত যুদ্ধ-নৃত্যের যে স্থান, লোক-সমাজে তাহার সেই স্থান নহে। আদিম সমাজে যুদ্ধ-নৃত্য একটি সামাজিক আচার (ritual), ইহা সমগ্র সমাজেরই অবশ্য পালনীয় ধর্ম; কিন্তু লোক-সমাজে ইহা তাহা নহে, ইহাতে তাহা ব্যক্তির জীবিকা মাত্র। সুতরাং যদিও যুদ্ধ-নৃত্যের মধ্যে একটি আদিম সংস্কার প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, তথাপি লোক-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ইহা সেই রূপ এবং শক্তি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নবতর পরিচয় লাভ করিয়াছে।

মধ্যযুগের বাংলার সামন্ত রাজগণ কেবলমাত্র যে বাঙ্গালী দ্বারাই তাহাদের সৈন্যবাহিনী গঠন করিতেন, তাহা নহে—সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বাহির হইতেও অনেক যোদ্ধজাতি ভাগ্যান্বেষণে বাংলাদেশে আসিয়া সৈন্যদলভুক্ত হইত। তাহাদের পরিবার সামন্তরাজ প্রদত্ত ভুসম্পত্তি লাভ করিয়া অবশেষে বাংলাদেশেই স্থায়িভাবে বসবাস করিত। এইভাবে বহু অবাঙ্গালীয় ভারতীয় বাংলার মাটিতে মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। এইভাবে কত রাজপুত, পাঠান, হিন্দুস্থানী যে বাঙ্গালীর রক্তে মিশিয়া গিয়াছে, তাহা আজ হিসাব করিয়াও বলিতে পারা যাইবে না। বাঙ্গালীর সঙ্গে এইভাবে একাকার হইবার ফলে ইহাদের যোদ্ধচরিত্র পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে যুদ্ধের কোন সংস্কারের আর কোনও পরিচয় অবশিষ্ট নাই। তবে কোন কোন সময় বাংলার সামন্ত রাজগণ বাংলাদেশেরই কোন কোন সম্প্রদায়ের লোককে সাধারণভাবে তাঁহাদের সৈন্যদলে স্থায়িভাবে নিযুক্ত করিতেন; এক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত লোক বলিয়া তাহারা একই স্থানে বাস করিত এবং এই সূত্রেই তাহারা একটি সংহত সমাজ-জীবনও গড়িয়া তুলিবার অবকাশ পাইত। ইহারা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সামন্তরাজের পদাতিক সৈন্যের কাজ করিত বলিয়া সাধারণভাবে পাইক বা পদাতিক বলিয়া পরিচিত হইত। পাইক :পদবী দ্বারা ইহাদের বৃত্তিগত পরিচয় প্রকাশ পাইলেও ইহাদের সম্প্রদায়গত পরিচয়ও ছিল।

ইহারাই যুদ্ধকার্যের অবকাশে যে নৃত্যের অনুশীলন করিত, তাহাতেই বাংলায় যুদ্ধ-নৃত্যের কিছু নিদর্শন আজও পাওয়া যায়। এই সকল নৃত্য সম্প্রদায়গত-ভাবে গড়িয়া উঠে নাই, বরং বৃত্তিগতভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে; অর্থাৎ ডোম জাতীয় পাইক সৈন্যের নৃত্য ডোম-নৃত্য বলিয়া পরিচিত না হইয়া সাধারণভাবে পাইক-নৃত্য বা পদাতিক সৈন্যের নৃত্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। এই পাইক-সৈন্যের একটি প্রধান ভাগ পশ্চিম বাংলায় এদেশের ডোম জাতির দ্বারা গঠিত হইলেও মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে কোন কোন সময় আদিবাসী দ্বারাও গঠিত হইয়াছে। পুরুলিয়া জিলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজের রাজ্য দ্বারা বিভক্ত ছিল এবং পার্বত্য ও অরণ্য অঞ্চলের সুযোগ লাভ করিয়া ইহারা পরস্পর সর্বদাই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়া থাকিত। সেইজন্য এই অঞ্চলে স্থায়িভাবে সৈন্যদল রক্ষা করিবার দায়িত্ব সর্বাধিক ছিল। তাহার ফলে এই অঞ্চলের পাইক-নৃত্য বাংলার লোক-নৃত্যের মধ্যে একটি বিশিষ্ট পরিচয় লাভ করিয়াছে। বাঁকুড়া জিলার বিষ্ণুপুর এবং বীরভূম জিলার রাজনগরের সামন্ত রাজগণ ডোম, বাগ্‌দি এবং মাল সৈন্যদল রক্ষা করিতেন। ইহারা প্রত্যেকেই বাঙ্গালী হইলেও ইহাদের মধ্যে আদিম জীবনের সংস্কার অত্যন্ত প্রবল ছিল। বিশেষত পশ্চিম বাংলার সীমান্ত অঞ্চল রক্ষার দায়িত্ব সর্বদাই অত্যন্ত কঠিন ছিল; কারণ, এই পথেই বিভিন্ন আক্রমণকারী যেমন পাঠান, মোগল, বর্গী, আদিবাসী প্রভৃতি আসিয়া বারবার বাংলা দেশ আক্রমণ করিয়াছে। সেইজন্য এই অঞ্চলের সামন্তরাজগণ এক অতি শক্তিশালী স্থায়ী সৈন্যদল সর্বদাই রক্ষা করিতেন। সুতরাং এই অঞ্চল হইতেই বাংলার যুদ্ধ-নৃত্যের বিলীয়মান কতকগুলি নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে পাইক-নৃত্য ব্যতীতও রায়বেঁশে, ঢালী ও কাঠি-নৃত্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিম বাংলার ডোমজাতি দৈহিক শক্তি ও বীর্যের জন্য চিরদিনই খ্যাতি-লাভ করিয়া আসিয়াছে। বাংলার সুপরিচিত এই ছেলেখেলার ছড়াটির মধ্যে একটি ডোম চতুরঙ্গের বর্ণনা শুনিতে পাওয়া যায়।

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে।
ঝাঁঝ কাঁসর মৃদং বাজে॥ ইত্যাদি

ইহার অর্থ: আগডুম অর্থাৎ অগ্রবর্তী ডোমসৈন্যদল, বাগডুম অর্থাৎ বাগ বা পার্শ্বরক্ষী ডোমসৈন্যদল এবং ঘোড়াডুম অর্থাৎ অশ্বারোহী ডোমসৈন্যদল সজ্জিত

হইল। পশ্চিম বাংলার সীমান্ত রক্ষার কার্যে ডোমসৈন্যগণই সর্বাপেক্ষা সাহসিকতার পরিচয় দেখাইয়া বাঙ্গালীর ধন, মান ও প্রাণ একদিন রক্ষা করিয়াছে। সেইজন্য বাঙ্গালী তাহার কাব্যে ও ছড়ায় ইহাদের বীরত্বের কাহিনী নানাভাবে কীর্তন করিয়াছে। মধ্যযুগের ধর্মমঙ্গল কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়, কেবলমাত্র ডোম পুরুষই নহে, ডোম রমণীগণও যুদ্ধক্ষেত্রে অসীম শৌর্য-বীর্য ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়া শত্রুর কবল হইতে দেশ রক্ষা করিয়াছে। ডোম জাতির একটি সংহত সমাজ-জীবন ছিল এবং বাংলার তথাকথিত নিম্নজাতির মধ্যে ডোমজাতির একটি সুস্পষ্ট সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ছিল। একটি প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়াই যে ইহার সমাজ-জীবনের বিকাশ হইয়াছিল, তাহা 'বৌদ্ধ গান ও দোহা' পাঠ করিলেও জানিতে পারা যায়। বিশেষত এই বীরজাতির প্রধান বৃত্তিই ছিল যুদ্ধ; সুতরাং সেই সূত্রেই যুদ্ধ-নৃত্যও ইহার সাংস্কৃতিক জীবনের স্বাভাবিক অঙ্গস্বরূপ ছিল বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে ছিলও তাহাই। কিন্তু আজ যে তাহার ভিতর হইতে সেই সংস্কারের বিশেষ কিছু অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না, তাহারও কতকগুলি কারণ আছে।

দেশে ইংরেজ অধিকার স্থাপিত হইবার পর দেশের আভ্যন্তরিক শান্তি রক্ষার ভার যখন ইংরেজ সরকার নিজের হাতে গ্রহণ করিলেন, তখন সামন্তরাজ-দিগের পাইক-সৈন্যদল স্বভাবতই ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু যে এক বিপুল জনসংখ্যা দীর্ঘকাল যাবৎ অসি ধারণ করিয়া কেবলমাত্র বীর্যবত্তা ও সাহসিকতারই অনুশীলন করিয়াছে, তাহা সহসা একদিনে ভাঙ্গিয়া যাইবার পর ইহাদের নূতন অনুরূপ আর কোন বৃত্তির ব্যবস্থা হইল না; ইংরেজ সরকার ইহাদিগকে নিজেদের সৈন্যদলে গ্রহণ করিলেন না। তাহার ফলে ইহারা কর্মহীন হইয়া জীবিকার উপায় হইতে বঞ্চিত হইল। তাহারা যে-হাতে অসি ধারণ করিয়াছিল, সেই হাতে আর লাঙ্গল ধারণ করিয়া কৃষক সাজিতে পারিল না। নূতন করিয়া জীবনে কেহ কৃষক সাজিতে পারে না। সেইজন্য জীবিকার প্রয়োজনে তাহাদিগকে অসঙ্গত উপায় অবলম্বন করিতে হইল। দেশে ডাকাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। ইংরেজ সরকার মনে করিলেন, ইহারাই এই সকল কার্যের সঙ্গে লিপ্ত; অচিরেই ইহাদিগকে আইন দ্বারা Criminal Tribe (অপরাধপ্রবণ জাতি) বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন, নানাভাবে

তদানীন্তন সরকার ইহাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করিলেন ; ক্রমে ইহাদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িতে লাগিল। অগত্যা ইহারা দেশত্যাগ করিয়া পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহ, যেমন ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, উড়িষ্যার নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য ইহাদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল ; তাহাদের সামাজিক সংহতি বিনষ্ট হইল, ক্রমে তাহাদের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক জীবনের সকল পরিচয়ই লুপ্ত হইতে লাগিল। বাংলার প্রায় সকল অঞ্চলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যোদ্ধ-সম্প্রদায় সম্পর্কেই প্রায় অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল ; সেইজন্য বাংলার অন্যান্য লোক-নৃত্যের যে পরিচয় আজ প্রকাশ পাক না কেন, যুদ্ধ-নৃত্য সম্পর্কে তাহাতে সুস্পষ্ট পরিচয়ের সন্ধান পাওয়া অনেক সময় কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

পশ্চিম বাংলার সকল উৎসব-পার্বণে এখনও ডোমজাতি যে ঢাক বাজাইয়া থাকে, সেই ঢাক যুদ্ধবাদ্যেরই একটি অঙ্গ ছিল। ডোমজাতি ব্যতীত অন্য কোন জাতি এই অঞ্চলে ঢাক বাজাইতে পারে না, সেই শিক্ষা অন্য কাহারও নাই। সুতরাং ডোমজাতির সঙ্গে যুদ্ধকর্ম এবং তাহার সম্পর্কিত সকল আচরণই জড়িত ছিল। এই অঞ্চলে ডোম-নৃত্য বলিয়া কোন বিষয় না থাকিলেও, যে পাইক ও ঢালী-নৃত্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ডোমজাতিই প্রধানত অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। ঢালী কোন সম্প্রদায়সূচক শব্দ নহে— যুদ্ধকালীন যে ঢাল (shield) ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা ধারণ করিয়া অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধসজ্জা গ্রহণ করিয়া যে নৃত্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহাকে ঢালী নৃত্য বলে। ঢালী-নৃত্য যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত পদাতিক সৈন্যের নৃত্য, ইহার ঢাক (war drum)-বাদ্যকর ডোম, ইহাতে অংশ গ্রহণকারীও প্রধানত ডোম তারপর বাগদি ও মাল, তারপর অন্যান্য জাতি। রায়বেঁশে ও কাঠি-নৃত্যও এই যুদ্ধ-নৃত্যেরই পর্যায়ভুক্ত। রায়বেঁশে-নৃত্য প্রকৃত পক্ষে লাঠি-নৃত্য। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'দেবী চৌধুরাণী'তে, যে লাঠির জয়গান করিয়াছেন, ইহা সেই লাঠি। রায়বাঁশ নামক বিশেষ এক শ্রেণীর শক্ত বাঁশ দ্বারা এই লাঠি নির্মিত হইত বলিয়া ইহা হাতে লইয়া যে নৃত্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহাকেই রায়বেঁশে-নৃত্য বলে। কাঠি-নৃত্যও ইহারই অন্তর্ভুক্ত ; কারণ, কাঠি (stick) বা যাহা হাতে লইয়া কাঠি-নৃত্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহাও লাঠিরই একটি অধঃপতিত (degenerated) রূপ।

যুদ্ধ-নৃত্য প্রধানত সমবেত-নৃত্য—একক নৃত্য নহে; কারণ, ইহা সৈন্যদলের নৃত্য, ব্যক্তিবিশেষের একক অনুষ্ঠান নহে। পাইক, ঢালী, রায়বেঁশে কিংবা কাঠি-নৃত্য প্রত্যেকটিই সমবেত-নৃত্য, ইহাদের একক কোন পরিচয় নাই। পাইকের একক নৃত্য দেখিতে পাওয়া যায় না, দেখিতে পাওয়া যাইবার কথাও নহে। তবে পূর্ব বাংলায় লাঠিখেলা নামক যে অনুষ্ঠান দেখা যায়, তাহা লাঠি-নৃত্য। লাঠি-নৃত্য যেমন একক-নৃত্য হইতে পারে, তেমনই যুগ্ম-নৃত্যও হইতে পারে। যুদ্ধ-নৃত্যের ক্ষেত্রে ইহারা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলিয়াই মনে হয়।

যুদ্ধ-নৃত্য বর্তমান বাংলার লোক-সমাজের মধ্যে নানাভাবে আত্মগোপন করিয়া আছে। মুখোস-নাচ সম্পর্কিত আলোচনায় বলিয়াছি যে, পুরুলিয়ার ছো-নাচ যুদ্ধ-নৃত্যেরই একটি অবশেষ মাত্র—যুদ্ধই প্রধানত ইহার বিষয় এবং পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীর মধ্যে মধ্যে যে সকল অংশে যুদ্ধের অনুষ্ঠান আছে, তাহাই কেবল ছো-নাচের মধ্য দিয়া রূপায়িত হইয়া থাকে, সাধারণত গীতিসুলভ কোন বিষয়ই ছো-নাচের মধ্য দিয়া রূপায়িত হয় না। সমাজে প্রকৃত যুদ্ধের কার্য লুপ্ত হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধের সংস্কার লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে না, সাংস্কৃতিক জীবনের নানারূপের মধ্য দিয়া তাহা বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। ছো-নাচের মধ্য দিয়া তাহারই একটি রূপ প্রকাশ পাইয়াছে।

অনেক সময় ব্রত-নৃত্যের ভিতর দিয়া যুদ্ধ-নৃত্যের কোন কোন রূপ আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। এই সম্পর্কে বীরভূম জিলার ভাঁজো-নৃত্য এবং পুরুলিয়া জিলার জাওয়া-নৃত্যের কথা উল্লেখ করিতে হয়। ভাঁজো-নৃত্যে নৃত্যের ভিতর দিয়া একটি কৃত্রিম যুদ্ধের (mock fight) অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। একদল যুবক সারি বাঁধিয়া একদল যুবতীর সম্মুখে দাঁড়ায়। তারপর একটি বালিস্তূপের দিকে একদল নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া যায়, পুনরায় পশ্চাতে ফিরিয়া আসে—এইভাবে একদল নৃত্য করিতে করিতে যখন সম্মুখে অগ্রসর হয়, তখন আর একদল নৃত্য করিতে করিতে পশ্চাৎ অপসরণ করিতে থাকে। ভাঁজোর বালি অধিকার লইয়া এই 'কপট সংগ্রামে'র অভিনয় হয়। পুরুলিয়া জিলায় ইহার রূপটি সামান্য একটু স্বতন্ত্র। সেখানে নৃত্য বা 'সংগ্রামশীল' উভয় দলই যুবতী দ্বারা গঠিত, যুবকেরা দূরে দাঁড়াইয়া তাহা দর্শন করে মাত্র।

রাবণ-কাটা নৃত্য

বিষ্ণুপুরের মল্লরাজদিগের প্রবর্তিত একটি উৎসবের নাম রাবণ-কাটা নৃত্যোৎসব। রাবণের মূর্তি নির্মাণ করিয়া তাহাতে কাষ্ঠনির্মিত দশমুণ্ডের মুখোস পরাইয়া দেওয়া হয়। দুর্গাপূজার পর দ্বাদশী তিথিতে অনুষ্ঠিত এই উৎসবে রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্র প্রধানত হনুমান এবং জাম্বুবান সাজিয়া নৃত্য করা হইত। হনুমান মৃত্তিকানির্মিত বিরাট রাবণের মূর্তিকে দ্বিখণ্ডিত করিত। নৃত্যের ভিতর দিয়া সমগ্র অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপন করা হইত। এখনও ইহার কিছু অবশেষ রহিয়াছে।

রায় বেঁশে

বাংলাদেশের বিলুপ্ত প্রায় এক শ্রেণীর যুদ্ধ নৃত্যের নাম রায় বেঁশে। এই নৃত্যে বিশেষ এক শ্রেণী বাঁশ লাঠিরূপে ব্যবহৃত হয়, বাঁশের নাম রায় বাঁশ, সেই জন্য নৃত্যের নাম রায় বেঁশে বা রায় বাঁশিয়া। ইহা প্রধানত সামন্তরাজদিগের পাইকদিগের নৃত্য। এক হাতে লম্বা লাঠি আর এক হাতে ঢাল লইয়া নগ্ন গাত্রে পাইকদিগের সমবেত নৃত্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ঢাকের বাদ্যের তালে তালে এই নৃত্য হয়, ইহাতে কোন সঙ্গীত নাই। মধ্যে মধ্যে নৃত্যকারীদিগের মুখ হইতে উচ্চ চীৎকার (yell) শুনিতে পাওয়া যায় মাত্র। বাংলার পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে এই নৃত্যের কিছুদিন পূর্বেও প্রচলন ছিল।

শবখেলা নৃত্য

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমায় চৈত্র সংক্রান্তির গাজনের সময় সন্ন্যাসীরা এক বীভৎস আচার পালন করিত; শ্মশান হইতে মৃতদেহ সংগ্রহ করিয়া, কিংবা শববাহকদিগের নিকট হইতে শবদেহ কাড়িয়া লইয়া তাহা লইয়া নৃত্য করিত। বাঁশের মধ্যে মৃতদেহ ঝুলাইয়া তাহার দুই দিক কাঁধে লইয়া ঢাক বাদ্যের তালে তালে এই বীভৎস আচার-নৃত্যের অনুষ্ঠান হইত। সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে তাহা লুপ্ত হইয়াছে।

সঙের নৃত্য

নানা শোভাযাত্রায় সঙ সাজিয়া একক, যুগ্ম এবং সমবেত নৃত্যের প্রথা প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত আছে। গাজনে শিব গৌরী ভূত প্রেতের সঙ সাজিয়া নৃত্য

করা হয়। ঢাকার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জন্মাষ্টমী শোভাযাত্রায় ভাগবতের নানা বিষয় অবলম্বন করিয়া সঙ সাজিবার রীতি ছিল। তাহাদের নৃত্য বিশেষত্বপূর্ণ ছিল। কলিকাতার জেলে পাড়া সঙয়ের নৃত্য কৌতুককর ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঙ্‌য়ের নৃত্যের উদ্দেশ্য কৌতুক সৃষ্টি, কিন্তু একমাত্র ঢাকার জন্মাষ্টমী শোভাযাত্রার সঙই গুরুত্বপুর্ণ পৌরাণিক বিষয়-বস্তুরই রূপদান করিত। যেমন শ্রীকৃষ্ণের জন্মোপলক্ষে নন্দালয়ে গোপগণের আনন্দ প্রকাশ বিষয়ক সঙের নৃত্যে গোপের বেশ ধরিয়া অন্তত ২৫।৩০ জন পুরুষ সারিবদ্ধভাবে নাচিতে নাচিতে শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইয়া যাইত। নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ বাদ্যসহ সঙ্গীত হইত। পুরুষের নৃত্য এবং উল্লাসের অভিব্যক্তি ইহার অভিপ্রায় থাকিত বলিয়া তাহা অনেক সময় উদ্দাম হইয়া উঠিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এই প্রকার বহু নৃত্যের দল সৃষ্টি হইত এবং তাহা বিরাট শোভাযাত্রার অন্তর্নিবিষ্ট হইত। ক্রমে সঙের নৃত্য গুরুত্বপুর্ণ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া লঘু ব্যঙ্গাত্মক বিষয় অবলম্বন করিল। কলিকাতার জেলেপাড়ার সঙ ও তাহার নৃত্য তাহার নিদর্শন। তখনই ইহার বিনাশ অনিবার্য হইয়া উঠিল। কিন্তু ঢাকার জন্মাষ্টমী শোভাযাত্রার সঙ্‌ শেষ পর্যন্তও কোন লঘু ব্যঙ্গাত্মক বিষয়কে নৃত্যের মধ্যে স্থান দেয় নাই।

লেটো নৃত্য

বীরভূম অঞ্চলের লোক-সঙ্গীত রূপে যে লেটো গানের উল্লেখ করা হইয়াছে, (পুর্বে দেখ), তাহা নৃত্য সহযোগে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকেই লেটো নৃত্য বলে। ইহাতে নারীর বেশ ধারণ করিয়া পুরুষ নৃত্য করে। বৎসরের যে কোন সময় লেটো নৃত্য ও লেটো গান হইতে পারে। পুর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, নৃত্য শব্দটি হইতে লেটো শব্দের উদ্ভব হইয়া থাকিবে, সেইজন্য ইহাতে নৃত্য অপরিহার্য রূপে দেখা যায়।

সারি নৃত্য

লোক-নৃত্যকে সাধারণত দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন সারি নৃত্য ও একক নৃত্য। ইংরেজি 'গ্রুপ ডান্স' (group dance) কথাটিকেই সারি নৃত্য বলিয়া বাংলায় উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার মধ্যে কতকটা অস্পষ্টতা থাকিয়া যায়। সারি নৃত্য বলিলেই হয়ত কেহ সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া বহু সংখ্যক নরনারীর নৃত্য মনে করিতে পারেন ;

কিন্তু ইংরেজি 'গ্রুপ ডান্স' কথার অর্থ তাহা নহে ; ইহাতে সারিবদ্ধ ভাবে না দাঁড়াইয়াও অর্থাৎ এলোমেলো দাঁড়াইয়া ক্ষুদ্র জনতার যে নৃত্য, তাহা বুঝাইতে পারে। বাংলায় এই ভাবটি গোষ্ঠীনৃত্য শব্দ দ্বারাও প্রকাশ করা যাইতে পারে। কিন্তু গোষ্ঠীনৃত্য কথাটি বাংলায় অপরিচিত, বরং সমবেত কণ্ঠে যে লোক-সঙ্গীত গীত হয়, তাহা সারি গান বলিয়া পরিচিত, সুতরাং সেই সূত্রে এই অর্থে নৃত্য কথাটি ব্যবহার করা যায়। ইংরেজী 'সোলো ডান্স' (solo dance) শব্দটিকেই একক নৃত্য বলিয়া বাংলায় অভিহিত করা যায়; ইহার অর্থ পরিগ্রহ করিতে কোন বেগ পাইতে হয় না।

গভীরভাবে অনুশীলন করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, গোষ্ঠী বা সারি নৃত্যই সমাজে প্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল, ক্রমে সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির প্রতিভাও যখন সমাজে স্বীকৃতি লাভ করিতে আরম্ভ করিল, তখনই প্রকৃতপক্ষে একক নৃত্যের প্রচলন আরম্ভ হইল। একথা অনেকেই মনে করিয়া থাকেন যে, সাংস্কৃতিক সকল উপকরণ প্রথমত গোষ্ঠীজীবন হইতে সামগ্রিক ভাবেই বিকাশ লাভ করিয়াছে। এইভাবে লোক-সাহিত্যও যেমন গোষ্ঠীরই সৃষ্টি, লোক-নৃত্যও তেমনই গোষ্ঠীগত ভাবেই উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, নৃত্যের সম্পর্কে এ কথা সকল সময় বলা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে. ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে আদিম সমাজের পুরোহিত বা ওঝাগণ অনেক সময় যে নৃত্যের অনুষ্ঠান করিত, তাহা অনেক সময়ই একক নৃত্যই ছিল, তাহা সারি নৃত্য ছিল না। অথচ ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্যই আদিম সমাজে নৃত্যের প্রথম প্রচলন হইয়াছিল বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। এই উভয় মতবাদের পক্ষে এবং বিপক্ষে সমান যুক্তি আছে ; সুতরাং এ বিষয়ে কোন মতবাদই চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। তবে একথা সত্য, ঐন্দ্রজালিক (magical) ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিবার জন্য যে সকল নৃত্যের আজ পর্যন্তও সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেকটিই যে একক নৃত্য, তাহা নহে। এমন কি, উত্তর বঙ্গ অঞ্চলের কোচ কৃষক রমণীদিগের মধ্যেও অনাবৃষ্টি দূর করিবার উদ্দেশ্যে 'হুদুম দেও' নামক দেবতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য যে নৃত্য প্রচলিত ছিল, তাহা সমবেত অর্থাৎ সারি নৃত্য, ব্যক্তিবিশেষের একক নৃত্য নহে। যশোহরের পল্লী অঞ্চলে প্রচলিত শীতলা কিংবা গুজরাটের গরবা নৃত্যেরও যে ঐন্দ্রজালিক

উদ্দেশ্য আছে, তাহা সত্য। ইহাদের প্রত্যেকটিই সমবেত নৃত্য। তবে যে সমাজে ওঝার প্রভাব যত বেশী, সেই সমাজেই একক নৃত্যের প্রভাব তত বেশী। আদিম সমাজেও ওঝার প্রভাব-বহির্ভূত ক্ষেত্রে একক নৃত্য অপেক্ষা সারি নৃত্যের প্রভাবই অধিক অনুভূত হয়।

একক নৃত্য কেবলমাত্র যেমন ওঝা শ্রেণীর পুরুষের হইতে পারে, তেমনই কেবলমাত্র নারীরও হইতে পারে। ইহার কারণ, নারীও ওঝার স্থান গ্রহণ করিতে পারে। উড়িষ্যার কোরাপুট জেলার গুণুপুর তালুকের অধিবাসী আদিম জাতির মধ্যে নারীই ওঝার কাজ গ্রহণ করিয়া একক ঐন্দ্রজালিক (magical) নৃত্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসী গারো ও খাসি জাতির মধ্যেও এই প্রথার অস্তিত্ব আছে। আদিম কৃষিজীবী সমাজে নারীরই কর্তৃত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেই সূত্রে মনে হয়, বাংলাদেশেরও সাংস্কৃতিক জীবনের ভিত্তিমূলে নারীর একটি বিশেষ অধিকার স্বীকৃত হইত, তাহার ফলে নারী ওঝার কিংবা পুরোহিতের স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। অতএব নারীর একক ঐন্দ্রজালিক নৃত্যও এদেশে অপ্রচলিত ছিল না। এখনও বাংলার সমাজ-জীবনের মধ্যে ইহার পরিচয় নানাভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ওঝা কিংবা আদিম সমাজের পুরোহিতের ঐন্দ্রজালিক নৃত্য ক্রমে ইহার অলৌকিক লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া প্রত্যেক সমাজেই অলৌকিক উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ কেবলমাত্র আনন্দদায়ক (secular) নৃত্যানুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। বাংলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

সারি নৃত্যের মধ্যে কেবলমাত্র পুরুষের যেমন সারি নৃত্য হইতে পারে, নারীরও সারি নৃত্য হইতে পারে।

সারি নৃত্যের মধ্যে মিশ্র সারি নৃত্যই সর্বপ্রথম উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়াও কিছুই অসম্ভব নহে। ঐন্দ্রাজালিক চেতনা হইতেই যদি নৃত্যের উদ্ভব হইয়া থাকে, তবে সারি নৃত্যও তাহা হইতেই উদ্ভূত বলিয়া মনে হইতে পারে। যদি তাহাই হয়, তবে নৃত্যের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য প্রথম হইতেই রক্ষা হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং পুরুষের সারি নৃত্য এবং নারীর সারি নৃত্য, তাহাও যে পরস্পর স্বাধীনভাবে উদ্ভূত হইয়াছে এবং ক্রমে সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশের ধারায় যখন নারী ও পুরুষের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার স্বীকৃত

হইয়াছে, তখনই মিশ্র নৃত্যের প্রচলন হইয়াছে, তাহা মনে হইতে পারে। সর্ববিধ সামাজিক অনুষ্ঠানে নারীর সহজভাবে পুরুষের সঙ্গে যোগদানের নিদর্শন কেবলমাত্র কতকটা অগ্রসর সমাজেই সম্ভব হইয়াছে, আদিতম সমাজে তাহা সম্ভব হয় নাই। সেইজন্য এখন পর্যন্ত ভারতবর্ষেও যে সকল আদিবাসী সমাজ প্রাচীনতর সমাজ-জীবনের ধারা অনুসরণ করিয়া চলিতেছে, তাহাদের মধ্যে মিশ্র সারি নৃত্যের প্রচলন দেখা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, আসামের আদিম নাগা সমাজে মিশ্র সারি নৃত্য নাই, অথচ মণিপুরী সমাজে তাহা আছে। আদিম নাগাজাতি তাহাদের উপজাতীয় ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে বলিয়াই সেখানে মিশ্র সারি নৃত্যের প্রচলন সম্ভব হয় নাই; কিন্তু মণিপুরী সমাজ আদিম নাগা জাতিরই একটি শাখা হওয়া সত্ত্বেও ব্রহ্মদেশীয় সাংস্কৃতিক জীবনের প্রভাববশতই হউক, কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, দীর্ঘকাল ধরিয়াই মিশ্র সারি নৃত্যের অনুষ্ঠান করিতেছে। কিন্তু বর্তমানে ইহার উপর নানাদিক হইতে পাশ্চাত্ত্য ও বৃহত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব স্থাপিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার ফলে দেখা যাইতেছে, তাহাতে পুনরায় মিশ্র সারি নৃত্যের প্রভাব লুপ্ত হইতেছে। এমন কি, সুপ্রসিদ্ধ মণিপুরী রাস নৃত্যের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় বর্তমানে যে নৃত্য করিয়া থাকে, সেও পুরুষবেশী নারীই হইয়া থাকে। ইহা নাগাজাতির আদিম সংস্কারের প্রভাবজাত নহে, বরং স্বতন্ত্র এক সংস্কৃতির প্রভাবের ফল বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। ছোটনাগপুর এবং মধ্যভারতের অধিবাসী প্রায় কোন উপজাতির মধ্যেই মিশ্র সারি নৃত্য আজও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা পাশ্চাত্ত্য কিংবা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব জাত নহে, বরং মৌলিক আদিম সংস্কৃতিরই প্রভাবজাত। কারণ, এখনও এই অঞ্চলে নৃত্যের একটা সামাজিক আচারগত (ritual) মূল্য সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয় না। প্রত্যেক নৃত্যের সঙ্গেই এক একটি আচারগত উদ্দেশ্য জড়িত হইয়া থাকে, কোনদিক দিয়া নূতন কোন উপকরণ কিংবা আঙ্গিক ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে ইহার আচারগত উদ্দেশ্য সার্থক হয় না, এই বিশ্বাস হইতেই আদিবাসীর জীবনে দীর্ঘকাল ধরিয়া নৃত্যের রূপ কিংবা প্রয়োগ-পদ্ধতির শৈথিল্য দেখা দিতে পারে নাই। কেবলমাত্র বর্তমান ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে এই সকল অরণ্যচারী আদিবাসী যখন রাজধানীতে নিমন্ত্রিত হইয়া নৃত্যানুষ্ঠান দেখাইতে বাধ্য হয়, তখন

তাহাদের রূপ এবং আঙ্গিকে পরিবর্তন দেখা যায়; সুতরাং তাহা আদিবাসীর নৃত্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। আদিবাসী কিংবা লোক-নৃত্য মাত্রই সমাজ-জীবনে অন্তর্নিবিষ্ট (integrated) হইয়া থাকে; সেই সমাজ কিংবা তাহার আচারনিরপেক্ষ কোন মূল্য নাই; সামগ্রিক ভাবে সমাজ-দেহেই তাহাদের যথার্থ রূপ পরিস্ফুট হয়; সুতরাং তাহার মধ্যেই ইহাদের মূল্য বিচার করিবার প্রয়োজন হয়।

বাংলার লোক-নৃত্যের মধ্যেও স্ত্রীপুরুষের মিশ্র সারিনৃত্য নাই। ইহা যে সর্বত্রই হিন্দু-মুসলমান কিংবা ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবের ফল, তাহা নহে। অনেক সময়ই ইহা আদিম সমাজ-জীবনের সাংস্কৃতিক প্রভাবেরই ফল। এই উপলক্ষে বাংলার ভাঁজো নৃত্যের উল্লেখ করা যায়। বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় এই নৃত্য প্রচলিত আছে, তাহার বিশেষত্ব এই যে স্ত্রী পুরুষ মিলিয়া এই নৃত্যের অনুষ্ঠান করিলেও, তাহা মিশ্র সারি নৃত্য বা mixed dance বলিতে যাহা বুঝায়, ইহা তাহা নহে। কারণ, পুরুষ এবং নারী ইহাতে দুইটি স্বতন্ত্র সারিতে বিভক্ত হইয়া পরস্পর মুখোমুখী হইয়া দাঁড়ায়, একদল নৃত্য করিয়া কিছুদূর আগাইয়া যায়, তারপর নৃত্য করিতে করিতে পিছু হটিয়া আসে, তখন আর একদল অনুরূপ ভাবে নৃত্য করিতে করিতে প্রথমত আগাইয়া যায়, তারপর পিছাইয়া আসে, ইহাতে পুরুষ এবং নারী পরস্পরকে স্পর্শ করে না। ছোট-নাগপুর এবং মধ্য প্রদেশের সমগ্র আদিবাসী অঞ্চলের নৃত্যই প্রায় এই রূপ।

হুদুম দেও নৃত্য

উত্তর বাংলার একটি মেয়েলী ঐন্দ্রজালিক নৃত্যের নাম হুদুম দেও নৃত্য। অনাবৃষ্টির সময় এই নৃত্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। গভীর রাত্রে গৃহস্থ বধূগণ অন্যের দৃষ্টির অন্তরালে এই নৃত্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। শুনিতে পাওয়া যায়, ঐন্দ্রজালিক উদ্দেশ্যে বিবস্ত্র হইয়া নারীগণ এই নৃত্য করেন।